

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাক্ষৌ জয়ত:

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪২শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৯৬ { ১ম সংখ্যা



শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীগোর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্যালয় :—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭

২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুদ্রণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যশীলাপ্রসিদ্ধ গুঁ বিষ্ণুশ্যাম

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞানকেশবগোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত নান্দারাম মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমঠী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ. বি. টি., কাব্য-ব্যাখ্যাতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিজ্ঞানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাখ্যাতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাপ্রক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠ, তেবরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও

নবদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরান্দ ৫০৪ বিষ্ণু হইতে ৫০৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩২৬ ফাল্গুন হইতে ১৩২৭ মাঘ,
খ্রষ্টাব্দ ১৯২০ মার্চ হইতে ১৯২১ ফেব্রুয়ারী ।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

শ্রীমহৎসংস্কারী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রভাকর কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণবেদান্ত আচার্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় ঋঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আজীবন সদস্যগণের তালিকা

- ১। শ্রীহরিশাগর্ত দাসাধিকারী, ২২ এস. এস. চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
পোঃ নিমতা, কলিকাতা-৪২।
- ২। শ্রীবীন্দ্রনাথ হালদার, মাটিদহ, পোঃ শঙ্করপুর (হুগলী)।
- ৩। শ্রীমিত্যানন্দ দাসাধিকারী, ৮/২ বি, প্রভুরাম সরকার লেন,
টেংরা, কলিকাতা-১৫।
- ৪। শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ৭১, উত্তর লেন, চুঁচুড়া (হুগলী)।
- ৫। শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, সংপুর, পোঃ মহলদপুর,
(২৪ পরগণা উত্তর)।
- ৬। শ্রীযুক্তা কল্যাণী বিশ্বাস, মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।
- ৭। শ্রীযুক্তা রেণুকা ঘোষ, নবীন সেন রোড, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।
- ৮। শ্রীরাধামাধব দাসাধিকারী, ৮৪, গোয়াস্টুলি রোড,
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
- ৯। শ্রীযুক্তা উমারানী দেবী সিন্ধা, বৈচিগ্রাম (হুগলী)।
- ১০। শ্রীযুক্তা উমারানী দেবী, কলেজ রোড, চুঁচুড়া (হুগলী)।
- ১১। শ্রীযুক্তা আরতি ভট্টাচার্য্য, বেলি গোলা, উকিলপাড়া, পোঃ
বায়গঞ্জ (পশ্চিমদিনাজপুর)।
- ১২। শ্রীশৈলেনগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী, চাঁদনগর (২৪ পরগণা দক্ষিণ)।
- ১৩। ডাঃ সঞ্জীব কুমার দে, ৩৯১/২, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি
(দার্জিলিং)।
- ১৪। শ্রীভক্ণ কুমার পাণ্ডি, ১৪৪/১, ভ্রামনগর রোড, কলিকাতা-৫৫।

আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক গ্রাহকগণকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসের সহিত যোগাযোগ করিয়া গ্রাহক মূল্য জমা দিয়া পাকা রসিদ লইতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষ ত্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অষ্টগ্রহ-সমাবেশরূপ বিপদাপদেও ভক্তগণের হরিকীর্্তনমুখে হরিভজন কর্তব্য [পত্র]	১।২
অবতারবাদ	১।২৩
অনধিকারীর নিজ্জ'ন-ভজনের ছলনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ও হরিভজন-বিরোধী	৪।১২২
“অষ্টবক্ষ্য-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ শ্রবণং নৈব কর্তব্যম্”	৬।২২৭
অনাশ্রু জ্ঞান	৭।২৪৮
অভিধেয় তত্ত্ব	১০।৩৭৭, ১১।৪২১
স্মৃতি কুশমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	২।৬১
“আশা হি পরমং হৃৎখং নৈরাশ্রং পরমং সুখম্”	৪।১৩৭
আশ্রমীয় অশ্রুশাসন মানিয়া লওয়াই শিষ্টাচার [পত্র]	১০।৩৭১
উদ্বীপন [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজায়	২।৩৫৩
এক অঙ্গে দুই রূপ	১।৩৫
কুটীনাটী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৪
কৃষ্ণ-স্ববাটিকম্—শ্রী	১।১
কৃষ্ণবৈপায়ন-বেদব্যান্ধকৃতং শ্রীবলদেব স্তোত্রম্—শ্রী	২।৪১
কৃষ্ণ-বন্দনা—শ্রী [কবিতা]	৬।২৪০
কৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ	২।৩৩৭
গগনহ ত্রিরাশাবির্ভাব [কবিতা]	১০।৩২৩
গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল [শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িতে প্রদত্ত]	১।৩৬, ২।৭৩, ৩।১০৬, ৪।১৪৭, ৫।১৮৩
গুরু-মহারাজের উত্তরবঙ্গ ও আমায়ে শ্রীহরিকথা প্রচার—শ্রীল	৩।১১৬

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রী [শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৬২২১, ৭২৬৮, ৮৩০৫, ৯৩৪৭, ১০৩৮২, ১১৪৩২, ১২৪৫৯
গুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা] শ্রী তত্ত্বপ্রজ্ঞান কেশব গোঁস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১৪১৭
গুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীবাসপূজা—শ্রী	১১৪১৮, ১২৪৫৫
গুরু-চরণে প্রার্থনা-প্রস্থনাঞ্জলি—শ্রী [কবিতা] শ্রীমুক্তিবেদান্ত বামন গোঁস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১৪৩১
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১১৪৩৬
গুরুদেবে নিবেদন—শ্রী [কবিতা]	১১৪৩৬
গৃহস্থের কর্তব্য কি ?	১২৪৫৩
গোপীগণ-দ্বিজবর-কৃতং শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষাকবচম্	৫১৬১
গৌড়ীয়-পত্রিকা—শ্রী [কবিতা]	১২৯
গৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রশস্তি—শ্রী [পত্র]	১৩১
গৌড়ীয়ের ষিচস্বাবিংশ-বর্ষ	১৪০(৩)
গৌর-ভজন—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫১৬৯
গৌরান্দ-মহিমা—শ্রী [কবিতা]	৮৩১১
চতুস্মুখ-ব্রহ্মকৃতং শ্রীশ্রীধাকৃষ্ণ-দুর্গলস্তোত্রম্—শ্রী	৭২৪১
চতুস্মুখ-ব্রহ্মকৃত্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্ততিঃ—শ্রী	৯৩২১, ১০৩৬১, ১১৪০১, ১২৪৪১
চৈতন্তদেবের বৈশিষ্ট্য—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	২৬৮
চৈতন্তে মর্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ—শ্রী [প্রতিবাদ]	৫১৯৮,
	৬২৩১, ৭২৭৪, ৮৩১৫, ৯৩৫৪, ১০৩৯৬, ১২৪৬৬
জন্মান্তরবাদ	২৫৭, ৩২৫
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আস্থান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩১১৯
জয়দেবের শ্রীগীতগোবিনদের আদলে	৯৩৪২, ১০৩৭১
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে লাদর আস্থান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪১৫৯
তৃতীয় জন্ম [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯৩২৭
দীক্ষা-বিধান [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২৪৭

অবস্থার নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরুবর্গের নিকট রূপা প্রার্থনা [পত্র]	৬।২৩৮
দীনের বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	১২।৪৫১
দুর্ভাসামুদ্রিকৃতং শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রম্	৮।২৮১
ধর্ম কি ? সকল ধর্ম কি সমান ?	২।৬৯
ধর্ম ও বিজ্ঞান	১০।৩৮৯, ১১।৪২৬
ধাত্ত ও জামা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৮
নবদীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২।৭৯
নব-তত্ত্ব ভজনের মূল	৩।১০০
নবদীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৩৯
নামাশ্রয়ের ফল [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৫
নিগম ও আগম [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	১।৭
নিষ্ঠার সহিত চাতুর্মাছাদি ব্রতপালন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইবার উপদেশ [পত্র]	৩।৮৯
নির্যাপ	৩।১১৮
নিজ পরিচয় [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	৮।২৮৫
নিষ্ঠাবান্ শুদ্ধবৈষ্ণবের পক্ষে সংস্কারবিহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির পাতিত অন্নগ্রহণ অসুচিত ; শিষ্যের পক্ষে গুরুপাদপদ্মের বিচারধারা গ্রহণ ও তদনুকূল আচরণ কর্তব্য [পত্র]	৮।২৮৭
নিঃসর্ত্তে নিঃশূর্ণ-দানস্থলেই মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা [পত্র]	৯।৩৩০
নিবেদন-কুসুমাজলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসবে	৯।৩৪১
পত্রে প্রেম ও তত্ত্বের [পত্র]	৫।১৭৫
পঞ্চরস সেবা-শিখাধারা গোড়ীয়ের আরতি	৬।২১৮
পরমাথী কে ? [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৩
প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ-ক্রম ও তৎসংশোধন-প্রচেষ্টা	১।২৭
প্রাত্যহিক জীবন	৩।১১১, ৪।১৫৫
বর্ষারম্ভে নিবেদন	১।১৬
বর্ণাস্তর [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	৩।৮৬, ৪।১২৬
বহুদেব-দেবকীকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্—শ্রী	৪।১২১

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

বলদেব-নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর একই সিংহাসনে	
অবস্থিতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্বত কিনা ?—শ্রী	৫।১৭৪
বর্ষ-পরীক্ষা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৬
বন্দনা [কবিতা] শ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন	
গোশ্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১২।৪৬৬
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি [পত্রিকার ভিক্ষাবৃদ্ধির বিজ্ঞাপন]	২।৭২
বিহ্বল প্রতাপরুদ্র [কবিতা]	২।৭৮
বিজ্ঞপ্তি [শ্রীমদ্ভগবদগীতার বিজ্ঞাপন]	৫।১৮২
বৃন্দাবনবাসী পদে প্রার্থনা--শ্রী [কবিতা]	৩।১১৫
ব্যবহার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০২
ব্যানপূজা—শ্রীশ্রী	১।৪০(১), ২।৬৩
ব্যানপূজা কাহাকে বলে ? —শ্রী	৪।১৩০
ব্যানপূজা—শ্রী	৭।২৫৩, ৮।২২২
ব্যানপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্রহ্ম-মহেশ্বরাদি-দেবগণকৃতং শ্রীদেবকী-গর্ভস্তোত্রম্—শ্রী	৩।৮১
ব্রহ্মমণ্ডলে বৈষ্ণবাহুগমনে—শ্রী	৬।২১৫, ৮।২২০
ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৬৪
ভগবান্ আচার্য্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৪
ভগবৎপ্রের্ত্তা শ্রীগুরুদেব	১২।৪৬৭
ভক্তিকুমুদ সন্ত গোশ্বামী মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল	
[শ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন গোশ্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব- তিথিতে প্রদত্ত]	১।১২, ২।৫৩, ৩।২০, ৪।১৩২
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোশ্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—	
শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭২
ভাগবত ভ্রবণ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৬
ভোগী, দেহারামী, অলস ও ক্রোধীব্যক্তি মঠবাস ও	
হরিলেবার অনধিকারী [পত্র]	৬।২১০
ভ্রম-সংশোধন	৬।২৪০, ১১।৪৩৫
মহাপ্রভু-দর্শনে—শ্রীমন্ [কবিতা]	১।১০
মহাপ্রসাদে বিতর্ক—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৩
মহাপ্রভুর কথা প্রচারই বাস্তব বদান্ততা ও জীবদেহ—	
শ্রীমন্ [পত্র]	২।৫২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
মহাপ্রভুর আলোকে রথযাত্রা—শ্রীমন্	৪।১৪১, ৫।১২৩
মহামুনি-গর্গাচার্য্যকৃতং শ্রীবলরাম-কৃষ্ণনামকরণম্	৬।২০১
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১২।৪৫৮
মহুগ্ন-সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৪, ৬।২০৪, ৭।২৪৪
মর্গভেদী কান্না	৯।৩৫৮
মাৎসর্য্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৪৩
মৃষ্টি-ভিক্ষা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪।১২৩
মেঘালয় গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৮।৩১৩
রামানন্দ রায়-মুখে শ্রীময়মহাপ্রভুর সাধা-সাধন	
রসকথা প্রচার—শ্রীল	৭।২৫৮, ৮।৩০০
রাধারাবীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তুলসী-প্রদান	
সম্বন্ধে প্রশংসন—শ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১২।৪৪৮
রূপ ও সৌন্দর্য্য	৭।২৬৪
স্বাভাবিক ব্যবস্থাসমূহের বৈষ্ণবগণের চাব-আবাদ অর্থে নহে [পত্র]	৭।২৪৯
অঙ্কালি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী	
মহারাজের শুভ প্রকট-বাসরে	১।৩৯
অঙ্কালি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বামন গোস্বামী মহারাজের	
শুভাবির্ভাব-তিথিপূজার	১০।৩৭৬
শ্রীক্ষেত্র দর্শন [কবিতা]	৪।১৫৭, ৫।১২০, ৬।২১১, ৭।২৫০
সম্বন্ধ-তত্ত্ব	৯।৩৩০
সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১১।৪১২
সংক্রিয়ামার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা [বিজ্ঞাপন]	১১।৪৩০
সাধু-সঙ্ঘের প্রণালী-বিচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪০৪
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০(৮)



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

। শ্রীশ্রীগুরোগোরাধো জয়ত: ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরমর ।

অধোমলে অহৈতুকী ভক্তি বিরম্ভ ॥

অন্ত ধর্ম হুতুরূপে পালে যেই জন ।

হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ {	৩ বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ, ১০৪ শ্রীগোরাধ	} ১ম সংখ্যা
	২৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৯৬, ইং ১৪।৩।৯০	

সামুদায়

শ্রীকৃষ্ণ-স্তবাক্ষকম্

বিষ্ণু-ব্রহ্মা-মহেশ্বরকৃতম্

[শ্রীমদ্ভগবতঃসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-
বহুলাংশসংবাদে তৃতীয়েহধ্যায়ে]

শ্রীদেবা উচুঃ—

১। কৃষ্ণায় পূর্ণপুরুষায় পরাংপরায়
যজ্ঞেশ্বরায় পরাকরণ-কারণায় ।
রাধাবরায় পরিপূর্ণতমায় সাক্ষাদ-
গোলোকধাম-ধিষণায় নমঃ পরম্ ॥ ১৫ ॥

[দেবগণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম জানিতে পারিয়া অতীব
বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—]

দেবগণ বলিলেন,—পূর্ণপুরুষ পরাংপর যজ্ঞেশ্বর পরমকারণকারণ রাধাপতি
দাম্বাৎ গোলোকপতি পরিপূর্ণতম পরমপুরুষ কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

২। যোগেশ্বরঃ কিল বদন্তি মহঃ পরং হ্যং
তত্রৈব সাঙ্ঘতমনাঃ কৃতবিগ্রহঞ্চ ।
অস্মাভিন্নস্ত বিদিতং যদদোহদ্বয়ন্তে
তস্মৈ নমোহস্ত মহস্যাং পতয়ে পরস্মৈ ॥ ১৬ ॥

যোগেশ্বরগণ আপনাকে পরম তেজোরূপ বলেন, স্বাতন্ত্র্য-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ
আপনাকে দেহধারী বলিয়া থাকেন, আমরা আজ আপনাকে যে অংকুররূপে
জানিতে পারিলাম, সেই পরম তেজোরূপী আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

৩। ব্যঙ্গেন বা ন নহি লক্ষণয়া কদাপি
ফোটেন যচ্চ কবয়ো ন বিশস্তি মুখ্যাঃ ।
নির্দেশ্যভাব-রহিতং প্রকৃতেঃ পরঞ্চ
হ্যং ব্রহ্ম নিষ্ঠুর্গমলং শরণং ব্রজানঃ ॥ ১৭ ॥

হে ব্রহ্ম! মুখ্য মুখ্য কবিগণ ব্যঞ্জনা বা লক্ষণা আরোপ কিংবা ফোট
অর্থাৎ শব্দের সূক্ষ্ম শক্তিদ্বারা আপনার প্রকৃত রূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না;
আপনি অনির্করচর্য ও যায়্যারহিত; অতএব পূর্ণব্রহ্ম; আমরা আপনার
শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৭ ॥

৪। হ্যং ব্রহ্ম কেচিদ্ বদন্তি পরে চ কালং
কেচিং প্রশান্তমপরে ভুবি কর্মরূপম্ ।
পূর্বে চ যোগমপরে কিল কৰ্ত্তৃভাব-
মন্তোক্তিভিন্ন বিদিতং শরণং গতাঃ স্ম ॥ ১৮ ॥

কেহ আপনাকে বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন কাল, কেহ বলেন প্রশান্তরূপ,
কেহ বলেন পৃথিবীর কর্মরূপী, কেহ বলেন যোগরূপ, কেহ বলেন কৰ্ত্তা,—
এইরূপ বিভিন্ন বিরুদ্ধ উক্তি-পরস্পরাদ্বারা আপনার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব;
অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৮ ॥

৫। শ্রোয়স্করীং ভগবতস্তব পাদসেবাং
হিত্বাথ তীর্থ-যজ্ঞনাদি তপশ্চরন্তি ।
জ্ঞানেন যে চ বিদিতা বহুবিন্মসজ্জৈঃ
সন্তোড়িতাঃ কিল ভবন্তি ন তে কৃতার্থাঃ ॥ ১৯ ॥

হে ভগবন্! সর্বশ্রেয়স্করী আপনার পাদসেবা পরিত্যাগ করিয়া বাহারা ভীৰ্ষ-যজ্ঞাদি তপশ্চরণ করেন, কিংবা কেবল জ্ঞানদ্বারা আপনাকে বিদিত হইতে যত্ন করেন, তাঁহারা বহু বিষয়বিশিষ্টায়া সম্ভাষিত হইয়া কৃতার্থ হইতে সমর্থ হন না ॥ ১৯ ॥

৬। বিজ্ঞাপ্যমত্ কিস্মু দেব অশেষসাক্ষী

যঃ সর্বভূত-হৃদয়েষু বিরাজমানঃ ।

দেবৈর্নমস্তিরমলাশয়-মুক্তদেহৈ-

স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ২০ ॥

হে দেব! সম্প্রতি আপনার নিকট আমাদের কি আর বিজ্ঞাপনযোগ্য আছে? আপনি সর্বভূত-হৃদয়বানী ও অশেষ-সাক্ষী; শুদ্ধহৃদয়, পরম মুক্তজন এবং দেবগণও আপনার উদ্দেশ্যে কেবল প্রণামই করিতে সমর্থ। হে ভগবন্! আমরা আপনার সেই পুরুষোত্তমরূপকে প্রণাম করি ॥ ২০ ॥

৭। যো রাধিকাহৃদয়-সুন্দর চন্দ্রহারঃ

শ্রীগোপিকা-নয়নজীবন-মূলহারঃ ।

গোলোকধাম-ধিগধ্বজ আদিদেবঃ

স হং বিপৎসু বিবুধান্ পরিপাছি পাহি ॥ ২১ ॥

আপনি রাধিকা-হৃদয়ের সুন্দর চন্দ্রহার। গোপীগণের নয়ন ও জীবনের মূলহার এবং গোলোকধামের গৃহচূড়া। হে আদিদেব! আপনি দেবগণকে বিপদ হইতে পরিজ্ঞান করুন ॥ ২১ ॥

৮। বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ

গোপালবেশ কুতনিত্য-বিহারলীল ।

রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং হং

গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্মধারাম্ ॥ ২২ ॥

হে রাধেশ! হে বৃন্দাবনেশ! আপনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপতি ও ব্রজ-পতিরূপে গোপালবেশে নিত্য লীলাবিহার করিয়া থাকেন। হে শ্রুতি-ধরাধীশ! আপনি গোবর্দ্ধনধারী, এক্ষণে ক্ষিতিকে উদ্ধারপূর্বক ধর্মরক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

[গোকুলেশ্বর সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণত দেবগণকর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মেঘগন্তীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—যুগে যুগে যখন পাবগুণ যজ্ঞ-দয়াদি ধর্ম পণ্ড করে, তখন স্বয়ং আমিই ভূতলে অবতার পরিগ্রহ করিয়া থাকি।]

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যপ্রিয় ভগবান্ আচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা ও পূর্বজীবন

অনন্ত সংহিতায়াং :—

“আচার্য্য শ্রীল ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়াংশভাক্”।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়াংশ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবান্ আচার্য্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীকব
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নান্তর জ্ঞানশাস্ত্র পাঠ
করিয়া ‘জ্ঞান্যচার্য্য’ নামে বিখ্যাত হন। বাল্যকালে তাঁহার শ্রীচন্দ্রশেখর
আচার্য্যের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
অবতীর্ণ হইয়া বিষয়েতে ও কদর্য্য বামাচাৰ্যাদিতে বিষম বিমুগ্ধ জীবনকলকে,
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্মল প্রেমভক্তিদ্বারা কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। এবং
জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্য-পথাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্যের বিবাহ, বৈরাগ্য ও স্ত্রী-বঞ্চনা

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দেখিয়া আচার্য্যের কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যোদয় হইতে
লাগিল। তিনি পূর্বের জ্ঞান আর সংসারে মনোনিবেশ করেন না। সর্বদাই
মহাপ্রভুর সঙ্গ করিতে উৎসুক। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ঘোর বিষয়ী
পিতা শ্রীশতানন্দ খান নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীমধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত তাঁহার
বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল।
ইতিমধ্যেই গঙ্গার প্রবাহে তাঁহার, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ও মধুসূদন ঘটকের
বাতী ভগ্ন হইয়া জলপাং হইলে, সর্বাগ্রে মধুসূদন ‘দ্বারবাসিনী’-নিবাসী
দ্বারপাল নামক শূদ্র রাজার মালিক (যাহার নাম এক্ষণে শ্রীপাট মালীপাড়া)
গ্রামে কেদারমতী নদীর ঘাঁপে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু ভগবানের
বৈরাগ্য ও চৈতন্যদর্শনেচ্ছা বলবতী হওয়াতে তিনি স্বীয় পত্নীকে চন্দ্রশেখরের
নিকট রাখিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্যপত্নীর ‘জুলকুলে’ আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরলাভ

যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপাট কুলীন গ্রামে আগমন করেন, সেই সময় তিনি
জগদীশ পণ্ডিতের সহিত ‘জুলকুলে’ আসিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহ ও
ভগবান্ আচার্য্যের পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আচার্য্যের পত্নী প্রভুকে

প্রণাম করিলেন ; প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন—“তুমি পুত্রবতী হও ।” ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের পত্নী বলিলেন,—“প্রভো ! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে ? আমার পতি একপ্রকার বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমে আছেন ।” প্রভু কহিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না । আমি পুরুষোত্তমে যাইয়া আচার্য্যকে পাঠাইয়া দিব ; আর তোমার পুত্র হইলে জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য করিয়া দিব ।”—এইরূপ আদেশ করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যের গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং মালঞ্চে অবস্থান

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে যাইয়া মিশ্র শ্রিয় আচার্য্যকে নানা-প্রকার প্রবোধবাক্যদ্বারা সাস্তুনা করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন । আচার্য্য-প্রভুর আদেশানুসারে “জুসকুনে” আদিয়া পৌঁছিলেন । পরন্তু তাঁহাদিগের বাসের অস্থবিধা হওয়াতে তাঁহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরের শিষ্য দ্বারবাসিনী-নিবাসী ‘দ্বারপাল’ নামক শূত্র-রাজার পুৰ্ব্বোক্ত মালঞ্চে আদিয়া বাস করিলেন । ঐ গ্রামের নাম সেই হইতে মালীপল্লী অর্থাৎ মালীপাড়া হইল । প্রথমে তাঁহারা ঘে-পাড়াতে বাস করিয়াছিলেন, অতঃপাি সেই পাড়া ‘আচার্য্যপাড়া’-নামে বিখ্যাত । কিছুদিন পরে ভগবান্ আচার্য্যের দুই পুত্র হয় । একের নাম রঘুনাথ, অপরের নাম রমানাথ আচার্য্য । দুই জনেই জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ।

আচার্য্যের গৃহ-ভ্যাগ ও পুরীতে প্রভুর সহিত সখ্যভাবে স্থিতি

তদনন্তর ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার শিষ্য মধুসূদন ষটকের পুত্রের নিকটে পুত্রদ্বয়ের সহিত পত্নীকে রাখিয়া পুনর্বার পুরুষোত্তমে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিলেন ।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য ।

পরম বৈষ্ণব তিঁহ স্থপণ্ডিত আর্ধ্য ॥

সখ্যতা আকান্তচিত্ত গোপ অবতার ।

স্বরূপ গোঁনাই সহ সখ্য ব্যবহার ॥

একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্ত-চরণ ।

মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তিঁহ করে নিমন্ত্রণ ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত)

আচার্য্যের বংশাবলী

তাহার যে দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে রঘুনাথ আচার্য্য অপুত্রক। তিনি জগদীশ পণ্ডিতের “শ্রীপাট যশোড়া”-নামক স্থানের গদি প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ আচার্য্য পৈত্রিক ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ কেশব রায় জীউকে লইয়া মালীপাড়ায় বাস করিলেন। তাহার প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। একের নাম—শ্রীগোপীজন্মবল্লভ, অপরের নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম পত্নীর বিয়োগ হইলে রঘুনাথ আচার্য্য পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেন। সেই পত্নীর গর্ভে রামদাস, শ্যামদাস ও কৃষ্ণদাস নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। কেবল কৃষ্ণদাসই মালীপাড়ায় রহিলেন। তিনি শিষ্যের নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-নামক শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ ও তাহার পুত্র শ্রীবল্লভের পরিচয়

রঘুনাথ আচার্য্যের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের শ্রীবল্লভ নামক এক সন্তান হয়। কালে শ্রীবল্লভ অত্যন্ত সাধক হইয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের-সেবা প্রকাশ করেন। পরে কোন পরম-হংস প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল নামক শ্রীমূর্ত্তি তাহার হস্তগত হয়। তদ্বিবরণ বাঙল্য-বিধায় লিখিলাম না। শ্রীবল্লভের তিরোভাব উপলক্ষে মালীপাড়ায় ক্রমাধরে চৈত্রমাসে তিনটা মধোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমটা শ্রীরামনবমীতে, দ্বিতীয়টা শ্রীরামনবমীর পর শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ-কাল হয়। তৃতীয়টা কোন তিথিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

“যাহাদের আত্মবিংএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদ্ভিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঙুনীয় নহে।”

“যাহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাহার পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিখলতা লাভ করেন।”

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

নিগম ও আগম

‘নিগম’-শব্দে বেদশাস্ত্রকে বুঝায়। নিগমে বেদমন্ত্রসমূহ বর্তমান। আগম’-শব্দে মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রকে বুঝায়। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২০৭ সংখ্যায় ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, আগম বেদাহুগ শাস্ত্র নহে, উহা নিগমের প্রতিযোগী হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। নিগম শাস্ত্রে মন্ত্রসমূহ বর্তমান থাকিলেও সূত্র প্রভৃতিই তাহার পরিচালক বা বিধি-শাস্ত্র। সূত্র—শ্রৌত ও গৃহ্যভেদে দ্বিবিধ। এই সূত্রের কার্য্যই পুরাণ ও আগমাদিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদিকে বেদমূলক ব্যাখ্যাশাস্ত্র বলিতে দোষ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীম্যাসকৃত ভাষ্য-গ্রন্থ। ব্রহ্মসূত্র বিস্তৃত বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রের সামঞ্জস্য-বিধায়ক সংক্ষিপ্ত সূত্র। আর শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবত ও পঞ্চরাত্র ভক্তির একই লক্ষণ গান করিয়াছেন। এজন্য পঞ্চরাত্র বা আগমকে কৰ্ম্মকাণ্ডীয় স্তায় বেদ-প্রতিকূল শাস্ত্র বলিতে নাই। মূঢ়ের বিচারে ভ্রম হইলেই আগমকে বেদ-শাস্ত্রের প্রতিকূল তাৎপর্য্যবিশিষ্ট গ্রন্থ মনে হয়। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২০৮ সংখ্যায় ‘স্বত্বার্থনার’ এবং পদ্মপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্চনাধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই—

সর্ব্বৈ চাগম-মার্গেণ কুৰ্য্যবেদাহুসারিণা।

অর্থ্যাৎ সকলেই—পরমহংস, ত্রিবিধ এবং জ্ঞী-শূদ্রাদি পর্য্যন্ত সকল বর্ণই বেদাহুসারি পঞ্চরাত্র-বিধানাহুসারে ভগবানের অর্চন করিবেন। অবৈষ্ণবগণ দীক্ষাবিধানের অভাবপ্রযুক্ত দ্বিজ না হওয়ায় তাহাদের অর্চনাধিকার নাই। বৈষ্ণবগণের দীক্ষাবিধানক্রমেই দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। অবৈষ্ণবের তাদৃশ বর্ণান্তরতার সম্ভাবনা নাই। বিষ্ণু ব্যতীত অজ্ঞ দেবোপাসক সকাম হওয়ায় তাহাদের ইহজন্মে পাপ প্রশমিত হইবার উপায় না থাকায় তাহারা দ্বিজ হইবার সুষোগ লাভ করে না। তাহাদের বৈদিক সংস্কারে ইহজীবনে যোগ্যতা হয় না। অনন্ত-বিষ্মত্বের ইহজন্মেই দীক্ষাপ্রভাবে শিষ্টাচার বলেই ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ এবং বৈদিক সংস্কারসমূহই পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পরবর্ত্তিনী ক্রিয়া। বৈদিক সংস্কারাভাবে পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার সম্পূর্ণতা হয় না।

অবৈষ্ণব স্মার্তগণ যে মনগড়া মন্ত্র শূত্রাদিকে প্রদান করিয়া দীক্ষাদাতা বলিয়া অভিমান করেন, তাহাতে বৈদিক সংস্কার-যোগ্যতা না থাকায় তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্থ হন মাত্র। স্মার্তের পাতিত্বের জ্ঞান বৈষ্ণবাচার্য্যের পাতিত্ব-সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণবাচার্য্য গুরুদেবের নিকট যে মন্ত্র লাভ করেন, তাহাই অনধিকারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করিয়া তাহাকে নিজস্বদৃশ উন্নত করেন। অবৈষ্ণব গুরুর কার্য্য করিতে যাওয়ায় তিনি গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহাতে স্বাধা ও প্রণবাদি থাকায় অবৈষ্ণবকে মন্ত্র-প্রদানে তাঁহার অনধিকার হইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যের মন্ত্র কল্পিত না হওয়ায় তাঁহার পাতিত্ব হয় না।

মৃত অবৈষ্ণবগণ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিয়া পঞ্চরাত্রিক সংস্কারমাত্র স্বীকার করেন, সুতরাং বৈদিক সংস্কার কেবলমাত্র মূৰ্খ অবৈষ্ণবগণেরই স্বায়ত্তীকৃত বিষয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। মূল কথা এই যে, বৈদিক সংস্কারসমূহ কলিহত ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রাপ্য নহে, এই বিচারের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্তই পাঞ্চরাত্র দীক্ষার অন্তর্গত বৈদিক সংস্কারের আবশ্যকতা—এ কথাই বৈষ্ণবাচার্য্য শাস্ত্রপ্রমাণমূলে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ বলেন যে,—বৈষ্ণবের যজ্ঞসূত্রে পঞ্চরাত্রিক স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন,—বৈদিক সংস্কারে চিহ্নান্তর-গ্রহণ শাস্ত্রভাংপর্য্যায়িকক এবং তাহা বেদবিকৃত। পঞ্চরাত্রিক অধিকার ব্যতীত স্বতন্ত্র বৈদিক সংস্কার-বিষয়েই যে আপত্তিসমূহ বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বলিতেছেন, তদ্বারাই অবৈষ্ণবগণের বৈদিক সংস্কারাধিকার বিপন্ন হইয়াছে মাত্র। এই বিপদ হইতে অর্থাৎ শূদ্রতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্তই আগম-মার্গের ব্যবস্থা পূর্বাচার্য্যগণ শাস্ত্রপ্রমাণমূলে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অধস্তন হইয়া সেই পূর্ব পরিচয় অন্তায়পূর্বক দিয়া যদি কেহ বৈদিক সংস্কারমাত্র গ্রহণ করিবার পক্ষপাত দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্বাচার্য্যের বিচারবিরোধী গুরুবজ্রাকারী অপরাধীজ্ঞানে শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজ পরিবর্জন করিবেন মাত্র। বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবের গলদেশস্থ সূত্র ও কঞ্জী অপনয়ন করাইয়া তাহাকে শূত্র বলিয়া জানিবেন।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অষ্টগ্রহ-সমাবেশরূপ বিপদাপদেও ভক্তগণের হরিকীর্তনমুখে হরিভজন কর্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা

পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ৩।১।১৯৬২

স্নেহস্পন্দে—

***! *** নামীয় তোমার ইন্স্যাণ্ড লেটার দেখিলাম। অষ্টগ্রহের সমাবেশে বৈকুণ্ঠবাসীর কিছু আশে যায় না। তবে সাধক জীবনাত্তেরই সর্বদা হরিকীর্তন বিধেয়। তন্মধ্যে কোন একটা উপলক্ষ আসিয়া হাজির হইলে তখন হরিকীর্তনের স্বযোগ উপস্থিত হইল মনে করিয়া প্রচুর আনন্দের সহিত হরিকীর্তন ও হরিভজন করিতে হইবে।

পৃথিবীর লোক চিরদিনই হরিকীর্তন-বিরোধী। ভগবদ্ভিচ্ছাক্রমে গ্রহ-উপগ্রহসকল তাহাদের হৃদিবিরোধিতার জন্ম—শাসন করিবার জন্ম ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। পাপী ও অপরাধী ব্যক্তিগণ ভগবৎ-শাসন এড়াইবার জন্ম ভগবানের আত্মগত্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করে। মঙ্গলময় ভগবান্ শাস্তি হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণের অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। ইহা তাহাদের রক্ষাকবচ হইলেও এইরূপ দূর্ঘটনা পুনঃ সংঘটিত হইলেই হরিপ্রীতিমূলক কার্যে স্থায়ীচেষ্টা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমরা হরিবিরোধী কার্য দেখিয়া মনঃস্কুর হইয়া পড়ি। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ আমাদের ক্ষুর মনে শান্তি দিবার জন্ম জগতে বিপদ-আপদ প্রেরণ করেন। তাহাতে বিশ্ববাসী কস্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিপদভঞ্জন হরির ভজনচেষ্টা প্রদর্শন করে। সেই স্বযোগে কস্ম-জ্ঞানের চেষ্টা স্থান পাইলে ভগবদ্ভক্তগণের সেবাচেষ্টার স্বযোগ ঘটে।

বহিষ্কৃত ব্যক্তিগণের পক্ষে বাহ্য বিপদ, অন্তঃসূঁখ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাই সম্পদ। সুতরাং গ্রহ-সমাবেশের দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের সেবা-স্বযোগ মিলিয়া থাকে। 'স্বর্গ বহিষ্কৃতগণও 'ভগবান্ মধুসূদন ব্যতীত অন্য কেহ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নাই' জানিয়া ভগবদ্ভক্তগণের চেষ্টা

করে । তখন প্রতীপজনেরও অঙ্কুল চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ মহানন্দে নামযজ্ঞ বা হরিকীর্তনযজ্ঞ করিয়া থাকেন । আমরা তাহাই করিব ।

ওখানকার সকল ভক্তগণকে এই পত্র পড়িয়া শুনাইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিবে । আমি আগামীকাল্য মথুরা যাইতেছি । তথা হইতে জয়পুর হইয়া ২৪শে জ্যৈষ্ঠারী মবধীপ ফিরিব । তোমাদের কুশল দিবে ।

ইতি—

মিত্যমদলাকাজ্ঞী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীমায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে

শ্রীমন্মহাপ্রভু-দর্শনে

আজি কি মধুর ভাব হয়েছে এখানে,
 এসেছে ভক্তগণ গোরা দরশনে,
 মধুর চাঁদনি রাতি, মধুর সাজের ভাতি,
 মধুর মৃদঙ্গরোল বাজিছে কেমনে,
 চারিদিকে হরিক্ষনি হয় ঘনে ঘনে ।
 দেখ জগন্নাথ-গৃহে শচীর কোলেতে,
 বিরাজিছে ভগবান্ পুত্র-স্বরূপেতে,
 এসেছি আমরা ভাই, বহুদূর হ'তে তাই,
 শচীর নন্দনে আজি দেখিবার তরে,
 কাল্কটী-পূর্ণিমা দিনে এই মায়াপুরে ।
 দয়াল গৌরাঙ্গচাঁদ দয়া করি মোরে,
 যুগল চরণ তব দাও মোর শিরে,
 তুমি দয়া না করিলে, প্রেমভক্তি কোথা মিলে,
 জগতজনেতে তুমি প্রেম বিতরিলে,
 শুধু কি আমার প্রতি বিমুখ হইলে !

সংসার-যাতনা প্রভো বড়ই ভীষণ,
কৃষ্ণ-বিমুখের দণ্ড—বিষয়-জীবন ।

আজি এই মায়াপুরে, তোমা দেখিবার তরে,
কেমনে আসিব বলে কতই ভেবেছি,
তব দয়া হ'ল তাই আসিতে পেরেছি ।

জড় কাজে মত্ত হ'তে হবে পুনরায়,
রসংসা-বাগুরা মাঝে উর্গনাভি প্রায়,
আবার সংসার পেলে, তোমারে রহিব ভুলে,
থেকো তুমি দয়াময় স্মরণে আমার,
সদাই করিব সেবা চরণ তোমার ।

আজি এই মায়াপুরে সব ভক্তগণে,
তোমা সাথে হেরি প্রভু আনন্দিতপ্রাণে,
কি যে পুলকিত আমি, হয়েছি জগত স্বামী,
কেমনে করিব ব্যক্ত না পারি বলিতে,
পারিব না হেন দিন জীবনে ভুলিতে ।

সেবাসুখ-লাভ আশা থাকে যদি মনে,
এস শোকদগ্ধ জীব এই দিব্যস্থানে,
শান্তির আবার ওই, বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ যেই,
মায়াপুরে যোগপীঠে কর দরশন,
তঁাহার চরণে সঁপি জুড়াও জীবন ।

আরো দেখ সম্মুখেতে শ্রীরাধামাধব,
জীবে দয়া বিস্তারিতে প্রকট বিভব,
ভাগীরথী স্নান করি, দরশন করি হরি,
পাইয়া প্রসাদ-মালা গাও ভক্ত সবে,
হরিনাম বিনা আর কি আছে এ ভবে ॥

—শ্রীমতী শ্যাম সরোজিনী

শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীমীলাচল গোড়ীয় মঠ, পুরী (উড়িষ্যা), তাং ২১/১২/১৯৮২

আগন্তুক শ্রোতৃমণ্ডলী ! আমার স্নেহের নন্দনন্দন গতকাল আমাকে গিয়ে বলল যে, মহারাজ ! আগামীকাল তার গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি । আপনি অস্থস্থ, তথাপিও যদি গিয়ে কিছু হরিকথা পরিবেশন করেন, তাহলে আমরা খুব খুশী হব । তাই আমি আজ এখানে এসেছি । বর্তমান শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য—পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদিগ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ । আমি ঘটটা জামি—যদিও সেখানে প্রত্যক্ষ আমি ছিলাম না, যখন ঐল কেশব মহারাজ অস্থস্থ লীলাভিন্নয়কালে এই গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য নির্ণয় করে যান, শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ আমাকে বলেন যে,—মহারাজ ! কেশব মহারাজের শারীরিক অবস্থা সুবিধার নয় । তিনি শেষ সময়ে বলে গেছেন যে, ‘বামন মহারাজ শ্রীমমিতির আচার্য হবেন ।’ এখন সমিতির আচার্য শ্রীপাদ বামন মহারাজ । আমরা দুজনে একসঙ্গে বহুবৎসর মায়াপুরে কাটিয়েছি । তখন আমরা ছিলাম ছেলেমানুষ । মায়াপুর তখন জঙ্গল । নরহরি দাদা এবং বিনোদ দাদা ছিলেন আমাদের অভিভাবক । তাঁদের কথামত উঠেছি, বসেছি । আজ তারা নাই । তাঁরা প্রকট না থাকলেও নিত্যধাম থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন । আমাদের মত নম তাঁরা ।

অধুনা কতকগুলো লোক ‘গোড়ীয় মঠের আশ্রিত’ বলে পরিচয় দিয়ে বহু অপসিদ্ধান্তপূর্ণ কথা বলছেন । তাদের অন্ততঃ প্রভুপাদের শিষ্য আমরা যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন স্বীকার করব না । যেমন তারা বলছে,—আচার্যের জন্মতিথি প্রতিপালিত হবে না, যেদিন দীক্ষা নিয়েছেন সেদিন প্রতিপালিত হবে । এটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত, কখনই হতে পারে না । শাস্ত্রে বলছেন,—“ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র । বৈক্যবের জন্মতিথি সে হেন পবিত্র ॥” যারা গুরুদেবের জন্মটাকে জন্ম বলে ভেবে নিচ্ছে, তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয় । জন্মটা হচ্ছে কর্মফলবদ্ধ জীবের । ভগবান্ বা বৈক্যবগণ যে জগতে আসেন, সেটা তাঁদের জন্ম নয়—আবির্ভাব । আর এখন তাঁরা চলে যান, তখন সেটা তিরোভাব । তাঁরা যে তিথিটাকে অবলম্বন

করে আসেন, সে তিথিটা শিষ্টদের কাছে পরম পবিত্র এবং সেটা প্রতিপালন-যোগ্য। সেই তিথি প্রতিপালন করলে হরিভক্তি হবে। প্রতিপালন না করলে অন্তথা করা হবে বলছেন। ‘আবির্ভাব-তিরোভাব—বেদে মাত্র কয়।’ সূর্য্য উদিত হচ্ছেন মানে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করছেন—এটা বলা ভুল। আবার সূর্য্য অস্তাচলে চলে গেছেন বলতে তিনি মারা গেছেন—এটাও ভুল সিদ্ধান্ত। আমাদের নিকট এসে যখন উপস্থিত হন, তখন সেটা আবির্ভাব; যখন চলে যান সেটা তিরোভাব। তাঁরা আমাদের মত জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুবরণও করেন না। এইজন্য গীতাতে কৃষ্ণ বলছেন,—

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত্তি তবতঃ।

তাত্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন।

আমার জন্ম এবং কর্ম্ম দিব্য। দিব্য মানে অলৌকিক, ব্যবহারিক নয়। একটা লৌকিক—ব্যবহারিক, আর একটা পারমার্থিক। ব্যবহারিক ও লৌকিকের সঙ্গে পারমার্থিকটাকে ঐক্য করে ফেললে অপবাধ হয়ে যাবে।

আজ শ্রীপাদ বামন মহারাজের আশ্রিত যারা আছেন, তারা ভাগ্যবান। গুরুত্বটা কি? সেটা বুঝে নিয়ে চলবার চেষ্টা করবেন, যে যাহাই বলুন না কেন। আমি বুদ্ধ হয়েছি, চোখে দেখি না, অনেক সময় জানা জিনিস মনে আসে না। নেজন্তু আজকের আলোচনা করবার জন্য আমি পরপর কয়েকটা Point লিখে এনেছি। সেইটা পড়ে আপনারদের কাছে বলবার চেষ্টা করছি। জিনিসগুলো বুঝবার চেষ্টা করবেন। শাস্ত্র বলছেন,—

‘আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদিশিক্ষণম্।

বিশ্রন্তেন গুরোঃ সেবা লব্ধু-বত্সর্গাস্তবান্ম্॥

পরমার্থ-পথের পথিক হতে গেলে, ভগবানের কাছে যেতে গেলে ‘আদৌ গুরুপাদাশ্রয়’ অর্থাৎ প্রথমে গুরু পাদাশ্রয় করতে হবে। ‘আশ্রয়’-শব্দের অর্থ কি?—আশ্রয়-শব্দের অর্থ হল দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষা নিতে হবে। শুধু দীক্ষা নিলে হবে না, শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাছে থেকে। আর কি? বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করতে হবে। ইয়া, আমি এঁর সেবা করলে পরে আমার কল্যাণ হবে—এই বোধটা রাখতে হবে। লৌকিক-ব্যবহারিক নয়, পারমার্থিক বিশ্বাসটা রাখা প্রয়োজন। ‘বিশ্বাস’-শব্দে কি বলছেন,— ‘প্রদ্বা’-শব্দে বিশ্বাস কহে হৃদ-নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥

—একেই বলছেন বিশ্বাস। ‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস। বিশ্বাসটা কিরকম? আমি আপনাদের কাছে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।—

কৃষ্ণ গোচারণ করে ফিরে আসছেন। শ্রীদাম, হৃদাম, দাম, বহুদাম প্রভৃতি সখাগণ তাঁরা আগে চলে এনেছেন। কৃষ্ণ পিছন থেকে দেখছেন যে, তাঁরা কালীয়দহের বিবাক্ত জল অঞ্জলি ভরে পান করছেন। কৃষ্ণ ছুটে এসে এক থাণ্ড দিয়ে বললেন,—করছ কি তোমরা? এই জল বিষে পরিপূর্ণ। এর উপর দিয়ে পাখী উড়ে গেলে সে মরে যায়। আর তোমরা এই জল পান করছ! তোমরা যে মারা যাবে। তখন সখারা কি বলেছিলেন?—কানাই! এই প্রকার সমাগ্র বিশ্বাস নিয়ে তোমার সখারা তোমাকে ভালবাসে না। আমরা জানি, আমরা যা পান করছি এটা বিষ নয়—অমৃত। আমরা বিষপান করতে পারি না। আমরা অমৃত পান করছি। আমাদের মৃত্যু হতে পারে না। একেই বলে বিশ্বাস। অতএব গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস রেখে অঞ্জলি দিলে, পূজা করলে, তাঁর সেবা করলে, তাঁর আদেশ প্রতিপালন করলে আমার কল্যাণ হবে। এই হৃদয় বিশ্বাস নিয়ে যে শিষ্য চলবে, তাঁর আত্মকল্যাণ হবেই। কিরকম?—‘বিশ্রান্তেন গুরোঃ সেবা সাধু-বর্জ্যাহবান্ম’।—আমরা যে ন্যূনপথে চলব, সেই ন্যূনপথের ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি। তিনি দেখিয়ে দেবেন পথ। এই হচ্ছেন গুরুত্ব। এটাকে ভাল করে বুঝতে হবে। আর কি বলছেন,—

‘তস্মাৎ গুরুং প্রপন্নেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।’

কেন গুরু করব? গুরুকরণটা কি লৌকিকতা, ব্যবহারিকতা?—না, এটা লৌকিকতা নয়। ‘জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্’—এখানে শ্রেয় এবং উত্তম দুটো শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিরকম শ্রেয়?—উত্তম শ্রেয়। শুধু শ্রেয় বললে হবে না। উত্তমশ্রেয়—বাস্তবকল্যাণের জন্ত গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে। সেই গুরু কেমন?—‘শাস্ত্রে পরে চ নিষ্কণ্ঠম্’—তিনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে নিষ্কণ্ঠ। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম একটাই জিনিস—Identical। এই জগতের যে শব্দ, সেটা Material Sound, সেটা শব্দব্রহ্ম নয়, শব্দসামগ্র্য। আর পরব্রহ্মতের যে শব্দ সেটা Transcendental Sound—অপ্রাকৃত শব্দ। সেইটাই হল শব্দব্রহ্ম। অতএব তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্কণ্ঠ। আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তিনি ভগবানের নিকটেই রয়েছেন। এই উপলব্ধিটুকু থাকবে—এইজন্ত গুরুপাদাশ্রয়। তা না হলে আর কিছুর জন্ত নয়। সেই গুরুর লক্ষণ কি কি?—গুরুর লক্ষণ বহু আছে। আমি কিছুটা আলোচনা

করব। তিনি কিরকম?—তিনি রূপাসিদ্ধ, রূপার সমুদ্র, দয়ার সাগর। তিনি হুসম্পূর্ণ। দেখানে কোন অভাব আছে, অসম্পূর্ণতা আছে আমার গুরুদেবেতে—এই বোধ যেন শিষ্টের না হয়। তিনি সম্পূর্ণ, সর্বসম্বোধকারক—সকল সন্তার উপকারক। তাঁর কাছে যে যাবে তাঁর কল্যাণ হয়ে যাবে। এই যে চেতন জীব তাঁর সংস্পর্শে গেলেই কল্যাণ লাভ করবেই করবে, এমন কি জড়বস্তু পর্য্যন্তও। গুরুর যে পাছুকাটা, সেটা জড় না চেতন? কিন্তু সেটাকে আমরা প্রণাম করছি। কেননা পাছুকাটা গুরুদেবের সংস্পর্শে গিয়ে প্রণম্য হয়েছে। শ্রীগুরুদেব হলেন নিঃস্পৃহ। তাঁর কোন স্পৃহা নাই, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি সর্বতোষিক, সর্ববিজ্ঞাবিশারদ। সর্ববিষয়ে পারদর্শী তিনি। তিনি সর্বদংশয়চ্ছেতা—শিষ্টের যাবতীয় সংশয় ছেদন করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। শিষ্ট একটা প্রশ্ন করল, গুরু উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি গুরু নম। গুরুদেব অনলস—তাঁর কোন অলসতা নাই। তাঁকে বলা হয়েছে গুরু, তিনিই গুরু। সকলেই গুরু হতে পারেন না।

অনেকে বলেন,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সমান। আমি বলছি না, শাস্ত্র বলেছেন। হ্যাঁ, সমান বলেছেন, কি বিচার আছে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দ্বারা পড়েছেন তাঁরা জানবেন,—

নৈবোপায়ন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ ব্রহ্মাযুধাপি কৃতমুকুমুদঃ শ্রবন্তঃ ।

যোহন্তর্বহিস্তহৃত্যামন্তভং বিধুধ্বদ্যচাৰ্য্য চৈন্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

যিনি চৈন্ত্যগুরুরূপে 'আমার ভিতরে' রয়েছেন, তিনিই মহান্তগুরুরূপে জগতে প্রকটিত। শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্তর্ধ্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥

অন্তর্ধ্যামিরূপে চৈন্ত্যগুরু আর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মহান্তগুরু অর্থাৎ দীক্ষাগুরু। এই দুটো রূপ তাঁর। যিনি অন্তর্ধ্যামিরূপে রয়েছেন, তিনিই আবার ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে জগতে প্রকটিত রয়েছেন, তিনিই হলেন দীক্ষাগুরু। অতএব তাঁকে যদি অল্প কোনরকম বোধ করা যায়, তাহলে স্রবীধা হবে না। কেউ কেউ বলছেন, দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরু অধিক পূজনীয়, প্রণম্য। এটা ভুল সিদ্ধান্ত। কেন? ভাল করে জিনিসটা বুঝতে হবে। শাস্ত্রে বলছেন,—

মন্তগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।

তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥

প্রথমে দীক্ষাগুরুর কথা বলেছেন, পরে শিক্ষাগুরুর কথা বলেছেন। দীক্ষাগুরুর একত্ব এবং শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারেন। সকলকে কি শিক্ষাগুরু স্বীকার করা যাবে?—না, কখনও নয়। (ক্রেমশঃ)

বর্ষারম্ভে নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার স্তত দ্বিচত্বরিংশ-বর্ষারম্ভে তদীয় অযোগ্য ও সর্বধর্ম-সেবকসূত্রে শ্রীপত্রিকার মূল কেন্দ্রবিন্দু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্লিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সেবনার্থে তদীয় রূপাশক্তি লাভেচ্ছায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সংখ্যাতীত ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীপত্রিকাখানি তাঁহারই শাব্দিক প্রকাশস্বরূপে জীব-কল্যাণে বর্তমান। তাঁহারই বিচারধারা ও অপ্রাকৃত চিন্ময় অমুভূতিই এই পত্রিকার স্বরূপ। শ্রীপত্রিকা অবয়-ব্যতিরেকে তাঁহারই চিন্তাশ্রোতে পরিপুষ্ট। তাঁহারই গম্ভীর কর্ণস্বর ও অদম্যময় নির্ভীকতা ও নত্যাহুবাগই শ্রীপত্রিকার প্রাণ। তাঁহারই সূত্ৰপালিত আশ্রয় ও গুরু-পারম্পর্যই ইহাতে উদ্ভাসিত। মায়িক ছলনা ও কপটতা এই পত্রিকায় প্রকাশ পায় না। সর্বধর্ম সমন্বয়ের ছলনায় নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ইহাতে প্রস্রয় পায় না। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্শরূপ ছলনারও ইহাতে আশ্রয় নাই। ইহাতে কেবলমাত্র “ধর্মঃ প্রোজ্জিতকৈতবোহত্র-পরমো নির্ম্মংসরাণাং সত্যং” বাক্যের সার্থকতা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত সংবাদপত্রের ভোগবাদের উন্নততা ইহাতে স্থান পায় না। ইহা চিন্ময় বার্তাবহ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথের এবং রূপাহুগ গুরুধর্মের শিক্ষাধারায় পরিপুষ্ট। কম্বী-জানী-ঘোণীর চেষ্টাকে দ্বিহৃত করিয়া ইহাতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্মের মহিমা সমুদ্ভাসিত। ইহাতে রুচিবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকাগণও জগদ্বরেণ্য, মাননীয় এবং পূজনীয়। বর্ষারম্ভে তাঁহাদিগকেও আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

‘পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।’
এরূপ সত্যকথা বলিবার সাহসিকতা যাহাদের নাই তাহারাই সর্বধর্ম সমন্বয়-বাদের ছলনায় সরল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। তাহারাই প্রেমের অপব্যাখ্যা করিয়া ‘প্রেম’ শব্দকে জীবের প্রতি যোজনা করিয়া সত্যভ্রষ্ট মিথ্যাচারী হইয়া থাকে। এই প্রকার চেষ্টাকে শাস্ত্র উৎপাত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—“শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিঃ বিনা। ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপাতায়ৈব কেবলম্॥” প্রেমের আশ্রয় জীব এবং বিষয় দেখর বা ভগবান্। আশ্রয়-বিষয়-জ্ঞানহীন ব্যক্তিই অপসিদ্ধান্তপর-ধারণা পোষণ ও প্রচার করিতে পারে; তাহাদের এই কার্য্যকে কখনই শাস্ত্র-সম্মত বা সত্য

বলিয়া সিদ্ধান্তবিদ্ ব্যক্তি গ্রহণ করেন না। গ্রাম্যকথায় এরূপ বিচারকে “উদোর পিণ্ডি বুদোর ষাড়ে” বলা হয়। “মায়াধীশ-মায়াবশ ঈশ্বরে জীব ভেদ।” স্তত্রাং যে প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রযোজ্য তাহা মায়াবশযোগ্য জীবের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। ঈশ্বরের প্রাপ্য বস্তু জীবকে উপহার প্রদান করিলে মূৰ্খতারই পরিচায়ক হয় না কি? মানিকের প্রাপ্য সম্মান ভৃত্যকে প্রদান করা কর্তব্য ও সঙ্গত নহে। ইহা পায়ের জুতা মাথায় রাখার ত্যায় নিকোঁদিতা। জীবকে ঈশ্বর বা ভগবান্ বলা যেরূপ দোষাবহ, জীবের প্রতি প্রেমের বিধানও সমপরিমাণ দোষাবহ।

“পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ”—এই বাক্য যদি সত্য হয় তবে জীবকে “ঈশ্বরজ্ঞানে” সেবা করার উপদেশ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যিনি মায়াবদ্ধ তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও তাহার সেবায় ঈশ্বরসেবার ফল হয় না। মূৰ্খ হইতে পাণ্ডিত্যের ফল লাভ হয় না। মূৰ্খকে পণ্ডিত বলিলে মূৰ্খের প্রতি অতিশ্রুতি এবং পণ্ডিতের প্রতি অনসন্মান প্রকাশ পায়। “অতিশ্রুতি হয় নিন্দার সমান।” স্তত্রাং এরূপ কার্য উভয়ের প্রতিই অপমানজনক হইয়া থাকে। ইহাতে স্তম্ভের পরিবর্তে কুফল লাভই হইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবকে তাহার জীব বা তটস্থা শক্তির অংশ বলিয়াছেন—

১। “অপরেয়মিতদ্ব্যংগ্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে শরণম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গী: ৭।৫)

২। “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” (গী: ১৫।৭)

স্তত্রাং জীব শক্তিতত্ত্ব; শক্তিমন্তর নহেন। মুক্ত হইলেও তিনি শক্তিমান্ হইতে পারেন না। স্তত্রাং “পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ” বাক্যের ব্যাখ্যা জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বর হইবেন—বলা অসঙ্গত। কারণ “পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ” বাক্যে পাশমুক্তশিব বস্তুই পাশবদ্ধ হইয়া থাকেন বুঝায়। যে ঈশ্বর পাশ বা মায়াবদ্ধ হইয়া পড়েন, তাহার ঈশ্বরত্ব মিথ্যা হইল না কি? অতএব জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা মূৰ্খতারই পরিচায়ক। পরন্তু তাহাকে ঈশ্বরশক্তি-জ্ঞানে সমাদর করা কর্তব্য। পরমমুক্ত ও পরমদয়াল ভগবদ্দাসগণ জীবের পাশবদ্ধদশার ক্লেশমুক্তির জন্ত তাহার মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া তাহাকে নিত্য ভগবদ্ভাষ্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। “পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ, পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ” বাক্য স্বীকার করিলে ব্রহ্মের দুই প্রকার অবস্থা অথবা দুই ব্রহ্ম স্বীকার করা হয়। ইহাতে অদ্বয়ত্বের অস্বীকার-দোষ হয়। স্তত্রাং ব্রহ্মই মায়াবশ হইয়া জীব হয় না, ব্রহ্ম মায়াধীশ। ব্রহ্মের

জীবশক্তিই মায়াধারা বশীভূত হইয়া থাকে। স্তব্ধতা শক্তিরূপ জীবকে শক্তিমান ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করা অজ্ঞতামাত্র।

“হায় হায় আমি ভক্ত হইতে পারিলাম না, আমার সাধনা বিফল হইল”—সম্বয়বাদী যদি একথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্তিপথকে তাঁহার সাধনার পথ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হইল না কি? অথচ ভক্তিপথ এবং তৎপথে সাধ্যবস্তুই শ্রেষ্ঠ বলিলে তাহা গৌড়ামি হইল—এরূপ কথা তিনি বলেন কি করিয়া? অন্তএব ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার এই খেদোক্তি প্রকৃত খেদোক্তি নহে, তাহা কপটোক্তি মাত্র।

অবয় (অনু+অয়) পদের অর্থে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়াদি পদসমূহের যথাক্রমে বিভাসকে বুঝায়। যাহার যেই স্থান তাহাকে সেই স্থানে স্থাপন বা রক্ষা করা বুঝায়। ইহাতে অগ্রপশ্চাৎ অধিকার অবশ্যই বর্তমান থাকে। খুশীমত যত্র তত্র স্থাপন করাকে অবয় বলে না। সম্বয় পদও তদ্রূপ অগ্রপশ্চাৎ বা উচ্চাভা অধিকারের সূচক পদ। ইহা নিলামওয়ালার হরেকমাল একমূল্যের নামগ্রী নহে। শাস্ত্রে তজ্জন্ম পর, পরতর ও পরতম পদগুলি তত্ত্ব এবং ধর্ম—সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা উপেক্ষা করিয়া গায়ের জোরে সকলকেই সমান বলিলে সমান হইবে না। নিজ মনে ‘মনকলা’ খাওয়া হয় মাত্র।

সম্বয়বাদী নিজ মতবাদ অর্থাৎ সকল ধর্মেরই সাধ্য বস্তু এক—এইরূপ মিথ্যা বিচারকে সত্য, শ্রেষ্ঠ বা পরম বলিয়া মনে করেন—ইহাতে তাহার নিজের গৌড়ামি প্রকাশ পাইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ধর্মাবলম্বী যদি তাঁহার ধর্মীয় চিন্তাস্রোতকে শ্রেষ্ঠ বা পরম বলেন, তাহা হইলেই ‘গৌড়ামি’ প্রকাশ পাইল এবং তিনি উৎক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। পরহংস ও পরমবদ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিদ্বান্ ও মূর্খ, আলোক ও অন্ধকার, ঈশ্বর ও জীব কখনই এক ভাবাপন্ন বস্তু নহে। উদারমত প্রকাশ করিতে গিয়া সত্যের অপলাপ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পন্থার ফল একই—ইহা শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। কর্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি, যোগের ফল অষ্টাদশদিকি ও কৈবল্যমুক্তি এবং ভক্তির ফল প্রেম বলিয়া শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ম, জ্ঞান ও যোগপথে কখনই প্রেম লভ্য হয় না। নির্বিশেষবাদে ত্রিপুটী না থাকায় অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবার বর্তমানতা বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষে প্রেমধর্ম থাকিতে পারে না। কর্মপন্থী—ভোগী; সে ঈশ্বরকেও ভূত্যের গ্রাম ভোগ করিতে চাহে। ভূত্যকে বেতন-

স্বরূপ সামান্য অর্থপ্রদান করিয়া তদ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করাই তাহার ভৃত্যকে বেতন প্রদান করা। ইহা ভৃত্যের প্রতি ভালবাসার ছলনা। কন্মীর ঈশ্বরোপাসনাও তদ্রূপ। তাহার পূজা, নৈবেদ্য ও স্তবস্ততি সমস্ত ঈশ্বর হইতে ভোগের বস্তু সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রতি মমত্বহীনতা ও নিজস্বত্বত্যাগপর্য্যাই তাহার পূজাদির প্রকৃত স্বরূপ। তাহার পূজা ও স্তবাদি প্রেমপ্রদর্শিনী ভক্তি নহে, উহা ছলভক্তি মাত্র। জ্ঞানী কন্মী অপেক্ষা বুদ্ধিমান। তিনি বুঝিয়াছেন,—ব্রহ্মাণ্ডভূতগত ভোগ্যবস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল। সুতরাং এই ধ্বংসযোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইলে ক্রেশ ও শোক পরিণামে লভ্য হয়। তজ্জন্ত “কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্ট স্তুতিভ্যাং” বাক্যকে শিরোধার্য্য করিয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক লাভ করাকেই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। এতদ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তিরূপ ফল বলিয়া স্বীকার করেন। তাহাদের এই চেষ্টাও আত্মস্বত্ব-ত্যাগপর্য্যপন্ন। ইহাতেও ঈশ্বরে মমত্ববুদ্ধির অবকাশ নাই। ইহা কন্মী অপেক্ষা অধিকতর ভোগচেষ্টা। ইহাকে চরম কপটতা বলিয়া বিচারিত হইয়াছে।

“তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।

যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্বীন ॥”

যোগিগণও মায়িক জগৎ অতিক্রম করত পরমাত্মতবে লীনতা প্রাপ্তি হওয়ারকেই মাধ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পরমাত্মায় লীন হইলে প্রেম কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে? ইহাদের কেহই ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। তাহারা ভগবানকে প্রাকৃত দেহধারী মায়িক সবুণাশ্রক তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহার প্রতি অমান্দরও করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বস্তু এবং অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া বিচার করিতে সক্ষম হন না এবং তাঁহার প্রতি আদর ও মমত্ব লাভ করেন না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ইহাদের সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মাহুধীং ততুমাস্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মহাব্যশরীরধারী মনে করায় তাঁহার প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা বা অপরাধ হইতেছে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নিজেক্তি। তিনি ইহাদিগকে মূঢ় বলিয়াছেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখা যায়—“প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। অপরাধ নাই আর ইহার উপর।”

এইরূপ জ্ঞানী ও যোগীদের গতি সম্বন্ধে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ বলিয়াছেন,—

যেহন্তেহরবিলাস বিমুক্তমানিস্বাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আকুহ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোইনাদৃতযুগলজ্যুয়ঃ ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

জ্ঞানী ও যোগিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে মায়িক সম্বন্ধণাত্মক দেহবিশিষ্ট মনে করায় তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বা ভাব প্রকাশ করেন না, তজ্জগৎ বহুকে স্বীকার করিয়া যোগাদি ক্রেশবহুল পন্থা অবলম্বন করত বিমুক্ত বলিয়া মিথ্যা অভিমান করিলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকে, তজ্জগৎই পরমপদ লাভ করিয়াও তাহা হইতেও তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয় ।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং অস্তিত্ব বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভো ক্লিষ্টস্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।

তেষামর্দৌ ক্রেশল এব শিষ্যতে নাত্যদ্যথা স্থলতুষাবষাতিনাম্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

অর্থাৎ ভক্তিপথই শ্রেয়ঃ পথ, অস্তপথ বা মত শ্রেয়ঃ নহে, পরন্তু বিদ্রবস্থল ও ক্রেশকর । যথা শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্তি—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্হুঃখং দেহবন্দিরবাপ্যতে ॥ (গীতা ১২।৫)

অব্যক্ত নিষাকার ব্রহ্ম-ধারণার পথ হুঃখ ও ক্রেশবহুল । ভক্তিপথই পরম মঙ্গলপ্রদ, সুখকর এবং সুখগমনযোগ্য । এই সুখাত্মক পথকে ঘাহারা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভার্থে ইন্দ্రిয়াদি নিগ্রহরূপ বহুধা ক্রেশস্বীকার করে তাহাদের ঐ ক্রেশই ফলস্বরূপ লাভ হয়, অথচ কিছুই লাভ হয় না । যেরূপ তণ্ডুলকণাবিহীন তুষমকল অবঘাতনদ্বারা কোনকালে চাউল প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না, পরন্তু অবঘাতনজনিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনারূপ ক্রেশই লভ্য হয় ।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাকাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ পথ হইতে মুকুন্দে ভক্তিপথকে কি অধিকতর সুকলজনক পথ বলিতেছেন না ?

তপস্বিভোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জুন ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রমো ॥

প্রদ্বাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তোতমো মতঃ ॥ (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

গীতার এই শ্লোক দুটীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল পথের মধ্যে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ তদ্বিশয়ে নিজমত কি—তাহাই প্রকাশ করিয়া ভক্তিযোগপথে তাঁহাকে ভজনা করাই সূক্ততম পথ বলেন নাই কি ?

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উক্বব ।

ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভাগবতের এই শ্লোকটীতেও কি যোগ-জ্ঞানাদি পথ অপেক্ষা ভক্তিপথকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই ?

ভক্তিপথের বা ভগবন্তের শ্রেষ্ঠত্বহেতু কৰ্ম্মজ্ঞানাদি পথের সাধকগণ তত্তৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথকে আশ্রয় করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন । যথা—

আত্মারামাশ্চ নুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুত্ক্রমে ।

কুর্ষন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথ্যাত্তুগুণো হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

শুকদেব গোস্বামী, চতুঃসনাদি ইহার স্রাজ্জল্য প্রমাণ দেখা যায় । পক্ষান্তরে ভক্তিপথ পরিত্যাগ করত কৰ্ম্মজ্ঞানাদি পথকে অবলম্বন করিতে কোনও দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না । গোবিন্দের বংশীবাদনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তোষণ করত তাহাকে সর্বোত্তম উন্নত-উজ্জসরশ্রিত পারকীয় মাধুর্য্য-প্রেমস্বথ প্রদান করিবার যোগ্যতা বিস্ময় কেবলাভক্তি-পথ ব্যতীত অন্য পথে সম্ভবপর হয় না ।

শাস্ত্রের এবশ্চকার স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও যাহারা ভক্তিপথের সহিত কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পথকে সমপর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন, তাহাদের মতকে কোন শাস্ত্রজ ব্যক্তি গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন ? স্ততরাং শাস্ত্রবিচারে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে । অতএব সর্বধর্ম সমন্বয়ের যথার্থতা—ভক্তিপথ সর্বোত্তম ; যোগ, জ্ঞান ও কৰ্ম্মপথগুলি ভক্তির নিম্নক্রম বা সোপান বলিয়া শাস্ত্রে পরিব্যক্ত ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শাস্ত্রাদির সূচবিচার অবলম্বনে শ্রীভক্তিদেবীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মানবের পরমকল্যাণে চেষ্টান্বিত : অনধিকারী ব্যক্তিগণ এই জীবকল্যাণকর কার্য্যকে ধারণা করিতে অক্ষম হওয়ায় কেবল ভোগবাদের চেষ্টাকে সমাজসেবা বলিয়া অন্ময় বিচার পোষণ করিয়া থাকেন । এবশ্চকার মায়ামুগ্ধ জীবের জ্ঞান ভক্তগণ সতত দুঃখানুভব করেন এবং শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে তাহাদের কল্যাণের জ্ঞান নিকপট প্রার্থনা করিয়া থাকেন ।

প্রিয়জনকে নববর্ষে উপহার প্রদানের ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত আছে । আমাদের আদরণীয় ও মাননীয় পাঠক-পাঠিকাগণকে কিছু উপহার প্রদান

করা আমাদেরও কর্তব্য। কিন্তু মাদৃশ অতীব দীনহীন ভিক্ষুর নিজস্ব কিছুই উপহারযোগ্য বস্তু নাই। তজ্জন্তু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম এই দাসাধমের প্রতি অপার রূপাপরবশ হইয়া যে ‘সিদ্ধান্ত-রত্নমালা’ প্রদান করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটা রত্ন অদ্বয়ণীয় পাঠক-পাঠিকাগণের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে অষ্টৈত, সাংখ্য ও ন্যায়-মতবাদেরও পরিচয় স্থচিত হইয়াছে।

“অষ্টৈতবাদিনাং ব্রহ্ম নির্বিশেষং বিকল্পিতম্।

ব্রহ্ম তু ব্রহ্মস্বত্রস্ত সৃষ্টি-স্থিত্যাদি-কারণম্॥

দৃষ্টৈবং নির্মিতং বাক্যং মূখ্যং গোণমিতিষ্মম্।

ব্রহ্মণো লক্ষণে তেদো জ্ঞানিনাং শোভতে কথম্॥

‘জন্মান্তস্ত যতো’ বাক্যে ব্রহ্ম দশজিকং ভবেৎ।

ক্লীবেন শক্তিহীনেন সৃষ্ট্যাদি সাধ্যতে কথম্॥

শক্তিনাং পরিহারে তু প্রত্যক্ষাদি প্রবাধতে।

শাজ্জবৃত্ত্যা বিনা বস্তু নাস্তিকেনাদৃতং হি তৎ॥

কেচিদাহঃ প্রকৃত্যৈব বিশ্বসৃষ্টিব্যবস্থিতা।

তেষাং বৈ পুরুষঃ ক্লীবঃ কলত্রং হি তুষ্টৈব চ॥

পত্যভাবে কুমারীণাং সন্ততির্ষদি দৃষ্টতে।

তেষাং মতে প্রশংসার্না নমাজে সা বিবর্জিতা॥

জড়াগুমিলনে সৃষ্টিঃ জীববিখাদিকং কিল।

স্থিতিজেষাং প্রমাসিদ্ধা পরিবর্তনমূলকা॥

ধ্বংসস্ত কালচক্রেণ পরমাণু-বিভাজনে।

স্বভাবৈবঘটিতং নরকং কিমীশস্য প্রয়োজনম্॥

ষট-পট-গুণজ্ঞানে জড়দ্রব্য-বিচারণে।

তार्কিকানাং মহামোক্ষমজ্ঞায়েন কথং ভবেৎ॥

‘ষাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।’

ইতি ন্যায়ং পদার্থত্বং প্রাপ্নোতি নাস্তিকঃ সদা॥

অসংকারণবাদে হি স্বীকৃত্যহতাব-সংস্থিতিঃ।

নস্তাহীনস্ত সত্তা তু যুক্তিহীনা ভবেৎ সদা॥

কার্যাকারণয়োরীত্যা জড়ায় চেতনোদ্ভবঃ।

গীতাবাক্যং সদামান্য ‘নাভাবো বিজ্ঞতে সতঃ’॥”

—ত্রিদিগ্ভিষ্মাশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

অবতারবাদ

‘অবতার’-শব্দের অর্থ—যিনি গোলোক হইতে এই ভুলোকে অবতরণ করেন, তিনিই ‘অবতার’। অবতারগণ স্ব-শরীরে এই জগতে অবতরণ করেন এবং স্ব-শরীরে এই জগৎ হইতে গোলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, সাধারণ বুদ্ধজীব অবতার নহেন। বুদ্ধজীব নখর শরীরাদির সহিত জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পরে নখর শরীরকে এই জগতে রাখিয়া চলিয়া যান।

স্বয়ং ভগবানকেই অবতার বলা হইয়াছে। যিনি ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী, তিনিই ভগবান। অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র ধর্ম, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য্য ষাঁহার নিকট নিত্য বিद्यমান, তিনিই ভগবান। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,—

ঐশ্বর্য্যন্ত সমগ্রন্ত বীৰ্য্যন্ত ধর্মন্ত শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানঃ বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ধ্যানং ভগ ইতীদৃশা ॥

এই ষড়ৈশ্বর্য্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণই ৬৪ প্রকার পূর্ণগুণের অধিকারী। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার না বসিয়া ‘অবতারী’ বলা হইয়াছে। অবতার ছয় প্রকার, যথা—

অবতার ইয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।

পুরুষাবতার—এক, লীলাবতার—আর ॥

গুণাবতার, আর মহন্তরাবতার।

যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ (১৫: ৮: মং ২০।২৭৫-২৪৬)

১। পুরুষাবতারঃ—মহা নন্দর্ষণ হইতে কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, কীরোদশায়ী—এই তিন মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

২। লীলাবতারঃ—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্ত, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কর্দম স্ববির পুত্র কপিলদেব, দত্তাশ্রয়, হরশীর্ষা, হংস, পৃথ্বীগর্ভ, ঋষভদেব, পৃথু, নৃসিংহ, কুম্ভ, ধনুজরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, দ্বাষবেন্দ্র, ব্যাস, বলরাম, বুদ্ধ, কঙ্কি—এই ২৪ মূর্তি।

৩। গুণাবতারঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

৪। মহন্তরাবতারঃ—বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্কভোম, বিশ্বকুসেন, ধর্মসেতু, জ্ঞানামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভাচ্চ, যজ্ঞ, বামন, ঋষভদেব—এই চতুর্দশ মূর্তি।

৫। যুগাবতার :—সত্যো গুরুমূর্তি, ত্রেতায়া রক্তমূর্তি, দ্বাপরে শ্যামমূর্তি, দ্বাপরাণ কলিতে কৃষ্ণমূর্তি, কিন্তু বিশেষ কলিতে পীতমূর্তি ।

৬। শক্তাবেশাবতার :—কপিল, ঋষভদেব, অনন্ত, ব্রহ্মা, নারদ, পৃথু, পরশুরাম—এই সপ্ত মূর্তি ।

এই সকল অবতারের তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায় না ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী । শ্রীকৃষ্ণ হইতে সব অবতার আবির্ভূত । শ্রীমদ্ভাগবতে ইথা স্তম্বরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । যথা—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

শ্রীকৃষ্ণই কেবল স্বয়ংরূপ ভগবান্ । যতপ্রকার অবতার আছেন, সেই সবই শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকটিত হইয়াছেন । অর্থাৎ সেই সব অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অংশী, সব অবতারের মূলপুরুষ ।

ব্রহ্মার স্তুতিতেও পাওয়া যায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

সং, চিৎ, আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বর । তিনিই স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্বকারণের কারণ ।

অবতার এবং অবতারীর মধ্যে পার্থক্য এই—উভয়েই ভগবৎতত্ত্ব । ভগবদ্ভা উভয়ের মধ্যেই বর্তমান, কিন্তু লীলার ক্ষেত্রে পৃথক্ । ছুটের দমন, সাধুর রক্ষণ, ধর্ম-সংস্থাপনাদি কার্য্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নহে ; অংশরূপ বিষ্ণুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কার্য্য করেন । এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে ।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥

স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ ।

স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ।

আর সব অবতার তাঁতে আমি' মিলে ॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।

বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অস্থর-সংহারে ॥ (চৈঃ চঃ ১।৪)

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বদাই বৃন্দাবনে অবস্থান করেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—
“বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি ।” অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ কোথাও যান না। বৃন্দাবনের দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সদা-সর্বদা লীলারস আশ্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ (রসো বৈ সঃ) বৃন্দাবনের দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের ভক্তগণের বশীভূত। বৃন্দাবনের রাগাভুগাভক্তি ব্যতীত সাধারণ বিধি-ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত হন না। শাস্ত্রে আছে,—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।

ঐশ্বর্য্য-শিখিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।

বিধিভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১৫-১৬)

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিলেও, সেইসব লীলার বৃন্দাবন-রসের অভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণ মনে-প্রাণে ভালবাসেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকাকালীন প্রায়ই বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন। বৃন্দাবনের ভক্তের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাগীর ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ সদা-সর্বদা আকৃষ্ট। শ্রীমতী যশোদা-মা, গোপীগণ, বিশেষ করিয়া শ্রীমতী রাধিকাদেবী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে নিজের সমস্ত দেহ-মনের স্বথ বিসর্জন করিয়া কেবলমাত্র প্রাণটুকু ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রিয়সখা উদ্ধবের মাধ্যমে সেইসকল লীলা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, যত গোপী তত সংখ্যক মূর্ত্তি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলারস আশ্বাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে গোপীগণের মনে কোনপ্রকার হুঃখানুভবের ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু অবতার শ্রীরামচন্দ্র যদি দ্বিতীয় নীতার সহিত মিলিত হইতেন, তাহা হইলে নীতা আর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীরামচন্দ্র অবতার হেতুই শ্রীকৃষ্ণের দ্বায় চরম মধুর লীলা আশ্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন না।

শ্রীকৃষ্ণের এক নাম—হতারিগতিদায়ক। কিন্তু অন্য অবতারগণ এই নামের অধিকারী হইতে পারিবেন না। ইহার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, রাক্ষসী পুতনা, অস্থুর কংস, শিশুপাল, দম্ববক্র প্রভৃতি সকলেই উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের আর পুনঃ জন্মলাভ করিতে হয় নাই; কিন্তু রাবণ, কুন্তকর্ণ অবতার রামচন্দ্রের নিকট নিহত হইলেও পুনরায় জন্মলাভ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের গ্রায় সর্বোত্তম নরলীলা আর কোনও অবতারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও শ্রীরাঘচন্দ্র, বামন, পরশুরাম, বুদ্ধ, কঙ্কির মত অসংখ্য অনেকেই নরলীলার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গ্রায় সর্বোত্তম নরলীলা তাহাতে আত্মদিত হয় নাই। শাস্ত্রে আছে,—“কৃষ্ণের যতক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।”

‘শ্রীকৃষ্ণ’-নামের যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে এই নামে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব অহুমান করিতে পারিব। “কৃবিভূবাচকঃ শব্দঃ গুণচ নিবৃতিবাচকঃ। তয়োৱৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।” ‘কৃষ্ণ’ সকল জীবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকর্ষক। আকর্ষণ করিবার পর তিনি জীবকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম-নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণনাম নিহিত আছে। উক্ত মহামন্ত্রে পূর্ণশক্তি রাধিকা এবং পূর্ণশক্তিমান ‘কৃষ্ণ’ উভয়েই পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছেন। যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই নামের মাধ্যমে ভক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকেই লাভ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের শ্রীরাধাপ্রেম যাহা শ্রীকৃষ্ণ কেবল আত্মদান করিবার নিমিত্ত কলিতে শ্রীমদ্রূপপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই উন্নতোজ্জ্বল প্রেম কলির এই মহামন্ত্রের মধ্যেই বর্তমান। তজ্জন্ম শ্রীমদ্রূপ প্রভু কেবল হরিনামকে কলির সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দ নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন—

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।

অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।

আনন্দমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইলে এই কলিকালে একমাত্র শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত শ্রীনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে ব্যবস্থাপিত ও প্রচারিত থাকিলেও, এই শ্রীনাম-মাহাত্ম্য পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীমদ্রূপপ্রভু বিশেষভাবে এ জগতে প্রদান করিয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ-ত্রুটি

ও তৎসংশোধন-প্রচেষ্টা

দেশের শিক্ষাপ্রণালী বিলাতী ধরণে গড়িতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। আমাদের দেশে নিম্নতম শিক্ষা-সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চতম সোপান পর্যন্ত দেখা যায়—ভগবৎকথার নামগন্ধও নাই। নিরীশ্বর নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি মামূলী কথা আছে। স্বধর্মনিষ্ঠ মাতাপিতার সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বয়ঃ বালকগণের চিত্তে একটু ধর্মভাব দেখা যায়, কিন্তু মাতাপিতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া বালকগণ যতই উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে থাকে, ততই তাহার ভগবদ্বিশ্বাসটা পর্যন্তও হারাইতে থাকে। ক্রমে একেবারে নাস্তিক হইয়া বিলাতী ধরণের চালচলন আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে তাদের বিলাসিতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বাপ মা আর ছেলের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। বিলাতী-শিক্ষা লাভ করিয়া গুণধর ছেলে তখন তাহার পিতামাতার মিত্য অর্চনায় শালগ্রাম-শিলা-পূজাকে পুতুলপূজা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, বিষ্ণুদাসের চিত্রস্বরূপ তুলসী-মাল্য উর্ধ্বপুণ্ড্রাদি ধারণ প্রভৃতি তাহার মতে কুসংস্কার বলিয়া লিঙ্কান্তিত হয়, শুদ্ধভক্তগণসঙ্গে হরিকীর্তনাদিতে যোগদান করা অপেক্ষা গার্ডেনপার্টি, ইভিনিং ক্লাব প্রভৃতি করিয়া চা-চুক্রট, পান-তামাক প্রভৃতি কলির সেবাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি।

ছেলেদের মধ্যে এই যে নিরীশ্বর নাস্তিক্যভাব, ইহার মূল কারণ একমাত্র সংস্কার অতাব। শুদ্ধ সাত্ত্ব শাস্ত্রকারগণ-প্রবর্তিত শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত ছেলেদের এই নাস্তিক্যভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। শিশুকাল হইতে ছাত্রগণ যে প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে থাকে, সেই শিক্ষা তাহাদের হৃদয়ে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, সে সংস্কার পরে শত চেষ্টাতেও যাইতে চাহে না। ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি-কথিত ছাত্রজীবন অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ গুরুগৃহে বাদ করিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা আদর্শ ছাত্রজীবনের কথা এখনকার ছাত্রগণের নিকট যেন একটা উপকথা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহুদিন ধরিয়া একটা পদ্ধতি উঠিয়া গেলে তাহার কথা পরে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

তখন ছাত্রগণকে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে গুরুগৃহে যাইতে হইবে এবং

গুরুসেবা করিতে হইবে, গুরুদেবের আদেশমত ব্রহ্মচর্যাাদি চারি আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে—কথাটির মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল না; কেন না তাহাই তাৎকালিক রীতি ছিল। তখনকার ছাত্রগণের স্বাতিশক্তি প্রথর ছিল, গুরুদেবের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়াই ছাত্রগণ বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। সকলেরই স্বপক্ষে নিষ্ঠা ছিল। স্বধর্মনিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ উন্নতাত্মিকার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তও হইতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ নাস্তিক হইতে আরম্ভ করে, আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করা পর্যন্ত সেই নাস্তিকতা। অবশ্য কোন দোঁভাগ্যবান্ ধুবক বর্তমান শিক্ষার কবল হইতে ছুটি লাভ করিয়া একটু ভক্তি-জীবন লাভ করিতে চান বটে, কিন্তু তাহার সংস্কারগুলি তাহাকে শুদ্ধভক্তি কিছুতেই লাভ করিতে দেয় না; হয় তাহাকে ভোগী-কর্মী, না হয় মায়াবাদী জ্ঞানী অথবা ঘোণী করিয়া তাহাকে ভক্তিপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

শুদ্ধ মাস্ত-শাস্ত্র-প্রচারকগণের আচুগতো আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংশোধিত হইলেই বালকগণের উন্নত-জীবনের আশা করা যায়। বর্তমানে যে শিক্ষাশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গতির পরিবর্তন দুই এক বৎসরের চেষ্টায় যে সাধিত হইবে, তাহা নহে; তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলেও পরিণামে অনেক স্বকল আশা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অভিভাবকগণ যদি শিশুকাল হইতেই সন্তানগণকে নাস্তত শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সন্দু-চরণাশ্রয়ে মাস্ত শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে স্বকুমারমতি বালকগণ সচ্চরিত্রবান্ হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিময় জীবনযাপন করিতে পারেন। তাদৃশ ছাত্রগণস্বারা ভারতের ধর্মাকাশ অধর্মমেঘ-মুক্ত হইতে পারে। ধর্মজীবনযাপন করিতে হইলেই ছাত্রগণ নংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া যাইবে, এই ভরে অভিভাবকবর্গ যদি তাহাদিগকে নংশিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। মাস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বহল প্রচারক্রমে জগৎ হইতে ধর্মের ভাগ উঠিয়া যাইতে পারে, জগৎ একটা শাস্ত্রময় ক্ষেত্র হইতে পারে।

তবে একটা কথা হইতেছে যে, কেবল বই মুখস্থ করা পণ্ডিত-নামধারী শাস্ত্রোদ্ভিষ্ট গাচরণহীন অসদাচারী অভক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া ছাত্রগণ কিছুই লাভবান্ হইবে না। বরং হিতে বিপরীত ফল হইবে। শুদ্ধ-ভক্তি যিনি নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন, এমন আচার্য্যের চরণাশ্রয়েই জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

বর্তমানে ভারতে লোকের মধ্যে যেরূপ একটু ধর্মভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের খুবই বিশ্বাস হয় যে, ছাত্রগণ যদি সঙ্গুতর চরণাশ্রয়ে সংশিক্ষা লাভ করিয়া ধর্মজীবন যাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারাই দেশের মঙ্গল হইবে। সংশিক্ষার উন্নতিবিধানই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ যদি পূর্বতম মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার প্রচলনে যত্নবান হন, তাহা হইলে ভারতের বাস্তবিকই নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞাকে কেবল অর্থকরী করিয়া না তুলিয়া তাহা যদি পরমার্থকরী করা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি বলেন,—ছাত্রগণ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত ধর্মজীবনযাপন করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। আদর্শ ভিন্ন কখনও শিক্ষার প্রসার হয় না। বালকগণ তাহাদের সম্মুখে যেমন যেমন আদর্শ দেখিতে পাইবে, সেইরূপেই তাহাদের জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অতএব আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ-কর্তৃক আমাদের কথিত বিষয় যেন একটু স্থিরচিত্তে আলোচিত হয়।

কোন বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ নাই, তবে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদেশীয় চাল চলনের অম্লকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলেন, ইহাই দেখিতে হইবে। আমাদের পূর্বতম মহাজনগণের আদর্শে যদি ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে আর স্বধর্ম নাশের কোন আশঙ্কা থাকে না। শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীপত্রিকা আজি দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষে করিলেন পদার্পণ।

বিরুদ্ধবাদীর অপসিক্তান্ত সদর্পে করিয়া খণ্ডন ॥

শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীল কেশব গোস্বামী।

শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের লাগি ॥

শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট পূরণ-মানসে ।
 প্রতিমাসে চল্লিশ পৃষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশে ॥
 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' নামকরণ তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ মত ।
 গৌড়েশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের গুণকীর্তন যাঁর ব্রত ॥
 পত্রিকা পঠনে অপ্ৰাকৃত কামদেব মদনমোহন ।
 পাঠকের হৃদয়ে জাগরিত হন অনুরাগ ॥
 অপ-উপ-ছল-মিছা-কপট-ধর্ম্মকে করিতে নিরস্ত ।
 একমাত্র মাসিক — 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'ই সমর্থ ॥
 মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ও যুক্তবৈরাগ্য শিখা'তে ।
 সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমণ্ডলীর দ্বারে করাবাতে ॥
 বিচক্ষণ সম্পাদক-মণ্ডলী যাঁর অতল-প্রহরী ।
 হেন শক্তি আছে কার তাঁর কণ্ঠরোধ করি ॥
 মোর গুরুদেব — শ্রীবামন যাঁর অধ্যক্ষ-সভাপতি ।
 শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ তাঁর সম্পাদক-সজ্জপতি ॥
 কার্য্যাধ্যক্ষ যাঁর শ্রীমদু ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক ।
 শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ তাঁর প্রকাশক ॥
 এ হেন বৈকুণ্ঠ-বার্তার সম্পাদক — শ্রীত্ৰিবিক্রম ।
 তাঁহাদের সাহচর্য্য প্রার্থনা করয়ে এ দাসাধম ॥
 তাঁদের কৃপাকটাক্ষে শ্রীপত্রিকা করিয়া প্রকাশ ।
 এ দীনহীনের যেন হয় কিছু নংসিদ্ধান্তাভাস ॥
 প্রকাশেতে যেন কভুও না আইসে আলস্য ।
 গৌড়ীয়ের সেবা করি' যেন বুঝি গৌড়ীয়-ভাষ্য ॥
 শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে মোর এই নিবেদন ।
 বৈষ্ণবানুগত্যে থাকি' সদা করি শ্রীকৃষ্ণানুশীলন ॥

শ্রীপত্রিকার সেবাভিলাষী -

বৈষ্ণবদাসানুদাস —

— শ্রীজগদ্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রশান্তি

শ্রীশ্রীগৌড়গোবিন্দো জয়তঃ

৭১, ডাক্তার গলি

পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

তাং ২০/১/২০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

কার্যালয় :—শ্রীবিদ্যোদয়বিহারী গৌড়ীয় মঠ

২৮, হালদার বাগান লেন (কলিকাতা-৪)

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডব্রতপূরক নিবেদন এই যে,—আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত গ্রাহক ও সম্প্রতি আপনার পত্রিকার আবেদনে সাড়া দিয়ে আজীবন সদন্তভুক্ত হইয়াছি। পারমাণবিক জগতে উন্নতমানের ও নিরপেক্ষ পত্রিকার একজন গ্রাহক ও পাঠক হিসাবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করিতেছি। কারণ, বর্তমান জগতে ধর্মশাস্ত্র ক্রয় করিয়া আলোচনা ও অনুশীলন করা বহু ব্যয়সাশ্রয়। অধিকন্তু, ভাগবতধর্ম বা ভক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রীবৈষ্ণবগণের আশ্রয়তো শ্রবণ-কীর্তন ও অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন,—“কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল, হয় সাধুসঙ্গ”, “সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ-কীর্তন” ইত্যাদি।

যাহা হউক, আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪১শ বর্ষে ৯ম ও ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত “ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী” প্রবন্ধে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্বসিদ্ধান্ত লব্ধে বহুবিধে আলোকপাত করিয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের বাণী লিপিবদ্ধ করত নিঃসংসর সাধুগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মিত্য-লীলাপ্রবিশিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ১৯৫৯ খৃঃ শ্রীপত্রিকার উদ্বোধন করিয়া ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় “বিরহ-মাদল্য” প্রবন্ধে সহস্রে লিপিবদ্ধ করিয়া যে ভাব, ভাষা, পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের দ্বারা বিপ্রলস্ত রসের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪১শ বর্ষেও স্তিমিত হয় নাই। বহু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও স্বদীর্ঘকাল শ্রীপত্রিকা তাহার ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া অতি উৎসাহের

সহিত শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্মের কথা বিশ্বের আপামর জনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া জগতের প্রচুর মঙ্গল বিধান করিয়া চলিতেছেন। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কারণ, অত্যাধি কোন পারমার্থিক পত্রিকা নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া অদীর্ঘ ৪১শ বর্ষকাল চলিতে সক্ষম হন নাই। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের নিরপেক্ষতা ও সর্বজ্ঞতা তাঁহার বিশ্রুত সেবকগণকে নিরন্তর উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে।

নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রীল কেশব গোস্বামীর বাণীতে পাই,—“নত্যা যদি অপ্রিয়ও হয় তাহাও বলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ়রহস্য জগতে অপ্রচারিত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে। শুভাহুযায়ী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মর্মভেদী বাক্য আপাতসুখকর না হইলেও উহা আত্যন্তিক মদনের হেতু।” এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিবাক্য আদরণীয় নহে, যেমন—“সত্যং ক্রয়াৎ, প্রিয়ং ক্রয়াৎ, মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।”

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে (১৯৩৬ খৃঃ ৩১ ডিসেম্বর) শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনে দিশৃঙ্খলতার দরুণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির প্রকাশন ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। এমনকি, শ্রীধাম-পরিক্রমাও বিলুপ্তির পথে ছিল। শ্রীগুরু-মনোহরীষ্ট পূর্বের জন্ত শ্রীল ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রকাশ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা পুনরায় প্রবর্তন করেন। তাঁহার অনীম ধৈর্য্য, দূরদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও নিরপেক্ষতার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অত্যাতিলাষী, কুসঙ্গানী, কুযোগিগণের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক শ্রীগৌরবাণী ও শ্রীপ্রভুপাদের বাণী জগতে প্রচার করিতে সক্ষম হইলেন—হাপাখানা বা বৃহৎসুদেবের আশ্রয়ে।

শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের মায়াবাদ-নিরসনপর গ্রন্থ ও গীতিকাব্য লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধাদি, গভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলক বক্তৃতাবলী তৎকালে তাঁহার মতীর্ষ ও অলুকাঙ্ক্ষিত জনগণের নিকট ক্রবতারার ছায় পথের নিশানা ছিল। শ্রীল মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধের নামোল্লেখের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই পত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেদের আত্মমদলের জন্ত সুযোগ পাইলেই উহা পাঠ করিবার চেষ্টা করিবেন। এহেন মহাপুরুষের লেখনী ও বক্তৃতাবলী যাহা পরমার্থ বিষয়ক জটিল প্রশ্ন ও কূটতর্কাদির শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত সহস্রর দাম।—অষ্টমতবাদ নিরাসন, বিরহ-মাদল্য, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য, রথযাত্রার তিথি-বিচার, ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের আরতি, শ্রীজন্মান্তরীয়

বিশুদ্ধ-বিচার, মায়াবাদের জীবনী, সাউডীদলের অপপ্রচার, অপদেবতার (অবতারের) উপজীব নিবারণ, সাউডীশালার ভিত্তে গলদ, শ্রীনিবাসদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন, হিন্দু-নাথু-নয়্যাদি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ, শ্রীশ্রীকুলনমস্কার তিথি-বিচার, জীবসেবা ও জীবদয়া, জগন্নাথ মন্দিরে ছুঁয়াস্মারক, বর্তমান সমাজ ও নির্যাকারবাদ, শ্রীগৌর-গোবিন্দ আরতি, শ্রীকুলসী-আরতি, শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-ওষাষ্টকম্ প্রভৃতি।

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সভ্যসংরক্ষণে-নিভীকতা—দৃঢ়তা আজও সারস্বত গোড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজ আদরে স্মরণ করেন। শ্রীল মহারাজের অগ্রকটের কয়েক বৎসর পর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশন, শ্রীগোস্বামীবর্গ ও আচার্য্যবর্গের লেখনী ভিন্ন উচ্চমানের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত না হওয়ার দরুন গ্রাহকগণ হতোতম হইয়া পড়িলেন। শ্রীপত্রিকার গ্রাহকসংখ্যাও হ্রাস পাইতে লাগিল।

এমতাবস্থায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সমিতির অন্যান্য সভ্যবৃন্দের আন্তরিক চেষ্টায় বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীপত্রিকা তাঁহার পূর্বে সুনাম উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমমহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষপূর্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ‘শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সংখ্যা’ ৬৮শ বর্ষে ১ম সংখ্যায় প্রায় ৩২টী প্রবন্ধ ও কবিতাসহ প্রকাশিত হইলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিদায়ক ভক্তিনার মহারাজ, ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও আরও অনেকের দার্শনিক ও তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে ভরপুর ছিল। পরিশিষ্টে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ‘গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ-বর্ষ’ প্রবন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনীতে সিদ্ধান্তপূর্ণ তিথি-বিচার, জড়দ্যাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী, চিহ্নজড়-সম্বয়বাদ ও জাতিভেদপ্রথা এবং অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন বিষয়ের আলোচনা শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর নিরপেক্ষ ধারাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ‘নিরপেক্ষ নহিলে

ধর্ম না যায় রক্ষণ'—শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাণীই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার রক্ষা কবচ বলিয়া মনে করি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পরবর্তী বর্ষদংখ্যা আলোচনা করিলে আমরা আরও গভীর তত্ত্বদর্শন উপলব্ধি করিতে পারি। “শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান” প্রবন্ধ বিরোধি মতবাদখণ্ডনে খজাহস্ত-স্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের “শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত”, শ্রীল কেশব মহারাজের “মায়াবাদের জীবনী”, শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের “বলিহারি ডক্টরেট বিজ্ঞা”, “হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল”, শ্রীপাদ হরিদাস লিখিত “আমি যতিরাজ” পাঠে তথাকথিত বৈষ্ণবগণের শিরে বেত্রাঘাত, শ্রীল নারায়ণ মহারাজের “গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও সম্মান”, বর্তমান আচার্যদেব শ্রীল ভক্তিবেন্দান্ত বামন গোস্বামীর “বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা” শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪১শ বর্ষে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের লিখিত “ভোগবাদ” এবং ৪২-১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত “ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী” প্রবন্ধে দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও ওঁ বিষ্ণুপাদের শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা মাদৃশ পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছেন।

দিনে দিনে শ্রীপত্রিকার উৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধিতে পাঠক ও গ্রাহকগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে ও নিগূঢ় শাস্ত্রদিকান্তমূলক বিচারে তাঁহার স্প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। শাস্ত্র বলেন,—“দিকান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥”

পরিশেষে নিবেদন,—হে অমৃতের সন্তানগণ! আপনারা হেলায় এই সুহৃৎ মানব জন্ম নষ্ট করিবেন না। পারমার্থিক ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ ও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদিকান্ত বিচারপূর্বক অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া মানব জীবন সার্থক করুন। “এমন সুহৃৎ মানব দেহ, পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ, এবে না ভজিলে যশোদাস্ত, চরমে পড়িবে লাজে ॥”

শ্রীবাগ্ন-ত্রিবিক্রম-নারায়ণ চরণে মোর নিবেদন, শ্রীকেশবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত দর্মিতির মূত্রপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করুন রক্ষণ ॥

—জর্নৈক আজীবন সদস্য (গ্রাহক নং-৭)

এক অঙ্গে দুই রূপ

“রাধাভাব অঙ্গীকরি’ ধরি তাঁর বর্ণ।

তিনস্থখ আশ্বাদিতে হয় অবতীর্ণ ॥”

শ্রীরাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্মই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধাম নবদ্বীপে
জন্মগ্রহণ করেন শ্রীমমহাপ্রভু রূপে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যায়,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাত্মো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যক্যাস্তা মদমুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ

তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজ্জনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, (২) শ্রীরাধা যাহা আশ্বাদন করেন,
আমার সেই বিচিত্র মাধুর্য্য কিরূপ এবং (৩) আমার অনুভববশতঃ শ্রীরাধা
যে সৌখ্য বা আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ—এই তিনটি
বিষয়ের প্রতি লোভের বশীভূত হইয়া শচীগর্ভরূপ সিদ্ধিতে রাধাভাববিশিষ্ট
শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রাধাপ্রেমে বিভাবিত হইয়া
কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্মই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ধরাধামে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন।

তাই শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

“যদি গোরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমন ধরিত দে।

রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা জগতে জানাত কে ??

মধুর বৃন্দাবিনিমাধুরী-প্রবেশ চাতুরী দার।

বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ??”

রাধাভাব-ছাতি-স্বলিত-তল্ল গোরাঙ্গহৃদর একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণের
পরমতত্ত্ব আশ্বাদন করিয়াছিলেন,—বহিরদে তিনি শ্রীরাধা, অন্তরঙ্গে তিনি
শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্যদেব একদেহে উভয়রূপ, তথা উভয়বিধ প্রেমের স্বাদ গ্রহণ
করিয়াই সনাতন গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বয়ং
ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষে যাহা মাধ্য, অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণই অসাধ্য,
তজ্জন্ম বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাকে দূর হইতে বিশেষ
সাবধানের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলায় যতপ্রকার বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করি, বাধাভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরান্দের জীবনেও তাহার প্রতিকলন ঘটয়াছে, একটুও ব্যতিক্রম হয় নাই। ঐ অল্পপম লীলা-বৈচিত্র্য কৃষ্ণপ্রিয়া গুণা সরস্বতী-বাণীর আশ্রয়েই যথাযথ অনুভূত হয়।

এক অঙ্গে দুই রূপের যে মাধুর্য্য, তাহা আশ্বাদন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত জীবোদ্ধারণ-লীলা অপ্রাকৃত বন্ধজীবের কোনদিনই বোধগম্য বিষয় নহে। তথাপি সেই প্রেমময় শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী করুণায় কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষে উহা অনুভব ও উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের বিশেষ রূপাপ্রভাবে অপ্রাকৃত শ্রীনাথ-রূপ-গুণ-লীলাদি জীব-হৃদয়ে স্ফুটিলাভ করে। সেই পরদুঃখহুঃখী শ্রীগৌরজন্মের আমাদের হৃদয়াকাশে উদ্ভিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্ব্বক আমাদের পক্ষে প্রেমানন্দের অধিকার প্রদান করুন—ইহাই তাঁহার নিকট একান্ত প্রার্থনা।

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অম্বি (মেদিনীপুর)

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[শ্রীশ্রামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, মিলনপল্লী (শিলিগুড়ি), তাং—১৫।১২।১৯৮৮]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হয়ে বসে আছেন, দ্বারকাধীশ। তথায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্র জন্মগ্রহণ করল, সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। এইভাবে পর পর কয়েক বৎসর ধরে ব্রাহ্মণের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, আর ব্রাহ্মণ একটা একটা করে মৃত-পুত্রকে নিয়ে গিয়ে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করে 'রাজারই বিকর্ষবশতঃ তাঁর পুত্রের মৃত্যু হচ্ছে'—এইরূপ গালাগালি দিয়ে চলে আসছেন। যখন এইরকম ঘটনা ঘটছিল, তখন একদিন সেই রাজসভায় বসেছিলেন অর্জুন। তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন,—এই সভায় এমন কোন ব্যক্তি নাই, এমন কোন ক্ষত্রিয় নাই, যিনি ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেন? আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আপনার পুত্রগণকে বাঁচাব ও রক্ষা করব।

পরবর্ত্তিকালে দেখা গেল, যখন ছেলে জন্মগ্রহণ করছে তখন অর্জুনকে ডাকাডাকি করছেন সেই ব্রাহ্মণ। অর্জুন তথায় গিয়ে হাজির হলেন।

সব মন্ত-তন্ত্র উচ্চারণ করে বাণরাশিষারা তিনি স্মৃতিকাগারের চারিদিক বদ্ধ করে শর-পিঞ্জর নির্মাণ করলেন। কিন্তু দেখা গেল, যথাসময়ে ভূমিষ্ট সেই শিশু রোদন করতে করতে আকাশপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমি যদি ছেলেকে বাঁচাতে না পারি, তাহলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব। সেই কথারূপারে অর্জুন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন। তিনি দেহত্যাগ করবেন—এই খবর কৃষ্ণ পেয়ে গেলেন। অর্জুন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় কৃষ্ণ এসে হাজির। সখা! তুমি এদব কি ব্যবস্থা করছ? অর্জুন বললেন,—‘আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ব্রাহ্মণপুত্রকে রক্ষা করব, কিন্তু অনেক চেষ্টা করলাম, দিব্য অস্ত্র সব প্রয়োগ করলাম, কিছুই ত’ করতে পারলাম না। তখন কৃষ্ণ বললেন,—দেখ, তুমি নিজেকে এত ছোট মনে কর না। যারা আজ গালাগালি দিচ্ছেন আমাদের, আগামীদিনে তারাই আমাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করবেন। চল, আমরা দুজনে যাই, সেই বিজয়পুত্রগণ কোথায় আছে, তাদের নিয়ে আসি।

‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ সিনেমায় বই দেখানো হচ্ছে আজকাল। আমাদের উপনিষদে যে উপাখ্যান আছে, তা অবলম্বন করেই ওটা লিখিত ও রচিত। সাধারণ মানুষ এই Subtle Body নিয়ে যমালয়ে যেতে পারে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নচিকেতা এই শরীরে গেছেন যমালয়ে এবং সেখানে যমরাজের একজন নামকরা (V. I. P.) অতিথি হিনাবে হাজির হয়েছিলেন। যমরাজ তখন যমালয়ে অস্থপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন Circle officer। ‘চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁর কাজ দেখাশুনা করতে হয়। এক জায়গায় বসে থাকবার তাঁর উপায় নাই। নচিকেতা যখন যমালয়ে গিয়ে হাজির হন তখন ৫ বছরের বাচ্চা শিশু। সাধন-ভজনের বল কিরকম, চিন্তা করুন। যমরাজের গৃহিণী শ্রামলা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি মাননীয় অতিথিকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে বললেন,—আপনি এসেছেন, যমরাজ অস্থপস্থিত, আপনি স্নান করুন, আহাৰাদি করুন। নচিকেতা বললেন,—আমি ঝাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে জলগ্রহণ করব না।

তিনদিন পর যমরাজ ফিরেছেন। এসেই দেখেন মাননীয় অতিথি তাঁর দরজার গোড়ায় বসে আছেন। তাঁকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে বললেন,—আমি বড় অশ্রায় করেছি, আমার গৃহে অতিথি তিনদিন অভূক্ত অবস্থায় অবস্থান করছেন, আমাকে ক্ষমা করুন। এর পরিবর্তে আমি তিনটে বর দিতে চাই আপনাকে। নচিকেতা বললেন,—দিন।

নচিকেতা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিলেন। তাঁর পিতা রাজা ঔদ্ধালকি সমস্ত বুড়ো বুড়ো গাভীগুলো ব্রাহ্মণগণকে দান করছিলেন—যে গাভীগুলো কোনদিন বাচ্চাও দেবে না, দুধও দেবে না। নচিকেতা বললেন,—বাবা! তোমার এ কি দান হচ্ছে? এতে কোন পুণ্য ত' হবে না, বরং উন্টে পাপই হবে। বারবার এইরূপ বলে পিতাকে বিরক্ত করছেন। শেষকালে রাগ করে তিনি বললেন,—আমাকে তুমি কাকে দান করছ? পিতা বেগে গিয়ে বললেন,—যা, তোকে যমরাজকে দিলাম। 'যমরাজকে দিলাম' বলায় তিনি সশরীরে যমরাজের কাছে হাজির হয়েছিলেন। শিশু বটে, পঞ্চমবর্ষীয় বালক বটে, কিন্তু তাঁর সাধন-ভজনের এমনই বল ছিল যে, তিনি সশরীরে যমালয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

তুমি প্রথমে কি বর চাও?—আমার পিতার সঙ্গে মনোমালিঙ্গ হয়েছে, পিতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি আশীর্বাদ করুন—আমার উপর পিতার রাগ যেন থেমে যায়। যমরাজ বললেন,—ভদ্রান্ত। দ্বিতীয় বর তুমি চাও। দ্বিতীয় বরে তিনি আত্মতত্ত্ব জানতে চাইলেন। যমরাজ তাঁকে আত্মতত্ত্ব বললেন। আত্মতত্ত্ব তাঁর খুব ভাল জানা আছে, কেননা তিনি বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। শিবঠাকুর যেমন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী শিবানী, সেইরকম List এর মধ্যে যমরাজও আছেন একজন। দ্বাদশ জন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের নাম করা হয়,—

স্বয়ম্ভূনারদঃ শঙ্কুঃ কুমারঃ কপিলো মনঃ ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈর্যাসকিবরম্ ॥

এই 'বরম্'—শব্দে উদ্দিষ্ট হয়েছেন যমরাজ। যমরাজ নিজে কথাটা বলছেন। বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন তাঁর ভালরকম জানা আছে। তাই আত্মদর্শন উপদেশ করলেন তাঁকে। তৃতীয় বর চাও তুমি। তৃতীয় বর চাইছেন নচিকেতা—আমাকে জন্ম-মৃত্যু রহস্য বলতে হবে। বৃক্ষ-তণ-শুষ্ক-লতা, পাখী, পশু, মানুষ কেন জন্মগ্রহণ করছে এবং কেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়? এ নানায়ে আমাদের বারবার এই যাওয়াত কেন? আমাদের বুঝিয়ে দিন। সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছেন না যমরাজ, কেন? তিনি বিবিধবাক্যে প্রলোভিত করতে লাগলেন নচিকেতাকে। তোমাকে ইন্দ্র দিতে হবে, তুমি ইন্দ্র নেবে, তুমি ব্রহ্ম নেবে—যাই জিজ্ঞাসা করেন সবটাই 'না'। আমি যেটা জানতে চেয়েছি সেইটাই আমাকে জানিয়ে দিতে হবে। যমরাজ দেখলেন যে এটা খুব গোপনীয় ব্যাপার, এটা

I. B. Department-এর ব্যাপার, এটা বলা যায় না কাউকে। সেইজন্য তিনি বলতে চাচ্ছেন না, আর নচিকেতাও শুনবে না। আমাকে এইটাই বলতে হবে, আমি অল্প কিছু জানতে চাই না। যমরাজ ঠেকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করছেন, তুমি বৃথা তর্ক করছ, শুক তর্কের দ্বারা কখনও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। “নৈবা তর্কেণ মত্তিরাপনেয়া।” একটু ধমক দিলেন। কিন্তু শিশু নচিকেতা ভুলবার ছেলে নয়। সে বলল,—আমি ঐটাই জানব। আমায় ঐটাই বলতে হবে। আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি আমার গুরু হন, তাহলে আমি আপনার শিষ্য—পুত্র। এমন কি গোপন কথা আছে যেটা আমার কাছে বলতে পারবেন না আপনি? আমি শুনবার অধিকারী কিনা, আপনি আগে বিচার করুন। যদি আমি শুনবার অধিকারী হই তাহলে আমাকে বলুন। কেন আমাকে বঞ্চিত করছেন? খুব মুন্সিলের মধ্যে পড়ে গেলেন যমরাজ এই শিশুর কাছে। শেষে বলতে বাধ্য হলেন।

(ক্রমশঃ)

পরমারাদ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
 শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের
 শুভ প্রকট-বাসরে
 ঐক্যজালি

মাঘী কৃষ্ণতৃতীয়া-তিথি করি' আলম্বন ।
 শরচ্চন্দ্র-সুতরূপে যাঁ'র প্রকটন ॥
 যাঁহার ললিত অঙ্গ-হেরি' বিজ্ঞজন ।
 কহে—‘এই শিশু হ’বে গৌর-নিজজন ॥’
 যাঁহার শ্রীঅঙ্গে 'রাজে সর্ব সুলক্ষণ ।
 তিনি প্রভু শ্রীকেশব পতিতপাবন ॥ ১ ॥
 গুরু-মনোহরীষ্ট সদা করিতে পূরণ ।
 তুচ্ছ করিলেন যিনি নিজের জীবন ॥
 গুরুসেবায় সর্বসিদ্ধি—এই শিক্ষা যাঁ'র ।
 তাঁর পাদপদ্ম সদা ভরসা আমার ॥

আচারে-প্রচারে যাঁ'র আচার্য্য-লক্ষণ ।
 তিনি প্রভু শ্রীকেশব পতিতপাবন ॥ ২ ॥
 বৌদ্ধ-শাস্ত্র হ'তে যিনি করিলা প্রমাণ ।
 'শাক্যবুদ্ধ' ও 'বিষ্ণুবুদ্ধ' নহে একজন ॥
 গৌতমবুদ্ধ মনুষ্য, —নহে অবতার ।
 আদি-বুদ্ধই বিষ্ণুর নবম-অবতার ॥
 বুদ্ধ-সম্বন্ধে যাঁহার এ হেন বিচার ।
 সেই জগদগুরু পদে নমি বারবার ॥ ৩ ॥
 রাধা চিন্তা করি' কৃষ্ণ 'গৌর-কান্তি' পায় ।
 এমন সিদ্ধাস্ত জানি যাঁহার কুপায় ॥
 গৌর-কৃষ্ণ একতত্ত্ব—লীলা দুইপ্রকার ।
 এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা যাঁ'র অতি চমৎকার ॥
 যাঁ'র মঠে শ্যামচাঁদের গৌরকান্তি ভায় ।
 তিনি মোর গুরুদেব, নমি তা'র পায় ॥ ৪ ॥
 'বেদান্ত সমিতি' যিনি করিয়া স্থাপন ।
 বলদেবাচার্য্য-প্রতি জানাইলা সম্মান ॥
 শঙ্কর-দর্শন যিনি করিয়া খণ্ডন ।
 প্রভুপাদের সঙ্কল্প করিলা পূরণ ॥
 অপসম্প্রদায়-দলনে যিনি সদা ব্রতী ।
 তাঁ'র রাঙ্গা পদে করি কোটি কোটি নতি ॥ ৫ ॥
 শ্রীগুরু-বৈশিষ্ট্য কিছু করিয়া কীর্তন ।
 তাঁ'র পদে পুষ্পাঞ্জলি করিহু অর্পণ ॥
 জয়তু জগদগুরু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
 অস্তিনে ঐ পদ-পাশে দিও মোরে স্থান ॥ ৬ ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর

ইং ২২।২।২০

শ্রীগুরু-কিঙ্করাণুকিঙ্করাভাস

পতিতাবন—

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাদিকারী (কবিত্বষণ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান তার উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া আজ আমাদের সম্মুখে Computer লইয়া হাজির হইয়াছে। Computer এর নিয়মালুয়ায়ী Switch on করিলে Computer এ প্রস্তুত করা হিসাবাদি যন্ত্রণ বুঝিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আমরাও এই বিজ্ঞানের যুগে বর্তমান থাকার দরুণ একবার বৈষ্ণব সংবিধানের Switch on করিয়া দেখি—(১) ব্যাসপূজা কি? (২) অতীতে ব্যাসপূজা প্রথম কোথায়, কাঁহার দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল? (৩) ব্যাসপূজার ফল কি? ইত্যাদি।

শ্রীব্যাসপূজা কি? তাহা সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন। Geometry-র নিয়মালুয়ায়ী বস্তুর কেন্দ্রবিন্দুকে স্পর্শ করিয়া পরিধির একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যে সরলরেখা অঙ্কন করা হয়, তাহাকে 'ব্যান' বলে। তদ্রূপ জীবের সহিত ভগবানের যিনি মিত্য সংস্কৃ করাইয়া দেন বা জীব-হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বকে যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই 'ব্যান'। শ্রীকৃষ্ণদৈবায়ন বেদব্যাসের পূজাকে 'ব্যাসপূজা' বলা হয়। 'ব্যাসপূজা' বলিতে কেবলমাত্র ব্যাসদেবের পূজাই নহে, তদনুগত গুরুবর্গের পূজাকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে।

আজ হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে কলিযুগ-পারনাবতারী অভিল্লবজৈজ্ঞ-নন্দন শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা শ্রীবাসঅঙ্গনে ইহার প্রথম প্রচলন করাইয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহজগতে পুনঃ প্রচলন করেন।

শাক্ত সম্প্রদায়েও ব্যাসপূজার প্রচলন থাকিলেও উগা যথার্থ ব্যাসপূজা নহে, ব্যাসপূজার নামে গ্রহণ করা যায়। পূজ্যবস্তুকে আমরা নিঃস্বার্থে নিকপটে ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য জানিয়া পূজা করিয়া থাকি ও তাঁহার উপদেশ পালন করিয়া থাকি। যেখানে তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষে দুষ্ট—এরূপ বিচার বা নংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে পূজ্যবুদ্ধি কোথায়? তাই শ্রীশাক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ব্যাস ভাস্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥

আমি ব্যাসকে মানিব, অথচ তাঁহার বিচার মানিব না—এরূপ কথা

অসম্ভব। শ্রীব্যাসদেবে ও ব্যাসাভিন্ন গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি জীবের অধোগতির মূল কারণ। এজন্ত শাস্ত্রশিরোমণি পুরাণসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে তারঃশব্দে কীর্তন করিয়াছেন,—“ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাস্ময়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ”, “সংশয়াত্মা বিনশ্চতি”। ভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গল আকাজক্ষা করেন, তখন তিনি ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হন। উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্ট আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অশ্রয়া বা স্পর্ধা করিলে শিষ্টের কোনদিন সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের জন্ত আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তদবস্থজ্ঞানে বিধিমত পূজা করিতেই হইবে। সুতরাং আদৌ আমাদিগকে শ্রীব্যাসের অঙ্গগত হইতে হইবে। তাঁহার বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়া জগতে তাঁহার প্রচারে ব্রতী হইতে হইবে। তাঁহার শিক্ষাতেই সমস্তপ্রকার কল্যাণ নিহিত আছে।

অন্ত অশ্বদীয় গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবিভাব-তিথি। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণসরোজ বন্দনার্থে যে-সমস্ত তত্ত্ব-লিঙ্গান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে ব্যাসপূজার ফল সম্বন্ধে Clear conception হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।

Physiologist অভিমত সামান্যতমও যদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তাহলে আমরা বুঝিতে পারি, মস্তব্য-শরীরে ২০৬খানা মস্তান্তরে ২১৮খানা হাড় আছে। প্রত্যেক হাড়ের কমবেশী প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও Backbone বা মেরুদণ্ডই প্রধান। মেরুদণ্ডবিহীন মস্তব্য সমাজের জ্ঞানাল-সদৃশ। শ্রীব্যাস-পূজা বা গুরুপূজাই হইল—Backbone of Spiritual life (devotion life)। Democratic country-তে বসবাস করিয়া “Might is right” মনে করিয়া যদি কেহ বলেন গুরুপূজার কোন প্রয়োজন নাই, গুরুদেবের জয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,—তাঁহার নিজ গুরুদেবের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা নাই। গুরুসেবক কখনও অঙ্গ গুরুসেবককে গুরুভক্তি হইতে নিবারণিত করিবেন না, পরন্তু উৎসাহই প্রদান করিবেন। তাহা না করিলে তিনি গুরুসেবক নহেন, সেবকক্ৰব। আমরা ভগবন্তজন করিবার জন্ত আনিয়াছি মত, কৃষ্ণপ্রেমই চরম প্রয়োজন, ইহাও নিখুঁত মত। তাই বলিয়া কোন ভুটবুদ্ধি ব্যক্তির প্ররোচণায় গুরুদেবের পূজা করিব না, ইহা হইতেই পারে না। ভগবন্তার চরমদীপা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজখুখেই প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

প্রথম তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্ ।

কুর্কন্ সিদ্ধিমবাশ্রোতি হৃদ্বা নিফলং ভবেৎ ॥

হে সৌম্য! তুমি যদি আমার সেবা করিতে চাও প্রথমে তোমার গুরুদেবের শরণাগত হও, তাঁহার পূজা কর। তবেই সিদ্ধি হইবে—ভগবদ্ভক্তি হইবে, অগ্ৰথায় সব নিফল হইয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

গোড়ীয়ার দ্বিচত্বারিংশ-বর্ষ

শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেখিতে দেখিতে শ্রীপত্রিকার একচত্বারিংশ-বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। শ্রীপত্রিকার বলিষ্ঠ লেখনী বিভিন্ন পাঠকের সেবাবিধান বুদ্ধি ও প্রচেষ্টাকে সংশোধনপূর্বক প্রাকৃত কামনা-বাসনা-ছেদনে স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ “ততো হৃদয়মুৎসৃজ্য সৎস্ব সজ্জত বুদ্ধিমান্”—ভাগবতীয় বাণী হৃদয়দম করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইয়াছেন। হৃদয় পরিত্যাগপূর্বক নিরপরাধে গৌরবিহিত কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদানই বাস্তব আত্মকল্যাণ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়,—ইহা বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধির বিষয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ নিরাকারবাদী বহুবীশ্বরবাদী নহেন

বহুবীশ্বরবাদী, পঞ্চোপাসক, শূন্যবাদী, নির্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় তাহাদের স্ব-স্ব নাস্তিক্যভাব লইয়া প্রাকৃত সঙ্করজঃ-তমোগুণের দ্বারাই জগদীশ—জগন্নাথের সেবা হয় ভাবিয়া অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু জড়গুণাশ্রিত কোনরূপ প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা অধোক্ষজ-অপ্রাকৃত শ্রীজগন্নাথ-দেবের বাস্তবসেবা সম্ভব নহে, তাহা তাহাদের বোধগম্য হয় না। যাহারা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে সর্বোৎকৃষ্টরূপে বলিয়া জ্ঞান ও উপলব্ধি করেন, তাহারা কখনই ব্রহ্মেন্দ্রমন্দের সেবা পরিত্যাগপূর্বক—একায়ন-পদ্ধতি ছাড়িয়া

বহুশাখা-সমন্বিত অব্যবসায়ীর কাম্য নানা দেব-দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তি লাভ করেন না। সাদৃত-সম্প্রদায় ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর নথর উপাসনাকে তুচ্ছ ও ইতর কাম্যমূলে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া অহৈতুকী ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। নানাদেবৈকদেবিগণ ভক্তিবিরোধী সমন্বয়বাদের আবাহন করিয়া শ্রীমীলাচল-নাথের অপ্রাকৃত সেবা-বঞ্চিত হন।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব—সর্ববশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ

ভগবৎপ্রেরিত নিত্যসিদ্ধ পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবতগণ অভীক্ষিয় অপ্রাকৃত নবিশেষ শ্রীপুরুষোত্তমেরই সেবা করিয়া থাকেন। নিবিশেষবাদীর ভুবনেশ্বরের সেবা বা শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর্য সেবা-পর্যায়ভুক্ত নহে। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বাস্তুববস্তুরই সেবাধিকারী। তাঁহারা অনিত্য নথর তাৎকালিক উপাসনায় আগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ণাবয়ব পরিলক্ষিত না হইলেও, তিনি অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাঙ্গ, এরূপ বিচার বিশেষ দোষাবহ ও অপরাধজনক। তিনি সনাতন পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-তম। তাঁহা হইতেই নিখিল চিদচিৎ বিশ্ব ও জৈবজগৎ সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে। বেদে-উপনিষদে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে……তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।” স্তবরাং তাঁহার নিত্য শ্রীনাম, রূপ, গুণ, গীতা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য লইয়া তিনি অসমোক্ষরূপে মনঃসম্পূর্ণভাবে স্প্রতিষ্ঠিত। অতএব প্রাকৃত জগতের নবিশেষ-নিবিশেষরূপ মলযুক্ত কোন প্রকার বিশেষণে তিনি বিশেষিত হইতে পারেন না। “অণোরগীমান্ মহতো মহীয়ান্”, “ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে”, “তমীশ্বর্যাণাং পরমং মহেশ্বরম্” প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বেদোপনিষৎ-ভাগবতাদি তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমার সামান্য দিগ্‌দর্শন করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞানভক্তের শ্রীমীলাত্রিনাথরূপে বিশ্রান্ত সেবাগ্রহণ

অভিন্নরাজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু গৌড়ীয়নাথরূপে বিস্তৃত বিচার-সম্বলিত সাধন-ভজনপ্রণালী জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি মীলাচল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক তাঁহার চরম ভজন-শিক্ষা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রকট করিয়াছেন। বহুজীবকুল আপনা-দিগকে ঐকান্তিকী কেবলাভক্তির আশ্রয়গ্রহণকারীরূপে পরিচিতি বা স্বীকৃতি দিতে না পারায় শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন-যজ্ঞ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। শ্রীভগবান্

অবগুণ্ণানতরুরূপে ব্রহ্মজেন্দনন্দন, তিনিই আবার শ্রীমদ্রামায়ণরূপে প্রকটিত হইয়া তত্তসেবকগণকে অমায়্য তঁাহার সেবাস্বযোগ দানপূর্বক তঁাহাদের বিশ্রুতসেবা গ্রহণ করিয়া আত্মতুষ্ট হইয়া বিরাজিত ।

শ্রীমন্নহাপ্রভু উপাস্তত্ব-নির্ণয়ে স্বয়ং এবং স্বরূপাদি বড়গোষ্ঠামণী ও গৌড়ীয়-গুরুবর্ণের দ্বারা যে-সকল তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ ও প্রচার করাইয়াছেন, তাহা ভক্তিবিরোধী জনগণের উপলব্ধির বিষয় হয় নাই । তিনি গৌড়ীয়গণকে সর্বতোভাবে হৃৎসদ পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন ।

হৃৎসদ-বর্জনে শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিশেষ উপদেশ

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা নির্বালীকভাবে করিতে গেলে অনৎসদত্যাগ—ঘোষিৎ-ঘোষিৎসঙ্গি-সদ্বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে । সাধক-সাধিকাগণের অধিকাংশ প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারী হওয়ায়, বন্ধজীবগণের ভোগেনুখী আচার-আচরণ-সমূহ প্রায়শঃই তাহাদিগকে অমার্জিত ও অভদ্র হইবার যোগ্যতা প্রদান করে । সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত ঐরূপ স্বরূপবিস্তারিতকর সাধন-ভজনবিরোধী সদ্ব ও পরিবেশ সম্বন্ধে পরিহার করিয়া চলাই বুদ্ধিমান হরিতজনপিপাসু জনগণের বিশেষ ও একান্ত কর্তব্য বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

উন্নতোজ্জলরমে আরাধনার চরমক্যারিতা

সুতরাং হৃৎসদ বর্জনপূর্বক গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ব্যতীত কখনই সুনির্মল আত্মার নিত্যকল্যাণলাভ হয় না । শাস্ত্র, দাস্ত্র, গৌরব-সখোর অধিকারিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে উপাসনা বা সেবা করেন, তাহা শ্রীমদনন্দনের দেবার আংশিক প্রকাশ মাত্র । শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহকে যাহারা পরমোপাস্ত্র-বিগ্রহরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তঁাহাদের অপ্রাকৃত রসবিচারে ন্যূনতা বা অজ্ঞতা পরিপঙ্কিত হয় । বৈষম্য-পথের পথিকগণ অল্পরূপের সহিত ভগবৎ-সেবা করিবার অধিকারী নহেন ; তাহারা বিধি-নিষেধের অন্তর্গত বৈষম্য-দ্বারা মর্যাদামার্গে সর্বশক্তিমানের পূজার্চন করিয়া থাকেন । ঐরূপ উপাসনা বা আরাধনায় উন্নতোজ্জল-রসাদির প্রকাশ না থাকায় উহা অভীষ্ট চরমফল প্রদানে অসমর্থ । শ্রীমন্নহাপ্রভুর নরকশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা ও আরাধনার কথাই জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন । তিনি অখিলরসামৃতমুখী শ্রীব্রহ্মজেন্দনন্দনকেই মধুররতির উপাস্ত্র 'কান্ত'রূপে নির্ণয় করিয়াছেন । এইরূপ আরাধনায়ই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । অভিধাবৃত্তিতে বৈষ্ণবগণই—কণক এবং তাহাবাই গৌড়ীয়নাথের একান্ত অঙ্গত 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচিত । তাহাদের উন্নত সেবাধিকার—সাধু-শাস্ত্রকর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত ।

শ্রীবিগ্রহ দর্শনের বাস্তব অধিকারী নির্ণয়

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপ্ৰাকৃত দৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন—“প্রতিমা মহ তুমি, নাকীং ব্রজেনন্দন” বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—শ্রীজগন্নাথদেব অধোক্ষজ-তত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন। আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা বাহার প্রতি বর্ষিত হইবে, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে দর্শনের অধিকারী হইবেন; নতুবা পুরুষাভিমাণে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই তাঁহার হস্ত-পদবহিত দর্শন ঘটিবে। রজস্তমোগুণ-তড়িত ব্যক্তিগণের ভগবদর্শন হইতে পারে না। যতদিন জীব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত ভগবান্ শ্রীবাহুদেবের প্রকাশ তাহাদের চিত্তে প্রকটিত হইবে না।

“ব্রহ্মার ন্যায় ব্যক্তি—যিনি আমাদের হইতে কতগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিজ অক্ষজদর্শনে ভগবান্কে মাপিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার চেষ্টা দর্শন করিয়া তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিলেন,—আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। এস্থলে “মদনুগ্রহাৎ” কথাটী বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহই একমাত্র কারণ। ভোগবুদ্ধিবহিত হইয়া অনন্ত-চিত্তে ভগবদর্শনের যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞান-রহস্য-সংযুক্ত অধ্যয়ন-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। শ্রোতপথ অতিক্রম করিয়া ভগবজ্ জ্ঞানলাভ হয় না। ভগবজ্ জ্ঞানলাভের নিদর্শনই ভজ্ঞনকারীর ভজ্ঞনীয় বস্তুর সেবাবৃত্তিতে অবস্থান।”

রথযাত্রানুষ্ঠানের তাৎপর্য ও শিক্ষা

শ্রোতপথানুযায়ী ভগবদনুগ্রহলাভ-বিষয়ে যে দর্শন ও অনুভব, জাগতিক বিচারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তাহা কোনদিনই অনুধাবনের বিষয় নহে। বাহারী ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে স্নাত, তাঁহারাই শ্রীরূপানুগত্যে ভবসিদ্ধতীরে নাকীরূপে দণ্ডায়মান মহাপ্রভু শ্রীজগদ্ধকুর রথযাত্রা-মহোৎসবের বাস্তব তাৎপর্য অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুগত সম্প্রদায় ব্রজরাজনন্দনকে প্রেমরজ্জুদ্বারা আকর্ষণপূর্বক ঐশ্বর্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-লীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি সুন্দরাচল-বৃন্দাবনে লইয়া যান, উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বার্ষধানবীর ভাবকান্তি-গ্রহণকারী ‘শ্রীমদমহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় প্রথম রথযাত্রার সময় তাঁহাদের নিজস্থানে

লইয়া ঘাইবার জন্ত ঘেরূপ যত্নবিশিষ্ট হন, উন্টারখের সময় তাঁহাদের সে যত্ন নাই। তাঁহারা ঘরের নিজস্ব ধনকে পরের দুয়ারে ঠেলিয়া দিবার জন্ত ব্যস্ত হন না।' গোবুলের বিরহ-বিধুরা গোপীগণ কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে তীর্থযাত্রা ছলে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমমহাপ্রভুর ভক্তগণের পক্ষে এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। বিরহ বা বিপ্রলভই তাঁহাদের ভজন। অবসরকালে শ্রীমমহাপ্রভুর আলাল-মাথে গমন বা বিশ্রাম—বিপ্রলভ-ভজনেরই বিশেষ উদ্দীপক। শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সন্তোষস্পৃহার পরিবর্তে বিরহানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে স্থখপ্রদানের চেষ্টা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত।

শ্রীরাধা-নাথব-ভজনে অধিকার-প্রার্থনা

আমরা শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং গৌড়ীয়-গুরুবর্গের বাণীতে পাই,—“জড়চিত্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিত্তধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী হইতে না পারিলে কুরুভজন হইবে না।” শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর মহাদান—শ্রীনাথব-ভজনরীতি যাহা স্বহৃদে হইলেও তিনি দান করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎও অহুশীলন ও আলোচনার সময় ও সুযোগ আমাদের হইল না। আমরা অনর্থ ও জড়ের বিক্রমে এতদূর অভিভূত যে, সেই অনর্থরাশি পরিমার্জনপূর্ব্বক আত্মশোধন করিতে পারিতেছি না! আমরা কিরূপে তাঁহার নিজজনগণের একান্ত আশ্রয়ে তাঁহার বিপ্রলভ ভজনের—মহা অবদানের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিব? গুরু-বৈষ্ণবগণ ভূরিদ—পরম করুণাময়, আমরা আত্মঘাতী হইয়া দেই অর্হেতুকী রূপা কিরূপে অহুভব করিব? আমরা স্বরূপে পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আত্মমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। এরূপ হুবহুয় “আবৃন্তিরদ-কুতুপদেশাৎ”—এই বেদান্ত-বাক্যই আমাদের একমাত্র আশাবন্ধ। বিরহ বা বিপ্রলভদশায় বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের আদর্শ, শিক্ষা, আচার, প্রচারাদি অহুশীলনে একান্তভাবে প্রযত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। অপ্রাকৃত বিরহ-ভাবোদ্দীপ্তা সর্ব্বভুতস্বরী শ্রীনামকীর্ত্তনাম্বা ভক্তিমহাদেবী আমাদের হৃদয়াস্তঃপুর আলোকিত করুন। আমরা যেন নব-উদ্দীপনায় শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীনাম-দীক্ষায় উরুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta
Acharyya Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of Tridandi-Swami Shri
individuals who won the Shrimad Bhakti Vedanta
newspapers and partners Baman Maharaj, President-
or share holders holding Acharyya, on behalf of Shri
more than one percent of Goudiya Vedanta Samiti.
the total capital.—

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that
the particulars given above are true to the best of my know-
ledge and belief.

Sd./-Swami B. V. Acharyya

Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 90

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।	*
ধর্মঃ সমুচ্চিৎ পুংসাং বিদ্বৎসেন-কথাঞ্জলিঃ ।		নোংপাদসমুদয়াদি রুতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা নুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ৭৮ শ্রেষ্ঠ ঘাটে আত্ম পরনয় ।

অধোপক্ষে অহৈতুক্য ভক্তি বিদগুণ ॥

অতঃ ধর্ম অত্মরূপে পালে ধৈর্য জন ।

ইতি-কথার রুতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ	৪ মধুসূদন, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগোবিন্দ ৩১শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৯৬, ইং ১৯৪৮।৯০	২য় সংখ্যা
----------	--	------------

সান্ন্যাসাদং

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকৃতং শ্রীবলদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাংশ-
সংবাদে বলভদ্রজন্ম-বর্ণনে দশমেছধ্যায়ে]

শ্রীবেদব্যাস উবাচ,—

১ । দেবাধিদেব ভগবন্ কামপাল নমোহস্ত তে ।

নমোহনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

[শ্রীমদ মহারাজ বিস্মিত হইয়া বেদব্যাসকে শিগুরূপী শেষকে দর্শন করাইলে নত্যবতী-তনয় ব্যানদেব ক্রোড়স্থিত বলদেবকে অবলোকন করিয়া প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—]

শ্রীবেদব্যাস বলিলেন,—হে দেবাধিদেব ভগবন্! আপনি কামপাল ;

আপনাকে নমস্কার । আপনি শেখ অনন্ত সাক্ষাৎ বলরাম, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

২ । ধরাদ্বারায় পূর্ণায় স্বধামে সৌরপাণয়ে ।

নহস্তশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥ ৩৭ ॥

আপনি ধরাদ্বার, পূর্ণতেজোময়, লাদলপাণি, সহস্রমস্তক, সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নিত্য নমস্কার করি ॥ ৩৭ ॥

৩ । রেবতীরমণ স্বং বৈ বলদেবোহচ্যুতাগ্রজঃ ।

হলায়ুধঃ প্রলম্বয়ঃ পাহি নাং পুরুষোত্তম ॥ ৩৮ ॥

আপনি রেবতীরমণ, অচ্যুতাগ্রজ, বলদেব, হলায়ুধ ও প্রলম্বয় । হে পুরুষোত্তম ! আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥

৪ । বলায় বলভদ্রায় তালঙ্কায় নমো নমঃ ।

নীলাশ্বরায় গৌরায় রোহিণ্যায় তে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

আপনি বল, বলভদ্র ও তালঙ্ক নামে অভিহিত, আপনাকে নমস্কার । আপনার পরিধানে মৌল বসন ও বর্ণ গৌর; হে রোহিণীনন্দন ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩৯ ॥

৫ । ধেনুক্যরিমুষ্টিকারিঃ কুস্তাগারিস্তমেব হি ।

কুস্ত্যারিঃ কুপকর্ণারিঃ কুট্যারির্কব্জলান্তকঃ ॥ ৪০ ॥

আপনি ধেনুক, মুষ্টিক, কুস্তাগ, কুস্তা, কুপকর্ণ, কুট ও বজ্রের অন্তক ॥ ৪০ ॥

৬ । কালিন্দী-ভেদনোহসি স্বং হস্তিনাপুর-কর্ষকঃ ।

দ্বিবিদ্যারির্বাদবেন্দ্রে ব্রজমণ্ডল-মণ্ডনঃ ॥ ৪১ ॥

আপনি কালিন্দীর ভেদ ও হস্তিনাপুরের কর্ষণ করিয়াছিলেন ; আপনি দ্বিবিদের অরি, যাদবেন্দ্র ও ব্রজমণ্ডলের মণ্ডলস্বরূপ ॥ ৪১ ॥

৭ । কংসভাতৃ-প্রহন্তাসি তীর্থঘাত্রাকরঃ প্রভুঃ ।

ভূর্যোধন-গুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি জগৎপ্রভো ॥ ৪২ ॥

আপনি কংসভাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থঘাত্রাকারী সাক্ষাৎ প্রভু ও ভূর্যোধনের গুরু । হে প্রভো ! জগৎ রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

৮ । জয় জয়াচ্যুত দেব পরাংপর

স্বয়মনন্ত দিগন্ত-গতশ্রুত ।

সুর-মুনীন্দ্র-কণীন্দ্রবরায় তে

মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ৪৩ ॥

হে অচ্যুত পরাংপর দেব ! আপনার জয় হউক, জয় হউক । আপনি
লাক্ষ্য অনন্ত ও দিগন্ত-বিস্তৃতকীর্তি, স্বরেন্দ্র-মুনীন্দ্র ও কণীন্দ্রবর, আপনি
হলী-বলী ও মুনলী ; আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

৯ । ইহ পঠেৎ সততং স্তবনন্ত যঃ

স তু হরেঃ পরমং পদমাত্রজ্ঞেৎ ।

জগতি সর্ববলং ত্রিমূর্ত্তনং

ভবতি তস্মৈ জয়ঃ স্বধনং ঘনম্ ॥ ৪৪ ॥

ইহ সংসারে যে মানব সতত আপনার এই স্তব পাঠ করেন, তিনি শ্রীহরির
পরমপদ প্রাপ্ত হন ; জগতে তাঁহার শত্রু-সংহারক সর্ববিধ বল লাভ হয় এবং
তিনি প্রভূত অর্থ-পরমার্থলাভে সর্বত্র জয়ী হন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,

১০ । বলং পরিক্রম্য শতং প্রণম্য

দ্বৈপায়নো দেব-পরাশরায়জঃ ।

বিশালবুদ্ধির্মুনিবাদরায়ণঃ

সরস্বতীং সত্যবতীশ্রুতো যযৌ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—অনন্তর সমস্ত মুনিগণসহ বিশালবুদ্ধি বদরী-বনবাসী
দ্বৈপায়ন পরাশরতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস শ্রীবলদেবকে শতবার প্রদক্ষিণ-
প্রণাম করিয়া সরস্বতী-তীরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমহাপ্রসাদে বিতর্ক

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে কুচির পার্থক্য ; স্মার্ত্ত-দুরন্ধর বাসুদেব-
সার্বভৌমের মহা প্রসাদের মাহাত্ম্য উপলক্ষি

জগতে সকল বিষয়েই স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে কুচি হইপ্রকার । কেবল
কুচি নয়, সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কার্য্যেও এইপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয় । সত্ত্ব-রজ ও
তমোগুণের প্রভাবানুসারে এইপ্রকার কুচির ও সিদ্ধান্তের ভেদ হইয়া থাকে ।
বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইপ্রকার কুচি ও সিদ্ধান্ত-ভেদ দেখিয়া
আসিতেছি । বিদ্বদ্বর বাসুদেব-সার্বভৌম মহাশয় যে-দময়ে সর্বপণ্ডিতাগ্রগণ্য
হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারও মনে
শ্রীমহাপ্রসাদ-বিষয়ে বিষম সংশয় ছিল । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ

পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর রূপায় যখন তাঁহার চিত্ত বজ্র ও তমোশূণ্ধ্য অতিক্রম করিয়া ভক্তির বিস্তৃত সমুদ্রে অধিকার লাভ করিল, তখন তাঁহার আর মহাপ্রসাদে কোন সন্দেহ ছিল না। শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষ্যে তিনি নৃত্য করিতে করিতে অশৌভ-বদনে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া বলিলেন, যথা পদ্মপুরাণে,—

ভুংকং পৰ্য্যবিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।

প্রাপ্তিমাশ্রয়ে ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা ॥

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।

প্রাপ্তমগ্নং ক্রতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥

সংশয়াত্মার মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-শ্রীমামন্ত্রজ্ঞ

ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব

বাসুদেব-সার্কভৌম মহাশয় তৎকালে স্মার্তজগৎ ও মায়াবাদী পণ্ডিতদিগের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান ছিলেন। একপাখা ধাক্কিয়াও তিনি স্বয়ং বাক্যের দ্বারা ও চরিত্রের দ্বারা জগৎকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন আর শিষ্টাচারী কোন ব্যক্তিরই তদ্বিরুদ্ধে কথা কওয়া উচিত নয়। কিন্তু সৌভাগ্য ব্যতীত জীবের সংশয় দূর হয় না; সুতরাং তাঁহার পরেও সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বহুবিধ বিতর্ক করিয়া থাকেন। সার্কভৌম অপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-প্রাপ্তি ইহার কারণ নহে। মহাভারতে এইপ্রকার হুর্গতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিখ্যাসো নৈব জায়তে ॥

শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কৰ্ম্মজড় স্মার্তগণের কুতর্ক

উত্থাপন ও দৈবদণ্ড লাভ

যে-সময়ে আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলাম, সে-সময়েও অনেক স্মার্ত পণ্ডিতকে মহাপ্রসাদ-বিষয়ে কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি। কেহ বলিতেন যে, মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবন করা কর্তব্য; কেহ বলিতেন, মন্দিরের বাহিরে পঞ্চকোশ পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন কর্তব্য। কেহ কেহ বা বলিতেন, মহাপ্রসাদ সৰ্ব্বদা শূদ্রস্পৃষ্ট; মন্দিরের ভিতর বা মন্দিরের বাহিরে কোথাও সেবন করা উচিত নয়। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের প্রতি যে-সকল দৈবদণ্ড হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

বঙ্গবাসী-পত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে
স্মার্তের বহিস্খুখী ব্যবস্থা

বঙ্গবাসী-পত্রে আমরা একটি বহিস্খুখ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আমাদের কিছু দুঃখ নাই, যেহেতু এইরূপ ব্যবস্থা মায়াবদ্ধ জীবের নরকদাই হইয়া থাকে। ব্যবস্থা এই যে, শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ক্ষেত্র-পঞ্চকোশের বাহিরে গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বীয় ব্যবস্থা সমর্থন করিবার জন্য কোন বিজ্ঞানমহাশয় নিম্নলিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ কয়েকটি তুলিয়াছেন।—

উৎকল খণ্ডে—পঞ্চকোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তব্যবস্থিতম্।

ত্রিকোশং তীর্থরাজ্যন্ত তটভূমৌ স্থনির্ধিতং।

স্ববর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বশোভিতং ॥

বিষ্ণুপুত্র্য গন্তং তচ্চি নির্ধাণ্যং পতিতাদয়ঃ।

স্পৃশন্ত্যনং ন দুষ্টং তদ্ যথাবিষ্ণুস্তথৈবতং ॥

ব্রতহাবিধবা তত্র সর্বৈ বর্ণপ্রমাতৃথা।

তৎপ্রাশনেন পুরস্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ ॥

অদেহাঃ পরদেহাঃ বা সর্বৈ তত্র নমা মতাঃ।

চিরস্থমপি সংস্কৃতং মীতং বা দূরদেশতঃ।

‘যথা তথোপযুক্তং তং’ সর্বপাপপ্রণোদনম্ ॥

কুকুরস্ত মুখাদভ্রষ্টং—

ক্রিয়াযোগসারে—লবণাস্তোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংস্কৃতং।

পুং তদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি স্তুত্বভং ॥

প্রবিশন্তস্ত তং ক্ষেত্রং সর্বৈ স্থাবিষ্ণুমুগ্ধয়ঃ।

তস্মাদ্ বিচারণা তত্র ন কৰ্ত্তব্য কদাচন ॥

চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।

সাক্ষাৎবিবুৰ্ধতস্তত্র চাণ্ডালোপি বিজোপি চ ॥

উদ্ধৃত প্রমাণ-জ্ঞোকাবলীর যথার্থ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ,

এবং সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি-স্থাপন

উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে পণ্ডিতমহাশয় কেবল স্বন্দপুরাণের উৎকল খণ্ড এবং পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার দুইটী মাত্র শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার অজ্ঞান শাস্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বাহ্য কথিত আছে, তাহা দেখিবার সুবিধা হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে,

পণ্ডিত মহাশয়ের সিদ্ধান্তে অবিচারিত বিধান-দোষ দেখা যায়। আবার তিনি যে কয়েকটি প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বল পায় না। উক্ত প্রমাণগুলিতে এইমাত্র কথা আছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র—পঞ্চকোশ। এই পঞ্চকোশের মধ্যে যে ভগবদালয় আছে, তদগতব্যক্তির নির্মাণ্য ও অন্নগ্রহণ করা কর্তব্য। ইহাতে বর্ণ-বিচার নাই। ইহাতে এরূপ কোন কথা নাই যে, কেবল সেই মন্দিরের মধ্যে বা পঞ্চকোশের মধ্যে প্রসাদ সেবন করিবে, পঞ্চকোশের বাহিরে করিবে না। ‘নীতং বা দূরদেশতঃ’ এই শব্দগুলির দ্বারা মন্দির-মধ্যে বা মন্দির হইতে কিয়ৎ পরিমাণ দূর পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন করা উচিত—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে; তাহাতে আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইলাম, কেননা ‘চিরস্থমপি সংস্কৃতং নীতং বা দূরদেশতঃ। যথা তথোপযুক্তং তৎ’ এই শব্দগুলির অভিধাশক্তি বিচার করিলে সমস্ত জগতে প্রসাদ সেবনের বিধি করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। পূর্বোক্ত প্রমাণগুলিতে এমত কোন শব্দ পাওয়া যায় না, যদ্বারা ‘দূরদেশতঃ’ শব্দের অর্থ লক্ষণাধারা কৃতিত করা যায়। পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত বচনটীতে ‘প্রবিশস্তস্ত তৎ ক্ষেত্রং’ এই শব্দগুলি হইতে দ্বিতীয় পদে ‘তত্র’ শব্দের অর্থদ্বারা কেবল ঐ ক্ষেত্রমাত্র বুঝাইতে পারে না। ‘তত্র’ শব্দে তদ্বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীমহা-প্রসাদ-বিষয়ে ইহাই বুঝিতে হইবে। ‘চাঙালেমপি সংস্পৃষ্টং’ শ্লোকে দুইটি ‘তত্র’ শব্দ আছে। তাহার অর্থ সেই ক্ষেত্রনিষ্ঠ বটে, কিন্তু তদ্বারা ক্ষেত্রের বহির্ভাগে প্রসাদান্ন পাইবার কোন নিষেধ বাক্য দেখা যায় না।

উপবাসাদি-ত্রত-নির্ণয়ে স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থা

পারমার্থিকগণের গ্রহণযোগ্য নহে

ঐ পদ্মপুরাণে যখন “ন দেশ-নিয়মস্তত্র” এই বাক্য সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যপ্রভৃৎ শ্লোকে পাওয়া যায়, তখন মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বিচারত্ব মহাশয়ের জ্ঞানসিদ্ধান্ত কখনই বুধগণ-কর্তৃক আদৃত হইতে পারে না। স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ যদি সকলেই এরূপ সিদ্ধান্ত করেন ত’ করুন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রসাদের কোন ক্ষতি নাই; কেন না, প্রাচীনকাল হইতে শুক মহাপ্রসাদান্ন পাশ্চাত্য-দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দূরদেশে নীত হইতেছে এবং তত্র তত্রস্থ পারমার্থিক পণ্ডিতগণকর্তৃক আদৃত হইয়া গৃহীত হইতেছে। পারমার্থিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা সমস্ত পারমার্থিক জগতে গৃহীত হয়; সুতরাং স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে সিদ্ধান্তও সর্বত্র বিবিধ। স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মাথায় করিয়া রাখুন,

তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি বা ক্ষতি নাই। শ্রীহরিবাসরাদি সম্বন্ধেও দ্বিবিধ মত আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে।

কৰ্ম্মজড় স্মার্ত্তমত পারমার্থিকগণ-কর্ত্ত্বক চিরকাল উপেক্ষিত

শেষকথা এই যে, বিষ্ণুরত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার সম্প্রদায়ে গৃহীত হউক। তিনি পরমার্থীদিগকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবেন, একরূপ আশা (যেন) না করেন। কথা এই যে, একরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য পত্রে মুদ্রিত করিবার কারণ দেখা যায় না। স্মার্ত্ত-পরমার্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিবাদ উঠাইবার কি প্রয়োজন আছে? তবে এই কথা বলা যায় যে, এখন কলিকাল; এইরূপ মহাপ্রসাদ সম্পর্কে বৃথা বিতর্ক উঠাইয়া, শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরের শাখাযুগাদির বধ-ব্যবস্থা করিয়া এবং মন্দির-সংলগ্নস্থানে মলত্যাগ ব্যবস্থাপূর্ব্বক কেবল ভক্তবৃন্দের মনে কষ্ট দেওয়া কতকগুলি লোকের লীলা-খেলা হইয়া থাকে।

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দীক্ষা-বিধান

সাধারণতঃ মানবগণ বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত বৈদিক বিধানমত দশটী সংস্কার গ্রহণ করেন। উপনয়ন সংস্কার দশটী সংস্কারের অন্ততম। এই সংস্কার প্রাপ্ত হইলে মানবের পাপ অপমোদিত হইয়া দ্বিতীয় নিম্পাপ জন্ম হয়। যে কুলে সংস্কার গ্রহণ পৈতৃকাচার নহে, তথায় জন্মাবধি বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপ প্রস্রাভিত হয় না। আর যে কুলে সংস্কার-বিধি প্রচলিত, সেই কুলকে পুণ্যময় কুল বলিয়া পণ্ডিতগণ আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রাক্তন পাপবহুল হইয়া মানবগণ শোচ্য শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন আর প্রাক্তন পাপ ক্ষীণ হইয়া পুণ্যলব্ধ জীব দ্বিজকুলে শরীর লাভ করেন।

দ্বিজকুলে স্থলশরীর পাইলেই যে বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপাক্রান্ত হইতে হইবে না, একরূপ নয়, পরন্তু দশসংস্কার প্রভাবে প্রবর্ত্তমান পাপ বিনাশকল্পে উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—‘এবমেনঃ শযং য়াতি বীজগর্ভ-সমুদ্ভবং।’ উপনয়ন-সংস্কারে আচার্য্য বেদ-সমীপে মানবকে লইয়া যান। উপনীত দ্বিজই বেদাধ্যয়ন করেন। যিনি বেদাধ্যয়ন-বিশুখ, তিনি উপনয়ন

বিশিষ্ট হইয়াও উপনয়ন-গ্রহণের একমাত্র তাৎপর্যহীন হইয়া ইহ জন্মেই শূদ্র হইয়া যান এবং বংশ-পরম্পরা 'দ্বিজ' শব্দ বাচ্য হইবার পরিবর্তে শূদ্রবংশের জনক হন। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া পরিচয় দিলে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের যোগ্যতা হয় না। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার এক জন্ম বা শূদ্রতা বর্তমান থাকে। সংস্কার গৃহীত হইলে মানবক দ্বিজ হন।

বিশুদ্ধ মাতাপিতার নিকট জন্মলাভ করিলে তাহাই শৌক জন্ম। শৌক জন্ম বিধানক্রমে সাধারণতঃ পুরোহিতকর্তৃক বিচার না করিয়া পূর্ববংশগত প্রথমত উপনয়ন সংস্কার বিহিত হয়। যেখানে শৌকজন্মের অসম্ভাব, তথায় নানাপ্রকার যোগ্যতার বিচার উপস্থিত হয়। পুরোহিত সেই কালে বিচার করিয়া উঠিতে পারেন না। শৌক জন্ম হইলেই যে তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন, এরূপ নহে, তাঁহার সাবিত্র্য বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত প্রবর্তমান পাপের অবসান হয় না। পূর্ব পুণ্যফলে প্রাক্তন দুর্জাতি-অজ্ঞাবেই তাঁহার বিশুদ্ধ জনক-জননী লাভ হয়। 'বিশুদ্ধ'-শব্দে সংস্কার-বিশিষ্ট অর্থাৎ পাপ-বর্জিত বংশে পুণ্যবানের জন্ম হয়। বেদপাঠের অভাবে লঙ্ঘ-দ্বিতীয়জন্ম দ্বিজের পুনরায় পাপময় শূদ্রত্ব লাভ ও বংশপরম্পরাক্রমে শূদ্রতা বা অদ্বিজত্ব বা বেদপাঠাযোগ্যতা জামিতে হইবে। ইহাই শৌক বিধানক্রমে দ্বিজত্ব।

দ্বিজ যে কালে শাস্ত্র-বিধিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত সংস্কার হয়। যে-সকল মানবক সামাজিক বিধানমতে দ্বিজত্ব-লাভে বাধা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা গুরুর নিকট নিজ যোগ্যতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। শিষ্যের যোগ্যতা বা নিজ বৃত্তের পরিচয়—আশ্রয় গ্রহণ। আশ্রয় গ্রহণ আর কিছুই নয়, কেবল সেবা-প্রবৃত্তির পরিচয়ে শরণাগত হওয়া। অভক্তির পথে আশ্রয় গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। 'গুরুপদাশ্রয়' বলিতে গুরুকে ঈশ্বর-বোধ এবং আপনাকে দাস বা বস্তু-বোধ। সৎগুরু-বিচারে বেদ বলেন,—বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠই সৎগুরু এবং সংশিষ্টের হস্তে যজ্ঞীয় সমিধাদি যজ্ঞীয় উপায়ন বর্তমান থাকিবে। যে মানবক অক্ষজ জ্ঞান বা অধিরোহ-পন্থা বা মায়া'র ভোক্তা ত্রিগুণাত্মকতা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া অধোক্ষজের সেবা বা অবতীর্ণ, অবিসংবাদিত নিরস্ত্রকৃৎক মতো অবস্থিত হইতে পারিবেন, তাঁহারই গুরুচরণাশ্রয়-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া দীক্ষা-প্রাপ্তি হইবে। 'দিব্য জ্ঞানং যতো দত্তাৎ কুর্ঘ্যাত্

পাপস্ত্র সংক্ষয়ম্ । তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্র কোবিদৈঃ ॥ 'দীক্ষা' বলিলে এই বুঝায় যে, যে অহুষ্ঠান হইতে মানবক বা দ্বিজের প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ হইয়া প্রাকৃত পাপ-পুণ্যাদির সম্যক্ বিনাশ সাধিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞজনে 'দীক্ষা' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ।

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বেদান্তুগা । বেদান্তুগা দীক্ষা দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাক্ষরাত্তিকী । যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী । অযোগ্যজনে অধিকারীজ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অধিকারী-বিচারে ভাবী যোগ্যতা লাভের উদ্দেশে পাক্ষরাত্তিকী দীক্ষা । ব্রহ্মবামল বলিয়াছেন,—কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই । তাহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পঞ্চমবিলাস-প্রারম্ভে উদাহৃত হইয়াছে ।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্লাহি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ ।

তেষামাগম-মার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতব্যাৰ্জনা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতি মধ্যে যোগ্যতা-বিধায়ক দশসংস্কারের বিধান দীক্ষার অঙ্গমধ্যে উল্লিখিত করিয়া ক্রম-দীপিকা সাবদাতিলক, রামার্কচন্দ্রিকা পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অহুকূলে আগমবিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন ।

যথা কাক্ষনভাং যাতি কাংস্ত্রং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥

অর্থাৎ দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে । দীক্ষাকালেই অধিকারী মানবকের দ্বিজত্ব দিষ্ট হয় । দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যকালীয় মৌল্লিবন্ধনাদি অহুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না । তাহা পূর্বেই সাধিত হইয়া যায় ।

একমাত্র শৌক্যবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসকীয় স্মার্তগণ শূদ্রদীক্ষা-বিধান বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা 'দীক্ষা' শব্দবাচ্য নহে । তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলা যাইতে পারে । এইপ্রকার দীক্ষাদান-চাতুরীদ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব স্মার্ত বা পারমার্থিকগণ বলেন যে, উহা নব্যস্মার্তের মনগড়া কাল্পনিক মন্ত্র । নব্যস্মার্ত নিজগুরুর নিকট যে দিষ্ট মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার বর্জন, বর্জন, পরিবর্তনাদিকার তাহাকে কেহ দিতে পারেন না । স্মতরাং শূদ্রের বিতে লুক্ক হইয়া ভূতকল্পরূপে শূদ্রকে মন্ত্র দিতে গিয়া তাঁহার ধর্মহানিকর কৃত্রিমপথ অবলম্বন ভাল হয় নাই । শ্রীমন্নহাপ্রভুর সময় পাক্ষরাত্তিকী দীক্ষা

প্রদত্ত হইত বলিয়া সেইকালে দীক্ষিতগণ সকলেই দ্বিজ হইতেন। তখন পঞ্চোপাঙ্গকীয় স্মার্ত বা নিরীশ্বর স্মার্ত সমাজের উপর অধিক প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তিকালে যখন নিরীশ্বর স্মার্তের অধীন জনগণ বৈষ্ণবচার্য্য হইবার জন্য দুই সকল কার্য্যে পরিণত করিলেন, সেইকালেই দীক্ষিত ও অদীক্ষিত উভয়েরই মুক্তি-মিঞ্জির দ্বায় বৈষম্য বিদূরিত হইল। স্মৃতবাং দীক্ষাকার্য্য না হইয়া প্রাকৃত সহজমত বা স্মার্ত বা বিষ্ণুবিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরহরি ও তাহার পাদদগণের অভিপ্রায়মত সেই কাল-প্রোথিত সনাতনীয় দীক্ষাপ্রণালীর বহুল প্রচারের যত্ন করিতেছেন। দীক্ষা-বিধানক্রমে ‘দ্বিজত্ব’ কথাটি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিয়া নিরীশ্বর-প্রথা বা পঞ্চোপাঙ্গনামর পদ্ধতি বৈষ্ণব-জগৎকেও বিপথগামী করাইতেছে। আচার্য্যের কার্য্য করার ছলনায় আচার্য্য সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধকেই ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া চালাইতে চায়। ইহাদিগের জন্তই ভাগবত বলিয়াছেন,—কলিকালে প্রকৃত দ্বিজ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ ত্রাত্য হইয়া যাইবেন। আর শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণবংশ বা দাসী প্রভৃতি পরিচয় ছলনায় উদর ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালনোদ্দেশ্যে প্রতিগ্রহ করিতে থাকিবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মণ্যদেবকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইবেন। সেই সকল অধর্ম্মজগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণবংশজাত মর্যাদা বা গোস্থামী প্রভৃতি উচ্চ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া ভূতকাধ্যাপকরূপে ব্যাসানন প্রভৃতি অস্বাস্থ্যপূর্ব্বক দখল করিয়া ধর্ম্মোপদেশক হইবেন। উদরোপস্থবেগজীবগণ মর্কট বৈরাগী হইয়া রাগানুগ পরমহংস বেশে ত্রিদণ্ড ও দৈক্য বা যজ্ঞপুত্র ছাড়িয়া দিয়া নিজের কপট দৈক্য প্রচার করিয়া বান্দলীলা পড়িয়া শুনাইয়া ‘ভক্ত’ নামে অভিহিত হইবেন। এই সকলই কলির ধর্ম্ম।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধি বিনা।

একান্তিকী হরেভক্তিৰূপাতায়ৈব কেবলম্ ॥

নারপঞ্চরাত্রে (ভারতীয়াসংহিতা ২য় অধ্যায় ২৪ শ্লোক)—

স্বয়ং ব্রহ্মনি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব চ মন্ততঃ।

বিনীতানথ পুত্রাদীনৃ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই

দীক্ষাবিধি। অনেকে অজ্ঞতানিবন্ধন বলিয়া থাকেন যে, পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্রকেই দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে কি দোষ হয়? তৎপ্রতিবেদে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকই যথেষ্ট মনে হয়।

“বৈদিকী লৌকিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনৈ।

হরিন্দেবাম্বুকুলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥”

ভক্তির অন্তকূল দশমংস্কারাদি ভক্তির বিরোধী নহে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সংক্রিয়াদার-দীপিকা গ্রন্থে দশমংস্কার পদ্ধতি নিষিদ্ধ করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবকুলকে পঞ্চোপাসকের প্রচণ্ড তাপ হইতে হুশীতলচ্ছায়া দিয়াছেন। তিনিই নিরীশ্বর কশ্মিগণের তীক্ষ্ণ দশনরূপ ফলভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমহাভারতের লিখিত “শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো বিজ্ঞো ভবতি সংস্কৃতঃ।” এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্র হইয়া পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই বৈদিক দশমংস্কার-পদ্ধতি অচ্যুত আছে। দীক্ষার পরে আর বিজ্ঞত্বের লক্ষণাভাব থাকে না।

এক ব্যক্তির এক শত্রু লেখাপড়া শিখিয়া হাকিম হইয়াছেন শুনিয়া তিনি বলিলেন,—শত্রু কখনই বেতনভোগী হাকিম হইতে পারিবে না। তত্কালে তিনি যখন গুলিলেন, শত্রু মুনসেফ্ হইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন,—হোক না মুনসেফ্, মাহিমা পাইবে না। এইরূপে বিজ্ঞ-ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইলেও সে ব্রাহ্মণ হইবে না, তাহার ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যজ্ঞযুগ্ম থাকিবে না। আবার কেহ বলেন,—দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞযুগ্মে ‘তৃণাদপি সুনীচতা’র ব্যাঘাত হয়। আমাদের স্পর্দ্ধা করবার জিনিষটা এত সহজ-প্রাপ্য হইয়া গেল, সূতরায় ‘তৃণাদপি সুনীচ’ থাকিলে আমরা তাহাকে পাপী শূদ্র বলিবার স্বযোগ পেতাম। আমরা নিজেরা ব্রাহ্মণ এবং আমাদের গুরু ছয় গোস্বামী তাহাদিগকে শূদ্র বলিবার স্বযোগ পাছি, তাহা ত’ আর পাব না—এইসব অসুবিধা। পরমহংসের বেশে বর্ণচিহ্ন ও আশ্রমচিহ্ন নাই, তাহাতে আমাদের ভায় কলির শয়তানের সমগ্র জগতের গুরু পরমহংস দামগোস্বামীকে শালগ্রাম শিলাপূজায় অধিকারী বলিবার স্বযোগ পাছি, তাহাতেও বাধা পড়িতেছে।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর।

শ্রীমদ্বাং প্রভুর কথা প্রচারই বাস্তব বদান্যতা ও জীবে দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়া মঠ

তেষরিপাড়া

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ২৭ ১২/৬১

স্নেহভাজনেষু—

***! তোমার ২৩/১২/৬১ তারিখের ৮০ লাইন লিখিত ১খানা পোস্ট-কার্ড পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর তোমাকে উপাধির জ্ঞান কলেজে থাকিতে হইবে। আমিও প্রত্যহই তোমার কথা চিন্তা করিয়া থাকি, আর নরোত্তম ঠাকুরের একটা গান স্মরণ করি। তিনি লিখিয়াছেন,—
“রামচন্দ্র নন্দ মাগে নরোত্তম দাস।” সর্ববিষয়েতে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রবল, ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিবে। তিনি যেভাবে যাহাকে গঠন করিয়া তোলেন, তিনি সেইভাবে গঠিত হইয়া থাকেন। ভগবানের ইচ্ছায় বিকল্পে কাহারও চলিবার ক্ষমতা নাই।

যাহা হউক, যাহাতে ভালভাবে পাশ করিতে পার সেই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবে। বৈষ্ণব হৃদয়ে সমস্ত গুণেরই বিলাস। সুতরাং পার্থিব জগতের যাবতীয় গুণই তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈষ্ণবগণে থাকে। জড়বিজ্ঞান আনুশ্রিক হইলেও দেবতাগণ তাহাতে কমা নহেন। তুমি ভাল করিয়া পাশ করিয়া আনিবে।

সর্বদাই সত্যকথা প্রচারে ব্রতী থাকিবে। নন্দমাহন্যুক্ত ব্যক্তিগণের ভগবানই মহায়। পৃথিবী অসংপথে চলিলে আমরা তাহার দাসত্ব করিব না। পাপ প্রবৃত্তির বা অসংখ্য কথার কোন প্রশ্রয় দিবার জ্ঞান জন্মগ্রহণ করি নাই। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুশ্রিক শিক্ষাকে আমরা আদৌ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। কলির প্রাবল্যে বিশ্বব যাহা প্রগতি তাহা রোধ করিতে হইবে। বিশ্বের মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের ইহাই একমাত্র ব্রত হওয়া দরকার। ইহার নামই মহাবদান্য এবং ইহাকেই বলে জীবে দয়া। তুমি নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিবে। সত্য প্রচারের জ্ঞান নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণই পাণ্ডুগণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছেন। এমন কি, বহু মহাজনকে মতোর জ্ঞান প্রাপত্তাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভীত হইলে চলিবে না। মদ্যপ্রভুর Policy—তৃণাদপি সুনীচ হইয়া এবং বৃক্ষ অপেক্ষা নহিষ্ণু হইয়া জীবে দয়া বা প্রচার করিতে হইবে। ভগবৎকথা প্রচারই জীবে দয়া।

অধিক কি? আমার শরীর একপ্রকার আছে। আমি আগামী ৪/১২/৬২ মথুরা যাচ্ছি। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর]

আমার যখন দীক্ষা হল বাগবাজারে (হরিনাম হয়েছিল মায়াপুরে), তখন সকলে আমাকে ‘প্রভু’ বলে ডাকতে লাগলেন । আমার ব্রহ্মচারী-নাম ছিল—রাধারমণ । ‘রাধারমণ প্রভু’ বলে ডাকতেন । তখন আমি ছেলে-মাত্র । গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম,—প্রভো ! আগে আমাকে সকলে ‘রাধারমণ’ বলে ডাকতেন, এখন আমাকে ‘রাধারমণ প্রভু’ বলছেন কেন ? প্রভুপাদ তখন হাসলেন । হেসে বললেন,—দেখ, তোমাকে যে প্রভু বলছেন তাতে তুমি মনে করো না—তুমি ‘প্রভু’ হয়ে গেছ । এটা একটা উদাহরণ ও শিক্ষা । পাছে অভিমান আদে, গর্ক এসে যায় ; সেই গর্কটাকে খর্ব করার জন্য ‘গুরুর দেবক হয় মান্ত আপনার’—এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ।

এখন আমার কোন গুরুভাই আমাকে প্রণাম করছেন যে,—শ্রীল বন মহারাজের শিষ্য বসে আছেন, আপনার শিষ্যও বসে আছেন । যদি আপনার কোন গুরুভাই (যিনি দেহরক্ষা করেছেন), তাঁর কোন শিষ্য (যিনি শিষ্য করছেন) এমন সময় এসে যায়, সে আপনাকে প্রণাম করবে কিনা বা বন মহারাজকে প্রণাম করবে কিনা ? আমি বললাম—না, সে তার গুরুকে প্রণাম করবে । কিন্তু গুরুর কর্তব্য হবে, তিনি বলবেন,—আমার গুরুবর্গরা বসে আছেন, তাঁদের প্রণাম কর । অতএব যদি সে তার গুরুদেবের আদেশে এসে প্রণাম করে তাহলে তার অপরাধ হবে না । কিন্তু যদি সে গুরুকে আগে প্রণাম না করে, তাহলে তার অপরাধ হবে । গুরুদেবের কর্তব্য হবে শিষ্যকে বলবার, আগে আমার গুরুবর্গকে প্রণাম কর । এইটা বিধি এবং নিয়ম । দীক্ষাগুরুকে শ্রেষ্ঠ বলে জানবে । অতএব ‘দীক্ষাগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।’ এর মধ্যে আবার কথা । শ্রীল কেশব মহারাজের শিষ্য বাঁরা বড় বড় এখানে বসে আছেন, তার মধ্যে কেশব মহারাজের শিষ্য একজন ছেলেমাত্র বসে আছে । এঁরা যেমন সম্মানীয় হবেন, সে কি সেই সম্মানটা পাবে ? এতে ব্যতিক্রম দোষ হবে নাকি ? সে জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার সম্মানটা

পাবে না। সে শিক্ষাশ্রমের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে না। শিক্ষাশ্রমের মধ্যে গণ্য হচ্ছেন কে?—যিনি শ্রম-বৈষম্য এবং ভগবানের সেবাপ্রদীপ দিচ্ছেন, তিনিই শিক্ষাশ্রম। যিনি শ্রম-বৈষম্য-ভগবানের সেবাপ্রদীপ দিচ্ছেন না, তিনি শিক্ষাশ্রমের মধ্যে গণ্য নহেন। তাঁর অভিমান আছে মাত্র, কার্যতঃ তাঁর দ্বারা কোন কল্যাণ হবে না।

শাস্ত্রে বলছেন,—দীক্ষাশ্রমই শিক্ষাশ্রম। তিনি যখন দীক্ষা দিচ্ছেন তখন তিনি শিক্ষাও দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে দীক্ষা-শিক্ষাশ্রম অভিন্ন। আর যেসব শিক্ষাশ্রম তাঁহারা শ্রমের নিকট দীক্ষাশ্রমের স্থায় সমান সম্মানের পাত্র নহেন। দীক্ষাশ্রম এবং শিক্ষাশ্রম উভয়ে বসে আছেন। দীক্ষাশ্রম আগে প্রণম্য, শিক্ষাশ্রম পরে। বাবা ও কাকা দাঁড়িয়ে আছেন, আগে গিয়ে কি কাকাকে প্রণাম করবে ছেলে? তা কখনও হয় না। আগে পিতাই প্রণম্য, তারপর কাকা—এই হল শিক্ষা। এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে। শ্রমতত্ত্বকে অবজ্ঞা করলে শ্রমের কখনও কল্যাণ হয় না। আমি একটা উদাহরণ রাখছি আপনাদের কাছে।—

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী জাগতিক বিচারে ভ্রাতা; আর জীবগোস্বামী ভ্রাতৃপুত্র। বল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর কাছে গেলেন। গিয়ে বলছেন,—শ্রীরূপ! তুমি যে তত্ত্ববিশেষ-গ্রন্থ লিখেছ, এটা অপূর্ণ সুন্দর হয়েছে। কিন্তু একটা ছুঃখের বিষয়, বড় বেদনা লেগেছে। তুমি লিখেছ,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবন্তুক্তিস্থস্তাত্ম কথমভ্যুদগো ভবেৎ ॥

আপনি ভুক্তি-মুক্তিকে ‘পিশাচী’ বললেন। মোক্ষকামী লোক অনেক আছে, তারা এটাকে গালাগালি মনে করবে না কি? আপনার মত একজন মহৎব্যক্তি গালাগালি দিচ্ছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী তখন বললেন,—আপনি যা বলছেন তা আমি মেনে নিচ্ছি। বল্লভাচার্য্য সন্তুষ্ট হয়ে যমুনার পারে চলে গেলেন। বল্লভাচার্য্য তাঁর থেকে বয়সে বড় ছিলেন। দেখুন, বৈষম্য কাকে বলে। আমাদের বৈষম্যবোধিত ভাব কোথায়?

যখন বল্লভাচার্য্য রূপগোস্বামীর নিকট এসেছিলেন তখন জীবগোস্বামী সেখানে বসে ছিলেন। তিনি বল্লভাচার্য্যের পিছনে পিছনে যমুনার তীরে

হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্রজভাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন,—কে বাবা তুমি? জীবগোস্বামী বললেন,—আপনি একটু আগে ধীর কাছে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর শিষ্য। তোমার নাম কি?—আমার নাম শ্রীজীব। কি বলছ বাবা তুমি?—আপনি যে আমার গুরুদেবের সিদ্ধান্তটাকে খণ্ডন করে এলেন, এটা ত' খণ্ডনের জিনিস নয়। তিনি ত' ঠিকই লিখেছেন। বললেন কি রকম? তিনি লিখেছেন,—“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবন্তুক্তিস্থখস্তাত্র কথমভ্যাসয়ো ভবেৎ ॥” তিনি ভুক্তি-মুক্তিকে পিশাচী বলেন নাই, ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহাটাকে পিশাচী বলেছেন। নারীকে স্মৃণা করা হয় না। কেউ যদি বলেন নারীটা স্বপ্ন, সেটা হতে পারে না। কিন্তু নারীর প্রতি যে খারাপ ভাবটা, সেটাই স্বপ্ন। এটাই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আপনি কি করে বললেন,—এটা ঠিক নয়। ব্রজভাচার্য্যের মাথা ঘুরে গেল, আবার কিরলেন। কিরে এলে রূপ গোস্বামীর নিকট বললেন,—শ্রীরূপ! তুমি যা লিখেছ, তা ঠিক আছে। ওটা কাটবার দরকার নাই। কেন প্রভু, আপনি ত' এইমাত্র বলে গেলেন—এটা ভুল। আমার এই ভুলটা একটা প্রিয়-দর্শন বালক ভেঙ্গে দিল। কে সেই বালক?—জীবগোস্বামীকে দেখিয়ে বললেন এই ছেলেটা আমার ভুল ভেঙ্গে দিল। তুমি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাটাকে বাদ দাও বলেছ। ভোগের বাসনাটাকেই খারাপ বলা হয়েছে। শ্রীরূপ আগেও ‘আচ্ছা’ বলেছেন, এখনও ‘আচ্ছা’ বললেন। কি স্বন্দর ব্যবহার দেখুন।

যখন ব্রজভাচার্য্য চলে গেলেন তখন রূপগোস্বামী জীবগোস্বামীকে বললেন,—তোমার মুখদর্শন করব না, তুমি বৃন্দাবন বাসের ঘোষণা নহ। তোমার এখনও অভিমান ঘায় নাই। তুমি এতবড় একটা লোক তাঁকে বলতে গিয়েছ। জীবগোস্বামী—নিজের শিষ্য, আবার ভ্রাতৃপুত্র। জীবগোস্বামী একটাও কথা বললেন না যে, প্রভু! আমি অন্ডায় করি নাই। তিনি যমুনার তীরে নন্দগ্রামে ভজন করতে লাগলেন। আগে মাধুকরী করে খেতেন, পরে ছেড়ে দিলেন। বসে বসে কেবল হরিনাম করেন, খাজগ্রহণ করেন না। সনাতন গোস্বামী দ্বাদশবন ভ্রমণ করতে করতে নন্দগ্রামে এসে হাজির হলেন। তখন ব্রজবাসীরা বলছেন,—দেখুন, একটা প্রিয়দর্শন বালক এখানে বসে বসে হরিনাম করছে, খাজও গ্রহণ করে না। জীবনটা বোধ হয় ত্যাগ করে দেবে সে। সনাতন গোস্বামী গিয়ে দেখেন শ্রীজীব। কি ব্যাপার! এরকম করছ কেন? তোমার জীবন ত' শেষ হয়ে যাবে। তখন শ্রীজীব উত্তর দিচ্ছেন,—প্রভু! (বাবা বলতেন না) গুরুকৃপাবিহীন জীবন। যে গুরুর কৃপা পেল না,

গুরুদেব যাকে ত্যাগ করলেন, তার জীবনের কি দাম আছে ? তার মৃত্যুই ভাল। আমি মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করেছি। কি হয়েছে ? সমস্ত কথা খুলে বললেন। আমি গুরুনিন্দা সহ করতে পারি না। সেজন্য প্রতিবাদ করেছিলাম। তা গুরুদেব যখন আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আমার সরে আসাটাই ভাল। তাই সরে এসেছি। গুরুদেবকে উদ্বেগ দিই নাই।

সনাতন গোশ্বামী শ্রীজীবকে কিছু না বলে শ্রীকৃপের কাছে ফিরে এসে বলছেন,—শ্রীকৃপ ! শ্রীজীব যে প্রাণত্যাগ করতে বসেছে। তুমি তাকে রূপা কর, দয়া কর। শ্রীকৃপ গোশ্বামী বললেন,—হ্যাঁ, রূপ ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন—আয় বাবা। একেই বলে গুরুনিষ্ঠা। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়েছেন এসব সিকান্ত। সেই সিকান্তগুলোকে মেনে চলতে হবে, তবে না আমাদের কল্যাণ হবে। শাস্ত্র সেইজন্য বললেন,— আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিৎ।

ন মন্ত্যবুধ্যাত্ময়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

গুরুতত্ত্বটা কি ? আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানবে। ‘মাং বিজানীয়াৎ’—আমার মত জানবে, ‘নাবমন্তেত’—তাঁকে অবমাননা করবে না, নিন্দা করবে না। কেন ?—‘সর্বদেবময়ো গুরুঃ’—সমস্ত দেবতার যে শক্তি সেই শক্তি গুরুর, যেটা দেবতাদেরও নাই। ভগবৎ রূপায় কৰুণাশক্তি—সর্বশক্তি সমন্বিত হচ্ছেন তিনি। কেন ?—সর্বশক্তিমান্ ভগবান্কে তিনি দিতে পারেন। এরূপ আর কেউ পারেন না—দেবতারাও পারেন না। তাঁদের ঐ ক্ষমতা নাই। এই বিচারে তাঁকে দেখতে হবে। অতএব দীক্ষাগুরুরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

‘আদৌ গুরুপূজা’। কার পূজা হচ্ছে ? আগে দীক্ষাগুরুর পূজা হচ্ছে, না শিক্ষাগুরুর পূজা হচ্ছে ? আদৌ দীক্ষাগুরুর পূজা করতে হবে, শিক্ষাগুরুর নয়। দীক্ষাগুরুই সর্বপ্রথম পূজ্য। তুলনাদাস একটা কথা বলেছেন,—

গুরু আউর গোবিন্দ দো খাড়ে হার কিসকো লাগু পাঁও।

যো গুরু কো লাগে উসকো বলিহারী যাই ॥

শ্রীগুরু এবং গোবিন্দ দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে প্রণাম করব আগে ?—আগে গুরুকে প্রণাম করব, তারপর গোবিন্দকে প্রণাম করব। যদি এই সিকান্ত হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষাগুরু আগে কি করে প্রণম্য হবেন ? এরূপ বিচার সূত্র হতে পারে না। ‘দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য অধিক হতে পারে না। যেখানে বৈশিষ্ট্য বেধেছেন, সেখানে দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। এই বিচার জানতে হবে। গুরুতত্ত্বটা এই রকম জিনিস। তাই বলেছেন,—

সদগুরু পাওয়ে ভেদ বাতীওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।

তও কয়লাকি ময়লা ছোটো, যও আগ করে পরবেশ।

সদগুরু কাকে বলছেন?—ভেদ অর্থাৎ রাস্তা যিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, 'জ্ঞান করে উপদেশ'—তত্ত্বজ্ঞান যিনি উপদেশ করেন,—“অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানান্ধনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥” ‘কয়লাকি ময়লা ছোটো’—কয়লা ত’ ময়লা, কিন্তু যদি তাতে অগ্নি প্রবেশ করে, তাহলে তার ময়লা ছেড়ে যায়। তেমনি গুরুদেবের উপদেশরূপ অগ্নি যখন শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন হৃদয়স্থিত যে-সকল ময়লা, কালিমা রয়েছে, কুপ্রবৃত্তিগুলো রয়েছে, সেগুলো পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। তারপর ভগবদ্ দর্শন হবে। ইংরাজীতে দুটো কথা বলছেন,—Transparament ও Opaque। যতক্ষণ অসচ্ছ ভাব থাকছে ততক্ষণ কোন ছবি প্রতিকলিত হতে পারে না, কিন্তু যখন Transparent Medium হচ্ছে, তখন ছবি প্রতিকলিত হবে ॥(ক্রমশঃ)

জন্মান্তরবাদ

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম। জন্মান্তর ও পরলোককে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়া অবিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করিলে মানুষ কিসের জন্ত ধর্ম করিবে? ইহলোকে ইহজন্মেই যদি মরণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, মানুষের সকল জালা ঘুচিয়া যায়, তবে ধর্ম, নিয়ম, ঈশ্বর-আরাধনাদির আবশ্যকতা কি? কঠোর সংযম-তপস্যা-বিধানের কি প্রয়োজন আছে? শাস্ত্র-হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিবারও যৌক্তিকতা বা কি থাকিতে পারে? মানুষ কেবলমাত্র জন্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্নেহ-মায়ামমতা বিসর্জনপূর্বক হিংসার রাজ্যের পরিসীমা দিনের পর দিন ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া ত’ চলিতে পারিত। কই, সেইরূপ ত’ দেখা যায় না। কই, এখনও পর্য্যন্ত ত’ অশান্তির কালো ধোঁয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে নাই। কারণ মানুষের মন হইতে জন্মান্তরবাদ ও ঈশ্বর আরাধনার দৃঢ় বিশ্বাস এখনও মুছিয়া যায় নাই। তাই বিশ্বের সবাই বিশেষ করিয়া ভারতবাসী নাস্তিক চার্কাকের মতবাদকে বহুমাননপূর্বক জড়ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছে না। নাস্তিক চার্কাকের মতবাদটি জন্মান্তরবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। চার্কাক বলিয়াছেন,—

ঋণং কৃত্বা যুতং পিবেৎ যাবজ্জীবৎ স্বখং জীবৎ ।

ভক্ষীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমঃ কুতঃ ॥

“যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখেই জীবনযাপন করিবে, গৃহে কোন বস্তু না থাকিলে ঋণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে; ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, কেননা, যে শরীরে জীব পান-ভোজন করিয়াছে, তাহাদের উভয়েরই শরীর ফিরিয়া আসিবে না। এমতাবস্থায় ‘কে কাহার নিকট চাহিবে, আর কেই বা পরিশোধ করিবে?’

সনাতন শাস্ত্র পদ্যপুরাণ “জন্মজা মবলক্ষণি” শ্লোকে জীবের কর্মফলাভ্যাসারে এই ভবনমুদ্রে “কুমি-বৃক্ষ-পশু-নরাদি” চৌরাসী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের কথা পরিকার জানাইয়া দিয়া জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে সন্দেহের অবসান ঘটাইয়াছেন। শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত আছে,—

কর্মণা সুখমশ্রাতি দুঃখমশ্রাতি কণ্মণা ।

জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তন্তে কর্মণো বশাৎ ॥

“মানুষেরা কর্মদ্বারা সুখভোগ করে, কর্মদ্বারাই দুঃখভোগ করে। কর্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্মদ্বারা শরীরধারণ করিয়া থাকে এবং কর্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।” পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অত্যন্ত স্বকৃতিসম্পন্ন অংবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধরিয়াই ভারতীয় নরগণ ঐহিক সুখ বিসর্জন দিয়া বিপন্নাস্তিতর ও শরণাগতরক্ষক ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় নিজেদের সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট জন্মান্তরবাদ কবিকল্পনা আর কাব্যের অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে সর্বগ্রাসী জড়শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই বিশ্বাস কপূরের মত উড়িয়া বাইতেছে। যদি জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় কর্মফল ভোগ তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত জাগরুক থাকিত, যদি তাহারা অধ্যাত্ম জীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্মফলজনিত অদৃষ্টের কথা ক্রমে ক্রমে বিশ্বস্তির অতল গহ্বরে তলাইয়া না ফেলিতেন, তবে কখনই ইহজীবনে পাপের অগ্নি জ্বলাইয়া, দানবীয় দীপ্তিপূর্ণ চাহনিতে বাসনার আহুতি লইয়া তাহাদের দাঁড়াইতে হইত না।

বিবিধ বিষয়-বাসনা-বিজড়িত অনন্ত সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারের দিকে তাকালেই জন্মান্তরের ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যাইবে। জগতের কোথাও সমতা নাই—দৃষ্টিপাতে এই বাস্তব সত্য ধরা পাড়বে। ইহলোকে কেহ নানাস্থ

ভোগ করিতেছে, কেহ দুঃখ-দুর্দশায় কষ্ট পাইতেছে। কেহ ধনীৰ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাসুখে বাল্য-যৌবন অতিক্রমপূৰ্বক বান্ধিক্যে সংসার-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গমালার স্বাস্থ্য-প্রতিবাত্তে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হইতেছে। কেহ আমরণ বৃক্ষতলবাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা উদরপূৰ্ত্তি করিতেছে। কাহারও হৃদে চিনি, কাহারও শাকে বালি। কেহ আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া অন্তিমে রোগ-পীড়ায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; কেহ সারাজীবন রোগ-শোকে জর্জরিত হইয়া মনোহুখে কাপঘাপন করিতেছে।

এইরূপ বিবিধ অবস্থা-বৈষম্যের কারণ কি? অনন্ত করুণানিধান গ্রামবান্ ভগবান্ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূৰ্খ, স্বপ্নী, হুঃস্বপ্নী, সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া সমান স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট আত্ম-পর নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে বৈষম্য ও পক্ষপাত নাই। তবে সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি? কারণ—অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, স্ব-স্ব পূৰ্ব্বজন্মাজ্জিত কর্মফল। চারি বৎসরের কোন একটা বিরুতাদ শিশুরে রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে দেখিলে তাহা তাহার পূৰ্ব্বজন্মের কন্দের ফলশ্রুতি বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবান্ উহাকে কষ্ট দিতেছেন—কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বলিবেন না। এই সমস্ত কারণেই ভারতবাসীর জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং পূৰ্ব্বজন্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসহেতু কি ঈশ্বর, কি আত্মা, কি পরলোক—ভারতবাসীর নিকট এ সমস্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা স্বতঃসিদ্ধ।

মাহুষ এই দেখেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বাহু বিজ্ঞানমতে প্রতিক্ষণে দেহান্তর্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য চলিতেছে। সেই নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য প্রভাবে প্রতি দশবৎসর অন্তর কি মানবের নূতন নূতন দেহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে কোমারের পরে যৌবন আসিলে মাহুষের যে দেহান্তর, যৌবনের পর প্রৌঢ়েও সেই দেহান্তর এবং প্রৌঢ়ের পর জরায়ও তজ্জপ দেহান্তর। সুতরাং এই কোমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও জরায় মাহুষের শৈশব-মৃত্যু, কোমার-মৃত্যু, যৌবন-মৃত্যু ও প্রৌঢ়-মৃত্যু নংঘটিত হইতেছে। কারণ সেই সেই কালে তাঁহার পূৰ্ব্ব শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন হইয়াছে। জীব যদি এতবার মৃত্যুর পরে জীবিত থাকে, তবে জরায়-মৃত্যুর পর যে জরায় শরীরের ধ্বংস নাশিত হয়, সেই শরীরের ধ্বংসের পরে সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন?

অতএব মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিত্তমান থাকিয়া যে নতুন দেহ ধারণ করে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ। এই যুক্তিতে জীব বাচিয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী জীবের মৃত্যু দেখিয়া মুহমান হয় না। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, সেই দেহেরও কোমার, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে। আবার তৎপর দেহেরও তদ্রূপ উৎপত্তি ও লয় জীবের জন্মজন্মান্তর অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—

দেহিমোহশ্লিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তত্ৰ ন মুহতি ॥ (গীতা ২।১০)

“জীবের এই দেহে বালা, যৌবন ও বার্দ্ধক্য কালের গতিতে উপস্থিত হয়। তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর প্রাপ্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না।”

পেসিমিজম্ এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মূল লক্ষ্যই জড়নির্ব্বাণ লাভ

পাশ্চাত্যধর্ম ও সনাতন ধর্মের মধ্যে একটি বিষয়ে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যধর্মে একজন্মবাদ স্বীকৃত হয়। যদিও পাশ্চাত্যদেশীয় দার্শনিক Darwin তাঁহার Theory of Evolution এ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিলেন। কি করিয়া জীবাত্মা এক জন্ম হইতে অল্প এক জন্ম প্রাপ্ত হইতেছে—তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তিনি কেবল বলিয়াছেন,— “পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে ‘জেলিফিশ’ নামক এককোষী প্রাণী ছিল এবং ক্রমবিকাশের ফলে তাহারাই সর্বশেষে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যজন্মই জীবের ক্রমবিকাশের সর্বশেষ অবস্থা। মনুষ্যজন্ম হইতে জীব কখনও নিম্ন-যোনি বা উন্নততম যোনি আর প্রাপ্ত হইবে না।” ডারউইনের Theory-তে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও তাহা সনাতন ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ “জীব কর্মকলাত্মক্যই নিম্নযোনি বা দেবজ লাভ করিতে পারে”—এই Absolute Truth তিনি তাঁহার Theory-তে উল্লেখ করেন নাই। তাই ডারউইনের Theory দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম পরম কারুণিক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের

দিনবতিতম শুভ আবির্ভাব-বাসরে দীনের

আতি কুম্বাঞ্জলি

আজি শুভ মাঘী কৃষ্ণ তৃতীয়া-লগন ।

শ্রীগুরু পূজিতে সবে হয়েছে মগন ॥

চতুদ্দিকে ভক্তগণ “জয় গুরু” বলে ।

পুষ্পাঞ্জলি অর্পিছে শ্রীচরণকমলে ॥

শিষ্য-প্রশিষ্য করি কিবা ত্যাগী, গৃহিজন ।

প্রেমভক্তিমাধা অর্ঘ্য করে নিবেদন ॥

মুণ্ডিও তব শিষ্যক্রম অধম পাপিষ্ঠ ।

নহি কক্ষী, নহি জ্ঞানী, নহি ভক্তিনিষ্ঠ ॥

সর্ববিধ ভাবে মুণ্ডিও সেবার অযোগ্য ।

কৃপাবারি বর্ষি’ মোরে কর দেবার যোগ্য ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্যাদি ।

সর্ববিধ দোষ মোর আছে নিরবধি ॥

জড়কামে মত্ত মুণ্ডিও নহি কৃষ্ণার্পণে ।

অহ্মরাগ ঘেঘিঞ্জে, ক্রোধ ভক্তজনে ॥

গোভ হয় বিষয়ে মোহ তল্লাভ বিনে ।

মদ হয় কৃষ্ণ-বহিন্মুখ গুণ বর্ণনে ॥

হেন সব দোষে দোষী মুণ্ডিও মৃঢ়মতি ।

কেমনে লভিব তব চরণে ভক্তি ॥

তবে এক ভরসা যে আছে মোর চিন্তে ।

পুনঃ পুনঃ তারিতে আসিবে নাকি ভূত্যে ॥

এই আশা বুকে লয়ে আছি এই মর্ত্যে ।

জন্ম-জন্মান্তরে যেন তার’ এই ভূত্যে ॥

কতবার এ জগতে হয়েছে জনম ।

পশু-পক্ষী কীটাদিতে গমনাগমন ॥

কিন্তু প্রভু সে জনমে নাহি ছিল রতি ।
 এ জনমে তব কুপায় পাইয়াছি স্মৃতি ॥
 এই স্মৃতি সদা যেন বহে মোর হৃদে ।
 প্রার্থনা জানাই তব চরণ-সরোজে ॥
 তুমি নিত্যানন্দশক্তি কৃষ্ণ-কুপামূর্তি ।
 শরণাগত-জনে করাও লীলা ক্ষুদ্রি ॥
 শরণাগত-বৎসল তুমি হে মহান্ ।
 আশ্রিত জনেরে তুমি দাও দিব্যজ্ঞান ॥
 সেইরূপ মম হৃদি অন্ধকার নাশি ।
 দাওহে হৃদয়ে মোর ভক্তি-জ্ঞান-শশী ॥
 “ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি” শ্লোক প্রমাণে ।
 উদ্ধারিতে নাহি পারে জীব ভক্তিবিনে ॥
 কিবা ভক্তি, কেবা ভক্ত, কিবা তার সেবা ।
 তোমা কুপাবিনা প্রভু জানে আর কেবা ॥
 তোমা লজ্জিয়া কে জানিয়াছে পরতত্ত্ব ?
 শাস্ত্রবচনে কোথাও নাহিক মহত্ব ॥
 ‘আদৌ গুরুপদাশ্রয়’—শাস্ত্রের বচন ।
 তবে ত’ হয় শ্রীগৌর-কৃষ্ণ আরাধন ॥
 এই ত’ সিদ্ধাস্তসার, শাস্ত্রের বচন ।
 শ্রীগুরুকুপায় জীবের হয় ত’ ক্ষুরণ ॥
 নমি আমি ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুচরণে ।
 আর প্রণমি গুরুপ্রিয় বৈষ্ণবের গণে ॥
 সবাকার পদরেণু করিয়ে বন্দন ।
 জন্মে জন্মে হই যেন কুপার ভাজন ॥

শ্রীগুরুকরণারেণুপ্রার্থী—
 —শ্রীগৌরাঙ্গপদ ভক্তচান্দী

କ୍ରିଶ୍ନାସପୂଜା

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৪০ (৩) পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্তও পরিলক্ষিত হয়,—

নারায়ণোহপি বিকৃতিং যাতি গুরোঃ প্রচ্যুতশ্চ দুৰ্দ্ধন্ধে ।

কমলং জলাদপেতং শোষণতি রবির্ন পোষণতি ॥

(জয়সাহান সংহিতা)

কোন দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শুরু হইতে বিচ্যুত হইলে ভগবানও বিরূপ হইয়া যান। যেমন পদ্মল্ল যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলকে আশ্রয় করিয়া থাকে ততক্ষণ সূর্য্য তাহাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। জল ত্যাগ করিলে ঐ সূর্য্য তাহাকে আর প্রকাশ না করিয়া শুকাইয়া দিবেন।

অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষাস্থেদ্বা দ্বারা জীবের চরম প্রয়োজন প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহা ব্যাসপূজারই ফল। এজন্ত আমরা কোনপ্রকার ভাণ্ডভাবাস্বাদীতে কাণ না দিয়া ব্যাসপূজা বা গুরুবর্গের পূজা করিব। শ্রীশ গুরুদেবের পরিচয়ে নিজ পরিচয় প্রদান করিব। নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের জয় প্রদান করিব। গুরুদেবের জয় দিব না, গুরুদেবের পরিচয় দিব না—ইহা কখনও হইতেই পায়ে না। কেননা ‘গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে’। গুরুদেবকে ছাড়িয়া ভগবানের যতই সাধন-ভজন করা যাক, ফল—নরক। এজন্ত ‘সাধু সাবধান’ বাক্য স্মরণ রাখিয়া অসাধুগণের আদেশ-নির্দেশে কাণ দিলে চলিবে না।

আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাই—“শ্রী
আচার্যদেব ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহস্থহেতু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীশচীনন্দন
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো ও শ্রীহরিতত্ত্ববিনাশে শ্রীল আচার্যদেবের নামের পূর্বে ‘ও
বিষ্ণুপাদ’ বলিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আশ্রয়বিগ্রহ-সমাপ্তি বিষয়-
বিগ্রহ-দর্শনই—গৌড়ীয় দর্শন। আচার্য—অভিন্ন কৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণুপাদ;
দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরু উভয়েই সেবককোটি, তাঁহাতে কৃষ্ণকোটি বা বিষ্ণু-
কোটিত্বের বিচার নাই। সর্বদেবময়ই আচার্যত্বের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য
বলিব, অথচ ‘বিষ্ণুপাদ’ বলিব না—এইরূপ বিচার আচার্যের পদের প্রতি
অপরাধ—ভক্তিসিদ্ধান্তের নিকট অপরাধ।” এইজন্যই শ্রীগুরুদেবের নামের
পূর্বে ‘বিষ্ণুপাদ’ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

অস্বাভাবিক প্রকৃতির বিশ্বে বেদান্তের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, করিতেছেন।

এবং করিবেন। এখন বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। কাহারও মতে কৰ্ম, আবার কাহারও মতে জ্ঞান। কিন্তু ভালভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,—বেদান্তের মূল তাৎপর্য কৰ্ম বা জ্ঞান নহে। ঐমমহাপ্রভু-প্রদর্শিত উত্তমভক্তি—যাহা শ্রীশচীনন্দন শ্রীসনাতন-শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা, সর্বোপরি শ্রীরাঘবানন্দ-সংবাদের মাধ্যমে বিশ্বে বিঘোষিত করিয়াছেন। কোন একদময়ে কোন এক ব্রজবধু নৃত্যাবস্থায় শ্রীগোপীকান্তকে দর্শন করিয়া ‘অন্ত গোপীগণের নিকট বর্ণন করিতেছেন,—

শূণু মখে! কোতুকয়েকম্ নন্দনিকতনে ময়া দৃষ্ট।

,গোধূলি-ধূমরাঙ্গে নৃত্যতি বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ॥

নন্দবাবার অলিন্দে গরুর খুরের দ্বারা উথিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া নন্দনন্দন নৃত্য করিতেছেন। ইহার হাব-ভাব ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। বেদান্ত-স্বত্বের দ্বারা ইহার পুষ্টি করা অত্যাৱশ্যক। বেদান্তস্বত্বের ১।১।২ সংখ্যা সূত্র ‘জন্মান্তান্ত যঃ’ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। ঐমমহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি উপাধ্যায় প্রসঙ্গে দেখা যায়,—“আন্ত এব পরো বসঃ।” শৃঙ্গার রসের দ্বারা যে যুগলকিশোরের সেবা, তাহাই শ্রীল গুরুদেব শিক্ষা দেন। হুহাই বেদান্তের গুঢ় তাৎপর্য বলিয়া বোধ হয়। অস্মদীয় পরম-গুরুদেব ‘আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ রাখিয়াছেন এবং তাহার আশ্রিতগণকে ‘ভক্তিবেদান্ত’ উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই বলিয়াছেন,—“কৃষ্ণাশ্রয়ঃ স ন ব্রজরামাহুগঃ স্বহৃদি সন্ত শল্যামি মে”—আমার আশ্রয় করিয়াও যে ব্রজহৃদরীগণের আহুগতো ভজন না করে, তাহার ভজন আমার হৃদয়ে সন্তুশূল-মদন হইয়া থাকে। এইরূপ স্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচারধারা যিনি জগতে প্রচার করেন, সেই গুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮ শ্রী ও বিষ্ণুপাদকে আমি প্রণাম করি।

কৃষ্ণ-স্বরূপায়—স্বয়ং কৃষ্ণ একরূপ নহে। প্রিয়তমত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ার জন্য ‘কৃষ্ণ-স্বরূপায়’ বলা হইয়াছে। এর প্রমাণ আমরা গুরুদেবকে পাই,—‘সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্ত শাইব্ধঃ’। পুরাণসম্রাট প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—‘আচার্য্য মাং বিজ্ঞানীয়াৎ’। শ্রীকৃষ্ণ যেক্রপ জগন্মঙ্গলের জগৎ যুগে যুগে বিভিন্নরূপে অবতরিত হন, তক্রপ শ্রীকৃষ্ণের ককৃণা-স্বন মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবও জগতের মঙ্গল-সাধনের জগৎ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

এজন্য ‘স্বমঙ্গলায়’ শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে। ‘রাধাঙ্গকাস্ত্যা বিভূষিতায়’, —শ্রীমতী রাধারাগীর ত্রায় অঙ্গকাস্ত্যিবিশিষ্ট ইহা মূখ্যার্থ নহে। আশ্রয়-বিগ্রহের মূল শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্ত সর্বদা সচেত, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও কৃষ্ণার্থে অখিলচেতা পরায়ণ ও কৃষ্ণার্থে অখিল ভোগত্যাগ-যুক্ত। ‘চৈতন্তলীলামৃত ধারণায়’ চৈতন্তলীলারূপী অমৃত ক্রিভাবে ধারণ করেন, তাহা উল্লেখ করা হইতেছে। শ্রীশচীনন্দনই স্বয়ং নন্দনন্দন, স্বয়ং অবতারী, স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ‘শ্রীকৃষ্ণ’ সর্বদা এই নাম উচ্চারণ করেন। দক্ষিণদেশ অর্থাৎ পূর্বদেশে শ্রীবেঙ্কটচট্টের গৃহে অবস্থানকালে রঘুনন্দনের সেবা অপেক্ষা গোপীকান্তের সেবার উৎকৃষ্টতা দেখাইয়া দক্ষিণদেশবাসীকে অপার ককৃপা করিয়াছেন। শ্রীশচীনন্দন স্বয়ং নন্দনন্দন হইলেও নীলাদ্রিতে অবস্থান করিয়া শ্রীমবীনকৃষ্ণের সেবায়ই উৎকৃষ্টতা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই সেবাপ্রীতি দেওয়ার জন্তই ভক্তভাব অধীকার করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যদিও তাহার অবতারের অন্ত্যায় কারণ ছিল।

শ্রীগুরুদেবও শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভুর ধারায় অভিধিক্ত হওয়ার জন্ত সর্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। এইরূপ গুণে গুণান্বিত অম্বদীয় গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকচাচার্য্য ১০৮শ্রী ও বিষ্ণুপাদকে প্রণাম করি।

শ্রীভগবান্ ভূভার হরণের জন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীবরাহরূপে ভগবান্ পৃথিবীর উদ্ধার এবং ভূভার হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অশ্বরূপ পৃথিবীর বুকে অমর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, ভক্তগণকে ভগবন্তজনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্যই ভগবান্ অশ্বরূপকে সংহার করিয়া থাকেন। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব তাহার উপদেশরূপী অতিতীক্ষ্ণ তলোয়ারদ্বারা আশ্রিত স্নিগ্ধ শিষ্যের সমস্ত অনর্থ দূর করিয়া হৃদয়ে সৎজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান উদ্ভিত করিয়া থাকেন। পুরাণসম্রাট প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—‘ক্রয়ঃ স্নিগ্ধস্ত শিষ্ণস্ত গুরবো গুহ্মযুত’, ‘সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ’। শিষ্ণুক্রব বা নামধারী শিষ্য না হইয়া স্নিগ্ধ শিষ্য হইলে গুরুদেব তাহার উদ্ধারের জন্ত বায়ংবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন, ইহা শ্রীল সুরস্বতী প্রভুপাদের উক্তি হইতে এবং সর্বপ্রথম গোস্বামিগ্রন্থ ‘বৃহদ্ভাগবতামৃতম্’ এর গোপকুমারের উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়। শ্রীগুরুদেব গোস্বামী আদিকে মহামুনি বলা হইয়াছে। কারণ তাহারা ভক্তিরূপী ভূষণের দ্বারা ভূষিত। তদ্রূপ অম্বদীয় গুরুদেবও মহামুনির দিব্যগুণের দ্বারা বিভূষিত। এইরূপ দিব্য গুণের দ্বারা বিভূষিত শ্রীল গুরুদেবকে প্রণাম করি।

‘রূপাহুগবর্ষাৎ’-শব্দের ব্যবহারোপযোগিতা জানিতে হইলে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিগত ৫০১ গৌরাদে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমাকালে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে (মায়াপুরধামস্থ) ‘রূপাহুগ ভক্তিদ’ শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অস্মদীয় গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে এবং অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদয় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিজীবন জনার্দন গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহাই নিঃসঙ্কোচে বর্ণন করিতেছি। একত্র হুধী পাঠকবৃন্দ আমার ধৃষ্টতা গ্রহণ করিবেন না—ইহাই অমরোধ।

ভক্তি দুই প্রকার—(১) বৈধী এবং (২) রাগাহুগা। যতরাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্ত সা বৈধী ভক্তিক্র্যতে ॥ শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া ভক্তনুর্ঘাদয়াঘিতা ভক্তিরিয়ং কৈশিচনুর্ঘাদা-মার্গ-উচ্যতে। সাধনাদি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কোথাও লোভ, কোথাও বা শাস্ত্র-শাসনই সাধনের প্রবর্তক হয়। যে-ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক না হইয়া শাস্ত্র-শাসনই প্রয়োজক হয়, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। শাস্ত্রোক্ত প্রবল মর্ঘাদায়ুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কোন কোন পণ্ডিতগণ মর্ঘাদামার্গ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

রাগাহুগাভক্তি জানিতে হইলে রাগাত্মিকার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। “ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ধক্তিঃ সাত্ত্ব রাগোত্তি-কোদিতা।” ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ পরম আবেশ-মূলক প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা।—“বিরাজন্তীম-ভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃত্য বা না রাগাহুগোচ্যতে।” ব্রজবাসী জনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা যে ভক্তি, তাহাকে ‘রাগাত্মিকা’ বলে। সেই রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকেই রাগাহুগা নামে অভিহিত করা হয়। ‘রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার—কামরূপা ও মদ্বরূপা। কামরূপা ভক্তির অনু-গামিনী যে তৃষ্ণা, তাহাকে কামাহুগা ভক্তি বলে। ইহা মন্তোচ্ছাময়ী ও তদ্র-দ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দুই প্রকার। মন্তোচ্ছাময়ী কেলি তাৎপর্যবতী। কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া, ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়াকেই মন্তোগ বলা হয়। ব্রজ-যুগেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাদুর্ঘা সেইরূপ ভাবমাদুর্ঘ্যের কামনাকে তদ্রদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা হয়। তদ্রদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ মূলকিশোরে সগম্ভেহা, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা, কেহ কেহ শ্রীরাধা-স্নেহাধিকা। শেষোক্ত এই শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীর শ্রীরূপগোস্বামীপাদ ‘ভাবোন্মাস’ রতি আখ্যা দিয়াছেন। ইহার নামই মত্তরীভাব বা রাধাদাস্ত।

এই মঞ্জরীগণের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রধান। শ্রীরূপমঞ্জরীর আত্মগতে শ্রীরাধামেহাধিকা হইয়া যুগলকিশোরের সেবিকাকে রূপান্তর বলা হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত-নিকুঞ্জ-লীলায় ললিতাদি সখীগণ স্বল্প নায়িকা হওয়ার দরুন যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদের সেবার জন্য এই মঞ্জরীগণই উপস্থিত থাকেন। এইজন্যই দাসগোষ্ঠ্যমী বলিয়াছেন—“তাস্মলার্পণ-পাদমর্দন কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাং.....সংশ্রয়ে ॥” মঞ্জরীগণের কোন অবস্থাতেই সঙ্কোচ নাই, এইজন্যই ‘অসঙ্কোচিতা ভূমিকাং’ বলিয়াছেন। শ্রীযুগলকিশোরের প্রীতিমূলা সেবার জন্য সখীগণের সহিত পরামর্শ করেন—‘নিকুঞ্জ-যুনো-রতি-কেলি-সিদ্ধৌ যা যালিতিযুক্তিরপেক্ষণীয়া।’ শ্রীল গুরুদেব রূপান্তরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এজন্য ‘রূপান্তরবর্ষা’ বলা হইয়াছে। এইরূপ রূপান্তরবর্ষা গুরুদেবকে নিজ অধিকার অত্যাশ্রয়ী শারীরিক ও মানসিক গুণীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া ইহার বিপরীত মনে করা অতর্জনের পরিচায়ক, ইহাতে অপরাধের সম্ভাবনা।

শ্রীগুরুদেব—শ্রীমিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন। শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু অথও গুরুতর এবং শ্রীগুরুদেব তাঁহারই প্রকাশ। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—“সাক্ষাৎকরিভেন সমস্তশাস্ত্রেঃ”। তিনি সাক্ষাৎ হরি নহেন, শ্রীহরির ককণা-গুণ মূর্তিমান হইয়া জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। “যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিমিয়া লহ বল গৌরহরি ॥” শ্রীমিত্যানন্দাষ্টকে দেখা যায়,—

“যথেষ্টং বে ভ্রাতঃ! কুরু হরি হরিক্ষনিম্ননিশং

ততো বঃ সংসারামুখি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ ।

ইদং বাছ-ফোটেরটিতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং

ভজ্যে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং-নিরবধি ॥”

শ্রীগুরুদেব—শ্রীমিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ হওয়ার জন্য জীবের দুঃখে অবীভূত হইয়া জীবের ঘারে ঘারে গিয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন—“মহাস্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥” বাহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি জন্মে জন্মে উদ্ধার করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-রচিত শ্রীবৃহদঙ্গবতায়ত-গ্রন্থের গোপকুমার তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীল গুরুদেব যুগপৎ রূপান্তরবর্ষা ও নিত্যানন্দাভিন্ন হন কিভাবে? শ্রীমিত্যানন্দ প্রভু ত’ বলদেবরূপে রাধাকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত

খািকিতে পারেন না, রসাতাস দোষ হইয়া যাইবে। এই সংশয় নিরসনার্থ বলা হইয়াছে,—“নিতাই অমঙ্গমঞ্জরী দেহ কৃপা করি আমারে কিঙ্করী করিয়া।” অতএব যুগপৎ ‘কৃপামুগবর্ষা’ ও ‘মিত্যানন্দাভিন্ন’ এই সংশয় দূরীকরণ হইল।

‘শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় পরিকরম্’—শ্রী—রাধা, রাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরিকর। তিনি যুগলকিশোরের প্রীতিবিধানে নিত্য ব্যস্ত। এজন্ত শাজে বলা হইয়াছে,—
রাধাসম্মুখঃ সংসক্তিং সখীমঙ্গ-নিবাসিনীম্।

তামহং সততং বন্দে গুরুকৃপাং পরাং সখীম্ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ অস্ত্রান্ত সকলকে নিবেদনের পূর্বে প্রিয়তমত্ব শ্রীগুরুদেবকেই সর্বপ্রথম নিবেদন করা হয়। শ্রীগুরু-গায়ত্রীতে ‘কৃষ্ণানন্দায়’ কৃষ্ণ + আনন্দায় = কৃষ্ণানন্দায়। শ্রীমতী রাধিকাকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন তিনি কৃষ্ণের প্রিয় তম কিভাবে? “রাধিকার দাসী যদি হোস অভিমান। শীঘ্রই মিলয়ে তবে গোকুল কান ॥” “কৃষ্ণনাম-গানে ভাই রাধিকা-চরণ পাই, রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র ॥”—ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ।

উপসংহারে বলা যায়,—“ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা?” ছাড়িয়া শ্রীগুরুসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা? “শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব-প্রধান” (শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ—৪।১০।৮৯, মধুরা)। এজন্ত ভজনপ্রয়াসী সাধকগণ যেন কখনই গুরু ও বৈষ্ণব-অবজ্ঞা ও অপবাদ না করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই আদেশ মনে রাখিয়াই আমাদের বিশেষ সাবধানের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই শ্রীধামপূজার মার্থকতা।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল জ্ঞানসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-প্রদত্ত ভাষণ

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

অগ্রহণী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই অগ্রহ করুন।

ধর্ম কি ? সকল ধর্ম কি সমান ?

নির্মল জীবাত্মার নিত্য স্বভাবকেই জীবের ধর্ম বলে। জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের সন্তান বা সেবক। পিতার সেবা করা যেমন পুত্রের ধর্ম, সেইরূপ জগৎপিতার সেবা করা জগজ্জীবের ধর্ম। ভগবান্ এক এবং সনাতন ধর্মও এক। জীবাত্মায় কোন প্রাকৃত জাতি বা বর্ণ নাই। জাতি বা বর্ণধর্মগুলি নশ্বর দেহ ও মনের ধর্ম। ঐ সকল নশ্বর বা অনিত্য ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আত্মধর্ম বা স্বরূপের ধর্মকে আশ্রয় করিবার জ্ঞান গীতায় চরম উপদেশ,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥ (গীতা : ৮.৬৬)

ধর্মহীন ব্যক্তিগণ সকল ধর্মের সমন্বয় করিয়া লইতে বলিতেছেন। ইহা অজ্ঞান-প্রসূত ব্যাপার। নিত্যধর্ম, ছলধর্ম, অধর্ম, বিধর্ম—এবং এক নহে। উহাদের সমন্বয় সম্ভব নয়। আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সকল প্রাণীকে সমান দেখেন; অতএব শাস্ত্রজ্ঞান বাহ্যের বেশী, তিনিই তত স্পৃহ বা পবিত্র; আর যাহার যত কম, তিনিই তত অস্পৃহ বা অপবিত্র।

“যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ।” ধর্মই যাবতীর সুখ-শান্তির ও শ্রীবৃদ্ধির মূল- কারণ। ধর্মহীনতা বা ধর্ম-বিষেবই যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও অধঃপতনের কারণ। অধোক্ষজ শ্রীহরিকে ভক্তি করাই পরম ধর্ম। এই ভক্তিধর্ম পালন না করিলে মায়াব বন্ধন ঘটে, জীবের নানাবিধ ক্লেশ-অশান্তি ভোগ করিতে হয়। নৈতিক অবনতি, দুর্নীতি, ধর্মহীনতা, ঈশ্বর-বিষেব বা ধর্ম-বিষেবই যাবতীয় অশান্তির মূলকারণ। এই ভারতবর্ষ ধর্মীয় পীঠস্থান বা পুণ্যভূমি। এখানেই শ্রীভগবানের দশাবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানেই তাহা হয় নাই। এই ভারতবর্ষেই মুনি-ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং কলিযুগপাবনাবতারা শ্রীগৌরসুন্দর এই ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়া লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী এই ভারতেই বর্তমান। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—পুণ্যতোয়া নদীসকল এখানেই প্রবাহিত। মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, শ্রীবাসদেব প্রভৃতি অসংখ্য মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণের তপস্রার স্থান। এই ভারতবর্ষে দুর্ভীষ মানব-জনম লাভ করিয়াও যাহারা আত্মধর্ম অবলম্বনপূর্বক সাধন-ভজনের চেষ্টা না করেন, তাহারা

হতভাগ্য। সর্বোপরি খ্রীশ্চিগৌর-মিত্যানন্দের জ্ঞায় পতিতপাবন ও পরম দয়াল অবতারে যে যুগে জগাই-মাধাইয়ের জ্ঞায় মহাপাতকীগণও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিল, সেই যুগে যাঁহারা পতিত থাকিল, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনাতীত। কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া যদি তাহারা অল্প ভাপান্নেই দক্ষীভূত হয়, তথাপিও তাহারা এই ক্ষতিপূরণ কিছুতেই করিতে পারিবে না।

বর্তমানে অনেকে ধর্মের আবরণে অধর্ম প্রচার করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে অসংগত বা অধর্মের দিকে লইয়া যাইতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বে যিনি সঙ্গুরু-সমীপে গীতা-ভাগবত-বেদ-পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি শাস্ত্রীয় সনাতন যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন, এইরূপ নীতিবান্, আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিই ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার যথাযথ অধিকারী।

আজকাল কসির প্রভাবে বহু অসদাচারী, অধিকারী ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি, ধর্মমন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক ও গীতাশাস্ত্রাদি যাঁহারা সঙ্গুরের নিকটে স্বেচ্ছাবে অধ্যয়ন করেন নাই, তাহারাও ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের দৃষ্টতা পোষণ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা কোমলশ্রদ্ধ সাধারণ লোক বিপৎগামী হইয়া থাকে। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান না পড়িয়া রোগীকে চিকিৎসা করিতে যাওয়া অন্তায়, সেইরূপ ধর্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্মকথা আদৌচনা বা সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাও অন্তায়। অনেক ধর্ম-প্রচারকগণ বলিয়া থাকেন,—“যত মত তত পথ।” ইহা শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যবাক্য নহে। “মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ”—শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত দ্বাদশ মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র পথ। শ্রীভগবানের প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পথেই জ্ঞানীদের চলিতে হইবে। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া অজ্ঞানকে মত ও পথের কথা বলিয়াছেন,—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মননা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কর ।

মামৈবৈচ্ছাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞামে প্রিয়োহসি মে ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীতা ৬৩-৬৬)

সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমশ্রেয়ঃসাধক আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি

আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইহেতু তোমাকে কল্যাণকর কথা বলিতেছি। তুমি আমাতেই একমাত্র চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি,—তুমি আমাকেই পাইবে। লৌকিক সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমাতেই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্ভুও ঐ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ও ঐ পথে সাধন করিয়াছেন। সত্তা মানবের কল্লিত পথগুলি গ্রহণীয় নহে।

শ্রীমদ্ভগবত বলিয়াছেন,—“ধর্মস্ত সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্।” স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ভাগবত-ধর্ম, সনাতন-ধর্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম, নিত্যধর্ম ও সার্বজনীন ধর্ম। কোন মানব বা অতিমানব, দেবতা, ঋষি হইতে এই ধর্ম সৃষ্টি হয় নাই। স্মরণ্য মনোদর্শীর মতে চলিতে হইবে না। তাহাদের মতে ভুল-ভ্রান্তি থাকিবেই। অতএব সকল ধর্ম সমান নহে। সনাতন ধর্ম নিত্য, আর মনোদর্শ, দেহধর্ম, জাতিধর্ম, কল্লিত ধর্ম নিত্য নহে। ইহা অনিত্য ধর্ম।

যে যাহাই করুক, যে মতে বা যে পথে চলুক না কেন, সকলে একই স্থানে যাইবে না এবং ‘যত মত তত পথ’—একথা অশাঙ্গীয়া। সত্য ও অসত্য, সাধু ও চোর—ইহাদের মত ও পথ পৃথক্ এবং গন্তব্যস্থান পৃথক্। আবার উপাস্ত-দেবতাও পৃথক্।

যজ্ঞস্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজস্যাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংচাক্ষে যজ্ঞস্তে তামসা জনাঃ ॥ (গী: ১৭।৪)

যান্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ব্যজিনোহপি মাম্ ॥ (গী: ২০।২৫)

সাত্বিকাদিভেদে মানবের উপাস্ত-বস্তুও ভেদ হয়। যিনি সাত্বিক, তিনি সেইরূপ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। আর তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকেন। স্মরণ্য যে যে ধর্ম করুক এক স্থানে পৌছাইবে ও সকল মতই সমান, সকল ধর্ম সমান—একথা কখনও সত্য নহে। ইহা মায়ী-মোহগ্রস্ত লোকের প্রলোপোক্তি মাত্র। ঐ সকল অশাঙ্গীয়া বাক্যদ্বারা ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে বিপথে চালিত করা নিতান্ত অজ্ঞায়। কোন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা মিশনের প্রবক্তাগণ বলেন,—“যে যাহাই করুক একই স্থানে যাইবে।” তাহা হইলে চোর, দস্যু, লম্পট, মদ্যপায়ী প্রভৃতি সকলেবই উৎকৃষ্টত্ব আরও বাড়িয়া যাইবে। যাহার ফলে ভারতের নৈতিক অবনতি

ও অধঃপতন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বরং প্রচার করিতে হইবে—
সৎকর্মের গতি—সংলোকে, আর অসৎকর্মের গতি—নরকে। ধর্ম সৃষ্টকে
অজ্ঞ লোকেরাই বলেন যে, সকল ধর্ম সমন্বয় করিয়া লাও। জীবের বহুদশায়
যে-সকল অনিত্য দেহধর্ম, মনোধর্ম, জাতিধর্ম প্রভৃতি মিথ্যা কল্পনা মাত্র।
ঐ সকল ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হওয়াই জীবের
একমাত্র বাস্তব ধর্ম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ‘সর্বধর্ম্যন্ পরিত্যজ্য’ শ্লোক প্রদর্শন
বলিয়াছেন,—

এই আজ্ঞা-বলে যদি ভক্তের শ্রদ্ধা হয়।

সর্বধর্ম ত্যাগ করি’ সে শ্রীকৃষ্ণে ভজয় ॥

—শ্রীমদনগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীপত্রিকার কাগজ, মুদ্রণ-ব্যয় ও ডাকমাফুল অত্যধিক
বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ৪২শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক
ভিক্ষা ২৫'০০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ভিক্ষা ১৪'০০ টাকা
ধার্য করা হইয়াছে। গ্রাহকগণ বর্তমান বর্ষের ভিক্ষা
তদনুসারে প্রেরণ করিলে বিশেষ শ্রদ্ধা হইবে। এ
বিষয়ে আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি
কামনা করি।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে জন্ম-মৃত্যু রহস্য সবকিছু বলে দিলেন। সর্বশেষে বললেন,—দেখ, এটা কাকেও বলবে না। নচিকেতা বললেন,—আচ্ছা, আমি বলব কি না সেটা আমি বুঝব পরে। তিনি এই জন্ম-মৃত্যু রহস্য জেনে নিয়ে ফিরে এসেছেন এবং জগদ্বাসী সকলকে জানিয়েছেন। তবেই না প্রচার হয়েছে এই রহস্যটা। এতে তিনি গুরু আশ্রা লঙ্ঘন করেন নাই।

‘ঘমালয়ে জীবন্ত মাংস্ব’—এটা একটা প্রসঙ্গ। আর এখানে আর একটা ঘটনা। এক ব্রাহ্মণের শিশু বার বার মারা যাচ্ছে, তাকে বাঁচাবার কেউ নাই; সখা অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন শিশুকে বাঁচাবেন। সেই সভায় কিন্তু অতিরথ, মহাবরথ প্রভৃতি হাজির ছিলেন অনেকে। বাসুদেব কৃষ্ণ, নরদেব, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি হাজির সেই সভায়। কিন্তু কেউ ঐ ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব, এই কথা বলেন নাই। কিন্তু অর্জুন বলে ফেললেন—আমি তোমার ছেলেকে বাঁচাব। ভগবান্ তাঁর ভক্তকে দিয়েই এ জগৎকে রক্ষা করেন। ভাল-মন্দ সবকিছু শিক্ষা দিতে গেলে ভগবানকে তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগণকে দিয়ে শিক্ষা দিতে হয়—সেইটাই দেখাচ্ছেন।

অর্জুনের অহঙ্কার করা অন্তায় হয়েছে। কেননা, সেখানে স্বয়ং ভগবান্ —উপদেষ্টা হাজির আছেন। তাঁরা যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন না, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয় ঘোরতর। সেই শিক্ষাই এখানে রয়েছে। ভগবানকে যারা ভালবাসতে চাচ্ছেন তাঁদের ত’ তত্ত্বদর্শনের অভাব নাই, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব নাই, তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান জানা আছে। তথাপি কেন তাঁদের উল্টো-পাল্টা আচরণ—প্রশ্ন হতে পারে। শাস্ত্র বলছেন,—সমস্ত তত্ত্বদর্শন, ভাল-মন্দ জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান্ উপযুক্ত মাধ্যম নির্ণয় করেন তাঁর ভক্তকে। কখনও অত্যাধিক সাজিয়ে, কখনও অল্প সাজিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে সংশয়-সন্দেহহ্রস্টক প্রশ্ন করাচ্ছেন, আর স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-সম্মত উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে সেই ঘটনা ঘটেছে। রাজা যদি নীতি-আদর্শ পরায়ণ হন, তাহলে রাজ্যের কল্যাণ হয়, আর রাজা যদি নীতি-আদর্শহীন ভট্টাচারী হন, তাহলে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি। এখানে আলোচনার মধ্যে সেই বিষয়টা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য।

ভগবন্তত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত

বলেছেন,—ভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য ; জীব অহচ্চৈতন্য । অহচ্চৈতন্য জীবা আংশ, আর পূর্ণ—সনাতন পরব্রহ্ম ভগবান্ । অংশ কি করে পূর্ণ হবে? এমন অঙ্ক ত' কথা যায় না । ছেলেবেলায় জ্যামিতিতে পড়েছিলাম,—‘The part equal to the whole, which is absurd.’ অংশ কোনদিন পূর্ণের সঙ্গে সমান হয় না । কিন্তু সাধারণ মানুষ আজ উল্টোপাল্টা অঙ্ক কষছেন, কষবার চেষ্টা করছেন । মিলবে না কোনদিন ঐ অঙ্ক ।

হে জীব! তুমি কেন ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ? পরব্রহ্ম ভগবান্ তিনি তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়ে বসে আছেন । তুমি তাঁর নিঃস্বাসন দখল করতে যাচ্ছ কেন? তুমি ঠিক যা, তাই তুমি থাক । শাস্ত্রে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তা বুঝান হয়েছে,—অগ্নি—অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্য—সূর্য্যের কিরণ, সমুদ্র—সমুদ্রের তরঙ্গ । ঠিক এর উল্টো করে কথাগুলো যদি বলা যায়—তরঙ্গের সমুদ্র, দাহিকাশক্তির অগ্নি, কিরণের সূর্য্য, তাহলে উল্টো হয়ে যাবে । এরকম সম্পর্ক আমরা কখনও বলি না । অগ্নির দাহিকা শক্তি, সমুদ্রের তরঙ্গ, সূর্য্যের কিরণ বলতে হয় । আধার-আধেয় তত্ত্ব বিচার করেছেন এখানে শাস্ত্র । আশ্রিত এবং আশ্রয়—দুটো তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন । সমুদ্র যদি বলে যে তরঙ্গ আমার, তাহলে Theory ঠিক আছে, কিন্তু তরঙ্গ যদি বলে আমিই সমুদ্র, ঠিক হবে না, ভুল হয়ে যাবে Theory । শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে এ কথা বুঝিয়েছেন,—যথা সমুদ্রে বহুবন্তরদাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবঃ ।

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদাঙ্কিত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতামি জীব ॥

তরঙ্গ কোনদিন সমুদ্র হবে না, কিন্তু সমুদ্র যদি বলে তরঙ্গ আমারই—কথাটা ঠিক আছে । স্বতরাং হে জীব! তুমি ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ কেন, তুমি ব্রহ্মের আসন দখল করতে যাচ্ছ কেন? তুমি কি জান না—Anarchist—রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী হলে কি দাজা হয়? শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলে সর্বদা বিষয়বস্তু পাশাপাশি রেখে বিচার করতে হবে । কে সেই পরাংপর-তত্ত্ব ভগবান্, কে সেই অখিলরনামৃতমূর্ত্তি ভগবান্, কে সর্বৈশ্বরেশ্বর ভগবান্, কে সর্বশক্তিমান্ ভগবান্? শাস্ত্র বিচার করেছেন—যাঁর কোন অভাব নাই, যিনি স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট আপ্তকাম যত্নপতি ভগবান্, তাঁর সঙ্গে অল্প একজন সাধারণ মানুষের তুলনা হবে? “অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং যেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।” সাধারণ মানুষ ত' অভাবগ্রস্ত, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, স্ববলয় অভাব—দাও, দাও । ভগবানের ত' অভাব নাই, তিনি স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত । সেই পরাংপর তত্ত্ব ভগবান্ অসমোহী তত্ত্ব—বেদে,

উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর সমান কেহ নাই, উর্দ্ধেও কেহ নাই। He is second to none, সেই তত্ত্ব হল পরাংপর তত্ত্ব। ভগবান্ তাঁকেই বলা হয়েছে।

ন তন্তু কার্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে ন তৎ সমগ্ণাত্মাধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তিবিবিধৈব জগতে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

যাঁর সমকক্ষ কেউ নাই, যাঁর উর্দ্ধেও কেউ নাই—সেই তত্ত্ব যদি ভগবান্ হন, তাহলে মাতৃষ কেন তাঁর সঙ্গে সমতার অঙ্ক কষতে যাচ্ছে। কেন অঙ্ক কষতে যাচ্ছে—Equal in all aspect। ভুল ধারণা, সেটা হবে না কোমদিন। যেটা অসম্ভব সেটাকে সম্ভব করতে যাচ্ছে কতকগুলো অবুজ ও অর্ক্যাটম।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ ভগবানের আদেশে মায়াবাদ প্রচার করেছেন এ জগতে। নির্বিশেষ মতবাদ, যার অপর নাম Pantheism। বুদ্ধদেব প্রচার করেছেন শূন্যবাদ—Nihilism। আচার্য্যশঙ্কর তাঁর উপর একটু Sugar coating করে ব্রহ্মবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু জিনিস দুটো এক। কে এই শঙ্করাচার্য্য?—স্বয়ং শিবঠাকুর। ভগবান্ আজ্ঞা করেছেন,—দেখ শিব, আমার ভক্তের পথ রোধ করছে নিবীখর নিরাকারবাদী নাস্তিকগণ। তুমি তাদেরকে অন্যদিকে Divert—পরিচালনা কর। কিভাবে করব প্রভু? আমার উপরে কেন এ ধরনের আদেশ? আমার পক্ষে কি এ আদেশ পালন করা সম্ভব? আমি ত' তোমাকে ছাড়া, তোমার নাম ছাড়া কিছু জানি না। তুমি এই উন্টোপান্টা আজ্ঞা করছ, পালন করতে হবে আমাকে! শিবঠাকুর ইচ্ছুক নন। ভগবান্ বলছেন,—এটা তোমার দ্বারাই সম্ভব, অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। তোমাকেই এটা করতে হবে। কি করব?—তুমি বেদবাক্য, শ্রুতি-স্মৃতির কদম্ব কর, উন্টোপান্টা ব্যাখ্যা দিয়ে দাও।—“অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্তৌকগর্হিতম্।”—মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

মঠেব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিণা ॥

শিবানীকে বলছেন শিবঠাকুর—কলিকালে আমি ব্রাহ্মণের স্বরে গিয়ে মায়াবাদরূপ অসচ্ছাত্ত প্রচার করব। যার অপর নাম প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। ঘটনাগুলো ত' অস্বীকার করার উপায় নাই, শিবঠাকুর স্বয়ং আগে বলে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আদেশ পালন করতে হয়েছে। উন্টোপান্টা শ্রুতির কদম্ব ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে তাঁকে। যার নাম—বেদান্ত-দর্শনের “শারীরক-ভাষ্য”। তিনি অভিধা বাদ দিয়ে লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা দিয়ে উহা স্বচনা করেছেন। আমরা সবাই ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, ভগবান্ হয়ে

যাব। এখন ত' সব ঐ দলের। ভগবান্ বলেছেন,—যারা এই Theory মানবে, তারা সব দৈব-বিরোধী আত্মরিক শ্রেণীভুক্ত। তারা আত্মর, নাস্তিক। বর্তমান দুনিয়ায় আত্মর-নাস্তিকের একই আদম—দম্মান। কিন্তু মিরপেক্-ভাবে আলোচনা করলে তা প্রমাণিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতার মধ্যে বলেছেন,—হে অজ্ঞান! জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে।—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেশ্বিন্ দৈব আত্মর এব চ।

বিষুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আত্মরস্তদ্বিপর্যায়ঃ ॥

যারা ভগবদ্ভক্ত তারা দৈবীভাবাপন্ন, আর যারা ভগবদ্বিরোধী তারা আত্মরিক ভাবাপন্ন। ভগবান্ নিজে এ বিষয়ে প্রিয়সখা অজ্ঞানকে উপদেশ দিয়েছেন। মায়াবাদের কথাও ভগবান্ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন। গীতার ১৬শ অধ্যায়ের মধ্যে দৈবীসম্পদ ও আত্মরিক সম্পদ ব্যাখ্যা করেছেন। আত্মরিক সম্পদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন,—“ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা”—এই তত্ত্বটা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করা অসম্ভব। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে বাজারে নির্বিশেষ-মতবাদীরা বহু অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্।

অপরম্পরসমুৎং কিমন্তং কামহেতুকম্ ॥

‘ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা’ বাক্যের মধ্যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ অপ্রমাণিত। ব্রহ্ম যদি সত্য হ'ল, তাহলে জগৎও সত্য হবে। জগৎ অমিত্য কিন্তু সত্য। এক নাস্তিক ‘জগৎ মিথ্যা’ এই কথা বললেন। দ্বিতীয় নাস্তিক বললেন কি?—‘জগদাহরনীশ্বরম্’—এই জগতে ঈশ্বর বলে, ভগবান্ বলে কেউ নাই। তৃতীয় নাস্তিক বলছেন,—‘অপরম্পরসমুৎতম্’—Atom Molecules Theory—কণাদের বৈশেষিক দর্শন। চতুর্থ নাস্তিকের মতবাদ হল—ভগবান্ বলে একজনকে মেনে নিতে পারি, কিন্তু সেই ভগবান্ আমাদের কল্যাণের জন্ত জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, আমাদের সৃষ্টি করেন নাই। ‘কিমন্তং কাম-হেতুকম্’—সেই ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্ত, আমাদের কল্যাণের জন্ত নয়। এইসব নাস্তিকের তালিকা ভগবান্ নিজমুখে গীতার মধ্যে উপদেশ করে যাচ্ছেন। আমরা আছি কোথায়, বাস করছি কোথায়! এসব কথাগুলো কি আলোচ্য বিষয় নয়? ভালটা যদি শিখতে হয় আমাদের তাহলে খারাপ কোন্টা কোন্টা সেগুলো ত' জেনে নিতে হবে। আমি যেন খারাপের মধ্যে না পড়ে যাই। আমি

ভালই হব, Good boy হব, ইহাই যদি উদ্দেশ্য, তবে খারাপটাও আমাকে জেনে রাখতে হবে। সে সম্বন্ধেও হুঁচু অভিজানলাভ প্রয়োজন।

ভারউইন সাহেবের Theory-র সাথে আমাদের শাস্ত্রের Theory-র পার্থক্য কোথায় হচ্ছে? তিনি বললেন,—মানুষের উপরে আর কোন শ্রেষ্ঠ জীব নাই বা শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই। আমাদের শাস্ত্র বললেন,—চেতনতার ক্রমবিকাশানুসারে এই মানুষের চরম উন্নতি সম্ভব, এই মানুষের আবার অধঃপতনও আছে। মানবের যে কাজ, তা যদি মানুষের ভিতরে না দেখা যায়, মনুষ্যত্বের সন্দব্যবহার যদি সে না করে, তাহলে এই মানুষই আবার পশুত্বে চলে যায়। আবার বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটাকে Diversion। Deviation বলে। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে শাস্ত্রে। আপনারা জানেন, অহল্যা পাশাপী হয়েছেন। নৃগরাজ একজন ধার্মিক রাজা। দান করতে গিয়ে তাঁর সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। তজ্জগৎ তাঁকে কুকলান হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আপনারা জানেন—ধনকুবেরের ছই ছেলে—মলকুবের ও মণিগ্রীব অজ্ঞান বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। দেবতাগণের মধ্যে পরম রূপবান্ সুদর্শন বিজ্ঞাধর রূপগৌরব করেছিলেন বলে, অঙ্গিরা-পোত্রজাত ঋষিগণকে দেখে ঠাট্টা করেছিলেন বলে, কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখে পরিহাস করেছিলেন বলে জন্মগ্রহণ করলেন অজগররূপে। ভুরি ভুরি এই রূপ অধঃপতনের উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। সে কথা গীতায় ক্লষ্ণ বললেন,—

তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপ্যাম্যজস্রমণ্ডভানাস্থরীষেব ধোনিযু ॥

আস্থরীং ধোনিমাপন্ন্য মুঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপৈষ্যব কোন্ত্যয় ! ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥

শেষকালে জীবাত্মা আবার আচ্ছাদিতচেতনাদিরূপে জন্মগ্রহণ করছে। তাহলে শাস্ত্রের এই বিচার মানতে গেলে ভারউইন সাহেবের বিচারের সঙ্গে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে মনুষ্যজীবনের উর্দ্ধগতি ও অধোগতি—এই দুয়েরই বিচার বিবেচনার ক্ষেত্র রয়েছে। বাস্তবদত্ত্য বা পরমদত্ত্য বলেছেন শাস্ত্রে। (ক্রমশঃ)

বিহবল প্রতাগরুদ্র

প্রভুর মিলন আশে আঁকুল রাজন,—
বিরহে বিহবল রায়, রাজ্যস্থখ নাহি ভায়,
কভু হাসে কভু কাঁদে পাগল যেমন !
যে জন 'গৌরাজ' বলে ধরে তার পায়,—
সদা লুটে ধরাতলে, হিয়া ভাসে আঁখিজলে,
কেমনে গৌরাজ পাব সবারে বুধায় ।
সার্বভৌম পদে ধরি কহিছে রাজন,—
কতদিন হেন আর, করিব বা হাহাকার,
পাব না কি হেরিতে সে মূল চরণ ?
ভক্তবশ ভগবান্ ভাগবত গায়,—
তোমার চরণ ধরি, দেখাও সে গৌরহরি,
তব কৃপাবলে দয়া হবে গো আমায় ।
প্রভু বিনা এ জীবন শুধু মোর ভার,
সে পদ আঁকিয়া বুকে, সাগরে ডুবিব সুখে.
প্রভু বিনা রাজ্যভোগ কি হবে আমার ?
প্রভু বিনা কি করিব পুত্র-পরিজন ?
প্রভু বিনা এ হৃদয়, কেবল মরুভূময়,
এ মোর জীবন নহে সুদীর্ঘ মরণ ।
জগৎ তারিতে শুনি তাঁর অবতার,—
কেবল কি হেনরূপে, রাখি মোরে মোহকুপে,
তারিবেন এ জগৎ বাসনা তাঁহার !
বল বল সার্বভৌম ! কি করি উপায় ?
বিনা সেই গৌরহরি, মরমে মরমে মরি,
গরল আনিয়া সখে দেহ কঙ্কণায় !
গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন,—

অভাগারে করি স্নেহ, আমার সে মৃতদেহ,
ফেলে রেখ সিন্দুতীরে রেখ নিবেদন !
স্নান তরে যবে প্রভু করিবে গমন,—
পদধূলি উড়ি' যায়, ভূষিবে আমার কায়,
উখলি উঠিবে তাহে এ মৃত জীবন ।
—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ব্যহাশ্রয় বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁরই শুভাবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরের প্রেম-ধর্মে অমুপ্রাণিত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির (রেজিঃ) সেবকগণ তাঁহাদের পূর্বাচার্য্যবর্গের প্রবর্তিত ধারাহুয়ায়ী প্রাতি বৎসর বৃন্দাবনা-ভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব বিপুল সমারোহে পালন করেন। বর্তমান বর্ষেও সমিতির সেবকগণ যথারীতি শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ৬ই মার্চ আকাশবাণী ভবন হইতে স্থানীয় সংবাদে এবং বহুল প্রচারিত আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩শে ফাল্গুন ১৩৯৬, ৭ই মার্চ ১৯২০ সংখ্যায় শ্রীসমিতির এই মহোৎসবের প্রচারও হইয়াছিল।

পরিক্রমার পূর্বে হইতে প্রকৃতি দেবী কিছুটা বিরূপ আকার ধারণ করায় সমিতির সদস্যবর্গ কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রাণের আর্তনাদে তিনি তাঁহার সেই রূপ পরিগ্রহ করেন। তৎফলে নির্মল নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও সুকৃত পরিবেশের মধ্যে পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব সুসুভাবে সম্পাদিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্ত এই মহোৎসবে যোগদান করত উৎসবকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন।

গত ২০শে ফাল্গুন ১৩৯৬, ইং ৫ই মার্চ ১৯২০ সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীধাম পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার হইতে পরিক্রমা-

স্বচী অহুযায়ী যথাক্রমে শ্রীগৌড়মন্দির (কীর্তনাখ্য), শ্রীমধ্যমন্দির (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলমন্দির (পাদসেবনাখ্য), শ্রীকৃত্তমন্দির (অর্চনাখ্য), শ্রীজহ্নু মন্দির (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদকমন্দির (দানাত্ম্য), শ্রীকৃত্তমন্দির (সখ্যাখ্য), শ্রীদীনমন্তমন্দির (শ্রবণাত্ম্য) ও শ্রীঅন্তমন্দির (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবধাত্তিকের পীঠস্থানসমূহ দর্শন ও তত্ত্বস্থানমাংহাত্ত্য বর্ণনমুখে সন্ধ্যাসি-ব্রহ্মচারি ও যাত্রিগণ পরিক্রমা করেন। শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের সভাপতি-অধ্যক্ষ ত্রিদিগ্‌দ্বায়ামী শ্রীমন্তজিজীবন জনার্দন মহারাজ, ত্রিদিগ্‌দ্বায়ামী শ্রীমন্তজিবৈভববন মহারাজ, শ্রীমৎ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমন্তজিবৈদাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ধ্যাদীন মহারাজ, শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ প্রমুখ সন্ধ্যাসিগণ শ্রীধাম মহিমা-মাংহাত্ত্য কীর্তন করিয়া যাত্রীবৃন্দের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীদমিত্তির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদিগ্‌দ্বায়ামী শ্রীমন্তজিবৈদাস্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শারীরিক অসুস্থতাতে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন।

পরিক্রমাস্তে ২৬শে ফাল্গুন রবিবার অর্থাৎ শ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবসে সারাদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠায়া হয়। অজ্ঞ প্রায় ১২ শতাধিক শুদ্ধভক্তি যাজনকারী হরিতজন্মোৎসব ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করত তাঁহাদের পারমার্থিক জীবনযাপনক্ষেত্রের পথ প্রশস্ত করেন। সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-লগ্নে শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিশেষ অভিষেক ও আরতি হয়। আরাজিকাস্তে যাত্রিগণকে অহুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

রাজ্রে ভি. ভি. ও. যোগে 'শ্রীজগন্নাথদেব' ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে অঙ্কুষ্ঠিত শ্রীল গুরু-মহারাজের আবির্ভাব-তিথিপূজার ছবি প্রদর্শন করান হয়।

২৭শে ফাল্গুন সোমবার সাধারণ-মহোৎসব দিবসে যাত্রিগণকে ও আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া যাত্রিগণ সাধুসঙ্গে শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরের লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।

অধোকজে অহৈতুক্য ভক্তি বিরশূক্ত ।

অন্ত ধর্ম হৃদরূপে পালে যেই জন্ম ।

হয়ি কপার রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ {	৬ ত্রিবিক্রম, প্রহর, ৫০৪ শ্রীগৌরান্দ ৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৯৭, ইং ১২/৫/৯০	{ ৩য় সংখ্যা
------------	--	--------------

সামুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-মহেশ্বরাদি-দেবগণকৃতং শ্রীদেবকী-
গভস্তোত্রম্

[শ্রীমদ্গর্গন-হিতায়ং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাংশ-
সংবাদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-জন্মবর্ণনে একাদশোধ্যায়ে]

শ্রীনারদ উবাচ,—

১। অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনীন্দ্ৰৈরস্মদাদিভিঃ ।

শৌরি-গেহোপরি প্রাপ্তাঃ স্তবং চক্লুঃ প্রণম্য তম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন,—অনন্তর অস্মদাদি মুনীন্দ্ৰগণসহ ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ বহুদেব-
গৃহে আগমন করিয়া শ্রীভগবানকে প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

দেবা উচুঃ,—

- ২। যজ্ঞাগরাদিষু ভবেষু পরং হৃহেতু-
 হেতুঃ স্নিদস্তা বিচরন্তি গুণাঃ শ্রয়েণ ।
 নৈতদ্বিশন্তি মহাদিস্ত্রিয়-দেবসংজ্ঞা-
 স্তস্মৈ নমোহগ্নিমিব বিস্তুত-বিস্কুলিঙ্গাঃ ॥ ৮ ॥

দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—যিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের উৎপত্তি-হেতু
 মহেন অথচ হেতু হন এবং ঐহার আশ্রয়ে গুণসকল বিচরণ করে ; অনলোৎপন্ন
 অগ্নিকণা যেমন তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মহন্তর ও
 ইন্দ্রিয়গণের দেবতা ঐহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

- ৩। নৈবেশিতুং প্রভুরয়ং বলিনা বলীয়ান্
 মায়া ন শব্দ উত নো বিবয়ীকরোতি ।
 তদব্রহ্ম পূর্ণদমৃতং পরমং প্রশান্তং
 শুদ্ধং পরাৎপরতরং শরণং গতাঃ স্মঃ ॥ ৯ ॥

যিনি প্রভু, ঐহাকে জানা যায় না, যিনি স্বীয় বলে বলীয়ান, মায়া ও
 শব্দের অবিবয়ীভূত, আমরা সেই পূর্ণ, প্রশান্ত, শুদ্ধ, অমৃত পরম পরাৎপর
 ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই ॥ ৯ ॥

- ৪। অংশাংশক্যাংশক-কলাত্ববতারান্দৈ-
 রাবেশ-পূর্ণসংহিতৈশ্চ পরস্তা যস্তা ।
 সর্গাদয়ঃ কিল ভবন্তি তমেব কৃষ্ণং
 পূর্ণাৎ পরং তু পরিপূর্ণতমং নতাঃ স্মঃ ॥ ১০ ॥

যে পরম-পুরুষের অংশ, অংশাংশ, কলা, আবেশ ও পূর্ণ প্রভৃতি অবতারে
 সৃষ্টি-সংহারাদি সাধিত হয়, পূর্ণ হইতেও পরিপূর্ণতম সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা
 নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

- ৫। মনন্তরেষু চ যুগেষু গতাগতেষু
 কল্লেষু চাংশকলয়া স্ববপুর্বিভষি ।
 অদৈব্য ধাম পরিপূর্ণতমং তনোষি
 ধর্ম্যং বিধায় ভুবি মঙ্গলমাতনোষি ॥ ১১ ॥

যিনি অতীত ও অনাগত মনন্তর, যুগ ও কল্লের স্বীয় অংশকলায় শরীর
 ধারণ করিয়া থাকেন ; সম্প্রতিও যিনি স্বীয় পরিপূর্ণ-ধাম বিস্তৃত করিতেছেন,

সনাতন ধর্ম বিস্তারপূর্বক তিনিই পৃথিবীর বিবিধ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

৬। যদ্বল্পভং বিশদ-যোগিভিরপ্যগম্যং
গম্যং দ্রবন্তিরমলাশয়-ভক্তিযোগৈঃ ।
আনন্দকন্দ-চরতত্ত্ব মন্দযানং
পাদারবিন্দ-মকরন্দ-রজো দধামঃ ॥ ১২ ॥

যিনি উত্তম যোগিগণের ও ছল্লভ এবং একমাত্র সরল শুদ্ধাশয় ভক্তিযোগ-গম্য, আনন্দকন্দে মন্দমন্দ বিচরণশীল সেই বিভূর পদারবিন্দের মকরন্দ-রজকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ১২ ॥

৭। পূর্বং তথাত্র কমনীয়-বপুশ্চয়ং ত্বাং
কন্দর্প-কোটিশত-মোহনমন্তুতং চ ।
গোলোকধাম-ধিবণ-দ্যুতিমাদধানং
রাধাপতিং ধরণধর্য্যধনং দধামঃ ॥ ১৩ ॥

হে রাধাপতে! আমরা আপনার যে রূপ পূর্বে দেখিয়াছিলাম এবং এখনও দেখিতেছি,—আপনার সেই অদ্ভুত কমনীয় শতকোটি কন্দর্পমোহন দেহকাস্তি উত্তম গোলোকধামের দ্যুতিধারী ধরনী-ধারণক্ষম রূপ হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ১৩ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

৮। নত্বা হরিং তদা দেবা ব্রহ্মাত্মা মুনিভিঃ সহ ।
গায়ন্তস্তং প্রশংসন্তঃ স্বধামানি যমুর্দ্দা ॥ ১৪ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিগণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মুদিতমনে তাঁহার প্রশংসা ও গুণগান করিতে করিতে স্ব-স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

কুটীনাটী

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে। কোনস্থলে নিবিদ্ধাচার, জীব-হিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যে কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন। অত্যাধানে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

“অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।

কুটীনাটী পরিহারি’ একান্ত হইয়া ॥”

আবার শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয়রূত (মনঃশিক্ষা ...) শ্লোকে “কুটীনাটী ভয়-খবরকরনুত্রে স্নাতা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রাধাকৃষ্ণ প্রেমপ্রাপ্তির অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া ধরিয়াছেন। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের ‘কুটীনাটী’ পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

‘কুটীনাটী’ শব্দার্থ কি? অভিধান খুঁজিয়া এই শব্দটির অর্থ পাওয়া যায় না। শব্দটি বঙ্গসমাজে শ্রীলোকদিগের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যেখানে ‘কুটীনাটী’-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের ভাবার্থ বিচারপূর্বক এবং শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের লোকেরা এই শব্দ ব্যবহার করিবার সময় যে অর্থ মনে করেন, তাহা জানিয়া আমরা ‘কুটীনাটী’ বলিলে কি বুঝায়, লিখিতেছি। ‘কুটীনাটী’-শব্দে ‘কুটী’ ও ‘নাটী’ এই দুইটি কথা আছে। ‘শুচিবায়ু’গ্রন্থ ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই ‘কুটী’-দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটি জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের ‘কুটী’ মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। ‘শুচিবায়ু’ একপ্রকার কুটীনাটীর ফল বাহাদেব ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকে পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোনও সময়কে শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না, কোনও ব্যক্তিকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহাকে আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে ‘কু’-টির উপর ‘না’-টি উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের মানুষলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভূক্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন বাস্তববো স্থলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া। সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গ কুটীনাটীগ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন, কেন না,—

রুক্ষের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।

ভক্ত-শেষ হইলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান'।

ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদঙ্গল।

ভক্ত-ভুক্তশেষ,—এই তিন মহাবল।

কুটীনাটীগ্রন্থ ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্যাভিমান-প্রযুক্ত মহা-মহাপ্রসাদে, ভক্ত-পদধূলিতে ও ভক্ত-পদঙ্গলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাহার গৃথে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন, কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন, হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।—

* * * *

ভদ্ভাভদ্ভ বজ্জ্ঞান নাহি অপ্ৰাকৃতে ॥

বৈতে ভদ্ভাভদ্ভ-জ্ঞান—সব মনোদর্শী।

এই ভাল, এই মন্দ—এই সব জ্ঞম ॥

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।

অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের, চিদানন্দময় ॥ *

'কুটীনাটী'-শব্দের অর্থ মহাপ্রভু 'এই ভাল, এই মন্দ' শব্দদ্বারা করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবের শরীরে যে কিছু কর্মগতিকের অভদ্ভ দেখা যায়, তাহাকে অভদ্ভ মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দ্বাচারণ-ব্যবহার দেখিলেও তাহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। যথা শ্রীভগবদ্গীতা,—

অপি চেৎ স্তদুচ্যারো ভজতে মামনন্ততাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যো সম্যক ব্যবনিতো হি নঃ ॥ (গী: ৯।৩০)

এই উপদেশস্থলে ভক্তিবিরুদ্ধ আচারসকল সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের অনাদর অসংসদ্ব অর্থাৎ অবৈধ ক্রীদঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা,

* উক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, কোনও বৈষ্ণবের অপ্ৰাকৃত বা পরলোক গমনের পর তাহাকে অগ্নি সংযোগ বা তীর্থোদিকে প্রদান অথবা ভূগর্ভে স্থাপন করিয়া অনেকে স্মার্তের স্তায় নিজদিগকে অপবিত্র জ্ঞানে স্নানাদি করেন। ইহাও কুটীনাটী এবং বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বিশেষ। বৈষ্ণব সর্বদাই পবিত্র—ইহা স্বরণ রাখা আবশ্যক।—সম্পাদক

নাম-নামীতে ভেদজ্ঞান, অল্প শুভকর্মের সহিত নামের কাম্য, জড়দেহের অহংতা-মমতাবশতঃ নামে প্রীতির খরঁতা, নামবলে পাপাচরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তিবিরুদ্ধ আচার নির্ণীত আছে, তাহা যে ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্তভক্তি লাভ করিয়াছেন, এরূপ বলা যায় না। অনন্ত-ভক্তের ভক্তিবিরুদ্ধ আচার অসম্ভব। যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই। সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে। যাহার শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ আচার দেখিয়া কুটীনাটী পরিত্যাগ করিবেন। কুটীনাটী যতপ্রকার হয়, তাহা বিচার করিয়া যাহাতে কুটীনাটী হৃদয়ে না থাকে, তাহার চেষ্টা করিবেন।

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বর্ণান্তর

ভারতবর্ষে পূর্বকালে মানবের বর্ণ-বিভাগ ছিল না, পবে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই বর্ণ বিভাগ আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়ঃ—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাঃ হংস ইতি স্মৃতঃ ।

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণাম্মে হৃদয়ান্তরী ॥

বিপ্রক্ষত্রিয়বিটশূদ্রাঃ মুখবাহুরুপাদজাঃ ।

বৈরাজাং পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-লক্ষণাঃ ॥

সত্যযুগে আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা ‘হংস’ নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদজয় আবির্ভূত হয়। আমার বিরাটরূপ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদেশ হইতে মিত্র নিজ আচার-লক্ষণ-ভেদে বর্ণ-চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করে। মৌলকর্ষ মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৮।৪ শ্লোক-টীকায় বলেন,—‘বর্ণাঃ নাস্তিকং রাজসং তামসং মিত্রং চেতি স্বহৃদ্যা-দি-সাম্যাৎ গুণবৃত্তং বর্ণশব্দেনোচ্যতে।’ ‘বর্ণ’ শব্দে জীবের গুণবৃত্ত বুঝায়।

শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব মৌক্ষধর্ম ১৮৮ অধ্যায়ে ভরবাজ বলিলেন,—

জন্মানামসংখ্যোঃ স্বাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ ।

তেবাং বিবিধ-বর্ণানাং কুতো বর্ণ-বিনিশ্চয়ঃ ॥

স্বাবর ও জন্মসমূহের অসংখ্য জাতি । তাহাদের নামানুসারে বর্ণের কি-
প্রকারে বর্ণ নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হয় । তদন্তরে ভূগু বলিতেছেন,—

ন বিশেষোহন্তি বর্ণানাং সর্ব-ব্রাহ্মণ্যং জগৎ ।

ব্রাহ্মণ্য পূর্বসৃষ্টং হি কৰ্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥

ব্রাহ্মণ্যানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাং তু লোহিতঃ ।

বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা ॥

হিংসানৃতপ্রিয়লুকাঃ সর্বকৰ্ম্মোপজীবিনঃ ।

কৃকাঃ শৌচপরিভ্রষ্টান্তে বিজাঃ শূদ্রতাং গতঃ ॥

ইত্যেতৈঃ কৰ্ম্মভিৰ্যন্তা বিজা বর্ণান্তরং গতঃ ।

জীবের বর্ণসমূহের বিশেষ নাই অর্থাৎ দেহী বর্ণ-নির্বিশেষ । পূর্বকালে
ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন । পরে স্ব-স্ব-কৰ্ম্ম-প্রভাবে ক্ষত্রিয়াদি
বর্ণতা লাভ করিয়াছে । ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রকাশায় শমদমাদি স্বভাববিশিষ্ট সিত ।
ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রবৃত্ত্যায় শৌর্য্যভেদঃ প্রভৃতি স্বভাবযুক্ত লোহিত । বৈশ্য
কৃষ্যাদি হীনকৰ্ম্ম-প্রবর্তক রজস্তমোব্যামিশ্র পীত । শূদ্র আবরণায়া তমোগুণ-
যুক্ত স্বভাবপ্রকাশপ্রবৃত্তিহীন অপবচালিত শকটবৎ কৃষ্ণ বা অসিত । পরহিংসা
ও মিথ্যাপ্রিয় লোভী হইয়া সর্বকৰ্ম্মোপজীবগণ তমোগুণ বশতঃ সংস্কার-বর্জিত
অশুচিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শূদ্রতা প্রাপ্ত হন । এইসকল হীন-
কৰ্ম্মপ্রভাবেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পৃথক হইয়া ক্ষত্রিয়াদি অন্তবর্ণ প্রাপ্ত
হইয়াছেন । সকল জীবই নিত্যধর্ম্ম সত্ত্ব প্রতিলিখিত হইয়া ব্রাহ্মণ অথবা সত্ত্বগুণ-
প্রকাশাত্মা ; তিনিই সিত বা সত্ত্বগুণী হইয়াও অপর ধর্ম্ম রজোযোগে লোহিত,
আবার সত্ত্বহীন রজোগুণী লোহিত অপর তমোযোগে পীত এবং সত্ত্বরজোহীন
তমোগুণী অসিত বর্ণতা লাভ করেন । যিনি বর্ণ ধারণ করিয়া বিভিন্ন বর্ণ
বলিয়া পরিচিত হন, তিনিই বর্ণান্তর গ্রহণ করায় তাঁহার বর্ণ বা গুণানুসারে
বর্ণান্তর নির্দিষ্ট হয় । সেই বর্ণবিভাগের মূলে বা সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্রাহ্মণ অবস্থিত ।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১১) ব্রাহ্মণ-বিভাগের কথা পরিদৃষ্ট হয় ।
কৃষ্ণজুর্বেদ-সংহিতা (৭।১।১৪), গুরুজুর্বেদ-সংহিতা (১৪।২৮), অথর্ববেদ
(১।১০।১) এবং (১৯.৬.৬), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।২।৬৭ এবং ৩।১২।২৩)
এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ (২।১।৪।১৩) প্রভৃতি নানাস্থানে ব্রাহ্মণোৎপত্তির কথাও
দেখা যায় ।

ব্রাহ্মণবিত্ত নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারবিশিষ্ট বিজের পুত্রকে ব্রাহ্মণ
কল্পিব্য যে বিধান আছে, তাহাতে শৌক-পারম্পর্য্যক্রমে সংস্কার প্রদত্ত হইয়া

ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মণের পুত্রের ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্যতা আছে জানিয়া “অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্পনয়ীত” অর্থাৎ “ব্রাহ্মণকে অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করাইবে” এরূপ প্রতিবাক্য আছে। গোভিলীয় গৃহসূত্রেও “গর্তাষ্টমেযু ব্রাহ্মণং উপনয়েৎ” বিধান দৃষ্ট হয়। ষোড়শ বর্ষকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল। তাহা অতীত হইলে আব ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে না। উপনয়নের নির্দিষ্টকাল গত হইলে পতিত সাবিত্রীক হয়। ইহারই ‘ব্রাত্য’ সংজ্ঞা। ব্রাত্যকে উপনয়ন দিবে না, তাহাকে বেদধ্যয়ন করাইবে না, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। স্মৃতি বলেন,—

গৃহোক্তকর্মণা যেম সমীপং নীয়তে গুরোঃ ।

বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালস্তোপনয়ং বিদুঃ ॥

বৈদিক গৃহবিধানক্রমে যে অহুষ্ঠানদ্বারা বেদাধ্যাপক আচার্য্য গুরুর সমীপে বেদাধ্যয়নের জ্ঞাত বালককে লইয়া যাওয়া হয়, সেই অহুষ্ঠানকেই বালকের উপনয়ন বলে। জ্ঞানের উন্মেষের পূর্বে বেদাধ্যয়ন কার্য্যের উপযোগিতা নাই, তজ্জন্মই উপনয়নের পূর্বে যে-সকল সংস্কার আবশ্যক, তাহার অহুষ্ঠান-কাল অভাবগক্ষেও সাত বৎসর লাগে। অধ্যাপনের জ্ঞাত আচার্য্য-নমীপে আট-বৎসরের পূর্বে ব্রাহ্মণ বালককে লইয়া যাওয়া বিহিত নহে। মাতাপিতার গৃহ হইতে অন্যত্র গুরুগৃহে সেই শিশু কালে বাসের সম্ভাবনা নাই। গৃহবিধানানন্তর বেদাধ্যয়নকালেই ব্রাহ্মণ শ্রৌতবিধান-গ্রহণে সমর্থ হন। পরিশেষে যজ্ঞ-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবাব অবকাশ লাভ করেন। যদি ষোড়শবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে গুরুগৃহ বাসের জ্ঞাত প্রবেশ-সম্ভাবনা না থাকে এবং ব্রাহ্মণবটুর অধ্যয়ন করিবার কোন ইচ্ছা বা কচি না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজ কুচিবলেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে অভিলষ করেন না জানিতে হইবে। জড় ভরতের আখ্যান হইতেই জানা যায়, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি কর্ম্মসংস্কার-গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার কচি না থাকিলে ব্রাহ্মণবংশজাত বালক আদৌ সংস্কার গ্রহণ-পূর্ব্বক গুরুগৃহে যাইতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতিতে অগ্নিই সংস্কারের আদি উপাদান। এই কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি ভাবী উদ্দেশ্যের জ্ঞাত ভব্য-প্রস্তাবমাত্র, কিন্তু ফলকালে বৈষম্যের সম্ভাবনা। (ক্রমশঃ)

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

নিষ্ঠার সহিত চাতুৰ্ম্মাস্ত্রাদি ব্রতপালন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ঠাবিশিষ্ট হইবার উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ

কংনটীয়া

পোঃ মথুরা (মথুরা) ।

ইং ৩০।১।৬২

স্নেহাস্পদেষু—

***। *** ধরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় তুমি গিয়া ঘণ্টা দখল লইয়া আমাদের তরফে বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত। আমাদের লোকজন ঐরূপ বিষয় কার্যে অক্ষুণ্ণ। তোমরা হরিনেবার কার্যে ঐরূপ উদ্যমী হইলে চলিবে কেন? কার্যের সময় অতিক্রম করিয়া গেলে তাহাতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়।

*** দেখানে গোয়ালঘর করিতে দেওয়া হইবে না। *** প্রভুও *** প্রভু কি জন্ত তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলেন? *** প্রভুর বিচারধারা লোকমুখে যাহা শুনিতেছি, তাহা বেদান্ত সমিতির ভক্তিপ্রচারের অক্ষুণ্ণ নহে। তুমি তাহাতে গা ঢালিয়া দিও না।

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ঠাবিশিষ্ট না হইলে রাধারাসীর কৃপালাভ করা যায় না। ভগবানের জন্ত বঠরীকার করাই ভক্তির লক্ষণ। স্মৃতি-স্ববিধা খুঁজিতে যাওয়া ইচ্ছিতর্পণ বলিয়া জানিবে। ভগবৎসেবা সর্বতোভাবে করা আবশ্যক।

তোমাদের ঐদিকে চাতুৰ্ম্মাস্ত্রাদি ব্রতের পরিপন্থীকণে অনেকে ঝগাম খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীমমহাপ্রভুর স্বীয় আচরিত প্রচারের বিরুদ্ধ। তুমি এইসব কার্যের অল্পমোদন ও প্রশংসা দিবে না। হরিতত্ত্ব-ভক্তিবিলাসের বিধি সমস্তই গৃহস্থব্যক্তিগণের অবস্থা পালনীয়। হরিতত্ত্ব-বিলাস কাহাদের জন্ত লেখা হইয়াছে, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে সুখবন্ধেই লিখিয়া দিয়াছেন। গৃহস্থ ভক্তগণের অনেক পরিভ্রম করিতে হয়, এইরূপ অজিলায় ব্রতাদি পালন না করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অপরাধজনক। বেদান্ত সমিতির বৈশিষ্ট্য কখনও নষ্ট করা উচিত নহে। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রতাদি পালনে পরাশ্রয় হইলে উহা কখনও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

—শ্রীভক্তিপ্রদ্যান কেশব

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠার পর]

আমি বাংলাদেশের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিং, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর প্রভৃতি স্থানে প্রচারে গিয়েছিলাম। একজন মুসলমান আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন,—মহাশয়! ভগবান্ ভগবান্, হরি হরি করছেন; আমরাও আল্লা আল্লা করছি, কিন্তু তাঁকে ত' দেখা যায় না। তিনি কোথায় আছেন, তাঁকে কি করে চিনব? আপনি কি চোখে দেখেছেন?—কি উত্তর দেব? আমি উত্তর দিলাম—ইয়া দেখেছি। লগুনে একটা Play হচ্ছে, তোমার এখানে এইটুকু একটা T. V. বাজ, তুমি সেই Playটা এখানে দেখছ কি করে? লগুন থেকে ছবিগুলো এল কি করে? Ether-এর সাহায্যে সেখানে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে তুমি এখানে সেই বিষয়বস্তুগুলো দেখছ। তুমিও তোমার মনটাকে T. V. কর, দেখবে গোলোক থেকে ভগবান্ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। At that time you can realise—তুমি উপলব্ধি করতে পারবে; এ ব্যবস্থা ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবে না।

কেউ একটা ঘুবতী নারীকে ভালবাসে। সে এখানে নাই, বোধহয় আছে। বোধহয় থাকলেও তার অন্তরে আছে। ভগবান্কে যদি সেইরকম প্রীতি করতে পার, তাহলে ভগবান্ গোলোকে থেকেও তোমার হৃদয়ে থাকবেন। ভগবান্ নিজে বলেছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়স্থম্।

মদন্ততে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুগণের হৃদয়। সাধু আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না, আমিও সাধুকে ছাড়া কাউকেও জানি না। সে কি? তুমি সাধুর হৃদয়ে রয়েছ বলছ, কিন্তু তুমি ত' প্রতি জীবের হৃদয়ে অন্তর্ধামিক্রমে রয়েছ বলেছ। ইয়া আমি অন্তর্ধামিক্রমে রয়েছি। সে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, তার দুঃখ-কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পাই। কিন্তু আমি যে ভক্তের হৃদয়ে থাকি আমি কষ্ট পাই না, আনন্দ পাই। তার সেবাময় চিন্তাবৃত্তি দেখে আমি আনন্দ লাভ করি। শাস্ত্র বলেছেন,—

যশ দেবে পরা ভক্তির্ধ্বা দেবে তথা গুরৌ ।

তন্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

দেবতাকে যেমন দেখছি; গুরুকেও তেমনি দেখতে হবে; কোন অংশে কম নয় ।

ব্রজাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

কৃষ্ণ-ভজন করবেন । কৃষ্ণভজন করলে তবে তার মায়াজাল সরে যাবে । তখন সে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাবে । তাছাড়া কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়ার আর কোন উপায় নাই । গুরুরূপা ব্যতীত উদ্দেশ্য নিক হবে না । গুরু কি রকম ? রামা-শ্যামা গুরু হতে পারেন না ।

“বাতোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমূদরোপস্থবেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিচ্যাত ॥”

“এই ছয় বেগ যার সদা বশে রয় ।

সে জন গোস্বামী, তারে পৃথিবী পূজয় ॥”

‘গোস্বামী’-শব্দের হুটো অর্থ । ‘গো’ মানে গাভী । গাভীর স্বামী অর্থাৎ বাঁড় । সে হল কামুক । আর ‘গো’ মানে ইন্দ্রিয় । ইন্দ্রিয়ের যিনি স্বামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে যিনি Control (নিয়মিত) করছেন, তিনি গোস্বামী । তিনি গোদাস—ইন্দ্রিয়ের দাস নন । তিনি পৃথিবী বিজয় করেন । তার সংস্পর্শে গেলে কল্যাণ হবে ।

“আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বয়মাচরতে যশ্বাদাচার্য্যন্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥”

“আপনি আচারি’ ধর্ম জীবেরে শিখায় ।

আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ॥”

যিনি নিজের জীবনে আচরণ করে অগ্রকে শিখান, তিনি আচার্য্য বা গুরু । শাস্ত্রের সর্বত্র গুরুর প্রাধান্য দিচ্ছেন ভগবান্ অপেক্ষা । আমাদের গুরুদেব বলতেন,—ভগবান্ স্বয়ং যদি এসে বলেন যে ‘আমিই ভগবান্’, তাঁকে বলব—আপনি যেতে পারেন । গুরুদেব যখন এসে বলবেন—দেখ, ইনি ভগবান্, তখন আমি মাথাটা নত করব । “কবে অঙ্গুলি নির্দেশ করি’ মোরে দেখাইবে ।”—কথাটা আছে । কেন গাওয়া হয় “শ্রীকৃষ্ণস্বরী পদ, সেই মোর

সম্পদ" ? গীতিটি গুরুতব্ব সহজে নয় কি ? ভাল করে বুঝতে হবে বিষয়টী।
অতএব আচার-প্রচার দুটোরই দরকার আছে।

বর্তমানে শিক্ষাগুরু ও মহাস্তগুরু নিয়ে গোলমাল চলছে। অনেকে বলছেন,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই সমান সম্মাননীয়। আমি স্বীকার করি,—শিক্ষাগুরু সম্মাননীয়, কিন্তু দীক্ষাগুরুর সম্মুখে নয়। চৈত্যাগুরু স্বধাবিভক্ত হয়েছেন। কিভাবে হয়েছেন ?—শিক্ষাগুরু আর মহাস্তগুরু। মহাস্তগুরুই একাধারে শিক্ষাগুরু। গুরুদেব কি মন্ত্রটা দিয়ে খালাস হয়ে যাচ্ছেন ? তিনি শিষ্টকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন না যে, বাবা ! তুমি এইভাবে চলবে, এইভাবে তোমার জীবনটা পরিচালিত করবে। অতএব (ক) চৈত্যাগুরু শ্রীব্যাসদেব শিক্ষাগুরু, (খ) দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। আর যত শিক্ষাগুরু তাঁরা কি শিক্ষা দেবেন ?—তাঁরা গুরুদেবের আত্মগত্যে ভগবানের সেবাশিক্ষা দেবেন। যদি কোন শিক্ষাগুরু গুরুদেবের আত্মগত্যে শিক্ষা না দেন, তাহলে তিনি শিক্ষাগুরু নহেন। তিনি কখনও শিক্ষাগুরু হতে পারেন না। কি শিক্ষা দেবেন তিনি ? তাঁর দ্বারা কি কল্যাণ হবে জগতের ? কোন কল্যাণই হতে পারে না। তিনি Procedure টা বলবেন,—বাবা ! এইভাবে চল। পথ দেখাবেন তিনি, তাঁর কাছে যাও। তিনি করুণা করলে পরে ভগবানকে দেখতে পাবে, নচেৎ তুমি ভগবানকে দেখতে পাবে না। সেইজন্য শাস্ত্র বলছেন,—

“গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা করেন ভক্তগণে।”

এই পদ্যটির কেন বলেছেন ? এর মধ্যে একটা বিচার আছে। একদল গুরুকে ভগবৎরূপা-মূর্তিরূপে দেখছেন। আর একদল গুরুকে দীক্ষাং ভগবান্ বলছেন। তারা বলছেন—ভগবানের আর মূর্তি দরকার নাই, গুরুকে বসিয়ে দিচ্ছি। এটা আমরা স্বীকার করি না। কেন স্বীকার করি না ? সিদ্ধান্তটা বুঝতে হবে। King and representative of the king. Representative of the king is not a king. রাজার প্রতিনিধি এসেছেন, তিনি তাঁর সম্মান পাবেন। রাজা আসেন নাই বলে রাজার প্রতিনিধি—Viceroy রাজসম্মানটা পাচ্ছেন, কিন্তু Viceroy রাজা নন। তেমনি ভগবানের প্রতিনিধি হলেন গুরুদেব—তাঁর Representative হচ্ছেন গুরুদেব। সেই ভগবান্ মিজেই বলেছেন—“তন্মৈ দেখং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হুহ্ম।” আমারই মত গুরু পূজ্য। কেননা, তাঁর রূপা ব্যতীত তুমি আমাকে পাবে

না। অতএব এই যে গুরুদেব ভগবান্ তিনি হলেন সেবক-ভগবান্, আর ভগবান্ হলেন সেব্য-ভগবান্। গুরুদেব যদি স্বয়ং ভগবান্ হয়ে যান, তাহলে এ শ্লোক হত না।

অথ গুণমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

তঁার পাদপদ্ম যিনি দেখিয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। গুরুদেব কি পা-টা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন আমি ভগবান্, এইখানে মাথাটা নত কর। কখনও না। অতএব এই বিচারে আমরা গুরুদেবকে দেখি। তিনি সেবক-ভগবান্। তিনি আমাকে ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছে দিবেন। যিনি ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছে দিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা রাখেন না, সে গুরুদেবকে আমরা গুরুদেব বলি না। তার উদাহরণ,—

বামনদেব গিয়েছেন বলিরাজের কাছে, শিক্ষা গ্রহণ করবেন তিনি, দান করবেন বলিরাজ। বামনদেব আগে আগে চলে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণগণ ত' লোভী, তাঁরা বলছেন—একটা বাচ্চা ছেলে আগে আগে চলেছে, কি না কি চেয়ে নেবে, শেষে আমরা কিছু পাব না। তাই বামনদেবকে ধরে পিছনে করে দিয়েছেন। যখন ব্রাহ্মণগণ বলির কাছে পৌঁছেছেন তখন দেখেন বামন লোকটা বলিরাজের নিকট দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বলছেন,—হায়! হায়! একে ত' পিছনে ফেলে আসলাম, এ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাপারটা কি রকম! বলিরাজার বলছেন,—আপনি কি চান? বললেন—আমি কিছু চাই না, আমার পায়ে ত্রিপাদ ভূমি আমি চাই। তখন ব্রাহ্মণগণ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। বাবা! তুই বেশী চেয়ে নিবি, না—তোর পায়ে ত্রিপাদ ভূমি নিবি। তোর পায়ে তিনপাদ ভূমি আর কতটুকু? বোকা কোথাকার! তখন বলি মহারাজ বলছেন,—আপনি নিজের স্বার্থটা বুঝছেন না ত', বেশী কিছু চান, আমি দিয়ে দেব। না, আমার বেশী কিছু দরকার নাই, ত্রিপাদ ভূমি হলে চলবে।

এমন সময় গুরু গুণাচার্য্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। যে সে গুরু নন তিনি। শক্তি আছে তাঁর। এসে বলছেন—করছ কি ভূমি বলি! বলি বললেন,—আমি দান করছি। একে চেন ভূমি?—আজ্ঞে না। স্বয়ং ভগবান্। তোমার সব কিছু নিয়ে নেবে, কিছু থাকবে না। তার মানে আশ্রয়কালকার গুরুদেব বলছেন,—তোর যদি সব নিয়ে নেয় তাহলে আমি খাব কি? তাঁর চলবে কি করে? বলি মহারাজ বললেন,—বলেন কি,

উনি ভগবান্ ! বললেন—হ্যাঁ। তাহলে ত' খুব ভাল কথা, আমার দুইদিক্ থেকে লাভ। ভগবান্ যদি হন তাহলে তিনি সব নেবেন, আর যদি ভগবান্ না হন তাহলে ত্রিপাদ ভূমি নেবেন। আমার কোনদিকে ঠকা নয়।

তখন নিয়ম ছিল—কমণ্ডলুতে জল নিয়ে ওঁ বলে দান করতে হত। বলিরাজ কমণ্ডলু থেকে জল নিতে যাচ্ছেন, জল পড়ছে না। তখন বামনদেব বলছেন,—শলাকা দিয়ে নল পরিষ্কার করে দাও। শলাকা ব্যবহারের পর গুক্রাচার্য্য কাণা হয়ে কমণ্ডলুর নল থেকে বেরিয়ে এলেন। এখানে গুক্রাচার্য্যকে 'কাণা' বলছেন কেন ?—

'ঋতি-শ্রুতি উভে নেত্রে' শ্লোকে শ্রীবামনের দুটো নেত্র—ঋতি ও শ্রুতি। ঋতি হচ্ছেন মা। মা যেমন বাবার পরিচয় দেন—ঐ তোর বাবা, বাবাকে দেখে নাই ছেলে, কি বুঝবে বাবাকে, মা বলে দেন। তদ্রূপ ঋতি হল বেদমাতা, আর শ্রুতি বলে দেন—কি করে বাবার সেবা করতে হয়। ইনি (বামনদেব) যে ভগবান্ সেটা গুক্রাচার্য্য বলে দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর সেবা করতে দিচ্ছেন না। এইজন্য কাণা বললেন। বলিরাজ কিন্তু শুনলেন না, বললেন তোমার কথা আমি শুনব না, দান করবই। এই বলে গুরুকে পরিত্যাগ করলেন।

বামনদেব ছুপায়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল নিয়ে গেলেন। কোন্ গুরু আছেন, এখন যারা ভগবানের মূর্তি রাখেন না, নিজেরা ভগবান্ সেজে বসেছেন, সেই গুরু এখান থেকে পুরী মন্দির পর্যন্ত পা-টা বাড়িয়ে দিন দেখি। তাহলে আমি সব ছেড়ে দিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। শুধু তাই নয়, যখন বলি মহারাজকে বললেন আমার আর এক পায়ে দান দাও, আর এক পা তাঁর কোথায় তখন ? তিনি আর একটা পা বের করে দিলেন। কই কেমন গুরুদেব দেখি ত' তৃতীয় একটা পা বের করে দিন—যে নব গুরুরা আজকাল ভগবান্ সেজেছেন। ক্ষমতা আছে ? আমাদের সিদ্ধান্ত হল—গুরু ভগবান্, কিন্তু গুরু—সেবক-ভগবান্। সেবা বস্তুকে দিবার জন্য তিনি এসেছেন। গুরু ছাড়া কেউ ভগবান্কে দিতে পারেন না, কারও ক্ষমতা নাই। এইটাই হল বিচার ও সিদ্ধান্ত। এই বিচারটাই নিতে হবে আমাদের। (ক্রমশঃ)

জন্মান্তরবাদ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর]

পাশ্চাত্যধর্মের একজন্মবাদীরা বলেন,—“একজন্মবাদ স্বীকার না করিলে মানব ইহজন্মেই ভগবানের প্রতি অমুরক্ত হইবে না।” কিন্তু আমাদের প্রাচ্য ভূমিতে নাস্তিক চার্বাক ব্যতীত আর সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, এমনকি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়েও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের ‘পেসিমিজম’ (Pessimism) বা ‘নির্করণবাদধর্ম’ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ হইলেও জন্মান্তরবাদ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিজ্ঞমান। পাশ্চাত্যদেশীয় পেসিমিজম এবং ভারতীয় জৈন ও বৌদ্ধধর্ম— উভয়ই জড়নির্করণবাদ হইলেও পেসিমিজমকে একজন্মগত জড়নির্করণবাদ, আর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে বহুজন্মগত জড়নির্করণবাদ বলা যাইতে পারে। নপেনহ্যার, হার্টম্যান প্রভৃতি একজন্মগত জড়নির্করণবাদী। বৌদ্ধরা বলেন,—“বহু জন্মে দয়া-বৈরাগ্যাদি-গুণ অভ্যাস করিতে করিতে শাক্যদিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত ও অবশেষে বুদ্ধ হইয়াছিলেন।” জৈনগণ বলেন,—“সদৃশ-দয়া-বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিতে করিতে বহু জন্মে জীবের ক্রমগতি অল্পসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, পরব্রহ্মদেবত্ব, চক্রবর্তিত্ব ও অবশেষে পূর্ণ নির্করণ লাভ হয়।” বাহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে গোঁজামিল দিতে হয়।

খ্রীষ্টান ও মুসলমান—ধর্মের ঈশ্বর ও আল্লা নিষ্ঠুর ও কুবিচারক

খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম জন্মান্তর স্বীকার করেন না, কিন্তু স্বর্গাদি লোকান্তর স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন,—“পরমেশ্বর বিচার করিয়া জীবের সুকৃতি ও দুকৃতি অনুসারে দেহান্তে পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে ও পাপীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করেন। তবে এমন হইতে পারে যে, পাপ ও পুণ্যের ভারতম্যানুসারে যাহার পরিমাণ অল্প, অগ্রে সেই লোকে বাস করিয়া পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে যাইবে।” ইহাতে ঈশ্বর বা আল্লা প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও অবিচার আরোপ করা হয়। কেননা, পরিমিত কাল, কোটী কোটী যুগ হইলেও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। অনন্ত-কালের তুলনায় জীবের জীবনকাল কতটুকু? বাহাকে ‘দয়ার সাগর’ বলি,

তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকাল স্থায়ী দণ্ডবিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে ? এ যেন “স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানের বুকের রক্ত পান করিতেছেন”—এইরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে—পরমেশ্বর নিষ্ঠুর নহেন, তিনি অত্যন্ত দয়াময়।

খ্রীষ্টানধর্মের প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক সাদার্নের প্রশ্নের উত্তরে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ যাহা বলিয়াছিলেন (খ্রীষ্টসরস্বতী-সংলাপ-গ্রন্থে লিখিত) তাহা নিম্নে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইতেছে,—

“গীতাশাস্ত্র বৈষ্ণব-দর্শন হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মান্তরবাদের মথার্থ তাৎপর্যের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলে লোকে পর পর জন্মের অস্তিত্বের আশায় বর্তমান জন্মে পাপপ্রবৃত্তির সন্মোচ করিবে না অর্থাৎ বর্তমান জন্মে যথেষ্ট পাপাচরণ করা যাউক, পরবর্ত্তী জন্মসমূহে সেই সকল অল্পবিধা ও শাস্তার পূরণ করিয়া লইতে পারিব,— এইরূপ বিচার গৃহীত হইয়া যে খ্রীষ্টীয় ধর্মে জন্মান্তর অস্বীকার করা হয়, তাহা ভাগবতের “এই মানবজন্মেই জীবন থাকিতে থাকিতে ঐকান্তিকভাবে ভগবদলুপ্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা”র উপদেশের দ্বারা আরও পরিপূর্ণতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীতে সার্থকতা মণ্ডিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করার যে, জড় সর্বদৈববাদরূপ সর্বপ্রাণী বিপদ মুখব্যাধান করিয়া রহিয়াছে, তাহা ভাগবতের বিচার অবলম্বন না করিলে কখনও অতিক্রম করা যায় না। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের অনেকে জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিলেও, মনীষিগণ খ্রীষ্টধর্ম জগতেই জন্মান্তরবাদ স্বীকারের বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ‘বাইবেল’ ধর্মগ্রন্থের সেন্ট জনের স্থলমাচারে উক্ত হইয়াছে,—

“And as Jesus passed by, he saw man who was blind from his birth. And his disciples asked him saying,—“Master, who did sin? This man or his parents? That he was born blind.” (St. John 9, 1-2) অর্থাৎ “যখন যীশুখ্রীষ্ট চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একটা জন্মান্ন মানুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“প্রভো, কে পাপ করিয়াছে? এ ব্যক্তি, না—ইহার মাতা-পিতা? যাহার ফলে এ ব্যক্তি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।”

খ্রীষ্টীয় উপদেশকগণ যাহারা 'Christian father' আখ্যায় অভিহিত হইতেন, তাঁহারাও স্পষ্টভাবে জন্মান্তরবাদের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। Origen বলিয়াছেন,—“Is it not more in conformity with reason that every soul for certain mysterious reasons is introduced into a body and introduced according to its deserts former actions?” (Origen Contra Celsa, I, XXXII).

“I am sure that I, such as you, see me here, have lived a thousand times and I have to come again another thousand times.”—Goethe

অর্থাৎ—“প্রত্যেক আত্মা যে প্রাক্তন কর্মবশে এবং নিজ উপযুক্ততা-অনুসারে কোন রহস্যময় কারণাধীনতায় শরীর বিশেষে প্রবিষ্ট হয়, একথা কি বিবেক অধিকতর দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে না? আপনারা আমাকে দেখিতেছেন; কিন্তু আমি নিঃসন্দ্বিগ্নচিত্তে বলিতেছি যে, এই আমারই সহস্র জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে আরও সহস্রবার আসিতে হইবে।”

গ্রীকগণ যাহাকে 'Metempsychosis' বলিলেন বা ইংরেজী ভাষায় যাহাকে 'Transmigration' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়, সেই জন্মান্তরবাদ এককালে প্রাচীন গ্রীস, মিশর ও পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্থানেই নানাধিক স্বীকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের প্রচারকগণ জন্মান্তরবাদের সহিত তাঁহাদের অনেক পূর্বাপর সিদ্ধান্তের সমাজস্ব রক্ষা করিতে না পারায় জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি খৃষ্টধর্মের কোন যুক্তিবাদী কোন স্মৃতিদ্বারা জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু অনেকে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। হেরোডোটস্, পিণ্ডার, প্রেটো প্রভৃতি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক চাম্বলি তাঁহার “Evolution and Ethics”-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity like the doctrine of evolution itself that of transmigration has its root in the world of reality and it may claim such support as the great argument of 'Analogy' is capable of supplying”.

অর্থাৎ “চঞ্চল অব্যবহিকগণ ব্যতীত অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা জন্মান্তরবাদেরও বাস্তব জগতে দৃঢ় মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ইহা উপমান-প্রমাণের দৃঢ় যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে।”

অধ্যাপক লুটোলস্কি (Lutolawski), গেটে (Goethe) প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লুটোলস্কি বলিয়াছেন,—
 “I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth and that I have the certainty to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved generally having experienced all conditions of human condition.”—“আমার জন্মের পূর্বে এই পৃথিবীতে আমার পূর্ব অস্তিত্ব ছিল এবং আমাকে যে শিষ্টাচারে মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং যে পর্যন্ত নিখিল মানবীয় অভিজ্ঞতা আমার দ্বারা পরিপকভাবে সংগৃহীত না হইবে এবং সেই সকল অভিজ্ঞতায় বহুবার পুরুষ, স্ত্রী, ধনী, দরিদ্র, মুক্ত, বন্ধুগণ সর্ববিধ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবীয় সমগ্র জ্ঞাতব্য আমার দ্বারা সঞ্চিত না হইবে, সেই পর্যন্ত আমার জন্মের বিরাম হইবে না—এই সুসঙ্গত বিশ্বাস আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।”

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদিগণের এইরূপ জন্মবাদ বা Franciscus Mercurious Helmut (1618-1699) Leichtenburg (1742-1799) Lessing (1780) Herder (1791) Schopenhauer (1760-1788) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের জন্মান্তরবাদ কিংবা পারস্তদেশের আলালুদ্দিন রুমী নামক সুফী সম্প্রদায়ের লেখক, কিংবা থিয়সফি সম্প্রদায়ের জন্মান্তরবাদ বা ভারতীয় দ্বায় দর্শনের “প্রেত্যাভ্যাসকৃত্যং স্তম্ভাতিলাষাং” হ্রাসহ্রাসী জন্মান্তরবাদ কিংবা বৌদ্ধগণের জড়নির্কাণবাদে বহু জন্মান্তরবাদ নানা প্রকার বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বারা আক্রমণযোগ্য এবং অধিবোধবাদ জাত হওয়ায় অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ।

ত্রিহরিভজমই—জন্মান্তরের হস্ত হইতে পরিত্রাণের

একমাত্র উপায়-স্বরূপ

মনোতন শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত জন্মান্তর নিরোধের স্বসামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়

নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। জীব নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীতে তাঁহার আনা-মাওয়ার বেশ থামিয়া যায় না। ‘কৃষ্ণের নিত্যদান’ জীব কৃষ্ণ-বহিষ্কৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছা করিলেই মায়াপিশাচী তাঁহাকে জন্মান্তরের কাদে ফেলিয়া ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে। জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লিঙ্গদেহে আশ্রিত হন। জীব লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন এবং চৌদ্দ ভুবনে ঘুরপাক খাইতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ-বহিষ্কৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

পিশাচী পাইলে ঘেন্না মতিচ্ছন্ন হয়।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

‘আমি নিত্য কৃষ্ণদাস’—এই কথা ভুলে

মায়ার নক্ষর হইগা চিরদিন বুলে ॥

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।

কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।

কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দান, প্রভু ॥ (প্রেমবিবর্ত)

রোগের কারণ জানিয়া সূচিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করিলে মেরুপ রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দাণু-গুরু ভবরোগাক্রান্ত জীবকে ভবরোগনাশক ত্রিহরিনামামৃত পান করাইয়া জন্মান্তরের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-দার্শনিক শিরোমণি শ্রীল জীব গোস্বামীর লেখনীর দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভগবৎসেবায় দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই জীবের সমস্ত পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হয়; ইহজন্মেই শৌক, সাবিত্রা ও ঐ দৈক্ষ্য—এই ত্রিজনান্তর লাভ করিয়া জীব কর্মমাগী জন্মান্তরবাদের বিভীষিকা হইতে অনায়াসে উদ্ধীর্ণ হন। ভগবৎসেবায় দীক্ষিত ব্যক্তির কর্মমাগী জন্মান্তরবাদিগণের দ্বারা জন্মান্তরাপেক্ষা থাকে না, ইহজন্মেই তাঁহাদের ভগবৎ-সেবায় জন্মলাভ হয়, সেই জন্ম অস্ত্র কোন জন্মান্তর-পরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে না। বৈষ্ণবদর্শনে এইরূপ জন্মান্তরবাদের সূচী মীমাংসা আছে।”

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের চরম প্রয়োজন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের “সনাতন শিক্ষার” নিম্নোক্ত বাক্যগুলি অল্পকণ স্বরণপূর্বক জীব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভয়-পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবেন।—

ব্রহ্মাণ্ড স্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলাভ-বীজ ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৩/১৫১)

—শ্রীবলভজ্ঞ দাস ব্রহ্মচারী

নর-তনু ভজনের মূল

এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহধারী জীবগণ সন্ত, রাজঃ ও তমোবহুল স্ব-স্ব কৃতকর্মফলে যথাক্রমে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি বিবিধ গতিলাভ করিয়া থাকেন ; আবার স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভও ঘটে। নিখিল জগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়ন্তীতার ১৮/৪৫, ৪৬ শ্লোকে জানাইয়াছেন—“মানব নিজ-নিজ-কর্ম্মাক্ষতানে নিরত হইয়া যে-প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা অ্রবণ কর। যিনি ব্যাধি ও সমষ্টিক্রমে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার আরাধনা করিলে মানব অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করে। ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—নিখিল শ্রুতি-বেদ-বেদান্তাদির ইহাই নির্দিষ্ট পন্থা।”

জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত স্মৃতিফলে জীবের যে-কালে ভগবদ্ভক্তের প্রকট সঙ্গলাভ হয়, তৎকালে বিভিন্ন ধোনিতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদির মূল যে অবিচ্ছিন্নগ্রন্থি তাহা ছিন্ন হয় এবং তৎফলে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। এ জন্ম দেবতাবৃন্দও এই পুণ্যক্ষেত্রে ভারত-ভূমিতে ভগবদ্ভক্তনোপযোগী মানব-জন্মের প্রশংসাপূর্বক উহা কামনা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ভারতবর্ষে ভক্তনোপযোগী মানব-দেহলাভ-প্রাপ্তসা

“অহো! এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্কাই না করিয়াছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইনেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্য-জন্মলাভের জন্ম আমরা বাদনামাত্রই করিয়া থাকি, ইহারা সেই ভারতাদর্শে মুকুন্দ-দেবনোপযোগী মানব-ধোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ছকর যজ্ঞ, তপস্কা, ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে আর কি ফললাভ হইল? স্বর্গে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-স্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় বিষয়ভোগ-হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়; বিপরীতকাল আয়ুমান্ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অন্মায়ু হইয়া ভারত-ভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ; কেননা, ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্তন ঘটে। মর্ত্যবাদিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনসি মানবগণ সেই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের কৃতকর্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিয়া শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না। যে-স্থানে ভগবৎ-কথাকথ শুধাসরিং প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী-নদী-তটাস্থিত ভক্ত-ভাগবতগণের সমিষ্টান নাই, যে-স্থানে নৃত্য-গীত-বাছাদি মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সঙ্কীর্্তন-যজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও অমোদাশয় সেই স্থান কখনও আশ্রয় করেন না।—

‘যেখানে তোমার নাই যশের প্রচার।

যথা নাই বৈষ্ণবগণের অবতার।

যেখানে তোমার মহামহোৎসব নাই।

ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই।

গর্ভবাদ-ছুংখ, প্রভু, এহো মোর ভাল।

যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল।

তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।

হেন রূপা কর, প্রভু, না ফেলিবা তথা।’

এই ভারতবর্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং সম্পৎপরিপূর্ণ ভক্তনোপযোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী জ্ঞান-কর্মাদির কথায় পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্ববান্ না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধনদশা

প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পাশবক পক্ষিগণ যেমন কোনপ্রকারে ব্যাধ-কর্তৃক একবার পাশমুক্ত হইয়াও তাহাদের নিজকৃত অনবধানতাদোষে সেই বৃক্ষে বিহার করিতে যাইয়া আবার বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ সকল ব্যক্তি ভারত-ভূমিতে ভগবন্তুক্তি-লক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্য-জন্মলাভ করিয়াও নিজ নিজ কর্মদোষে পুনর্ব্যার বন্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

ভগবন্ত্বিত্তিবুদ্ধিতে বিশ্বরূপোপাসকগণও ধন্য; কেননা স্ব-স্ব অধিকার অনুসারে তাহারা ইচ্ছাদি বিভিন্ন নামে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ তত্ত্বদেবতার উদ্দেশ্যে প্রত্যাগত বিধি-মন্ত্রাদির দ্বারা যে-সকল হবিঃ পরিত্যাগ করেন, সর্বাদী ভগবান্ শ্রীহরি পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণ-ইচ্ছাদি নামে গ্রহীত হইয়াও কৃপাপূর্বক সেই সকল দ্রব্য হর্বসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি চতুर्वিধ পুরুষার্থ-প্রদানে সমর্থ ও স্বয়ং পরিপূর্ণরূপ ভগবান্ হইয়াও তাহা উপেক্ষা করেন না। সামান্ত কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তও যদি কেহ কৃষ্ণভজনে আগ্রহবান্ হয়, তাহা হইলেও তদন্তঃ-সদৃশকালে তাহার পূর্বোদিত্ত বাসনা দূরীভূত হয়। অজ্ঞ মনুষ্য ভক্তগণ ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাহাদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু কামনা-উদয়কারী অর্থ তাহাদিগকে কখনও দেন না। তাহারা ইতর কামনাবিনামী তাহার পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহার ভজনা করেন, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং স্বীয় পাদপদ্ম দিয়া থাকেন।—

“অন্যকারী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিলে কৃষ্ণ তাহে দেন স্বচরণ ॥

কৃষ্ণ কহে,—‘আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।

অমৃত ছাড়ি’ বিষ মাগে,—এ বড় মূর্থ ॥

আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খ’ বিষয় কেনে দিব।

স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ডুলাইব ॥’

‘কাম লাগি’ কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।

কাম ছাড়ি’ দাস হৈতে হয় আঁতলাষে ॥”

অতএব আমরা সম্যক প্রকারে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও অগ্ন্যজ্ঞ সংকল্পানুষ্ঠান-জনিত পুণ্যফলে অধুনা যে স্বর্গস্থিতি উপভোগ করিতেছি, যদি সেই পুণ্যের (স্মৃতির) কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের হরি-স্মরণোপযোগী মানবজন্ম লাভ হউক—ইহাই প্রার্থনা; কারণ

ভগবান্ শ্রীহরি এই ভারতবর্ষে তত্ত্বজ্ঞপণের বিশেষভাবে কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন।”

এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে মানবজন্ম লাভ বিশেষ নৌভাগ্যের পরিচায়ক। তজ্জন্ম ইহা ‘সুহৃৎ’ ও ‘পরমার্থদ’ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আত্যন্তিক মঙ্গলের নিমিত্ত আনুত্যা চেষ্টা ও যত্নই ইহার একমাত্র মঙ্গলতা—

এতাবজ্জন্ম-সাকল্যং দেহিনামিহ দেহিবু।

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ (ভাঃ ১০।২২।২৪)

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।

কর্ষণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ (বিঃ ৩।১২।৪২)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা জীবের ভগবৎস্বমুখ্য অপনোদনপূর্ব্বক অনুযায়ী চরণরূপ নিত্যদয়া প্রদর্শনই দেহদারী জীবগণের জন্মসাকল্য। কায়-মন-বাক্যের দ্বারা ইহ-পরকালে প্রাণিগণের নিমিত্ত ভগবদ্ভক্ত্যনুযায়ী স্বকৃতি উৎপাদন করাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের একমাত্র কর্তব্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, ভারতভূমিতে জন্মিয়া মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করাই, ‘অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানাইয়াছেন—‘ভারত ভূমিতে হৈল যদুধ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার।’ (১৫: ৫: অঃ ৯।৪১)

পবিত্র ভারতবর্ষে নবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভজনবিহীন মানব জীবন ত ও আত্মস্বাতী

মহুয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটির যে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞানার নিত্য কল্যাণকে শ্রেয়ঃ এবং আপাত-মনোরম পরিণামে বিষবৎ বিষয়াদি সংগ্রহ-পিপাসাকেই প্রেয়ঃ বলা হয়। ধীর ব্যক্তি ধর্মপথেই সর্বদা বিচরণ করেন, আর বিবেকহীন মদবুদ্ধি অনিত্য বিষয় স্বেচ্ছাই মত্ত হইয়া থাকে। জন্ম লক্ষ জন্মের পর এই মহুয়া জন্ম লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা দুঃখ-ভ—সুহৃৎ-ভ ; অনিত্য নশ্বর হইলেও ইহা ভগবদ্ভক্তনোপযোগী পরমার্থপ্রদ স্বদূত নৌকাস্বরূপ। সদগুরু-কর্ণধার লাভ করিয়াও যে মানব এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি ‘আত্মস্বাতী’ শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবাই আত্মার নিত্য বৃত্তি ; সেই স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় নিত্যবৃত্তিকে স্তব্ধীভূত

করাই আত্মহত্যা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবৃত্তিই সেই আত্মহত্যা হইতে জীবকে নিবৃত্তি করিয়া চেতনরাজ্যে স্থাপনপূর্বক পরমশাস্তি দান করিতে সমর্থ। ফলভোগী ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী কৰ্ম-জ্ঞানাদি কথায় আবদ্ধ হইয়া ভক্তির পরমশোভা দর্শনে অসমর্থ।

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে তজ্জ্ঞান কোনস্থলে প্রবৃত্তিমাৰ্গের উপদেশ লক্ষ্য করা যায় না। সন্দেহে ভব-রোগীর নিমিত্ত কখনই কুপথ্য ব্যবস্থা করেন না। ইহসংসারে মানবগণের কৰ্মাদি ধর্মোদ্দেশ্যে—শ্রীরির প্রীতির নিমিত্ত—কৃষ্ণার্থে অখিলভোগ-ভ্যাগ উদ্দেশ্যে কৃত না হইলে তাহাদের প্রাণধারণ বুঝা অর্থাৎ শাস্ত্র তাহাদিগকে ‘জীবন্ত’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিষয়ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণই জীবের প্রাণধারণের একমাত্র লক্ষ্য নহে; ভগবৎ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মূখ্য প্রয়োজন হওয়া উচিত; নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মাক্ষণের দ্বারাও সেই তত্ত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। স্বভাবতঃ কৰ্ম্মজড়গণ বিবিধ কৰ্ম্মাক্ষণের আবাহনপূর্বক নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেও, বস্তুতঃ কৰ্ম্মাগ্রহিতা ভগবদ্ভদ্রে প্রদর্শিত না হওয়ায় উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে—উহাই বন্ধনের কারণ হয়। জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ; ভক্তগণ কখনই উহাতে বুঝা কালক্ষেপ করেন না। গৃহমেবিগণ তুচ্ছ সংসারস্থখে মগ্ন হইয়া তাহাতে কখনই পরিতুষ্ট হয় না, তথাপি উহাই তাহাদের একমাত্র কাম্য। একাদশে-শ্রদ্ধি সব সময়ে ভোগোন্মুখী জীবকে বিষয়ভোগে আকর্ষণ করিয়া বিব্রত করিতেছে। মানবের তাহা হইতে উদ্ধারের কোনরূপ চেষ্টা-যত্ন বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, বরং সে অধিকতর উৎসাহের সহিত উহাতেই রুচিবিশিষ্ট। এ দুর্ভাগ্য মানব-জন্ম বা নর-তত্ত্বদ্বারা দর্শিত্রিয়ে শ্রীভগবানের সেবা বা তন্মাত্র-রূপ-গুণাদি কীৰ্ত্তনই হইবার সার্থকতা। যদি ভগবদ্ভজন বা হরিসেবা না হয়, তবে এ শরীর ধারণ বুঝা; ইহাকে ভারবাহী বলীবর্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুবিষয়-দর্শন ও তাহাদের সেবা ব্যতীত মানব-দেহ শব্দতুল্য। ভগবানের অভয় শ্রীপাদপদ্মে শরণ না লওয়া পর্য্যন্ত মানব দেহমনোদর্শে আসক্ত হইয়া ভয়-শোকাদিতে অভিভূত হয়। এই জড়াসত্তিই বা পক্ষান্তরে ভগবৎ-বিশ্বত্বেই তাহার সংসার দশার মূল কারণ।—

“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহিঃসুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥”

পরমপিতা শ্রীভগবানের সেবাই জীবস্বরূপের ধর্ম। “অমৃতের দস্তান” জীবগণের শ্রীকৃষ্ণভজন ও তাহাতে ভক্তিবিধানই শ্রেষ্ঠ কৃত্যরূপে নিরূপিত

হইয়াছে। প্রাকৃত জগতের মাতাপিতার সেবায় অনিত্য পিতৃলোকাদি, দেবতাদির আরাধনায় নম্বর দেবলোক ইত্যাদিই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ভগবদ্-যাজ্ঞিগণ নিত্য শাস্ত হ্রাসে অধিষ্ঠিত পরাংপর তত্ত্বকে লাভ করিয়া ধন্য হন।—

“জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥

সকল জন্মে পিতামাতা নবে পায়।

কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায় ॥”

“চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম করিতে তারা রোরবে পড়ি’ মজে ॥”

এ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনা মনুষ্যের জীবন এবং সেবা-বঞ্চিত-অবস্থাও নিরয়প্রাপিকা। তজ্জন্ত বৈষ্ণব-মহাজন “মনঃশিক্ষা” পদাবলীতে মানবদেহধারী জীবগণের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।—

“এ মন ! আর কি মানুষ্য হবে ?

ভারত-ভূমেতে, জনম লভিয়ে, কি কাজ করিলি কবে ॥

এ মন ! কি লাগি আইলি ভবে।

এমন জনমে, ‘হরি’ না ভজিলি, সে তুই মানুষ্য কবে ॥

মানুষ-আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।

নহিলে বদনে, কেন না বলহ, ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দ’ নাম ॥

পাখীয়ে যে নাম, লগয়াইলে লয়, শারী-শুক আদি কত।

তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত ॥

দিবস-রজনী, আবোল-তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।

তাহার ভিতরে, কখন কেন কি, ‘গোবিন্দ’ বলিতে নার ॥

ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি স্থখ পাইয়ে।

বুঝিহু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি থাইয়ে ॥

বদন ভরিয়া, ‘হরি’ বল যদি, ক্ষতি না হইবে তাহ।

কহে ‘প্রেমানন্দ’, তবে যে নিজান্ত, এড়াবে কৃতান্ত দায় ॥

—ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমন্তজ্ঞানবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৭ পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্র কাকে বলেছেন ?—Constitution । ভারতবাসী জাতির, ভারতবর্ষে বাস করি, Indian Constitution যেনে নিয়েছি । কেন ?—আইনের সুযোগ-সুবিধাগুলো পাব বলে । শাস্ত্র হচ্ছেন—Spiritual Constitution । আমার আত্মসমর্পণের যে প্রাণেটা, সেটা যদি আমি চাই তাহলে আমাকে শাস্ত্র মানতে হচ্ছে । যেমন সন্তানের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য পিতামাতা, Guardian কে মেনে নিতে হয় তদ্রূপ । অস্বীকার করার উপায় নাই । যিনি Constitution করেছেন প্রজ্ঞাশাসনের জন্য, আইন-কাছন, নীতি-আদর্শ সব সংরক্ষণ করেছেন, তাঁকেও মেনে নিতে হচ্ছে আমাদের । যদি কেহ বলেন—তিনি কিছু নন, তাহলে কোথা থেকে হল ওটা ? যিনি মূল নীতি-আদর্শের ধারক-বাহক তাঁকে বলা হয়েছে ভগবান্ । তাঁকে মেনে নিতে হচ্ছে । তাঁকে বলছে নীতি-হীন, দুর্নীতিপরায়ণ । মুসলিম ভ' সেখানে । পুত্র-কন্যা-সন্তান যদি পিতা-মাতাকে বলে আমার পিতামাতা দুর্নীতিপরায়ণ, তাহলে দুর্নীতিপরায়ণ পিতা-মাতার সন্তান দুর্নীতিপরায়ণ কি করে হতে পারে ? যুক্তি দিয়ে অপমানা বিচার করবেন । শাস্ত্রযুক্তিতে এইরূপ উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে ।

আমি যদি আমার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে চাই, ভালমাহুষ হতে চাই, আমার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাই, তাহলে আমার উপরওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে । আমি তাঁদের অস্বীকার করতে পারি না । যথাযথানে সম্মান আরোপ করতে হবে । ইহাই ত' শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা । গুরুমুখী বিজ্ঞা যিনি অর্জন করেছেন, তার কোন অসুবিধা নাই, কোন ভুল বুঝাবুঝি—Misunderstanding হতে পারে না । যেহেতু তত্ত্বদর্শন তার জানা আছে । ভাল-মন্দ দুটো দিক্ তিনি জেনে নিয়েছেন । তত্ত্বদর্শনের ভাল-মন্দ জানা না থাকলে যে কোন মুহূর্ত্তে ভুল হতে পারে । যে কোন মুহূর্ত্তে আমি সংকে অসং, অসংকে সং বলতে পারি । এ দুটোই ত' ভুল । সংকে সং, অসংকে অসং ; চোরকে চোর, সাধুকে সাধু বলাটাই সত্যদর্শন । চোরকে সাধু বলা আর সাধুকে চোর বলা সাংঘাতিক বা সমদর্শন নয় । একে সত্যদর্শন বলা হয় নাই শাস্ত্রে । সমদর্শনের কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে ।—

বিজ্ঞা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

স্তনিষ্ঠৈব খপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ ॥

সমদর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে শাস্ত্রে। কাকে লক্ষ্য করেছেন?—আজ্ঞ-দর্শনকে। ভগবান্ প্রতি জীবাশ্মা, প্রতি শরীরে অবস্থিত—এটা হল সত্য-দর্শন। এই দর্শনের নাম হল সমদর্শন। এখানে অল্প কোন দর্শনের কথা চিন্তা করা হয় নাই। মূল-মালিক যিনি তিনি যদি ভূনীতিপরায়ণ হন, তাহলে জিনিসটা আসবে কোথা থেকে?

একজন মাষ্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—তিনি বললেন আমি ভগবান্ মানি না। তাহলে কি মানেন আপনি?—আমি নীতি-আদর্শ মানি। আপনার নীতি-আদর্শ কাকে আশ্রয় করে? এ প্রশ্নের জবাব নাই। নীতি-আদর্শের মূল্যায়ণ যে করছেন আপনি, সেই নীতি-আদর্শ পাচ্ছেন কোথা থেকে? নীতি-আদর্শের Generation কে? নীতি-আদর্শ এস কোথা থেকে? ভাল-মন্দের বিচার পাচ্ছেন কোথা থেকে? ভগবানের আজ্ঞা পালন করলেন অজ্ঞান। তিনি তত্ত্ব—সখ্যাতাব লাভ করলেন। আর ভগবদাজ্ঞা পালন না করে উপেক্ষা করে একজনকে নরক দর্শন করতে হল। বিচারের কথা এগুলো। সনাতন শাস্ত্রের Theory এগুলো। আইন যেমন আছে তেমন প্রত্যেকটা আইনের Exception—ব্যতিক্রমও আছে। কেন?—Exception proves the rule। দুটো পাশাপাশি আছে। আইন যেমন মানতে হচ্ছে তেমন আইনের পাশাপাশি ব্যতিক্রমও মানতে হচ্ছে। এটা ঋষিগণের ও ভগবানের শিক্ষা।

আইন একটা প্রথমে বলা হয়েছে। সেই আইনের ব্যাখ্যা (A), (B), (C), (D) ধারা-উপধারা করে চলল। শেষের দিকে যে ব্যাখ্যা এল দেখা গেল সেটা মূল আইন থেকে সরে গেছে। তথাপি ঐ ধারা-উপধারাগুলি মূল আইনের অন্তর্গত ও সমদর্শী। শাস্ত্রে কিন্তু সব জিনিসটাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। নীতি-আদর্শ ভগবানকে কেন্দ্র করে। আর তাঁকে যদি বাদ দিয়েছি তাহলে নীতি-আদর্শ শিখে কি লাভ? সে নীতি-আদর্শ কাকে লক্ষ্য করে? কোথায় দাঁড়াবে সে? সেইজন্য কথাটা হচ্ছে—ভগবান্ নীতি-আদর্শের ধারক। তাঁর জন্য সব কিছু, তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই সব কিছু প্রচেষ্টা আমাদের। সেইজন্যই কর্ম। সংসারে কর্ম করবে কি জন্য? গীতার কৃষ্ণ অজ্ঞানকে বলছেন,—

যজ্ঞার্থং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদৰ্থং কৰ্ম কোন্তেয় মুক্তদহঃ সমাচর ॥

“যজ্ঞার্থং কৰ্মণঃ, যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ,—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতেঃ।” বিষ্ণু

ভগবানকে কেন্দ্র করে তুমি সংসারে কর্ম আচরণ কর। তবে তোমার মুক্তি। যদি সে উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তোমার কর্মবন্ধন অবশ্যজ্ঞাবী। দুটো পোকামাকড়কে দিয়ে উদাহরণ দিলেন, যারা গৃহস্থের ঘরে থাকে, প্রায় দেখা যায়। একটা হল মাকড়সা। ঘরের কোণের দিকে জাল তৈরী করে নিজের থুথু দিয়ে। তাতে সে বদ্ধ হয় না, অল্প পোকামাকড়গুলো ধরা পড়ে। এই মাকড়সা জাতীয় ব্যক্তি ধারা এ সংসারে আছেন, তাঁরা হলেন মুক্তজীব, মুক্তপুরুষ। সংসারের কালিমা তাঁদের স্পর্শ করে না, সংসারের বিষয়-বাসনা তাঁদের আক্রমণ করে না।

আর একটা হল গুটীপোকা। সে তার লাল দিয়ে স্নতো বের করে গুটী তৈরী করে, গুটীর মধ্যেই বদ্ধ হয়। শেষকালে তাকে সিদ্ধ করে মারা হয়। অতএব এক কর্মের দ্বারা মুক্তি, আর এক কর্মের দ্বারা বদ্ধদশা লাভ। স্নতরাং কর্মের যে গহণা গতি সেটা জেনে নিতে হবে। কর্মপ্রগতিটা কি? কোন্ কর্ম করব?—“কর্মাণ্যেকং তস্মৈ দেবস্মৈ দেবা।” সেই পরমদেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম আচরণ, সেটা বাস্তব কর্ম, আর সবই অকর্ম-বিকর্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। বেদের মধ্যে সেই কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন।

পরোক্ষবাদো বেদোহং বালানামহুশাসনম্।

কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধন্তে জগদং ঘণা।

বাচ্চা শিশু সব, তেতো ওষুধ গিলবে না। দুই, শয়তানের দল সব। আমরা সবদময় চাচ্ছি ফল। কি ফল পাব? ফলটা আগে বল। শাস্ত্র সেইজন্য কিছু প্রলোভন দেখিয়ে রেখেছেন—এটা করলে এই হবে, ওটা করলে ওই হবে। আমি যদি সেটা অভ্যাস করি তাহলে অভ্যাসযোগের দ্বারা কিছু লাভ সম্ভব। কিন্তু সে অভ্যাস ত' করতে চাচ্ছি না। সেটুকু ক্লেশস্বীকার পরিশ্রম আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে বস্তু লাভ করব কি করে? ‘কষ্ট করলে কেউ পায়’—কথাটা আছে। কিন্তু কষ্ট করতে চাচ্ছি না, কেউ পাব কি করে? গোড়া কেটে দিচ্ছি আগে, প্রচেষ্টা নাই। অন্যায়সে কিছু করতে চাচ্ছি, বিনা পরিশ্রমে কিছু পেতে চাচ্ছি। কি করে হবে? শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখছি,—ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক-ধারণা থাকা চাই। কে ভগবান, আর কে জীবাত্মা? এই জগৎ কি? ভগবানের সঙ্গে আমার কোনদিন সম্পর্ক ছিল কি? যদি ছিল সেই সম্পর্ক Cut off হয়েছে কেন? বা এখন কোন উপায় আছে কি না পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার?—এইসব প্রশ্নগুলো হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। আচার্য্য শঙ্করপাদ সেই

তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা বলে গেছেন—“কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে! কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে?” চিন্তা কর তুমি। আমরা যে কর্ম্মাচরণ করছি এখানে সে কর্ম্মের ফলটা কি? সে কর্ম্ম কোথায় আমার পৌঁছে দেবে? আমার জমার ঘর কিছু আছে কি না? Fixed Deposit কিছু হচ্ছে কি না? না সবটাই খরচের খাতায়, করছি কি আমি? সময়টার সদ্যবহার করছি, না অসদ্যবহার করছি। সূর্য্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছেন। আমার যে সীমিত পরিমিত পরমায়ু তার একটা একটা দিন চলে যাচ্ছে। সূর্য্যদেব জানিয়ে দিচ্ছেন তোমার গোণা দিন একটা নিয়ে মিলায়। চিন্তার কথা ত’! সময়ের সদ্যবহার বলছি ত’ আমরা, কিন্তু সময়ের সদ্যবহারটা কিভাবে হবে? ‘Time and tide wait for none’ কথাটা সকলের মুখস্থ আছে, কিন্তু সময় ত’ কারও জ্ঞান অপেক্ষা করছে না। অপেক্ষা করে তারই জ্ঞান যিনি সময়ের সদ্যবহার করেন। তার জ্ঞান নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে। ভগবানকে জানতে গেলে, ভগবানকে ভালবাসতে গেলে, ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখতে গেলে ভাল-মন্দের বিচার দুটো পাশাপাশি রেখে আমাদের বিচার করতে হবে। শাস্ত্র সে বিচারটা দিয়ে রেখেছেন আমাদের কাছে। শাস্ত্র আলোচনা মানে Comperative study। পাশাপাশি রেখে বিচার করা হয়েছে এবং সেই বিচারটা আমাদের ভালভাবে পরখ করতে হবে। শাস্ত্র মানে হল সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য। আজকাল অনেকে বলছেন, শাস্ত্র হল—কতকগুলো মেয়েলি গল্প। বাস্তবিক তা নয়। এটা Eshop’s Fabels বা Arabian Knights এর গল্প নয়। ঋষিগণের কথার মধ্যেই রয়েছে,—

কেবল শাস্ত্রমাস্ত্রিত্য ন কর্তব্যোবিনির্গমঃ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

হে জীবগণ! হে মহুগুণগোষ্ঠী! তোমরা কখনও সেই বাক্যকে গ্রহণ করবে না, সেই বাক্যকে কখনও মানবে না—যে বাক্যের পিছনে সদুযুক্তি নাই। সুতরাং বিচারক্ষেত্র কোনটা আমি সেই Point আলোচনা করবার জন্য একটা বিশেষ অধ্যায় ধরেছি—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৮২তম অধ্যায়।

শ্রীশুক উবাচ,—শ্রীশুকদেব এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করে যাচ্ছেন রাজা পরীক্ষিতের কাছে। পরীক্ষিত রাজা বোকা ছিলেন না। রাজ্যশাসন করেছিলেন তিনি। ধার্মিক রাজা ছিলেন, অধার্মিক ছিলেন না। কিন্তু ব্রহ্মশাপ—সাতদিনের

মধ্যে তক্ষক সর্প দংশনে মৃত্যু হবে তাঁর। তাই মহারাজ পরীক্ষিত্ব বিচার বিবেচনা করে সকলের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে স্থির করেছেন যে জীবনের এই নাগাহকালে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করতে হবে। তাহলেই আমার সর্বার্থসিদ্ধি, জীবনের সুস্থতা বাস্তবে রূপায়িত হবে। সেই-ভাবে ভাগবতকথা, ভগবানের লীলাকথা শুনতে বসেছেন। শুকদেব বর্ণনা করছেন,—

একদা দ্বারবত্যাস্ত বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ ।

জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥

বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্য্যাপধ্যায় সঃ ।

ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ ॥

ব্রাহ্মণ পত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হল। ব্রাহ্মণ উক্ত মৃতপুত্রকে নিয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন এবং কাতর ও দুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন,—

ব্রহ্মবিষঃ শঠধিয়ো লুপ্তস্ত বিষয়াশ্রমঃ ।

কত্রবক্ষ্যোঃ কর্মদোষাং পঞ্চত্বং মে গতোহর্ভকঃ ॥

নালিশটা কি ?—ব্রাহ্মণ-ষেথী, কুটিলমতি, লোভী, বিষয়াসক্তচিত্ত রাজার পাপকর্মবশতঃই আমার এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নালিশ কিন্তু দিচ্ছেন রাজদ্বারে কক্ষের কাছে। কক্ষ তখন দ্বারকার রাজা ছিলেন। শুনলে মনে হয়, কক্ষেরই সমালোচনা করছেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু অধ্যায় শেষের দিকে যখন আলোচনা করব, তখন আপনারা দেখবেন ব্রাহ্মণ তত্ত্ববিৎ। তিনি জানেন নীতি-আদর্শের কথা। তিনি ভগবানের পরে দোষারোপ করছেন না। সাধারণভাবে যেটা বলা প্রয়োজন সেটা তুলে ধরছেন। ব্রাহ্মণবিষেথী কাকে বলে ? ব্রহ্মণ্যধর্ম কাকে বলা হয়েছে ?—হাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন তাঁদের বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ। সেইরূপ ব্যক্তিগণের মালিক হচ্ছেন ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ব্রাহ্মণ কে ?—‘ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ’। পরব্রহ্মের সম্বন্ধ যিনি পেয়েছেন, ভগবানকে যিনি জেনেছেন, বুঝেছেন, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। এটা সাধারণ কথা নয়। আমি ব্রাহ্মণ স্বরে জন্মগ্রহণ করেছি, সুতরাং আমি ব্রাহ্মণ, তা নয়। ব্রাহ্মণের যে ক্রিয়াকলাপ, আচার-অহুষ্ঠান আছে—শাস্ত্রে সত্য, শৌচ,

তপঃ ইত্যাদি যে বারোটি গুণ বর্ণিত আছে, সেইগুলি যিনি আচরণ করছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। তার প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান যদি কেউ না করছেন তাকে কি ব্রাহ্মণ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে?

মাতুরগ্ৰেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌজ্জিবন্ধনে।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং বিজন্তু শ্রুতি চোদনাং ॥

ব্রাহ্মণের তিনটে জন্ম। মাতৃকৃষ্ণি থেকে জন্ম সকলের সমান। দ্বিতীয় জন্ম হচ্ছে ব্রাহ্মণ যখন উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। ‘তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং’—তৃতীয় জন্ম হল যখন তিনি যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করছেন। যিনি ভগবৎতত্ত্ব তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। আর যিনি ভগবানকে ভালবাসেন না বা ভগবৎতত্ত্ব অবগত নহেন বা তাহা জানার কোন প্রচেষ্টা নাই, তাঁকে ত’ ব্রাহ্মণক্রম বলা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মবন্ধু। ‘গালাগালির শব্দ। ব্রাহ্মণাধম শব্দও প্রয়োগ করা হয়েছে শাস্ত্রে। তাহলে ব্রাহ্মণবিষেধী কে?—ভগবানকে যিনি ভালবাসেন না, ভগবদ্ভক্তকে যিনি ভালবাসেন না, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ-বিষেধী। যারা ভগবানের ভজন-সাধন করেন, ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করেন, ভগবৎতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। গুণগত বিচার।

স্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটে গুণ প্রাকৃত গুণ। দৈবীমায়ার দ্বারা রচিত এই তিন গুণ। ভগবানকে এই তিন গুণের মধ্যে নীষিত করা হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তাঁর একটা বিশেষণ আছে—ত্রিগুণাতীত, লোকাতীত, মায়াতীত। (ক্রমশঃ)

প্রাত্যহিক জীবন

আমরা অনেক সময়ে ধর্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটি শুনিতে পাই—“আমার কর্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে?” অর্থাৎ ধর্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম-জীবনযাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠান-বলীর একটি তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সক্ষম করেন। এরূপ সক্ষম উদ্ভব। কিন্তু এতৎপূর্বে একটি জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জ্ঞান ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে স্বয়ং হইবে সর্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই

চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন, পতিগৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার দ্বারা উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্যগুলি সম্বন্ধেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অচুষ্ঠানাবলী স্বথ-শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অচুষ্ঠানকারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও তজ্জন্ম নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্বোপায়ে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবানই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব আমাদেরিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে “সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা” বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই ‘দীক্ষা’ বা ‘দিব্যজ্ঞান’।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অহুকরণ মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধবিমুখিনী ব্যক্তিচারিণী বারবনিতার গৃহকার্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই উদ্দীষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত নাক্ষী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য-গুলির প্রত্যেকটাই পতির সুখায়েষণ-উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা অশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহ-পরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত ভক্তের দৈনন্দিন অচুষ্ঠান এবং বিষয়ী ও অভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—“বিষয়িণঃ প্রাতঃস্নানং মূত্রপূরীষোৎসর্গ-মুখ-প্রক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-অবণ-কথনাদি-ব্যাপায়াঃ বিষয়স্বথ-ভোগার্থমেব, কর্ম্মভিত্ত্য দেবপিতৃাদিপূজার্থমেব ক্রিয়ন্তে তথৈব ভগবত্ত্বজেন তে ভগবৎ-সেবার্থমেব কৰ্ত্তব্য ইতি তে তেহপি তেষাং ভক্ত্যদ্বানি ভবেয়ুরিতি।” অর্থাৎ যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপূরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, অবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়স্বথভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডের ব্যক্তিগণও দেবপিতৃাদি পূজার জন্যই তৎ তৎ কার্য করেন, ভগবত্ত্বজগণও তদ্রূপ সেই সেই কার্য, সেইরূপভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে “মূত্র-পূরীষোৎসর্গ হইতে অবণ-

কখনাদি" যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভজ্যদ্রুপেই পর্যাবসিত হয়। মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবন্তের বিষয়ী ও কর্মকাণ্ডের ব্যক্তির জ্ঞান যাবতীয় কার্যাই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্মীর বাহ্যাত্ম্যে কোনও পার্থক্য নাই; কেবলমাত্র অন্তরনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্যই ভগবানের প্রীতি ও সেবার উদ্দেশ্যে করেন; আর বিষয়ী ও কর্মকাণ্ডের ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তৎ তৎ কার্য করেন। যেমন, সাক্ষী-শ্রী কেশবিত্তাস, বেশ-বচনা, গৃহসংস্কার ও রত্নকর্ম প্রভৃতি যাবতীয় অত্মতত্ত্বের জন্যই করেন; আর নিজস্ব-তাৎপর্যপরা ব্যবহৃত্যও তৎ তৎ কার্যগুলিই নিজ অর্থাদি-স্বার্থেচ্ছাটিকতবশে করিয়া থাকে।

অতএব, আমাদের সর্বপ্রায়ে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যিক। সম্বন্ধের পরে 'অভিধেয়' অর্থাৎ "আমাদের যাঁহা কর্তব্য" তাহা নির্ণয় ও তদন্ত। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'অভিধেয়' নির্ণয় হয় না। আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে, এবং তথায় সন্মান করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই জানিতে হইবে। যখন ভাৰ্যা পতিগৃহের কার্যগুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাপণে করিতে থাকে; নানাপ্রকার অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক অগ্রাহ করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অত্মতত্ত্ব করিতে থাকে; তখনই বালিকার অভিভাবকগণ এবং অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাক্ষী পত্নী কি চান? তিনি কখনও অপরের প্রশংসাপ্রাপ্তির জন্য পতিসেবা করেন না। কিম্বা, পতিসেবার পরিবর্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়স্বার্থের উদ্দেশ্যে অনন্সার বা বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি চান পতির স্বার্থের জন্য পতির সেবা; পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির স্বার্থেই তাঁহার সুখ, নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু নহে।

“কৃষ্ণ-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,

পতি লাগি' কৈল বেশার সেবা।

সুস্তিল স্বর্ষের গতি,

জিয়াইল মৃত পতি,

ভুট কৈল মুখ্য তিন দেবা।” (চৈ: চ: অ: ২০।১৭)

সর্বতোভাবে নিজ স্বার্থ বর্জন করিয়া ভগবৎপ্রীতির অহুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সধ্বস্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তিদ্বৈতের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য সৎগুরুপদাশ্রয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“আদ্যো গুরুপদাশ্রয়ঃ”। ঋতি বলেন,—“ভগবৎস্বর বিজ্ঞানলাভ করিতে হইলে ‘সমিত্যপানি’ হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবন্তবৎ সৎগুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে” (মুক্তোপনিষৎ ১২।১২)। “আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষা ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন” (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩।১৪।২)। “যাহার ভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও একাধিকী ভক্তি, সেই মহাত্মাই ঋতির মধ্যস্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন” (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যে, কর্তব্যাকর্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সৎগুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি ঋতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, ক্লেশেকশরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সৎগুরু।

ভক্তিদ্বৈতের ব্যক্তিই পারমার্থিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমার্থিক গুরু-বরণ-কালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে” (ভক্তিদন্দ ২।১০)। বিষ্ণুস্মৃতি বলেন,—“শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই ‘গুরু’ পদবাচ্য নহেন।” “স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন” (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। “কেহ যদি এই সকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথা অনুসারে কোনও ‘সৎগুরুকেই ‘গুরু’ বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদটি-মস্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবেন” (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)। যাহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক নমস্কে মনে করেন, ‘অসৎগুরু’ ত্যাগ করিয়া সৎগুরু গ্রহণ করিলে গুরু-ত্যাগ-রূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাংখ্য শ্বতী-শাস্ত্র বলেন,—“এরূপ অসৎগুরু পরিত্যাগই বিধি” (ভক্তিদন্দ ২।১০ ও ২৩৮ সংখ্যা)। যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অজ্ঞায় কথা কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে অজ্ঞায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য

দ্বোর নরকে গমন করিয়া থাকেন” (হরিভক্তিবিলাস ১৬২) । পূর্বাচাৰ্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন । অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—“দুঃখ ঘেঁৰপই হউক না বা গুরু যাঁহাই থাকুন না কেন, বিষপ্ৰদ বিক্রেতা হইতে বা গুরুক্ৰব হইতে দুঃখ বা লব্ধ মন্ত্ৰ (?) ত’ আর কিছু খাৰাপ হয় নাই ? আর শিষ্ণের যদি ভক্তি (?) থাকে তাহা হইলে শিষ্ণের কর্তব্য বলে অসদগুরুও শিষ্ণের নিকট ‘সৎ’ বলিয়া প্রতিভাত হইবে !”— এই সকল কথা সমর্থন করিবার জন্তও বহু বহু মনঃকলিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু ঋতি-স্মৃতি-পুৰাণাদি শাস্ত্র এই সকল মনোদ্বৈত কথার সমর্থন করেন না । (ক্ৰমশঃ)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পদে প্রার্থনা

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন ।
 কালিন্দী-যমুনা জয় ধেনুবৎসগণ ॥
 শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন ।
 গিরিধারী, গোপীনাথ, মদনমোহন ॥
 কেশীঘাট, বংশীবট, ছাদশ-কানন ।
 ঘাঁহা ঘাঁহা লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥
 গোপ-গোপী আদি যত ব্রজবাসিগণ ।
 ভূমিতে পড়িয়া বন্দে । সবার চরণ ॥
 বেণু, বেক্স আদি যত নাগকন্ঠাগণ ।
 শ্রীদামাদি সখা যত ব্রজবাসিগণ ॥
 বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ ।
 উদ্ধবাহু করি’ বন্দে । সবার চরণ ॥
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদ করিয়া স্মরণ ।
 গোপী-পদরেণু মাগে দাস বৃন্দাবন ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব বন মল্লারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের

উত্তরবঙ্গ ও আসামে শ্রীহরিকথা প্রচার

গত ২২শে মার্চ, ১৯২০, ১৫ই চৈত্র ১৩২৬, বৃহস্পতিবার ত্রিগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীমন্তজিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীধাক্ষবিহারী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরবঙ্গ ও আসামে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে ভ্রমণাভ্যাস করেন। ৩০শে মার্চ শ্রীসমিতির কুচবিহার-সহরস্ব প্রচারকেন্দ্র শ্রীমরোত্তম গৌড়ীয় মঠে পৌছান। তথায় ভক্তবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বিপুল সন্মানে জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-গান্ধারিকা-গিরিধারীর আরাধিকান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমন্তাগবত একাদশ-স্কন্ধের ২য় অধ্যায় ৫৫তে নিম্ন-নবযোগেন্দ্র সংবাধের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পরদিন অর্থাৎ ৩১শে মার্চ প্রাতে যাত্রা করিয়া বাসযোগে ধুবড়ী জেলায় গোলকগঞ্জ শ্রীগোলকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। তথায় দিবসব্যয় অবস্থান করত শ্রীহরিকথা প্রচারপূর্বক ২/৪/২০ তাং এ ধুবড়ী সহরের শ্রীকিশোরী পালচৌধুরী মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করেন। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীমন্তজিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ মঙ্গল মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণও তথায় উপস্থিত হন। শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীকিশোরকৃষ্ণ প্রভুর গৃহে ২ দিন শ্রীমন্তাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৩/৪/২০ তাং এ ধুবড়ী নিবাসী শ্রীনিখিলচন্দ্র দাস মহোদয়ের গৃহে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্তাগবত পাঠ করেন। ৪/৪/২০ ও ৫/৪/২০ তাং এ স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিশেষ অহুর্বোধে ধুবড়ী শ্রীহরিসভায় ধর্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত সভার প্রথমদিনে অর্থাৎ ৪/৪/২০ তাং এর ধর্মসভায় শ্রীল গুরু-মহারাজকে সভাপতিরূপে বরণ করেন। তৎপরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্তজিপ্রেম পরমার্থী মহারাজ, শ্রীরামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক, ভোলানাথ কলেজ, ধুবড়ী), শ্রীকৃষ্ণীনীকান্ত রায় (প্রাক্তন এ. এল. এ. ও প্রাক্তন অধ্যাপক গোবীপুর্ কলেজ) শ্রীমন্তজিবৈভব বন মহারাজ, শ্রীমন্তজিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও প্রধান অতিথি শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য (Addl. Deputy Commissioner, Dhubri, 'দনাতনধর্ম')

সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ ৫/৪/২০ তাং এর ধর্মসভায় শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, প্রধান অতিথি শ্রীনির্মল সরকার (Senior advocate), শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য-কৃত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সনাতন ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীল গুরু-মহারাজ বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন।

৬/৪/২০ তাং এ স্থানীয় শ্রীবামপদ রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৭/৪/২০ তাং এ কোকড়াঝাড় জেলার বাসুগাঁও সহরে শ্রীপমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে শুভযাত্রা করেন। তথায় ১২/৪/২০ তাং পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ১৩/৪/২০ তাং-এ গোহাটীর আদাবাড়ী নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল রায়-এর গৃহে পদার্পণ করেন। তথায় প্রত্যহ পাঠ-কীর্তন হইতে থাকে এবং নিকটস্থ কয়েকজন গৃহস্থ ভক্তের গৃহে উৎসবাদি হয়। ১৬/৪/২০ তাং এ গোহাটীর কালাপাহাড় নিবাসী শ্রীমুক্তা প্রভা নাথ-এর বিশেষ আগ্রহে এবং শ্রীমুক্তি সেনগুপ্ত ও তৎ সহধর্মিণী শ্রীমতী বন্দনা সেনগুপ্তের ইচ্ছায় তাঁহাদের বাসভবনে যাত্রা করেন। তথায় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন হয়। অতঃপর সন্ধ্যাবেলাে জলপাইগুড়ি জেলার বারবিশা, কুচবিহারস্থ শ্রীনরোত্তম গোড়ীয় মঠ হইয়া ২৪/৪/২০ তাং এ কুচবিহার নিশিগঞ্জের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রীগৌরপদ মালাকার মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করেন। নিকটস্থ ছিটকিবাড়ী নিবাসী স্বধামগত শ্রীসতীশচন্দ্র দাশাধিকারী ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের গৃহেও পদার্পণ করেন। তথায় দিবসব্যয় পাঠ-কীর্তনপূর্বক ২৬/৪/২০ তাং এ শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে আগমন। তথা হইতে শ্রীভ্রাম-সুন্দর গোড়ীয় মঠে শুভযাত্রা। এখানে শ্রীল গুরুদেব অস্থস্থতাহেতু প্রায় এক-মাসকাল অবস্থান করিবেন।

২৮/৪/২০ তাং-এ শিলিগুড়ির পূর্ব বিবেকানন্দ পরীতে শ্রীহরীকেশ রায় ও শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায় নির্মিত শ্রীশ্রীগোপালমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীল গুরুদেব তথায় গমন করেন। পরমপূজ্যপাদ জিদগিহ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, জিদগিহ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত জিদগী মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসি ও ব্রহ্মচারিগণ উক্ত শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার যাগ-যজ্ঞ-হোমাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ—

নির্যাতন

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশিগাড়ী থানা নিবাসী) শ্রীভাগবতচন্দ্র দাসমহাপাত্র (দীক্ষানাম শ্রীভক্তিকমল দাস) গত বাং ১৭ই চৈত্র ১৩২৬, ইং ৩১শে মার্চ ১৯২০, শনিবার সকাল ১০-৪৫ মিঃ গৌর-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীল রামানুজাচার্যের আবির্ভাব-দিবসে দেহরক্ষা করেন। বাং ১৩৫১ সনে শ্রীপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে বাং ১৩৫২ সনে শ্রীল প্রভুপাদের অমৃতম অমৃতকম্পিত শ্রীমন্তুক্তিকমল সন্ত মহারাজের প্রথম কেশিগাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাদ মঠের ভূমি ও গৃহ দান করেন। পরবর্তিকালে শ্রীগৌরাদ মঠের বাংসরিক উৎসবে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের নিয়ামকত্বে সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নমাজের সাধুসন্তদের আনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অগাধ উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন শ্রীগৌরাদ মঠের বাংসরিক মহোৎসবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ পদার্পণ ঘটেছিল।

তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের নির্দেশে শ্রীগৌরাদ মঠের শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজায় রত ছিলেন। পরলোক গমনের দিন শ্রীগৌরাদ মঠের শ্রীগৌরকুণ্ডে স্নানরত অবস্থায় অন্তঃস্থ হয়ে পড়েন এবং মঠ প্রাঙ্গনে দেহ রাখেন। শ্রীগৌরাদ মঠের দাতা হইয়াও তিনি সেবকের জায় জীবনযাপন করতেন। তিনি নিরভিমামী ছিলেন। তাঁর সরলতা সমস্ত বৈষ্ণব গুণলীকে আকৃষ্ট করত। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশ্রীমসুন্দর দাসমহাপাত্র শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত। তিনি বর্তমানে জীবিত আছেন।

গত ২৭শে চৈত্র পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের উপস্থিতিতে তাঁর পুত্রজয় শ্রীমান রাধানাথ, সন্তর এবং কৃষ্ণকান্ত নিজ বাসভবনে দাত্ত স্বতি-বিধানে আন্তর্জাতক সম্পন্ন করেন। আত্মহুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

—শ্রীরাধানাথদাস মহাপাত্র
কেশিগাড়ী (মেদিনীপুর)

। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদেও জয়তঃ ।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের আশাশুসারে)

[২৪শ বর্ষ]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেকর্ডিষ্টার্ড)

ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

তেঘরিপাড়া,

১৮ই বৈশাখ, ১৩৯৭ ; ইং ২৮।৪।২০

স্বাদয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

অন্তান্ত বৎসরের জায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উত্তোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাভূটানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৭ই আষাঢ়, ১৩৯৭ (ইং ২২।৬।২০) শুক্রবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৭ (ইং ২।৭।২০) সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাট্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যঙ্গুণে যোগদান করিলে সমিতির সদস্তুবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকুপালেশপ্রার্থী—

গভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবাপঞ্জী

১। ৭ই আষাঢ়, (ইং ২২।৬।২০) শুক্রবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচিন্দ্রানন্দ জ্ঞানবিনোদ ঠাকুরের ভিরোজাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ৮ই আষাঢ়, (ইং ২৩।৬।২০) শনিবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকার নগর সঙ্কীৰ্তনমুখে শুভিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে শুভিচামন্দির-মার্জ্জন এবং মঠে প্রত্যাবর্তন।

৩। ৯ই আষাঢ়, (ইং ২৪।৬।২০) রবিবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শুভিচাবাড়ী গমন; পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাট্রিক, সঙ্কীৰ্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন সোমবার হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন বুধবার পর্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্তন ও আরাট্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ১৩ই আষাঢ়, (ইং ২৮।৬।২০) বৃহস্পতিবার—হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত শুভিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্তন। অপরাহ্ন ৭টা হইতে সঙ্কীৰ্তন; সন্ধ্যায় আরাট্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন শুক্রবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই রবিবার পর্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন ও আরাট্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ১৭ই আষাঢ়, (ইং ২।৭।২০) সোমবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা; পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য:—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সাধারণ সম্পাদক"-এর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ বাতে আত্ম-পরমর ।

অধোক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিম্বগুণ ॥

অন্য ধর্ম হইকূপে পালে সেই জন ।

হরিকথার রতি নৈলে পও সেই জন ॥

৪২শ বর্ষ {	৭ বামন, গর্ভোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগোরাঙ্গ ৩১শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৯৭, ইং ১৭৮৬/৯০	{ ৪র্থ সংখ্যা
------------	--	---------------

সাম্বাদং

শ্রীবসুদেব-দেবকীকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

[শ্রীমদ্গর্গস-হি চার্যাং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বচনান্ব-
সংবাদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-জন্মবর্ণনে একাদশোহধ্যায়ে]

শ্রীনারদ উবাচ,—

১-২ । ভাস্ত্রে বুধ কৃষ্ণপক্ষে ধাত্রক্ষে হর্ষণে বুধে ।

কৃষ্ণষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রৌ নক্ষত্রেশ-মহোদয়ে ॥ ২৩ ॥

অন্ধকারাবৃতে কালে দেবক্যাং শৌরিমন্দিরে ।

আবিরাদীদ্ধরিঃ সাক্ষাদরণ্যামধ্বহেহগ্নিবৎ ॥ ২৪ ॥

ভাস্ত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী-তিথিতে বোহিণী-নক্ষত্রবৃত্ত বুধবারে
হর্ষণযোগে অর্দ্ধরাত্রিে অপাণ চন্দ্রে বৃহল্লগ্নে অন্ধকারাবৃত সময়ে অরণি হইতে
যজ্ঞাগ্নির জ্বায বহুদেবগৃহে দেবকীতে সাক্ষাৎ হরি আবির্ভূত হইলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

৩। হরিমানকভূনুভিস্তবৈঃ স্তবনং তং প্রণিপত্য বিস্মিতঃ ।

অকরোহৃতি-প্রভুদায়ো গতাতিঃ স্মৃতিগৃহে কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৩০ ॥

বিস্মিতমনা বহুদেব বিবিধ স্তবে স্তুতি ও প্রণাম করিলেন, প্রভুর উদয়ে তাঁহার ভয় অপনোদিত হইল ; তিনি স্মৃতিগৃহে কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীবহুদেব উবাচ,—

৪। একো যঃ প্রকৃতিগুণৈরনেকধাসি
হর্তা স্ব জনক উতাস্ত্র পালকস্তম্ ।
নির্লিপ্তঃ স্ফটিক ইবাচ্চ দেহবর্ণৈ-
স্তস্মৈ শ্রীভুবনপতে নমানি তুভ্যম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবহুদেব বলিলেন,—তুমি এক হইয়াও যোগমায়া-গুণে নানাবিধ । তুমি এই জগতের হর্তা, জনক ও পালক ; কিন্তু নির্লিপ্ত তোমার দেহশোভা স্ফটিকবৎ শুভ্র ; হে জগৎপতে ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩১ ॥

৫। এধঃসু স্ননল ইবাচ্চ বর্তমানো
যোহস্তস্তো বহিরপি চান্দ্রম্ যথা হি ।
আধারো ধরণিরিবাস্ত্র সর্বসাক্ষী
তস্মৈ তে নম ইব সর্বগো নভস্বান্ ॥ ৩২ ॥

কাষ্ঠমধ্যস্থ অগ্নির জ্বায় যিনি হৃদয়মধ্যস্থ হইয়াও আকাশের জ্বায় বাহিরেও বিজ্ঞমান, যিনি ধরণীর জ্বায় সর্বাধার এবং যিনি বায়ুর জ্বায় সর্বসাক্ষী ও সর্বগত, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

৬। ভূভারোদ্ভট-হরণার্থমেব জ্ঞাতো
গো-দেব-দ্বিজ-নিজবৎস-পালকোহসি ।
গেহে মে ভূবি পুরুষোত্তমোত্তমস্তম্
কংসান্মাং ভুবনপতে প্রপাহি পাপাং ॥ ৩৩ ॥

তুমি পৃথ্বীর ভারস্বরূপ দাক্ষণ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিবার জন্ত ভূতলে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ । তুমি গো, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নিজভক্তজনকে পালন কর । হে পুরুষোত্তম ভুবনপতে ! পাপ কংস হইতে আমাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩৩ ॥

৭। পরিপূর্ণতমং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং শ্রামসুন্দরম্ ।

জ্ঞাত্বা নত্যাথ তং প্রাহ দেবকী সর্বদেবতা ॥ ৩৪ ॥

সর্বদেবতা-স্বরূপিণী দেবকী তাঁহাকে পরিপূর্ণতম শ্রামসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীদেবক্যুবাচ,—

৮। হে কৃষ্ণ হে বিগণিতাণ্ডপতে পরেশ

গোলোকধাম-ধিবর্ণধ্বজ আদিদেব ।

পূর্ণেশ পূর্ণ পরিপূর্ণতম প্রভো মাং

জং পাহি পাহি পরমেশ্বর কংসপাপাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীদেবকীদেবী বলিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরেশ, গোলোকধামের প্রকাশক ধ্বজাধ্বজ, আদিদেব, পূর্ণেশ, পূর্ণ, পরিপূর্ণতম ও প্রভু । হে পরমেশ্বর ! পাপ কংস হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর—পরিত্রাণ কর ॥ ৩৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

৯। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ।

সম্মিতো দেবকীং শৌরিং প্রাহ স বৃজিনার্দনঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম পাশনাশন সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া দ্বৈবং হস্তানহকারে দেবকী-বসুদেবকে পূর্বসৃষ্টির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন । [স্মৃতিকাগৃহে বসুদেব-দেবকীর সমক্ষে শ্রীহরি তুষ্ণীভাবে অবস্থিত হইয়া বালক হইয়া গেলেন] ॥ ৩৬ ॥

মুষ্টিভিক্ষা

ব্রজে বৈষ্ণবগণ দ্বারে দ্বারে মাধুকরী-বৃন্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন । শ্রীব্রজমণ্ডলে গৃহস্থ মানবগণ বঙ্গভূমির জায় ডাল, ভাত খান না । তাঁহারা কুটী, ছোপাভাজা ইত্যাদি কৃষ্ণ দ্রব্য আহ্বার করিয়া থাকেন । বৈষ্ণবগণ গৃহস্থদিগের দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বৈষ্ণবকে এক টুকরা করিয়া কুটী দিয়া থাকেন । দশজনের বাটী হইতে এক এক টুকরা করিয়া কুটী পাইলে এক এক বৈষ্ণবের ভোজনমোপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগঠন হয় । বহুকাল হইতে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী-বৃন্তি-লভ্য কুটীর দ্বারা জীবন নির্বাহ হয় ।

বদভূমিতে কটীর প্রথা নাই। বদ্বাদী গৃহস্থগণ ভাল, ভাত খাইয়া থাকেন। বদভূমিতে মাধুকরী-বৃন্তি অবলম্বন করিয়া দর্ভত্র খাত্ত্রব্য লাভ হয় না। কেননা, সকল বাটীতে দেবদেবা নাই; দেবতার প্রসাদ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবকে কি ভিক্ষা দিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে একমুষ্টি চাল আনিয়া দিয়া থাকেন। ব্রজে যেরূপ কটীর টুকরা প্রদত্ত হয়, গোড়ে সেইরূপ তণ্ডুল-মুষ্টি প্রদত্ত হয়। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবেরা ব্রজমণ্ডলে যেরূপ অনায়াসে কটীর টুকরা খাইয়া দিনপাত করেন, সেদ্রুপ গোড়-মণ্ডলে তণ্ডুল-মুষ্টি লইয়া অনায়াসে দিনপাত করিতে পারেন না। তণ্ডুলগুলিকে পাক করিতে হইলে হাড়ি, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। আবার পাক করিতে গেলে যে সময় লাগে, তাহাতে ভজনের অনেক ব্যাঘাত হয়।

ষোলকোশ বৃন্দাবন যে ধাম, ষোলকোশ নবদ্বীপও সেই ধাম। অতএব গোড়মণ্ডলে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের স্তায় সমস্ত গৃহস্থের নিকট হইতে মাধুকরী করা প্রস্তুত হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে স্তূহু হয় না। নিকটে নিকটে এত সেবাস্থান পাওয়া যায় না যে, প্রতিস্থান হইতে এক গ্রাস অন্ন-ভাল লইয়া ভক্তদের উদর পূরণ হয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণ মাধুকরী করিতে পান না; এবং মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতেও যত্ন করেন না। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আজকাল ক্রমশঃ নানাস্থানে অনেক সেবা প্রকাশ হইতেছে; তাহাতে বৈষ্ণবদিগের জীবন নির্বাহের অনেক সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

সে বাহা হউক, মুষ্টিভিক্ষার আজকাল অবস্থা কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। বৈষ্ণবগণ মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া একদল অযোগ্য জী-পুরুষ মুষ্টি ভিক্ষা-প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। যে-সব জীলোক উপার্জন করিয়া উদর ভরণ করিতে আশ্রয় প্রকাশ করে, তাহারা প্রাতে উঠিয়া বস্ত্র ত্যাগ করুক না করুক, গৃহিণীর কার্য্য সমাপন করিয়া তিলক-মালা ধারণপূর্ব্বক আমাদের শচীনন্দনের নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্বেই তাহারা ৩৪ সের চাল লইয়া ঘরে আইদে। ঐ চাউল কিছু পাক করে, আর কিছু বিক্রয় করে। বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতে উপপতির সেবা ও জারজপুত্রের উদর পালন ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিভিক্ষা-দাতা এইরূপ উদর ভরণের উপায় প্রদান করিয়া আর দেবক-সেবিকা অনায়াসে পান না। দুই তিন ঘণ্টার পরিশ্রমে যদি এত লাভ হয়, তাহা হইলে পরিচর্যা-কার্য্য করিয়া কেন খাইবে ?

আদৌ শুদ্ধবৈধবের উপকারার্থে মুষ্টি ভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। পীড়িত, অন্ধ, বৃদ্ধ ও অনাশ্রিত বালকেরাও মুষ্টিভিক্ষা পাইবার যোগ্য বটে। আজকাল তাহাদের প্রতি কেহ দৃষ্টি করেন না। ধর্মধ্বজী বৈধব-বৈরাগীগণ জগতের কোন কার্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের হাত হইতে গৃহস্থদিগের নিস্তার নাই। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আনিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে; যতক্ষণ প্রত্যেককে ততুল-মুষ্টি না দিবে, ততক্ষণ তাহাদের বাক্য যত্নগায় গৃহস্থ টকিতে পারিবে না। গৃহস্থ ও গৃহিণী যদি একটু সরিয়া গেলেন, সম্মুখে প্রাপ্ত বটী-বাটী-কাপড় ঐ সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়ে। (ইহাতে) গৃহস্থদিগের একপ্রকার বিপদ হইয়া পড়িয়াছে। ‘প্রতিদিন এ বিপদে পড়িব না’—এই চিন্তা করিয়া কেহ কেহ রবিবারে ভিক্ষা দেন। সেদিন আর তাহাদের কোন প্রকারে নিস্তার নাই; কাঙ্গালী বিদায়ে দিনপাত হয়, কোন শুভকার্য্য করিতে পান না। যদি যথার্থ কাঙ্গালী হইত, তাহলে দানের সার্থকতা হইত।

বস্তুতঃ দাতাগণ অপেক্ষা গ্রহীতাগণ সুনম্পন্ন দাতাগণের মুষ্টি গ্রহণ করিয়াই উহারা এত অর্জন করে যে, অন্নদিবের মধ্যেই তাহাদের গৃহ-দ্বার-পশু প্রভৃতি সম্পত্তি হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে ভিক্ষুকগণ গৃহস্থগণকে এমন অমঙ্গলের ভয় দেখায় যে, তাহারা ভীত হইয়া ঋণ গ্রহণপূর্বক ভিক্ষা দান করিয়া থাকেন। দরিদ্র গৃহস্থের আয় কি? প্রতিদিন যদি অর্দ্ধসের ততুল ঐরূপ অপাত্রে দিতে হয়, তাহা হইলে উহারা কিরূপে সংসার নির্বাহ করিবেন? এই প্রশ্নটি যদি একেবারে উঠিয়া যায় তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না।

ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দুই অন্ন ও সাধু-বৈধবকে সামান্য মিষ্টান্ন দান করিয়াও গৃহস্থদিগের কোন ক্ষতি হইতে পারে না; সেই পর্য্যন্ত ভিক্ষাদান বজায় রাখিলে ভাল হয়। ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কু-প্রথাটী রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদৃগৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে। উপযুক্ত ভিক্ষকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। “অপাত্রে দীযন্তে দানং তিদ্ধানং তাম্রসং স্নাতকং”—এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বনপূর্বক সকলেই অপাত্রে দান করুক।*

—জগদগুরু শ্রীল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্ত প্রবন্ধ তাঁহার “শ্রীমজ্জনতোষণী” মাসিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহাতে বর্তমান পরকারের

বর্ণান্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

অক্ষয় চেষ্টা যে সর্বত্র সাফল্য লাভ করিবে এরূপ নহে। বালকের ইচ্ছা হউক বা না হউক, তাহার পিতৃবর্গ বা সামাজিকবর্গ বংশের বা সমাজের কুলগত প্রথারক্ষার জন্য তাহাকে গুরুগৃহে যাইতে বাধ্য করেন। তাহাতে ফল হয় এই যে, পিতৃবর্গ বা অপরের প্ররোচনাক্রমে তাহাদের প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডে বালকের অনেক সময়ে যোগ্যতার অভাবে অথবা কঠির বৈষম্যে প্রাণিত ফল লব্ধ হয় না। এই কারণেই বংশের ওভালুধ্যায়িগণের বিধানমত কার্য্য করিয়াও ব্রাহ্মণ বালক উপন্যাস হইলেও পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা বর্ণবহির্ভূত শ্রেণী-বিশেষে বর্ণান্তরিত হন।

স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়েই বর্ণ ধারণ করে। দেহীর সকল বর্ণধারণ-যোগ্যতা দেহদ্বয় দ্বারাই সম্ভবপর হয়। হংস বা নিগুণ ব্রাহ্মণ দেহধারণসঙ্গেও বিরাট-পুরুষের সর্বোদ-নিঃসৃত বলিয়া তাহার একমাত্র অপরিবর্তনীয় নিগুণ সত্ত্বাই গুণজাতদর্শনে অনাস্বভূমিকায় চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গুণ ও তদ্ব্যুৎ কর্মই জটিল দর্শনে সমধর্ম্মা জীবের বর্ণের বিভাগ করিয়াছে। বিরাট সমষ্টি সমাজকে লক্ষণ-বিচারেই চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভাগ-পদ্ধতি বা লক্ষণধারা ব্যক্তিবিশেষকে জানিতে হইলে তাহার স্থূল পরিচয় বা দেহের পূর্ব পরিচয়াদি পিতৃকুলেই আবদ্ধ স্থির করিতে হয়। পরে তাহার সূক্ষ্ম পরিচয় বা বৃত্তগত পরিচয় বর্ণবিভাগ-কার্য্যের সহায়তা করে। সূক্ষ্ম পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ

ভিক্ষুক-নিষেধ আইনের (Beggars Act এর) কতকটা সহায়ক হইতে পারে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ ভিক্ষা বন্ধ কখনই করা হইবে না, বরং সুবিচারপূর্বক সংপাত্রে ভিক্ষা অবশ্যই দিতে হইবে। শাধু-সজ্জন, সম্মানী, ত্যাগী, বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষাবারা সাহায্য না করিলে গৃহস্থের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। ধর্ম্মার্থে দান সর্বদাই করা কর্তব্য। অপাত্রে দান চিরদিনই নিন্দনীয়। ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের ভিক্ষারূতি আদরণীয় নহে। কিন্তু দান, দুঃখী, কান্দাল, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, দুঃস্থ, বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করা গৃহস্থগণের অবশ্য কর্তব্য। 'দান' মনুষ্য-জীবনের একটি প্রধান ধর্ম্ম—বিশেষতঃ কলিকালে। ধর্ম্ম কখনও উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। 'দান'-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে উহা গ্রহণ করার পাত্রও স্থির থাকিবে একান্ত প্রয়োজন।—সম্পাদক

দেখিতে গিয়া আমরা অনেক স্থলে স্থূল শরীরের মূল অনুসন্ধান করি। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম শরীর স্থূল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে ফলের খোঁসা হইতে তন্নিহিত বীজের উদ্ভব মানিয়া লইতে হয়। স্থূল শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের জনক বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেরূপ ধারণা সূক্ষ্ম শরীরের ধারণায় অনুমোদিত হয় না। স্থূলের পতনে যখন সূক্ষ্ম শরীরের পুনরায় স্থূলগ্রহণ বিচারিত হয়, তখন সূক্ষ্মের পূর্থাবস্থানই স্বীকৃত হয়। ষাংরা জন্মান্তরবাদ বা কর্মপদ্ধতি অনুমোদন করেন, তাহারা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উদ্ভব না মানিয়া সূক্ষ্মই স্থূল আবরণ গ্রহণ করেন, ইহাই বলিয়া থাকেন। বাসনাই গুণময় জগৎ হইতে স্থূল শরীরের উপাদান গ্রহণ করে। স্থূল শরীর বহির্জগতের যে উপাদান পরবর্তী সময়ে ক্রমশঃ গ্রহণ করেন, তাহা নিজের বা অপরের তাদৃশ সূক্ষ্মশরীর বা মনের অনুমোদনক্রমেই তাহার তাদৃশ রুচির উদয় হয় বা তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই চিদাভাস মন বা সূক্ষ্ম কারণই স্থূল-গ্রহণের হেতু।

দর্শন দ্বারা দৃষ্টবস্তুর বর্ণোপাদান স্থিরীকৃত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারাই দর্শনাদি হইতেই ধারণা বা ধর্মের অভিব্যক্তি। যে কালে স্থূলদর্শন-প্রক্রিয়ায় দৃষ্ট মানবের বাহ্য পরিচয় লক্ষিত হয়, তৎকালে মানবের বর্ণপরিচয় শৌক্যবিচারেই আবদ্ধ হয়। আবার চিন্তাশীল মানববুদ্ধ বৃত্ত-বিচারকেই বর্ণ-নির্ণয়ের কারণরূপে নির্দেশ করেন। কিন্তু সকলেই সূত্রেভাবে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে অসমর্থ হইবে, বিচার করিয়া সামাজিক জ্ঞান কার্যাদি নির্বাহার্থে অর্থাৎ বৌদ্বৈতপ্রভৃতি মিরূপণ বিষয়ে শৌক্যপরিচয়কেই প্রাধান্য দেন। শৌক্য-পরিচয় প্রাধাণ্যে লক্ষণ বা বৃত্তদ্বারা বর্ণমিরূপণ-পন্থা নানা প্রকারে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ ধর্মশাস্ত্র বা গৃহস্থাদিতে সচরাচর এই বিষয়ের সূত্রে মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রৌত ক্রিয়া যে কালে বিচারবহিত ভারবাহিগণের কক্ষফলভোগমার্গে পরিণত হইল, তৎকালেই পঞ্চরাত্র-বিধি শ্রৌতক্রিয়ার স্থানে সূত্রেভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বেদ আরণ্যক শুদ্ধনংখ্যান ভক্তিযোগ একত্র স্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চবিধ জ্ঞান 'পঞ্চরাত্র' নামে তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছিল। কর্মিগণ যাহাকে শ্রৌতাসুতান বলিতেন, আরণ্যকগণ তাহা হইতে তাঁহাদের নিজস্ব পার্থক্য স্থাপন করেন। পাঞ্চরাত্রিক বেদবিধান উপাসনামার্গে ভক্তগণের শ্রৌতাসুতান। উগনিষদ নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিস্থর শ্রৌতাসুতান। স্মৃতি ও পুরাণাদি ক্রতি-বিষয়েই ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছেন। কর্মি-শ্রৌত মলিন পদ্ধতিকে তাহারা একেবারে উৎসাদিত

না করিয়া তাহাকে অসম্পূর্ণ ও অবিবেকিগণের বিধান বলিয়া তাহারই সমুচ্চি
সাধন করিয়াছেন। সেইজন্যই নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিঃ বিনা।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিকুংপাতায়ৈব কল্পতে ॥

শ্রৌতবিধান, স্মার্তবিধান, পৌরানিকবিধান ও পঞ্চরাত্র-বিধান সম-
তাৎপর্য্যাবিশিষ্ট। যেখানে তাহাদের পরস্পর বৈষম্য মিলিত হইয়াছে,
সেইখানেই হরি-ভজ্ঞনকার্য্য বা অঙ্গরাজ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পঞ্চরাত্র-বিধান
শ্রৌতবিধানের প্রতিকূল জানিবেই কাল্পনিক পঞ্চরাত্র-বিধি উৎপাতের কারণ
বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। শ্রৌতবিধি-গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র ভেদজনিত
অযোগ্যতা যে শ্রুতাহুকুল তন্ত্র বা শ্রুতিবিস্তৃতিদ্বারা অভাব-পূরণে সমর্থ ও
সমতাৎপর্য্যাবিশিষ্ট হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র-বিধান। শ্রৌতবিধানের আল্লগতো
গৃহোক্ত বর্ণাশ্রম-বিধিগুলির যথাযথ উপযোগিতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই
অভাব পূরণের জন্ত ও বৈদিকবিধান অনুরূপ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীনারায়ণের
শ্রীবাণ্য হইতেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র উদ্গত হইয়াছেন। পঞ্চরাত্রশাস্ত্র-সাধ্য না
লইয়া যে বিবদমান শ্রৌতপদ্ধতি, তাহা অনেক স্থলে বাধা প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর
উপাসনা বিকৃত হইয়া যে পঞ্চরাত্রবিরোধ-বাদ শ্রৌতবিধির অঙ্কে উৎপত্তি
লাভ করিয়াছে, তাহা উৎপাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কাল-প্রভাবে গৃহোক্ত বিধিগুলি বা শ্রৌতবিধান স্ফুটভাবে সম্পন্ন হইতেছে
না। শাণ্ডিল্যের পঞ্চরাত্রের মহিমা, যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদবিরোধ বলিয়া
বিস্তের আধার করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমহাভারতে স্ফুটভাবে বেদাহুকুল বলিয়া
বহুপূর্ব হইতেই দিকান্তিত আছে। কস্মী যাহাকে শ্রৌত বলিয়া নিজ মহত্ব-
প্রচারে ব্যস্ত হন, তাহাই পঞ্চরাত্রবিদগণের বিচারে বিকৃত-বিরোধী হওয়ায়
জড়ভোগ মাত্র। বেদশাস্ত্রই কস্মিগণের হস্তে পড়িয়া যে ভগবৎ-বিস্তৃতি
জানয়ন করে, পঞ্চরাত্রবিদগণ সেই বেদশাস্ত্রই হরি-উপাসনার আকরস্থান
বলিয়া নির্দেশ করেন। বেদশাস্ত্রের ভোগপর কর্মকাণ্ড, ত্যাগপর জ্ঞানকাণ্ড
ও ভোগত্যাগাতীত ভগবৎসেবাপর উপাসনাকাণ্ড সম্প্রদায়ত্রে পরস্পর ভেদ
উৎপন্ন করে। সকলেই বেদাহুক-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য
আছে। স্মরণ্য বর্ণাশ্রমাদি-বিচার ও কস্মি জ্ঞান-ভক্ত-ত্রিবিধ মমাজে শ্রৌত-
গৃহ-স্মরণপ্রতিপাদ বিষয়ে যে ভেদ আছে, তাহা লইয়া বিবাদ করিতে গেলে
সুফল লাভ করা কঠিন।

গৃহসংস্কার-গ্রহণে বয়োবহানিধি শ্রীমহাভারত, মাতৃতনংহিতা ভাগবত,
পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে বেদতাৎপর্য্য যেরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা
প্রবন্ধান্তরে ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অনধিকারীর নির্জন-ভজনের ছলনা—ইন্দিয়- তর্পণপর ও হরিভজন-বিরোধী

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীউদ্ধারণ গোঁড়ীয় মঠ

চৌমাথা

পো: চুঁচুড়া (হুগলী)।

১৯৮/১৯৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

*** মহারাজ! আপনি *** মহারাজকে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার ঠিকানা দেখিয়াছিলাম। সেই ঠিকানায় পত্র দিতেছি, পাইবেন কিনা বুঝিতেছি না।

আমার বর্তমানে শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। আগামীকলা রক্ত পরীক্ষা হইলে নূতনভাবে চিকিৎসা আদৃত করিতে পারি।

এ বৎসর আগামী শুক্রবার ২৩.৮.৬৩, বাংলা ৬ই ভাদ্র তারিখে হাওড়া হইতে কেরার-বন্দী পরিক্রমার জন্ত *** মহারাজ, * * * মহারাজ ও * * * যাইতেছে। তাহারা সর্বমোট ১৫ জনের টিকিট কাটিয়াছে। আরও ২/১ জন হইলে হইতে পারে। তাহারা Hill Concession-এ Return করিয়া প্রথমে দেবদুর্গ যাইবে। তথা হইতে হরিদ্বার আসিবে। হরিদ্বার দর্শন করিয়া ঋষীকেশ যাইবে। তাহাদের সহিত আপনার দেখা হইবে কিনা বলিতে পারি না। আপনার নির্জন ভজনের ব্যাঘাত হইলে দেখা করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট গুনিয়াছি,—নির্জন ভজন ইন্দিয়তর্পণের নামান্তর; সুতরাং তাহা হরিকৃতজনের বিরোধী। শতকরা ১০০ জন ঐ শ্রেণীর লোককে পতিত হইতে দেখা যায়। হরিভজন না হইলে যাহা ঘটয়া থাকে তাহাই হয়। আপনি যেক্রপ আদর্শ (?) স্থাপন করিলেন, তাহা শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে হানিকর।

আপনি বুদ্ধ ও বুদ্ধিমান। আপনাকে অধিক লেখা আমার বাহ্যল্য। আপনার এইরূপ জীবন গ্রহণ করিবার পূর্বে আমার নিকট সুস্পষ্টভাবে জানান প্রয়োজন ছিল। আমি আপনার কার্যকলাপে অবাক হইয়াছি। শরীর অপটু হইলেও যে কোন মঠে থাকিয়া হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিতেন। তাহাতে ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হইত।

নংকৃত পরীক্ষায় এবার ৫ জন পাশ করিয়াছে। *** ও *** ফেল করিয়াছে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীব্যাসপূজা কাকে বলে ?

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজা অমূল্য বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ‘শ্রীব্যাসপূজা’ অর্থে শ্রীব্যাসদেবের পূজাকেই লক্ষ্য করে। আবার শ্রীব্যাসদেবের পূজা বলায় কোন্ বস্তুটা লক্ষ্যীভূত হয়, তাহা স্বহৃৎভাবে অনুভূত না হইলে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগুরুপূজার ঐক্য উপলব্ধি হয় না। জ্যামিতি-মতে ‘ব্যাস’ অর্থে পরিধিবারা দীর্ঘাবদ্ধ কেন্দ্রে অবস্থিত সরলরেখাকে বুঝায়। একরূপ সরলরেখা অসংখ্য হইতে পারে; কিন্তু অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটিরই একই ধর্ম। সেইরূপ ব্যাসের বহু হইলেও প্রত্যেকেই মূলতঃ একই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। গোলোক-মধ্যস্থিত কেন্দ্রেই কক্ষ কহে। তাহাতে সন্নিহিত রেখাস্বরূপ শক্তিই শ্রীব্যাস। তাহাকে কখনও অংশ, কখনও শক্তিরূপে গণনা করা হয়। বেদাদি-বিভাগ কার্যদ্বারা বহুজীবকে কক্ষসম্বন্ধ অরণ এবং ইয়া কক্ষসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীব্যাসের কার্য। ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবেও তাহাই প্রধানরূপে দৃষ্ট হয়। একারণ শ্রীগুরুদেবই শ্রীব্যাসদেব, শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা।

“আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীয়াৎ” বাক্যে কক্ষকেই আচার্য্য বলিয়া জানিতে নির্দেশ রহিয়াছে। শ্রীগৌরহৃদয়ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিকান্তের শিক্ষাদান করিয়াছেন। “গুরু কক্ষরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কক্ষ রূপা করেন ভক্তগণে।” গুরুদেব শ্রীগুরুদেবই রূপ। গুরুভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম-জ্ঞানে অভেদরূপে দর্শন করেন। তজ্জন্ম শ্রীগুরুদেবের সেবাই ভগবৎ-সেবা; শ্রীভগবৎসেবা বসিগা পৃথক্ আর কি আছে? সেইহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগুরুপূজাই করিয়া থাকেন। ইহা কনিষ্ঠাধিকারে বা বদ্ধাবস্থায় কখনই ধারণা হইতে পারে না।

‘পূজা’-শব্দদ্বারা কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করা হইবে? পুষ্প-চন্দন-ধূপাদি পক বা বোড়শোপচারদ্বারা অর্চনকেই কেবলমাত্র পূজা বলা হয় না। অর্চনা সাধারণতঃ কনিষ্ঠাধিকারে ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে অর্চনা দার্থক হইতে পারে না। স্বতরাং Ontology কে পরিত্যাগ করত কেবল Morphology তে নিবদ্ধ না থাকিতে শাস্ত্রে প্রচুর নির্দেশ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসদেবের প্রীতি কিভাবে সাধিত হয় তাহা যিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত শ্রীব্যাস-পূজক বা শ্রীগুরুপূজক।

‘নাদেবো দেবমর্চয়েৎ’ বাক্য হইতে জানা যায়, পূজা বা সেবা—সাক্ষাৎ চিদ্রাজ্যেই সম্ভব। মায়িকাবস্থায় সেই চিদ্রাজ্যের সম্যক উদয় না হইলেও তত্ত্বমুখী-ভাবে আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে করিতে মায়িকভাব অপনোদিত হয় ও পরিশেষে চিদ্রাজ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবমুক্ত-অবস্থায় জীব তখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজকে তৎসেবক বলিয়া জানিলাভ করে। তখন মায়াদৃষ্টির কোন প্রভাব তাহাতে কার্য্য করিতে পারে না। যে শক্তি-প্রভাবে বদ্ধজীব সেই চিন্তাব লাভ করিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। এজন্ত শ্রীগুরুদেবের রূপা ব্যতীত বদ্ধজীবের সেই পরম-ভাব লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন,—

“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ”। (ছাঃ ৬।১৪।২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রাপ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাস্ত্রে পরে ৫ নিষ্কাতং ব্রহ্মপাশমাশ্রমম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।২১)

নৈবাং মতিস্তাবচ্ছক্রমাজ্জিৎ, স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ।

সহায়সাম্ পাদরজোহভিষেকং, নিক্ষিপনানাং ন বুধীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন। কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তমশ্রেণ অবগত হইবার জন্য মদগুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি ‘শব্দব্রহ্মে’ অর্থাৎ ঋতিশাস্ত্র-দিকান্তে স্থনিপুণ, ‘পরব্রহ্মে’ নিষ্কাত অর্থাৎ যিনি ‘অধোক্সজ’ অহুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই মদগুরু। যাবৎ নিক্ষিপন ভগবন্তজের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহরতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদ-পদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।]

গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কাহারও চিত্ত্রাজ্যে প্রবেশাধিকার সম্ভব হয় না; কিন্তু কি-প্রকার জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবে? তদ্বিশেষে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি কখনই পরিদৃষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে জীবের পূর্বদক্ষিত স্মৃতিই তাহাকে এইরূপ সংসদলাভের সুযোগ দান করে।—

“সংসদঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্মৃতিৈঃ পূর্বদক্ষিতৈঃ।”

“ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনশ্চ তর্হ্যচ্যুত-সংসমাগমঃ।

সংসদমো যর্হি তদৈব সদগতো, পরাবরেশে ত্ময়ি জায়তে রতিঃ ॥”

[হে অচ্যুত! ভব-ভ্রমণ করিতে করিতে অপবর্গ অর্থাৎ তাহার সমাপ্তি

হইলে যখন জীবের সংস্কার লাভ হয়, তখনই সদ্গতি ও পরাবরেখর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ।]

“এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিনতা-বীজ ॥”

অতএব ভাগ্যবান্ অর্থাৎ স্মৃতিশালী জীব ব্যতীত কেহ কখনও সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে না ; আবার সদ্গুরু আশ্রয় না হইলে কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি নানামার্গে জীবের ভ্রমণ করিতে হয়, বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশাধিকার ও চিরায় সেবাফল প্রেমধনে অধিকার লাভ হয় না ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভিব্যোমসত্ত্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল ভক্তিকুমুদ সত্ত্ব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃত্তা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর]

অতএব ‘গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥’ এখন কেউ কেউ বলবেন—শিক্ষাগুরু ও তাঁর প্রাধান্ত । “শিক্ষাগুরুকে ত’ আমি কৃষ্ণের স্বরূপ । অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥” ছোটো ভাগে ভাগ করেছেন শিক্ষাগুরুকে । অন্তর্যামিরূপে রয়েছেন সেই চৈতন্যগুরু, আর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মহান্তগুরু বা দীক্ষাগুরু । অন্তর্যামী শিক্ষাগুরুগণ যে প্রাধান্ত দিচ্ছেন—দীক্ষাগুরুগণ অপেক্ষা শিক্ষাগুরু শ্রেষ্ঠ, সেটা হতে পারে না ।

গুরুাচার্য্য কোন গুরু হলেন ?—তিনি প্রকৃত গুরু মন । যেমন—পরশুরাম । ভীষ্মদেব গুরু পরশুরামকেও ত্যাগ করলেন । কিন্তু কেন ত্যাগ করলেন ? তিনি ত’ ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার । ভীষ্মদেব ত’ তাঁর শিষ্য । অহা, অধিকা ও অহালিকাকে ভীষ্ম জয় করে এনেছিলেন । অধিকা এবং অহালিকাকে ভাই বিচিত্রবীর্ষ্য ও চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে বিয়ে দিলেন । কিন্তু অহা শল্যরাজকে ভালবাসতেন । শল্যরাজ অহাকে বিবাহ করল না । তখন অহা ভীষ্মকে বিয়ে করতে চাইল । কিন্তু ভীষ্ম বললেন,—‘আমি ত’ প্রতিজ্ঞা করেছি বিবাহ করব না । তুমি গুরুর কাছে যাও । গুরু বললে ‘গুরোরাজ্ঞা হবিচারণীয়া’—গুরুর আজ্ঞা অবিচারে পালন করতে হয় । পরশুরামের কাছে গেলেম । পরশুরাম ভীষ্মকে বিয়ে করতে বললেন । কিন্তু ভীষ্ম বললেন,—

সে কি গুরুদেব ! আমি ত' প্রতিজ্ঞা করেছি আকুমার ব্রহ্মচারী থাকব, জীবনে বিয়ে করব না, আর আপনি গুরু হয়ে একি কথা বলছেন ! পরশুরাম বললেন,—আমি গুরু বলছি—বিবাহ কর ।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকাৰ্য্যমজ্ঞানতঃ ।

উৎপত্তপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

উৎপত্তগামী গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধি । ভীষ্ম গুরুকে পরিত্যাগ করলেন । তখন গুরু বললেন,—‘বুদ্ধং দেহিং’ । যুদ্ধ কর । আঠার দিন যুদ্ধ করে ভীষ্ম পরশুরামকে পরাস্ত করে জয়লাভ করেছিলেন । এইজন্ত তাঁর নাম হয়েছিল ‘রামজয়ী’ । অতএব এই যে বাইরের যোগ্যতা, এটা গুরুর কার্য্য নয় । গুরু কে ?—যিনি ভগবানের পাদপদ্ম দেখিয়ে দিতে পারেন, তিনি প্রকৃত গুরু । কতকগুলো Power সঞ্চয় করলাম, তার দ্বারা গুরু হয়ে যাব, ভগবানকে পেয়ে যাব—সেটা হবে না । যোগীদের অনিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ হয় । কিন্তু সিদ্ধির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে না ।

জীবো সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈতন্যরূপে ।

শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহাস্তম্বরূপে ॥

চৈতন্যগুরুর সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎ নাই । ‘চৈতন্যগুরু হন কৃষ্ণ মহাস্তম্বরূপে’—অতএব মহাস্তম্বরূপে তিনি গুরু হন । মহাস্তম্বরূপেই দীক্ষাগুরু । শিক্ষাগুরুকে মহাস্তম্বরূপে কোথাও বলা হয় নাই । স্পষ্টভাবে এখানে বলেছেন—কে খণ্ডন করবেন করুন এই কথা ।

ভগবৎশিক্ষা দিলেই কি তিনি শিক্ষাগুরু হবেন ? শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর আত্মগত্যে সেবা করার শিক্ষা দিবেন । দীক্ষাগুরুকে বাদ দিয়ে যদি তিনি নিজের ‘অহং ব্রহ্মস্মি’র জায় ব্রহ্ম হয়ে যান, তা কখনও হতে পারে না । দীক্ষাগুরু হচ্ছেন মহাস্তম্বরূপ—যিনি জীব উদ্ধার করার জন্ত এসেছেন । গুরু দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ । ভগবান গুরুকে পাঠান জগতে কখনও নিত্যসিদ্ধ করে, আবার কখনও সাধনসিদ্ধ করে । দীক্ষাগুরু যদি ভগবৎপ্রেরিত জন হন, তিনি শিষ্ট করবেন লোককে উদ্ধার করবার জন্ত । তিনি ত' প্রেরিত সন্তান জীবকে উদ্ধার করবার জন্ত । এইজন্ত তাঁকে মহাস্তম্বরূপ বলা হয়েছে । তিনি ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করে থাকেন । ভাল করে জিনিসটা বুঝতে হবে ।

বৌদ্ধবাদ যখন জগৎটাকে আচ্ছন্ন করল, দয়াধর্ম প্রচার করলেন বৌদ্ধরা,

তখন শিবকে ভেকে স্বয়ং ভগবান্ বলছেন,—যাও তুমি জগতে । জগতে গিয়ে তুমি বেদের কদর্থ কর ।—

স্বাগঠৈঃ কল্লিতৈশ্চক্ৰ জনামধিমুখান্ কুরু ।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্রাৎ সৃষ্টিরেবোত্তরোত্তরা ॥

আমাকে বাদ দিয়ে জীবকে ব্রহ্ম করে দাও । ‘মাঞ্চ গোপয়’—আমাকে গোপন কর, আর ‘সৃষ্টিরেবোত্তরোত্তরা’—বহিস্মুখ সৃষ্টি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । শিব হাতজোড় করে বললেন,—প্রভু ! আমি এ কাজ করতে পারব না । আমি আপনাকে গোপন করতে পারব না । তখন ভগবান্ বললেন,—তুমি ছাড়া এ কাজ হবে না । এখন এটা দরকার । মায়াবাদ—নির্বিশেষবাদ স্থাপন করতে হবে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ তোমাকে বলতে হবে ।

ভগবানের কথাতে শিব আসলেন শঙ্করাচার্য্য হয়ে । কিন্তু শেষে পারলেন না তিনি ভগবানকে গোপন করতে । আচার্য্য শঙ্কর একল কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর জন্মস্থান কেরলে । আর শেষে বলে গেলেন,—‘ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মুঢ়মতে ।’ এটা কাঞ্চীপুরমের শঙ্করপন্থিগণ স্বীকার করেন না ।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি ।—শিব যখন কাশীতে ছিলেন, তখন একদিন শঙ্করাচার্য্য মণিকর্ণিকার ঘাট দিয়ে আসছিলেন । দুর্গাদেবী মূর্ত্তবৎ শিবকে কোলে নিয়ে রাস্তায় শুয়ে আছেন । শঙ্করাচার্য্য এসে বলছেন,—আপনি এ কি করছেন ! মড়া নিয়ে শুয়ে আছেন । মরে যান, নইলে যাব কি করে ? তখন মেয়েটি উত্তর করছেন,—আপনার সিদ্ধান্ত কি ? আপনি বলেছেন—‘জীব ব্রহ্ম’, ‘সর্বব্রহ্মমিদং জগৎ’ । যদি ‘সর্বব্রহ্মমিদং জগৎ’ হয়, তাহলে আপনি মড়া দেখছেন কি করে ? আপনার সিদ্ধান্ত কিরূপে বজায় থাকে ? তখন শঙ্কর অবাক হয়ে গেলেন । একটা মেয়ে আমাকে এরকম কথা বলেছে ! এরূপ বলার পর দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । শিব-দুর্গা নিজেই এসেছিলেন তত্ত্ববর্নন প্রকাশ করার জন্ত । অতএব নির্বিশেষ মতবাদ—অঐত্ববাদ টিকবে না । এতে অকাটা কোন যুক্তি নাই ; হুতরাং অঐত্ববাদ অপ্রমাণিত ।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব কি করে জানা যাবে ? “কৃষ্ণ যদি রূপা করেন কোন ভাগ্যবানে । গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥” তর্কের দ্বারা কি জানা যাবে ? —না, ‘কৃষ্ণ যদি রূপা করেন কোন ভাগ্যবানে’—এখানে কোন ভাগ্যবানে বলেছেন, সকলের ভাগ্যে হবে না । ‘গুরু অন্তর্যামি-

রূপে শিখায় আপনে ॥’—‘তিনি অন্তর্যামিরূপে শিখাবেন। কৃষ্ণ রূপা করে ত’ গুরুদেবকে পাঠিয়েছেন। কৃষ্ণ যদি রূপা করে গুরুকে না পাঠাতেন, তাহলে আপনি কৃষ্ণরূপাটা লাভ করতেন কোথা থেকে? গুরুকে ত’ পাঠালেন সেইজন্য আপনার কাছে। আপনি যদি আধার তৈরী করেন, তাহলে ঠিক আপনার আধারে সেই রূপাটা আপনা থেকে এসে যাবে। শ্রীস জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন,—‘ভগবৎরূপা ভক্তরূপাগামিনী, ভক্তরূপা ভগবৎরূপাগামিনী।’ ভগবানের রূপাটা গুরুরূপায় লাভ হবে এবং গুরুরূপাটা ভগবানের রূপায় লাভ হবে। এটা শুভপ্রোতভাবে সম্পর্কবৃত্ত। ভগবান্ রূপা করলে আমি গুরুরূপা পাব, গুরু রূপা করলে আমি ভগবানের রূপা পাব। কিন্তু শিক্ষাগুরু যেখানে দস্ত করছেন—‘আমি দীক্ষাগুরুর মত সম্মানের পাত্র’, সেইটাকে অজ্ঞায় বলা হয়েছে। কেন শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর সম্মান পেতে চাচ্ছেন? তোমার একজন গুরুভাই শ্রদ্ধা। নিশ্চয় প্রণাম করবে তাঁকে, কিন্তু তোমার গুরুদেবের সম্মুখে নয়—এইটাই বক্তব্য। গুরুদেবের কোন গুরুভাই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গুরুভাইকে প্রণাম করব, না—তাঁকে প্রণাম করব? গুরুকে প্রণাম করব—এই হল সিদ্ধান্ত। তিনি যদি বলেন যে, মহারাজকে প্রণাম কর, তাহলে প্রণাম করতে পার। দেটাতে অজ্ঞায় হবে না। আমরা মহাজন-পদাবলীতে পাই,—

“শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সম্ম,

বেদে মূক্তি সাবধান মতে।

যাহার প্রসাদে তাই, এ ভব তরিয়া যাই,

রূকপ্রাপ্তি হয় যাহা হ’তে ॥

গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,

আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,

যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥

চক্ষু-দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,

দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

‘প্রেম-ভক্তি যাহা হৈতে, অবিজ্ঞা বিনাশ যাতে,

বেদে গায় যাহার চরিত ॥”

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে কি বলে গেলেন? ‘সেই সে পরমবন্ধু সেই

পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে য়েই প্রেমভক্তিদাতা।’ অতএব এই জগতের যথার্থ পিতা হলেন গুরুদেব।

অমেব মাতা চ পিতা অমেব, অমেব বন্ধুশ্চ সখা অমেব।

অমেব বিত্তা অবিণং অমেব, অমেব সর্বং মম দেবদেবঃ ॥

আমি ব্রটিশ আমলে যখন রেজুন, বার্মাতে প্রচারে গিয়েছিলাম, তখন শ্রীপাদ য্যচক মহারাজ ও আমি একসঙ্গে ছিলাম। একদিন “জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’। কৃষ্ণের ‘তটহা শক্তি’ ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥”—এটা আমি পড়ছি। পড়ে য্যচক মহারাজকে বলছি,—মহারাজ! আমি একথা স্বীকার করি না। শেকি! শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, আর তুমি একথা স্বীকার কর না! আমি একটা প্রবন্ধ লিখে দৈনিক ‘নদীয়া প্রকাশ’ পত্রিকায় দিলাম। তখন শ্রীমন্তকিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রীমন্তকিনুসুম অমণ মহারাজ (শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী) প্রকাশক ছিলেন। আমি তখন ‘ভূত্যের পরিচয়’ বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে লিখেছিলাম,—‘কৃষ্ণের দাস হয় মোর পরিচয়’—কথাটা ঠিক লিখেছেন। কিন্তু এখন আমি এটা স্বীকার করি না। কেন?—কৃষ্ণের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নাই, আমি তাঁকে দেখি না, চিনি না, কিছু বুঝি না, তাঁকে পাই না। শেষে লিখেছিলাম—‘গুরুদাস হল মোর পরিচয়।’ আমার পরিচয় যদি কিছু থেকে থাকে সেটা হল ‘আমি গুরুদাস’। প্রভুপাদ সে প্রবন্ধটা পড়ে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন,—এইটুকু ছেলে এতবড় কথা লিখল। শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি প্রভুকে বললেন,—তুমি লিখে দাও, গুরুদেব তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন তোমার সিদ্ধান্ত পড়ে। ঠিকই ত’ আমরা কৃষ্ণকে কোথায় দেখছি। আমরা কৃষ্ণকে পাখর দেখছি। আমার এই যে মাটিয়া বুদ্ধি, জড়ীয় বুদ্ধি, এটা অপদারিত করে দিবেন যিনি, আমার চোখের ছানিটা কাটিয়ে দিবেন যিনি, তিনি হলেন শ্রীগুরুদেব। তাঁর কল্পণায় ভগবানের দর্শন হবে। অতএব তাঁকে বাদ দিয়ে মহাবটা কার দেব? আমি অণ্ডের মহত্ত্ব দেব কিসে?—আমার গুরুরূপা লাভের জন্ত। আমার গুরুরূপা-বঞ্চিত জীবনে আমি কারও মহত্ত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে রাজী নই, তিনি যে কেউ হোন না কেন।

গুরুজ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গেছেন। গিয়ে কি বলছেন?—‘বংশী ধরিয়ে ছাড়িয়ে ধনুর্ধ্বাণ।’ গুরুজ প্রণাম করছেন না রামচন্দ্রকে। ধনুর্ধ্বাণ ছেড়ে দিয়ে বংশী ধর, তবে তোমাকে প্রণাম করব। হতুমান গেছেন কৃষ্ণের কাছে।

গিয়ে বলছেন,—‘ছাড়িয়ে বংশীধ্বনি ধরিয়ে ধরুর্বাণ।’ নিষ্ঠাটা কোথায়?—

‘শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাশ্রমি।

তথাপি মম সর্বস্বা রামঃ কমললোচনঃ ॥’

আমার সর্বস্ব হল শ্রীরাম-কমললোচন। আর আমার কেউ নাই। অতএব নিষ্ঠা—শিশুর গুরুনিষ্ঠা রাখতে হবে। গুরুনিষ্ঠার দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুনিষ্ঠা ব্যতীত কাহারও ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয় না। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের শিষ্য হয়ে আমি বলছি,—যদি অল্প কেউ শিষ্ট করেন, তাঁর শিষ্ট গুরুকে যথাযোগ্য সম্মান দিবেন। যদি সম্মান না দেন, তাহলে পরমার্থ জীবনবাণন তার হতে পারে না। এইটাই হল সিদ্ধান্ত।

“আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্”

কুহকিনী আশার ছলনায় মোহিত হইয়া মায়াবদ্ধ জীবগণ “দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ” রব তুলিয়া অলীক সুখের সন্ধানে ভাটবীতে ইতস্ততঃ ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে। তৃকর্ত পণ্ডিতের মরীচিকায় বাধি অহুদন্ধানের জ্বায় তাঁহারা ছলনাময়ী আশা-বিস্তারিত জড়হৃৎ প্রলোভনের ফাঁদে পা দিতে গিয়া চিরকালের জন্য আত্মহুত হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মহারাঙ্গ বিক্রমাদিত্য এক সময়ে স্বাক্ষরের প্রঃমর উত্তরস্বরূপে বলিবাছিছেন,—“আশা বৈতরণী নদী।” আশা বৈতরণী নদীর জ্বায়, অপর পারে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ আশার প্রলোভনের ফাঁদ হইতে মুক্ত হওয়া জীবগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃস ব্যাপার। জীবনকল সাধাতীত বস্তুকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে। কথায় বনে,—“আশা করেছেন কাণ্ড, পাকলে থাকেন ডেও।” কিন্তু ভ্যাংকল পাকিবার পূর্বেই যদি কাকের মৃত্যু হয়, তবে তাহার কখনও ভ্যাংকল খাইবার আশা পূরণ হয় না। জীবগণের আয়ুক্ষয় অতি ক্ষণস্থায়ী, তাই আশার হাতছানিতে মাড়া দিতে গিয়া আত্মবঞ্চিত হওয়া কি তাহাদের বুদ্ধিমানের কাজ হইবে?

আশার শেষ নাই। দরিদ্র শতপতি হইতে চায়, শতপতি সহস্রপতি হইবার বাসনা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হইতে কামনা করে, লক্ষপতি কোটিপতির ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, কোটিপতি রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট হইবার ইচ্ছা করে। তাই এক প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরি ভুরি ।

রাজার হস্ত, করে সমস্ত, কাঙ্ক্ষালের ধন চুরি ॥

মানুষ অধিক আশা করিতে গিয়া নিজের অধঃপতন ডাকিয়া আনে । কথায় বলে,—“আশায় মরে চাষা ।” চাষী প্রচুর ফলস পাইবার আশায় চাষ করে, কিন্তু যদি স্রুষ্টি না হয় তাহা হইলে ফলস জন্মে না, চাষীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । “আশার অর্দ্ধেক ফল ।” কোন কোন ক্ষেত্রে যতটা আশা করা যায়, ততটা লাভ না হইলেও, আংশিক লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হয় । কিন্তু এই আংশিক প্রাপ্য বস্তুও জীবের দুঃখের কারণ হয় । “আশার” স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া কোন এক প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

ধন্য আশা কুহকিনী ; তোমার মায়ায়

মুক্ত মানবের মন, মুগ্ধ জিভুবন ॥

ইন্দ্রিয়সুখাশ্রয়ে জীবগণ মৈথুন ধর্ম্মাশ্রয়ে দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক স্বথের আশায় অগ্রসর হয় এবং ভোগী হইয়া কর্ম্মের কর্তৃত্ব আত্মনিয়োগ করে । ষাঁহার কৰ্ম্মফল পূর্বেই দর্শন করিতে পাবেন, তাঁহার এই শ্রেণীর দুর্দশা লক্ষ্য করেন । ইহজগৎ ও কর্ম্মফলভ্য পরলোক—উভয়ই বেধ-হিংসাদিপূর্ণ ও নশ্বর । দেহাভিমানী জীব কর্ম্মক্রিয়সকলদ্বারা উত্তরোত্তর দেহধারণের নিমিত্ত বাসনাশিশুক্ত কর্ম্মসমূহের আচরণসহকারে সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন । কর্ম্মপরবশ জীব দেব-মহুগা-তির্য্যগাদি বিবিধ দুঃখপ্রদ গতিলাভ করিয়া ভৌতিক প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ভোগ করিতে থাকেন । স্বথের জন্ত—ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্ত বন্ধজীবের সকল অকুষ্ঠানই দুঃখে পর্য্যবসিত হয় । সুতরাং যে আশায় আশারিত হইয়া তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহা স্বথ প্রসব করিতে না পারিয়া অধিকতর দুঃখ আনয়ন করে ।

প্রভু ও দাস, পিতা ও পুত্র, পতি ও পত্নী প্রভৃতি পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করে, তদ্বারা জীবের নিত্য চরমকল্যাণ দাখিত হইতে পারে না, কেবল আপেক্ষিক ধর্ম্মে জীব সংসারে ভ্রাম্যমান হয় । দাংশারিক সুখ ও দুঃখ স্বতঃই লভ্য হয়, আবার অনেক সময় বহু প্রয়াদেও লভ্য হয় না । গৃহ, অপত্য, ধন, আত্মীয় ও পশু প্রভৃতি সকলই অনিত্য বলিয়া কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয় না । কর্ম্মদাক্ত বিস্ত মর্কভোভাবে ক্লেশদায়ক হইয়া তাহাদিগকে আত্মঘাতী করায় । ইন্দ্রিয়সমূহ ও বিষয়সমূহ নিত্যকাল স্থায়ী নহে এবং তাহাদের বিনাশ আছে বলিয়া প্রাপ্তিক

কষ্টস্কন্ধ কোন দ্রব্যদ্বারা বাস্তবিক প্রীতি সাধিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপে, শস্তর বাড়ী স্বর্গের ত্রায় মনোহর স্থান, কিন্তু তিন দিনের বেশী থাকিতে নাই, থাকিলে অপমানিত হইতে হয়। তাই প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়—“One day a guest, two days a guest, three days a pest”. আবার ভোগের দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি নিরসনের চেষ্টা হস্তীশ্রমের ত্রায় বৃথা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে যযাতি মহারাজ তাঁহার জী দেবধানীকে বলিয়াছেন,—

ন জাতু ক্লামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভুং এবাতিবর্জ্যতে ॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৪)

“স্বত্বদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্বাপিত হয় না, পরস্তু উত্তরোত্তর বর্জিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্জিত হইয়া যায়, উপশম প্রাপ্ত হয় না।”

শ্রীহরিভজন কন্দিবার আশাই—প্রকৃত নৈরাশ্য

ভোগময় জড়ভগতে ভোক্তার নিত্য অশান্তি বিরাজমান। ত্রিবিধ তাপ শ্রেয়ঃপথের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া সুযোগ পাইলেই অসতর্ক জীবকে নশ্বর জড়ভোগের ভোক্তা করিয়া তুলে। কর্মফলের আশা জীবের কোন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। তাই নিজ কর্তৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ও কর্তৃত্বক্ষে কর্মফল লাভ করা জীবের মন্দবুদ্ধিরই পরিচয় মাত্র। আত্মদর্শিগণ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্যবিষয়সমূহ অনিত্য জানিয়া ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ও উপভোগ করেন না। তিনি জানেন যে, শ্রীহরিশ্রবণ ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সমূহের অলুপ্ত চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ হইয়া থাকে। বিষয়ানন্ত দুর্লব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত কষ্টজনক, স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও যাহা জীর্ণর প্রাপ্ত হয় না; সেই দুঃখরাশি—বহনকারিনী ভোগ-পিপাসাকে প্রকৃত সুখাভিলাষী ব্যক্তি অতি নীচ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজা যযাতি বছবর্ষ পর্যন্ত বিষয়ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পক্ষবয় উৎপন্ন হইলে, পক্ষীশাবক যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যযাতিও ইন্দ্রিয়ত্বের আশা ক্ষণিকের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

যস্ত যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।

ভজন্তি চরণান্তোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥ (ভাঃ ৯।১৩।৮)

“হরিবুদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ—‘দেহের বিয়োগ হইবে’—এই ভয়ে কাতর

হইয়া দেহযোগ অর্থাৎ দেহগত স্থখ বাসনা করেন না, কিন্তু কেবল সেবাস্থখ-বাসনায় ভগবৎপাদপদ্ম ভজন করিয়া থাকেন ।”

জড়ভোগের আশায় জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার কু-বাসনা কখনও বদ্ধজীবকে বাবণ, কংস ও জরাসন্ধ বা অঘ-বক-পুতনার আত্মগত্য করাইয়া প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ করায়। জড় জগতের ক্ষণভঙ্গুর আশা-প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া বৈষ্ণবাত্মগত্যে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে বদ্ধজীবের সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হয়। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

‘হরি’ ব’লে দেও তাই আশার মুখে ছাই রে।

(আশার ত’ শেষ নাই রে)।

ফল্গুবৈরাগ্য জীবকে দান্তিক করিয়া তুলে; যুক্ত বৈরাগ্যই জীবকে বিস্তৃকসঙ্কে বা অপ্রাকৃত বিচারে অবস্থান করায়। জড়ভোগের আশা-ভরনার প্রদীপ নির্বাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীহরিপদপঙ্কজ-সেবায় ভক্তের আশা স্থান লাভ করিতে পারে না।

সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে মানবের ইন্দ্রিয়গুলি আকৃষ্ট হয়, উহাই বদ্ধজীবের মূঢ়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেবা-বিমুখ ব্যক্তি কপটতা করিয়া কিছুকালের জন্য যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তব্ধ করেন, তাহা তাহার অমঙ্গলের জন্য নাশিত হয়। নিত্যবস্তুর অচূলস্বাদ-সাহিত্যই এই অমঙ্গলের কারণ। মূঢ়তা-প্রযুক্ত জীবগণই জড়ের ভোক্তা পুরুষগণকে স্বীয় প্রভু-জ্ঞানে তাহাদের নিকট হইতে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য কামনা করে। এইরূপ প্রবৃত্তি অদাস্তেন্দ্রিয় জীবগণের মোহবিস্তারের কারণ। বিবেক উপস্থিত হইলেই জীবের প্রেয়ঃ পথাত্মগমন শ্রীহরিভজনরূপ শ্রেয়ঃ পথাত্মদরশে পরিণত হইতে পারে। অতএব, শ্রীহরি-ভজনের দ্বারাই যে জীবের জড়ীয় আশার একমাত্র নিবৃত্তি সম্ভব, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমহাপ্রভুর আলোকে রথযাত্রা

“আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাং-দিবাচ্ছবি-সুন্দরায়।

তশ্চৈ মহাপ্রেম-রসপ্রদায় চৈতন্ত্যজ্ঞায় নমো নমস্তে ॥”

“কদাচিত্ কালিন্দীতট-বিপিন-সদ্বীত-তরলো

মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ মধুপঃ।

রমা-শঙ্কু-ব্রজামরপতি-গণেশাঙ্কিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥”

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সমাগত। শ্রীমহাপ্রভু এক নবলীলার উন্মাদনার মাতিয়া উঠিয়াছেন এই রথযাত্রা উপলক্ষে। তিনি কানীশিখ, পড়িছাপাত্র ও মার্কভোম ভট্টাচার্যের নিকটে সন্তুষ্ট হইয়া যাত্রা করিতেছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মার্জনের জন্ত। ভক্তেরা ভাবিতেছেন—প্রভুর একি লীলা? আমরা থাকিতে তিনি নিজে কেন মন্দির মার্জন করিবেন?

শ্রীমহাপ্রভুর এই নব লীলারশ্রুতে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে জানিয়া লই,—এই শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ কে? নীলাচলে মহাপ্রভুর কেন এই প্রবল আকর্ষণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দর্শনের?

“রাগময়ী স্তম্ভি প্রচারেচ্ছাই গৌরাবতারের মুখ্য কারণ।” জগন্নাথ-বিগ্রহ প্রেমে বিগলিতবিগ্রহ। নারদের প্রার্থনার পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কলিতে এই রূপেই দেবিত হইতেছেন পুরীধামে রাজা ইন্দ্রহাসের নির্মিত শ্রীমন্দিরে। দ্বারকায় মহাবীগণ যখন স্তম্ভকে দ্বারে প্রহরার রাখিয়া কুরুধার-কক্ষে মাতা রোহিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বৃন্দাবনলীলা-কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন সেই কুরুধারে দাঁড়াইয়া প্রেম কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ, স্তম্ভ ও বলরাম বিগলিত হইয়া জগন্নাথ-বিগ্রহরূপে রূপান্তরিত হন। কলিতে এই রূপেই দেবিত হইবেন—এই ছিল শ্রীভগবানের ইচ্ছা। এই কারণে রাজা ইন্দ্রহাসকে নীলমাধবরূপে স্বপ্নে দর্শন দিয়াও সেই রূপে তিনি তাঁহাকে ধরা দিলেন না। ধরা দিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহরূপে।

তাই শ্রীজগন্নাথ সাক্ষাৎ শ্রীভক্তজন্মদন। গৌরাবতারে অবতারী শ্রীগৌর-সুন্দর রাধা-ভাব-কান্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর দীর্ঘ বিরহাস্ত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন ব্রজে তাঁহার নিত্যসহচর শ্রীকৃষ্ণরূপে। এজন্ত মহাপ্রভু প্রকট জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষ

বিপ্রলভভাবে বিতোর হইয়া লীলা করিয়াছেন নীলাচলে জগন্নাথদেবের সন্নিকটে ।

এবার প্রশ্ন,—মহাপ্রভু কেন জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সন্মুখীন করিয়াছেন ? কেন প্রভুর এত উন্মাদনা রথযাত্রা উপলক্ষে ? ‘দীর্ঘ বিরহান্তে রাধিকার কৃষ্ণ দর্শনোৎসাহ ভাবময় প্রভু দর্শন করিতেন জগন্নাথদেবকে ।’

“যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন ।

মনে ভাবেন,—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥” (১৫: ৮:)

“কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন-স্বর্থ লাভ করেন । প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণ-বিরহভাব উদ্দীপিত ছিল । কেবল যে যে সময় জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেই সব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলনভাব তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভিত হইত ।”

“সেই ত’ পরাণনাথ পাইছ ।

যাহা লাগি’ মদন-দহনে কুরি’ গেছ ॥”

“কৃষ্ণদর্শনোৎসাহ গোপকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে সন্মুখপঙ্ককে প্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ জনগণের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌর-সুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান । গোপললমাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোপকুলের মাধুর্য্য আশ্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাঁইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ শ্রীগুণচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বাঁধভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণিচয়ন লইয়া যাইতেছেন ।”

এই উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু রথযাত্রার সন্মুখীন করিয়াছিলেন । এবার এই রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমহাপ্রভুর যেনবলীলা, সেই লীলায় আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি ।—

শ্রীমহাপ্রভুর রথযাত্রার পূর্ব প্রস্তুতি :—

শ্রীগুণচামন্দির-মার্জ্জন করিবার জন্ত প্রভু ভক্তগণসহ প্রভাতে যাত্রা করিবেন । একারণে বহু ঘট ও সংমার্জ্জনী আনিতে আদেশ করিলেন । পড়িছা প্রভুর ইচ্ছায় একশত ঘট ও শত সংমার্জ্জনী আনিলেন । প্রভাতে প্রভু সকল ভক্তের অঙ্গে নিজহস্তে চন্দন লেপন করিয়া শ্রীহস্তে এক একটী মার্জ্জনী প্রত্যেককে দিলেন । এইবার সকল ভক্তগণ লইয়া শ্রীগুণচামন্দিরে

দৌছাইয়া সকল ভক্তসহ প্রভু স্বহস্তে শ্রীনাথসহ মন্দির মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের ভিতর-বাহির, সিংহাসন সর্বত্র অতি নিখুঁতভাবে পরম স্বস্ত্রের সহিত প্রভু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অতি অপূৰ্ণ। ভগবান্ স্বয়ং ভগবান্দির মার্জ্জন করিয়া ভক্তদের শিখাইতেছেন।

“চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।

আপনি শোধন প্রভু, শিখান সবারে ॥

প্রেমোন্মাদে শোধন, লয়েন কৃষ্ণনাম।

ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে, বরে নিজ কাম ॥

ধূলি-ধূসর-তহু দেখিতে শোভন।

কাঁধা কাঁধা অশ্রুজলে বরে সংমার্জ্জন ॥”

এবার প্রভু ভক্তগণকে মন্দির-অভ্যন্তরের ধূলি-তৃণ-বিলুপ্ত প্রভৃতি জগ্জাল বাহিরে রাখিতে বলিলেন এবং জগ্জালের পরিমাণ অহুসারে প্রত্যেকের কার্যের অবত্যা করিলেন।

“সবার ব্যাটান বোঝা একত্র করিল।

সবা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥”

পুনরায় প্রভু পৃষ্ঠধূলি-তৃণ-কাঁকর দূর করিবার উত্ত মার্জ্জন করিলেন।

“সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।

দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥”

অপর সপ্তদ্বারের ভক্তগণও মন্দির মার্জ্জনে প্রভুর সহিত যুক্ত হইলেন। এইবার শত শত ঘট পূর্ণ করিয়া ভক্তেরা জল আনিতে লাগিলেন মন্দির প্রক্ষালনের জন্য। প্রভু শ্রীহস্তে ভক্তগণসহ মন্দিরের উর্দ্ধ-অধো-ভিত্তি, গৃহমধ্য সিংহাসন, সকলকিছু উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু স্ববস্ত্রে গৃহ ও সিংহাসন মার্জ্জন করিলেন।

“নিজবস্ত্রে কৈল শুভু গৃহ সংমার্জ্জন।

মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মাজল সিংহাসন

শতঘট-জলে কৈল মন্দির মার্জ্জন।

মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ ঘন ॥

নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।

আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥”

প্রভু শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে শ্রীহস্তে মার্জ্জন ও প্রক্ষালনের কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে স্বয়ং প্রভু আচরণ করিয়া অপরকে শিখাই-

তেছেন। তাহা ছাড়া স্বষ্ট সেবকের সেবার প্রশংসাও করিতেছেন। উপরন্তু স্বষ্ট সেবককে আচার্য্যের কার্য্য করিবার নির্দেশও দিতেছেন।

“তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্তরে।

এইমত ভাল কর্ষ দেই যেন করে।

এইমত সব পুরী করিল শোধন।

শীতল নির্মল কৈল যেন নিজ মন।”

শ্রীমহাপ্রভুর গুণ্ড্যামদিধ-মার্জ্জন লীলা রংস্ত্র, পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অমৃতভাষ্যের ব্যাখ্যা হইতে আমরা সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিব। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্পর্কে কি বলিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে চেষ্টা করি।—

“জগদগুরু মহাপ্রভু এই লীলাটির দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন দোষাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংগাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টিকে নির্মল, শাস্ত্র ভক্ত্যুজ্জল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেবা ভগবান্কে বদান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্ত্যভিলাষ, কর্ষ, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যেখানে ভক্তীতর অগ্ন্যভিলাষ, জ্ঞান-কর্ষযোগ-তপত্বাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল-ভাবদ্বারা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসরস্বতী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্ত্যভিলাষ অর্থাৎ জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব—এইরূপ ইতর অভিলাষ। উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদ্যবৃত্তি কেবলাভক্তিকে বিধ্ব করে। কর্ষ্যচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্তা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখভোগ করিব—এরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া; উহা ধূলিনদৃশ। কর্ষ্যবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। নং ও অনং কর্ষের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জঘন্যমান্তর ধরিয়া মগ্নন করিয়াছে, তাই তাহাদের কর্ষ-বাসনা দূর হইতেছে না।

নির্কিংশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞানযোগাদি চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল

বিক্রি করিবারই প্রয়াস করা হয়। স্বতরাং ভগবান্ তাদৃশ বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। দেইজ্ঞত গৌরহৃদয় ঐসকল ধূলি-তৃণ-খিঁকুরাদি আবর্জ্যাবাশি ভগবদ্ব্যক্তির চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না। পরন্তু নিজ বহির্বিদ্যার তৎপন্থ্য বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, পাছে বাতায় সহায়তায় ঐ সকল জ্ঞান পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও স্বয়ং স্বয়ং মল থাকিয়া যায়। উহাকে ‘কুটিনাটি’, ‘প্রতিষ্ঠাশা’, ‘জীবহিংসা’, ‘নিষিদ্ধাচার’, ‘লাভ-পূজা’ প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে ‘কপটতা’। প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে মিচ্ছন ভঙ্গনাদি বা বুদ্ধকগীদ্বারা নির্বোধ লোক আমাদের একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুচ—এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থ পূরণোদ্দেশ্যে কাটিনাপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবভান প্রদর্শনদ্বারা তত্ত্ব বা অবতার সাক্ষিবার আশা। জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে কুষ্ঠতা বা রূপগতা, মায়াবাদী কর্মী বা অস্ত্রাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের ‘মন’ রাখিয়া কথা বলা। লাভ-পূজা-শব্দে ধর্মের নামে হরিনাম মন্ত্ৰ, বিগ্রহ-ভাগবতজীবী হইয়া নির্বোধ লোককে ঠাটাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি, নিষিদ্ধাচার-শব্দে জীদগ এবং কর্মী, জ্ঞানী ও অস্ত্রাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তের দল বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁচর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি কাটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরহৃদয় দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জনদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোন মূক্তি-কামনারূপ সূক্ষ্মদাগ লাগিয়া থাকে তজ্জন্য তিনি নিজের পরিবেশ শুক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎ-পীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন, মার্জ্জন, ঘষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার, লেশ, এমনকি একটা সূক্ষ্ম দাগও নাই। শ্রীমন্দিরটি ফটিকবৎ নির্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার স্নীগতলও হইল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টি রবিতপ্ত মরুভূমিসম তাপহীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাদনাজনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালারহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহার হৃদয় হইতে অস্ত্রাভিলাষ ও কর্ম-জ্ঞান-মোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি—শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শাস্ত ও স্নীগতল হয়।

এইরূপে শ্রীগৌরহৃদয় কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত

করিয়া স্বরাট কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্ত, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাহার জন্ত মহোৎসাহের সহিত উঠেঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীব্যভিমান করিয়া অগদ-গুরুরূপে স্বয়ং মহাপ্রভু শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রতিভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার কাজ ভাল হইতেছে তাহাকে প্রশংসা এবং যাহার সেবা কৃষ্ণবাহ্যপুষ্টিময়ী শ্রীরাধার ভাবস্ববলিত প্রভুর নিজ মনমত হইতেছে না, তাহাকেও পবিত্র ভৎসনাপূর্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্য-শিক্ষাগত লক্ভজন-কৌশল, অপরজ্ঞানে ভক্তিযোগবৃত্ত শুঃহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্তও আদেশপূর্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার যিনি যতবেশী পরিমাণে অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহারপূর্বক পরিহার করিতে সমর্থ, তিনি ততবেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটয়াছে, তাহার পক্ষে শান্তিধরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।”

শ্রীকৃষ্ণগরাধদেবের রথযাত্রার পূর্বপ্রস্তুতি মহাপ্রভু এইভাবেই সমাপন করিলেন। এ প্রস্তুতি ব্রজগোপীগণ যে প্রতিদিন বৃন্দাবনকে অর্পণ নবমাজে সাজাইতেন এই আশা লইয়া যে—বৃন্দাবনচন্দ্র কখন কোনদিন কোনসময়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন বৃন্দাবনে, তাহাকে আনন্দ দান করিবার জন্ত ব্রজগোপীগণ যে প্রস্তুতি লইয়া সাজাইয়া রাখিতেন তাহার প্রেমস্থলীকে—গেই প্রস্তুতি। মহাপ্রভু মহাভাব-স্বরূপী ব্রজবিলাদিনীর ভাব-কান্তি। সেই কারণেই ত’ বহুদিনের বিরহান্তে তাহার প্রেমাম্পদকে সুখমাগরে নিমগ্ন করিবার পূর্ব-প্রচেষ্টা তাহার গুণ্ডিচামন্দির পরিমার্জন। ভক্তগণ বাধারাপীর নিত্যসঙ্গিনী ব্রজগোপীগণ। গোপীনাথের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের পূর্বপ্রস্তুতি তাহার সমাপন করিলেন গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনেই মধ্য দিয়া। (ক্রমশঃ)

(আমার পরম আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে লিখিত ।)

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বশিরহাট (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১১ পৃষ্ঠার পর]

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈবৈভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পুরমব্যয়ম্ ॥

ত্রিগুণবিত মায়া । মায়া থেকে ত্রিগুণ এনেছে—সত্ত্ব, রজঃ, তম । ভগবান্ ত্রিগুণের অতীত । সেইকথাই ত' শাস্ত্রে বলা হয়েছে । অথচ আমরা ভগবান্কে সেই ত্রিগুণের মধ্যে কেনতে চাচ্ছি । আমরা বোকা, হতভাগ্য । সেইজন্য ত' ঐরকম Motive । 'মায়া মিশাইয়া এগ ভগবান্ ।'—কোন কবি প্রার্থনা করছেন । ভগবান্কে মায়া মিশিয়ে আপতে হবে কেন ? ভগবানের যে নিজস্ব প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ত' তিনি এ জগতে অবতীর্ণ হন । সেই কথাই ত' গীতা-ভাগবতে লেখা আছে ।—

নাহং প্রকাশঃ সর্বকৃৎ যোগমায়া-সমাবৃতঃ ।

মৃঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মায়াজমব্যয়ম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে বলিতেছেন,—সত্যবিক, নির্দোষ যারা, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব আছে যাদের, তারাই মনে করে,—আমি অব্যক্ত ছিলাম, আমি ব্যক্ত হয়েছি ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মনন্তে মায়াবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মায়াব্যমহন্তমম্ ॥

'অবুদ্ধয়ঃ' গালাগালির পরিভাষা । 'অবুদ্ধয়ঃ'-শব্দের অর্থ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি, অজ্ঞ ব্যক্তি । তারাই মনে করছে—আমি অব্যক্ত ছিলাম, ব্যক্ত হলাম ।

তা ত' নয় । সূর্য্যদেব এখন Eastern hemisphereএ নাই, Western hemisphereএ চলে গেছেন, তাই বলে আমি যদি বলি—সূর্য্যদেব মরে গেছেন । সেটা বলা চলবে?—না, তিনি সবদময় আছেন । তদ্রূপ ভগবান্কে যারা ঐরকম বলতে চাচ্ছে—চোখের নামনে যখন দেখলাম তখন

মানলাম, আর যখন চোখের আড়াল হলেন তখন বললাম মরে গেছেন । বোকা কোথাকার ! ভগবান্ অব্যক্ত, তিনি ব্যক্ত হয়েছেন—এই যে বিচার, এটা সম্পূর্ণ ভুল । ভগবান্ ির ব্যক্ত, মিত্য প্রকাশিত তত্ত্ব । অব্যক্ত ভাবটা Negative idea, শুটা positive idea নয় । আগে ব্যক্ত, তারপর অব্যক্ত ।

শ্রীতায় কৃষ্ণ অজ্ঞানকে দিগে সাবধান করেছেন । অজ্ঞান ! কতকগুলো লোক

কি ভাবছে জ্ঞান ? এই অব্যক্তের যে চিন্তাটা, এটা একটা বিরাট সূক্ষ্ম চিন্তা ! ভগ্নানক দার্শনিক বাহাদুরি এই চিন্তার মধ্যে ! বহু বোকা লোক ভাবছে এটা ! শ্রীভগবান্ গীতার ‘অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং’ যেরূপ বলেছেন, তদ্রূপ বলেছেন,— “ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যাক্তা হি গতির্হুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥”

যারা অব্যক্ত-চিন্তায় আসক্ত, তারা সব বোকা লোক, তাদের অধিক ক্লেশ, তারা দুঃখজনক গতি লাভ করে। সূর্য্যদেবের অস্তিত্ব যেরূপ মেনে নিতেই হয়েছে, শ্রীভগবানের অস্তিত্বও তদ্রূপ। আমি জানালায় পাশে বসে আছি। একটা সওয়ারী ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলে গেল। আমি কি বলব—ঘোড়ার সওয়ারী আদৌ ছিল না, আর পরেও নাই। জানালায় যতটুকু আমার চোখের দৃষ্টি, ততটুকুই আমি দেখতে পেয়েছি। ঘোড়া-সওয়ারীর অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল, পরেও থাকবে। তদ্রূপ ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব। যারা ভগবানকে অব্যক্ত বলতে চাচ্ছে—ভগবান্ অব্যক্ত, ভগবান্ নির্বিশেষ, ভগবান্ নিরাকার, ভগবান্ নিগূঢ়, ভগবান্ নিঃশক্তিক—এই সব কথা বলে যারা ভগবানের ভগবত্তা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, তাদের মত চরম নাস্তিক ছনিয়ায় আর কেউ নাই। সমগ্র জগৎকে তারা ইংস করছে আজ। ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা জগৎকে বিপথগামী করছে। যারা বলেছেন—ভগবান্ হুর্বাতিপরায়ণ, ভগবান্ বলে কোন কিছু নাই, আর ভগবান্ ত’ মাল্ধই, তারা অনাছন্দ। বিশ্বস্ততা, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তাহলে আমাদের বেপরোয়াগিবি করতে খুব স্বেধা, যথেষ্টাচারী হতে যথেষ্ট স্বেযোগ। ভগবান্ বলে মালিক যদি কেউ থাকেন, তাহলে মুক্তি হয়ে যাবে ত’। নাস্তিকের শয়তানি বুকি রয়েছে এরূপ চিন্তার পিছনে। ভগবান্ বলে একজন্মকে মেনে নিলে ত’ আমাদের নাস্তিক হওয়া যাবে না !

ভগবানের যে আচরণ, জীবের কি সেই একই আচরণ হবে ? ভগবানের নিজস্ব কতকগুলি আচরণ আছে—শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। পিতার কতকগুলো নিজস্ব আচরণ আছে, আর পুত্র-কন্যারও কতকগুলো নিজস্ব আচরণ আছে। সেটাকে কখনও এক বলে ধরলে হবে না। যিনি পরাৎপরতঃ ভগবান্, তাঁর নিজস্ব আচরণগুলো জীবশিকার জন্ত নয়। শাস্ত্রে লোকশিকার জন্ত যে বাণী প্রচারিত হয়েছে সেটা পৃথক্, আর ভগবানের নিজস্ব আচরণ পৃথক্। ভগবানের নিজস্ব আচরণ জীব যদি অলঙ্করণ করতে যায়, তাহলে জলে পুড়ে মরবে। সেই কথা লেখা আছে শাস্ত্রে, ভুরি ভুরি উদাহরণও আছে।

যখন সমুদ্র মহান হয়েছিল, তখন বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। ঐরাবত হস্তী, লক্ষ্মীদেবী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অমৃত ও গরল পাওয়া গেল। কিন্তু এই যে গরল এটা কে গ্রহণ করবেন? উপযুক্ত মানুষ সন্ধান করে পাওয়া গেল শিবঠাকুরকে। তাঁকেই দেওয়া হল গরলটা। তিনি সেই গরল পান করলেন। যদিও তিনি সেই গরল পান করে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তাহলেও শিবঠাকুর শিতিকর্ষ, নীলকর্ষরূপে থেকে গেলেন। বিষ খেয়ে হজম করে দেওয়ার মত ক্ষমতা শিবঠাকুরের ছিল। তাই তাঁকে এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল।

যারা আজ মনে করছেন,—আমরা সব শিবঠাকুর বনে গেছি, তারা সবাই গরল পান করুন না, খান না এতিনু, দেখা যাক কি হয়! Scientific Laboratory-র পটাসিয়াম সাইনাইড আর দরকার হবে না। মানুষ আজ বিজ্ঞান। সে সবসময় অন্ধ কবতে চাচ্ছে কিনা ভগবানু আর আমি—তুই সমান! আগে অধিকার লাভ কর, তারপরে অলৌকিক কিছু বলবে। শিবঠাকুরের অধিকার লাভ না করে যে বিষপান করতে যায়, তার যে অবস্থা হবে, এইসব নাজা ভগবানু যারা আছেন বা ভগবানের সিংহাসন দখল করার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট যেসব ব্যক্তি আছেন, তাদের কি সেই অধিকার হবে? তারও ছুরি ভুরি উদাহরণ আছে।—

শৃগাল বাসুদেব। কৃষ্ণ যখন রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি ‘বাসুদেব’ নাম নিয়েছিল। বাসুদেব নাম নিয়ে প্রচার করতে লাগল যে, ‘আমি কৃষ্ণের সঙ্গে সমান।’ তাকে সবাই ‘শৃগাল বাসুদেব’ বলতে লাগল। নাজা বস্তু কি আসল হবে কোনদিন? একটা কাককে রাজহংসের পালক দিয়ে স্তম্ভর করে নাজালে সে কি রাজহংস হবে? রাজহংসের আচরণ করতে পারবে সে? যেতে পারবে সে মানদ-সরোবরে? তথায় বিচরণ করতে পারবে কি সেই কাক? শাস্ত্রে উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে।—

কাকস্ত চকু যদি স্বর্ণযুক্তা, মাণিক্যযুক্তং চরণং চৌতস্ত।

একেক পক্ষে গজরাজমুক্তা, তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥

কাকের চোঁটটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হল, মণি-মাণিক্য দিয়ে পা দুখানা মুড়ে দেওয়া হল, আর এক এষ্টা পাখনা তার গজরাজ-মুক্তা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। তাহলে কি কাক তার বৃত্তি ছাড়বে? সে কি রাজহংসের কাজ করতে পারবে?—হবে না কোনদিন। সেইজন্য কথাটা আসছে—হে জীব! তুমি কেন ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ? তুমি কেন পরব্রহ্মের সিংহাসন দখল

করবার দুঃখা পোষণ করছ ? শুটা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সেবক, আশ্রিত-ভক্ত। তুমি সেবা কর, সেবা করে ধন্ত হও। আমি চিনি খাব, না—চিনি হয়ে যাব ?—সমাজে একপ প্রশ্ন আছে। আমি যদি চিনি হয়ে যাই, তাহলে আত্মজ-আত্মদন কিছই বুঝা যাবে না। চিনি খেতে বলছেন মানে—সেবা-রস আত্মদান কর তুমি। “সেবা-কথা-রসমহো নিতরাং পিব ত্বম্”—সেই কথা শাস্ত্রে বলেছেন।

সেবারস আত্মদান করতে বলেছেন। আমি সেবক বা সেবিকা। আমি সেবারস আত্মদান করব। ভগবান্ হলেন পরম সংসেব্য বস্তু, আর মিথিল বিশ্বের জীবাত্মা হলেন সেবক বা সেবিকা। যদি জীবকে শক্তি ধরা হয় তাহলে সেবিকা-শব্দই যথাযথ, সেবক-শব্দ আসবে না। কেন বলেছেন এটা ? —এই জগতে—মাগিক ব্রহ্মাণ্ডে এখানে পুরুষ এবং স্ত্রী বিচার রয়েছে। কিন্তু চিহ্নগত একমাত্র ভগবান্ই হলেন পরম পুরুষ, আর সবাই শক্তি। সেইজন্য সেখানে বলেছেন সবাই প্রকৃতি—জীবরূপ প্রকৃতি। গীতার মধ্যেও সেই কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,—

ভূমিরাপোহমলো বায়ুঃ ধং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীয়ং যে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিত্যুতং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যথৈদং ধার্যতে জগৎ ॥

জীবভূতা প্রকৃতি। তাহলে জীব পুরুষ নহে, প্রকৃতি ; ভগবানের শক্তি। গুণবাচক বিশেষ্য। সেইকথাই ত’ শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হে জীব ! তুমি কেন ভোগী হতে যাচ্ছ ? তুমি ভোগ্য, ভোগী নহ। Material দুনিয়া কি শিক্ষা দিচ্ছে ? আজকাল আমরা সব চার্বাকের শিষ্য হয়ে পড়েছি। চার্বাক কি শিক্ষা দিয়েছেন ?—“ঋণং কৃত্বা দ্ব্যতং পিবেৎ যাবজ্জীবৎ সুখং জীবৎ । ভাস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতং ?” তোমার পরমা নাই, তুমি ঋণ কর। ঋণ কে শোধ দেবে ? আরে ! ‘মুদলে আখি, সবই ফাঁকি’, কে আবার শোধ দেবে ? এ ত’ খুব ভাল Theory ! এই নীতি-আদর্শে আমরা গা ভানিয়ে চলেছি। কে কার ধারদেনা শোধ করবে ? আর শাস্ত্র বলেছেন,—যতদিন ছয়টা ঋণ—দেবঋণ, ঋষিঋণ, প্রাণীঋণ, আত্মীয়ঋণ, নৃঋণ ও পিতৃঋণ সামাজ্য পরিমাণে থেকে যাবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাকে মাগিক ব্রহ্মাণ্ডে বারবার যাতায়াত করতে হবে। এ ত’ মুন্সিলের কথা। মাহুষের যতদিন পার্থিব জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে

এই ধরাধামে—এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে মহামায়া দুর্গাদেবীর কারাগারে বারবার যাতায়াত করতে হবে। সেইকথাই ত' গীতায় অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন,— অর্জুন! তুমি যে জন্মগ্রহণ করছ, জগতে আসছ-যাচ্ছ কেন? ভগবানকে— আমাকে যদি তুমি ভালবাসতে পার, তাহলে তোমার এই যাতায়াত বন্ধ হয়। তুমি ত' বাস্তুহারা। আজ যারা পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, এঁদের সবাইকে বলা হচ্ছে বাস্তুহারা—Displaced persons, Evacuees বলা হচ্ছে। শাস্ত্র আলোচনা করে, গীতা-ভাগবত আলোচনা করে দেখছি, আমরা সবাই বাস্তুহারা। আমরা আমাদের পূর্ব-বাস্তুভিটা হারিয়ে ফেলেছি। কোন্ বাস্তু?—যে বাস্তু ভগবানের নিত্যবাসস্থান, সেইটাই আমাদের সকলের বাস্তু ছিল। এখন সেটা হারিয়ে ফেলেছি। তথাপি আমাদের Permanent settlement-এর চিন্তা। Quarters এ যারা আছেন, তাঁদের Permanent ব্যবস্থা নয়, তাঁরা জানেন,—আমাদের চাকুরী গুটালে আবার কোথায় গতি হবে তার ঠিক নাই। কিন্তু বহু ব্যক্তি বনে আছেন যারা Permanent settlement—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাইছি। মৌরসী পাটা নিয়ে থাকতে চাচ্ছি। থাকা ত' যাচ্ছে না। দুরন্ত কাল, দুরন্ত ক্লান্ত্য সন্নিবেশ দিয়ে দিচ্ছে আমাদের যথাসময়ে। আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি থাকতে পারছি না। যদি অবস্থা তাই হয়, তাহলে পূর্বেই সময় থাকতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। মহাত্মা তুলসীদাস বলছেন কি?—হে তুলসীদাস! তুমি যখন জগতে এনেছিলে তখন জগতের লোক কি করেছিল? তাদের ঘরে একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তারা খুব আনন্দিত। আর তুলসী, তখন তুমি কেঁদেছিলে। এখন কি করবে জান?—তুমি সাধন-ভজন করে, হাসতে হাসতে এই পৃথিবী থেকে চলে যাও, আর জগৎ তোমার জন্ত কঁাদতে থাকুক।—

“তুলসী যব জগন্মে আয়ে জগ্ হসে তোম্ রোয়।

আয়সে কাশ বসন্ত চলো কি, তোম্ হসো জগ্ রোয়।”

কর্তব্য, দায়িত্ব জিনিটা ত' আজ নাই। যার অভাবে আজ সব জায়গায় গণ্ডগোল। দাবী নিয়ে কাণ কালাপাল্য হয়ে যাচ্ছে। কে কার দাবী মানবে? আমি কোনদিন কারও দাবী মেনেছি কি? আমি কারও দাবী মানতে প্রস্তুত আছি কি? তবে না আমার দাবী কেউ কোনদিন মানতে পারে। আমি ত' গুটা চিন্তা করে দেখছি না, কিন্তু বলছি—আমাদের দাবী মানতে হবে। মনেবে না ছুনিয়া, শুনেবে না কখনও। যদি আমি কখনও কারও দাবী পূরণ

করেছি, কারও দাবী শুনেছি, তখন কেউ আমার দাবী শুনবে, তার আগে নয়। শ্রদ্ধা-ভক্তিসাথে বাধা-বিপত্তি প্রচুর।—

তুগনদী ইয়ে সংসারমে, কাইসে ভক্তি ভেট।

তিন বাতোসে চটপাট ছায়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট ॥

দাম্‌ড়ি, চাম্‌ড়ি ও পেট—ধন, শিশু ও জঠর—এই তিনটাই ত' মুঞ্চিল করে দিয়েছে আমাদের। কি করব আর, বড় সমস্যা! বহু ব্যক্তি আমাদের কাছে বলছেন,—মহাশয়! ওদব শাস্ত্রের কথা বলে কি হবে? ওতে কি পেট ভরবে?—হ্যাঁ, পেট ভরে, ভরেছে একজন ব্যক্তির। সেই ব্যক্তি তদগতচিত্তে ভাগবত শুনছিলেন। সেই পরম ধার্মিক রাজার পেট ভরেছে সত্যিই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাঁর ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসে তিনি এই ভাগবতকথা, ভগবানের শ্রীমাদ-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করেছেন। তাঁর সত্যিই পেট ভরেছিল। সকলের কি আর সমান পেট ভরবে যের খেতে বসে। যার যেমন রুচি—কেউ টক, কেউ ঝাল, কেউ নোহা, কেউ তেতো, কেউ মিষ্টি খায়। বিভিন্ন রুচির লোক এক একটা জিনিসে রুচিবিশিষ্ট। সকলের পেট ত' সমান ভরান যায় না। সকলকে ত' সমানভাবে সন্তুষ্ট করা যায় না খাইয়ে। নিজের রুচির উপরে নির্ভর করে সেই ক্ষুরিবৃত্তি ও সন্তুষ্ট।

বহু ব্যক্তি বলছেন,—আমাদের মুখে অন্ন নাই, অর্থাভাবে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে আমরা দিন কাটাচ্ছি। এখন প্রশ্ন হতে হতে পারে,—যে দেশ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটাচ্ছে না, যে দেশের কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয়েছে, যে দেশ কিছু খাণ্ডা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেছে, সে দেশ ধার্মিক ত' ? সে দেশ নীতি-আদর্শপ্ৰায়ণ ত' ? প্রশ্ন রাখলাম আমি,—খাওয়া, পরা পেলে আমরা নীতি-আদর্শ প্ৰায়ণ হব ত' ? আথবা বাড়াবাড়ি করব না ত' ?

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্চ দিগ্ধনম্ ॥

আমরা অপরের ধনে আকাজক্ষা করব না ত' ? অপরের সম্পদ দেখে ঈর্ষা-হিংসা প্রকাশ করব না ত' ? এ গ্যারান্টী কোথায় ? এ গ্যারান্টী প্রথমে চাই। আমি যদি পেট ভরে খেতে পাই তাহলে আমি ধার্মিক হব, নীতি-আদর্শ পালন করব, এমন কোন আদর্শ আমার সামনে আছে কিনা ? আমি দেখতে পাচ্ছি বরং উল্টো। যারা কিছু ভাল খেতে পয়তে পাচ্ছেন, তারাই বেশী দুর্নীতিপ্ৰায়ণ। একথা আমি যে ভাগবত নিয়ে বসে আছি, এর ভিতর থেকে প্রমাণ করব। দরিদ্র স্বভাবতঃই অভাবগ্রস্ত, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট,

তার ভিতরে যে সহস্র-স্বরল ভাবটা থাকে, সেটা বেপরোয়া লোকের মধ্যে থাকে না, থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়। সেই কথাই বলেছেন,—

“চিরস্থায়ী জ্ঞান, ভ্রমে কি কখন, ব্যবহিত-বেদন বৃদ্ধিতে পারে ?

কি যাতনা বিধে, বুদ্ধিবে সে কিমে, কভু আনন্দিবিধে দংশেমি যারে ?

যতদিন ভবে, না হবে না হবে, তোমার অবস্থা আমার সম।

ঈশং হাসিবে, শুনে না শুনিবে, বুকে না বুদ্ধিবে যাতনা মম ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—হুর্জ্জন ব্যক্তির পক্ষে দরিত্রতাই প্রকৃষ্ট অঞ্জন-স্বরূপ। দরিত্রতা লোকের গর্বাক্ষভাব দূর করিয়া যথার্থ দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। দরিত্র ব্যক্তি প্রাণিগণকে নিজের মত প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করে। হুর্জ্জন ব্যক্তি কখনই অস্ত্রের ক্রেশ বুদ্ধিতে পারে না। জীবমাত্রেরই হুখে সমান—ইহা কোনদিনই তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় না। গর্ব-অহঙ্কারশূন্য উকতা-ভাবমুক্ত দরিত্র ব্যক্তি ইহলোকে স্বভাবতঃই আহার ও বস্ত্রাদির অভাবজনিত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে সেই কষ্ট পরম তপস্তাস্বরূপ। তপস্তার জায় ঐ দারিত্র্যই তাহাকে গর্বহীন করিয়া থাকে। অতএব দারিত্র্যই বস্তুতঃ তপস্তা-স্বরূপ। সমদর্শী সাধুগণও দরিত্রের লক্ষ্যই করিয়া থাকেন। দরিত্রও সাধুনঙ্গবশতঃ বিষয়-বাদনা-নাশে সমর্থ হয় এবং শীঘ্রই তাহার চিন্তাভাবিত হইয়া থাকে।

কে কার হুখে-কষ্ট উপলব্ধি করবে ? আমার পাশের বাড়ীর লোকটা না খেয়ে রয়েছে। কই আমি দেখতে চাচ্ছি না, আমার দে চিন্তাবৃত্তি নাই। শুনেও শুনিছি না। তাহলে আমি কি করে দেশকে ভালবাসতে যাচ্ছি ! পিতামাতা, Guardian কে ভালবাসি না, ভাই-বোনদের দেখতে পারি না, তাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, কিন্তু আমি দেশবরেণ্য নেতা ! কি করে হবে ? “Charity begins at home”—দানধর্ম আরম্ভ হয় নিজের ঘর থেকে। শিক্ষা ত’ ঘরে হবে আগে। ঘরকে আমি ভালবাসতে পারি না, দেশকে! ভালবাসতে যাচ্ছি আমি। ‘স্বদেশ’ মানে কি ? সেই শিক্ষাই ত’ শাস্ত্রে রয়েছে। ‘ভারতভূমি’ ‘ভারতভূমি’ করছি, ভারতভূমির নীতি-আদর্শ নিচ্ছি কোথায় ? ঋষিগণ হলেন ভারতভূমির নীতি-আদর্শ। ঋষিগণের বাক্য ত’ মানছি না, তাহলে দেশকে কি করে ভালবাসব আমি ? ঋষিগণের যে নীতি-আদর্শ, সেই নীতি-আদর্শ যদি কেউ নিতে পারেন, তাহলে দেশকে ভালবাসা হবে। প্রথম কথা হল নীতি-আদর্শ। আমি নীতি-আদর্শপরায়ণ কিনা, তা নির্ভর করছে ভগবানকে ভালবাসা, দেশকে ভালবাসা, অপরকে ভালবাসার উপর।

আত্মবৎ যে আমি দেখব, কি করে দেখব? আমি ত' আমার নিজেকে
নিজে ব্যস্ত। কবি গেয়ে গেলেন,—

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন-মন সকলি দাও।

সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ॥

—কিভাবে প্রমাণিত? আমি ত' ঘরের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছি না—
ভগবৎপ্রীতি-ভালবাসা, বাইরের লোককে কি করে ভালবাসব, দেশকে কি
করে ভালবাসব? আগে ঘরেই প্রমাণিত হোক সেই মহত্ব-উদারতা, তারপরে
বাইরে। (ক্রমশঃ)

প্রাত্যহিক জীবন

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর]

শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই
আমরা হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন না কেন'—একদম ছন্দস্ব-
বিচার বর্জন করা কল্যাণেছু পারমার্থিকের বিচার নহে। পরমার্থ অস্বপ্নস্থ
ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা 'আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত
করিয়া ক্রমশঃ ভজন-বাস্তব অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—যিনি স্বয়ং
শাস্ত্রাভ্যাসী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচার্য্যে স্থাপন করেন। তিনিই
'আচার্য্য'। উৎপথগামী কখনও 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত
ব্যক্তি, শোককারী, আচার্য্যহীন, স্ত্রী-মদী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি
কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হইতে পারে না। একটি দোহায় কোনও একজন
ভক্তকবি লিখিয়াছেন,—

“গুরু-লোভী শিখ্ লাল্ চি, দেনো থেসে যাঁও।

দেনো বপূবা ডুব মরে, চড়ছে পথিরকে নাও ॥”

অর্থাৎ যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারস্থ-একান্ত অভিলাষী,
ইহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবদাগরাভ্যন্তরে পাষণ্ডের গ্রাস
দৃঢ় জ্ঞাননৌকায় আরোহণপূর্বক থেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই
নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবদাগরের পারে যাইতে
সমর্থ হইবেন না।

শিষ্টের ভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এরূপ কথা নিতান্ত অনিচ্ছাস্তপর। যাহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি ‘গুরু’ পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর ‘শিষ্ট’ বলিতে শাসন-যোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি—‘শিষ্ট’, আর যিনি শাসন করেন, তিনি—‘গুরু’। গুরু যদি শিষ্টের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জাতি-কুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আগার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি ক্রমতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুপাদপদে উপনীত হইবেন।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উক্তম্।

শাস্ত্রে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।

তত্র ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ শিচ্ছেদ্গুর্বান্ভদৈবতঃ।

অমায়য়াহুবৃত্যা যৈ স্তবোদ্যাত্মান্নদো হরিঃ ॥

(ভাঃ ১১।৩।২২-২৩)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিভূষ্ট হন, সেইরূপ মনুস্মৃতিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে শিষ্ট ভাগবতধৰ্ম্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ‘ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ-বিগ্রহ জন্মিবে।

অতবজ্জ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে,—‘শ্রীহরিভক্তিবিন্দন’ ‘অষ্টরকব কখনই গুরু হইতে পারেন না’, এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু যত্নভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধহয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যতা স্বীকার করেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা ভক্তিকে অতীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই ‘উপেয়’ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—মুক্তিলাভের পূর্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যিকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে ‘ভক্তি’, ‘ভক্ত’ ও ‘ভগবানে’র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র—‘মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়,’ ইহাই দিচ্চা করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন,—আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অর্হেতুকী

ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবানকে ভজনা করেন। তাঁহারা মূর্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্বদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ই একমাত্র যথার্থ গুরুকে স্বীকার করেন। যে গুরু আজ আছেন, কালে থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ফলপ্রদই পদার্থ লাভ হয়। অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ, তিনি নিত্যকাল ভগবানের আনির্জিত বিগ্রহ-রূপে অবস্থান করেন। শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আশ্রুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্যপদার্থ বা বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় করাই কি সকলের কর্তব্য নহে? আবার ‘বৈষ্ণব’ বলিতে কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহুবিশেষকেই ‘বৈষ্ণব’ মনে না করেন। রামবাদ্যী অভিনয়-কালে ‘নারদ ঋষি’ সাজিলেও, সে ‘প্রকৃত নারদ’ নহে। যিনি সর্লক্ষ্য নারদ অর্থাৎ নারদের আশ্রুগত্যে হরি-কীর্তনকারী, নিকপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উদ্যম সর্লক্ষ্যপ্রথমে সঙ্গুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিকপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবানই আমার আশ্রিত ও শুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহাস্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন। নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিমূখবৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভরপুর থাকিয়া কখনও ভোগ-চক্ষে সঙ্গুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুद्धি আমাকে যাহা ‘ধর্ম’ বা ‘সত্য’ বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে, অথবা প্রচলিত জনমত বা গতাশ্রুগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে ‘ধর্মকর্ম’ বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইচ্ছন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই ‘সঙ্গুর’ মনে করিয়া আমার জীবন বিপথেই পরিচালিত করিব। তখন “আমার ভিতরে কোন হুঁটবৃত্তি বা কপটতা নাই”—বাহুজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হরিসেবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ ঋজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোকমুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বহুতা, কথকতা, ব্যাখ্যাপ্রণালী প্রভৃতি লোক-

বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত, পরমবৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিকপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহাস্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন। কঠোরকঠিনাই মহাস্ত-গুরুর স্বরূপ লক্ষণ। অগ্ন্যস্ত্র লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট, অবৈষ্ণব ব্যক্তিও লোকবঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ঐ সকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষার সর্বপ্রথম মাস্তুলিক অহুষ্ঠানটী আজ বিবৃত করিলাম। ক্রমশঃ অগ্ন্যস্ত্র অহুষ্ঠানাবলীর কথাও প্রকাশ করিব।
“আবন্তসদৃশোদয়ঃ।”

শ্রীক্ষেত্র দর্শন

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপূর্ণকায় ॥
জয় জয় সীতানাথ অষ্টদ্বৈত ঈশ্বর ।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥
রূপ, রঘুনাথ, গদাধর মহাশয় ।
শ্রীধরূপ, রামানন্দ, সার্বভৌম জয় ॥
ভকতিবিনোদ জয় আমার ঠাকুর ।
কেবলা কল্পনা যঁ'র জীবিতে প্রচুর ॥
নিখিল দয়ার নিধি শচীর নন্দন ।
মায়াপু্রে অবতার—শাস্ত্রের বচন ॥
মাধুর্য্যপূরিত প্রভু মহা কৃপাময় ।
ভক্তের বান্ধব নিত্য ভক্ত ছাড়া নয় ॥
ধামের মাহাত্ম্য শাস্ত্র করেন প্রকাশ ।
নিত্যধামে নিত্যলীলা করয়ে বিকাশ ॥
স্বতন্ত্র প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল ।
অপ্রকাশ হয়ে ধাম ছিল বহুকাল ॥

ভকতিবিনোদ দেব পতিতপাবন ।
 গৌরাঙ্গপার্বদ তিঁহ নিত্য সিদ্ধজন ॥
 প্রকাশ করিল ধাম গৌরকৃপাবলে ।
 শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে ধন্য হইলা সকলে ॥
 মম ভাগ্যে হৈল যবে ধাম দরশন ।
 সংহতি ছিলেন প্রভু অধমতারণ ॥
 শ্রীভক্তিবিনোদ দেব মম প্রভুবর ।
 বাহার কৃপায় নাম ফুরিল অন্তর ॥
 জন্মোৎসবে মায়াপুরে করিয়া গমন ।
 গৌরচন্দ্র মুখ হেরি জুড়াল নয়ন ॥
 কিবা সে চাঁচর কেশ দেখিতে সুন্দর ।
 গলদেশে ফুলমালা অতি মনোহর ॥
 শ্রীমঙ্গের জ্যোতিঃ কিবা, কমল নয়ন ।
 অধরে অমিয় হাসি ভুবনমোহন ॥
 বামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিস্বরূপিণী ।
 দক্ষিণে দাঁড়ায়ে লক্ষ্মী জগত জননী ॥
 বিস্তৃত বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মনে ।
 প্রভুজন্ম-মহোৎসব করেন কীর্ত্তনে ॥
 চৈতন্যচরিতামৃত নিদ্ধান্ত মধুর ।
 পাঠ করে ভক্তগণ আনন্দ প্রচুর ॥
 ভক্তসঙ্গে গ্রন্থাশ্রমে অতি সুখানয় ।
 শ্রবণ করিয়া মোর প্রফুল্ল হৃদয় ॥
 ঐবৎ হাসিয়া প্রভু জগতের প্রাণ ।
 অনুভবে দেখাইল নিদয়ার স্থান ॥
 কেন আজ্ঞা দিল প্রভু না জানি কারণ ।
 ক্ষেত্র দরশনে মন হৈল উচাটন ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীবল্লভযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন—৭২৪০০১

জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দেবকবুন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-
অধ্যক্ষ পরিব্রাজকস্বর্গ্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমন্ত ক্রীষ্ণবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের আত্মগত্য আগামী ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২৮।২০)
বৃহস্পতিবার হইতে ২০শে শ্রাবণ (ইং ৩০।২০) মোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বুল্লভযাত্রা ও ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৭।২০) মঙ্গলবার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্বয়ং আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সমিতির
শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্তাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-
সকীর্ত্তন, ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের
জন্মানীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদ্ব-রাধা-বিনোদবিহারী-
জীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও নন্দোৎসবের দিন সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ
বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত শুক্লভক্ত্যুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিয়া
সমিতির দেবকবুন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদুষ্ঠানের
শুক্ল উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাকাব্যারা সমিতির দেবাকার্য্যে
সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী স্বকৃতি অর্জিত হইবে। বিশেষ
অহুষ্ঠান-স্মৃতি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

শুক্লভক্তরূপালেশপ্রার্থী—

দেবকবৃন্দ,

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে জ্ঞানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা
করিলে শ্রীবল্লভদ্র দাস ব্রহ্মচারীর নিকট উপযুক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা
প্রেরিতব্য।

—ঃ জীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী :—

২৭শে আশ্বিন (ইং ১৩।৮।২০), সোমবার—

অধিবেশন—সন্ধ্যা ৬ টায় ।

কীর্ত্তন—সন্ধ্যা আরাধিত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ।

২৮শে আশ্বিন (ইং ১৪।৮।২০), মঙ্গলবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায় ।

নগর সঙ্কীৰ্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে ৮টা পর্য্যন্ত নগর পরিভ্রমণ ।

সঙ্কীৰ্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমহরদিনী পাঠ—সকাল ৮-৩০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত ।

ধৰ্ম্মনভা—সন্ধ্যা আরাধিত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত
রামমঙ্গল, তদনন্তর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ।

২৯শে আশ্বিন (১৫।৮।২০), বুধবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায় ।

ভোগারতি—মধ্যাহ্নে ।

নন্দোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ।

সন্ধ্যায়—আরাধিত্রিকান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন
ও রামমঙ্গল ।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যাহ্বরণে উৎসব-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য ।

#	জ বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	#
ধর্মঃ সমুজ্জিতঃ পুংসাং বিশ্বক্শেন-কথাষু যঃ ।		মোংগাদেয়োদ্যদি যতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
#	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাত্মা জ্ঞপ্রসীদতি ॥	#

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আজ পরসহ ।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরূপা ॥

অন্য ধর্ম অতীতপে পালে যেই জন ।

হরি-কথার রুতি মৈলে পও সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ	৯ শ্রীধর, প্রহ্ম, ৫০৪ শ্রীগোবিন্দ ৩২শে আশ্বাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৯৭, ইং ১৭/৭/৯০	৫ম সংখ্যা
----------	---	-----------

মানুবাং

গোপীগণ-দ্বিজবর-কৃতং শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষাকবচম্

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুল্লাস-সংবাদে
পুতনা-শকট-তৃণাবর্তমোক্ষে ব্রহ্মোদশ-চতুর্দশেহধ্যায়ে]

শ্রীগোপা উচুঃ,—

১। শ্রীকৃষ্ণস্তে শিবঃ পাতু বৈকুণ্ঠঃ কণ্ঠমেব হি ।

স্বৈতদীপপতিঃ কর্ণে নাসিকাং যজ্ঞরূপধৃক্ ॥ ১৫ ॥

[যশোমতী পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বোহিনীর ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বে যথাবিধি তাঁহার
রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন; যমুনার পুত্রমৃত্তিকা ও জলে তাঁহার দেহ
অভিষিক্ত করিয়া তদীয় মস্তকোপরি গোপুচ্ছ ভ্রমণ করাইলেন; গোমূত্র ও
গোময়ে স্নান করাইয়া বক্ষমাণ রক্ষাবাক্য বলিতে লাগিলেন ।]

গোপীগণ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ তোমার মস্তক রক্ষা করুন ; বৈকুণ্ঠ তোমার কণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপপতি কর্ণধর এবং যজ্ঞরূপধারী তোমার নাসিকা রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

২। নৃসিংহো নেত্রযুগ্মঞ্চ জিহ্বাং দশরথায়ুজঃ ।

অধরাববতাং তে তু নরনারায়ণাবুধী ॥ ১৬ ॥

শ্রীনৃসিংহ নেত্রযুগল, দশরথ-তনয় রাম বদনা এবং নরনারায়ণ ঋষি তোমার অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

৩। কপালৌ পাতু তে সাক্ষাৎ সনকাত্মা কলা হরেঃ ।

ভালস্তে শ্বেতবারাহো নারদো জ্বলতেহবতু ॥ ১৭ ॥

সাক্ষাৎ হারির অংশ সনকাদি তোমার কপোলদ্বয় রক্ষা করুন এবং শ্বেত-বরাহ তোমার ললাট ও দেবর্ষি নারদ তোমার জুয়ুগল রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

৪। চিবুকং কপিলঃ পাতু দন্তাত্রেয় উরোহবতু ।

স্কন্ধৌ দ্বাবুভয়ঃ পাতু করৌ মংস্ত্রঃ প্রপাতু তে ॥ ১৮ ॥

কপিল তোমার চিবুক রক্ষা করুন, দন্তাত্রেয় তোমার বক্ষ রক্ষা করুন । ঋষভ তোমার ঋদ্ধদ্বয় রক্ষা করুন এবং মংস্ত্রপী হরি তোমার করদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

৫। দোদীপ্তং সততং রক্ষ্যেৎ পৃথুঃ পৃথুলবিক্রমঃ ।

উদরং কমঠঃ পাতু নাভিঃ ধনন্তুরিচ্চ তে ॥ ১৯ ॥

প্রভূত পরাক্রম পৃথু সতত তোমার ভুজযুগল রক্ষা করুন ; কুর্শ তোমার কুক্ষি রক্ষা করুন এবং ধনন্তুরি তোমার নাভি রক্ষা করুন ॥ ১৯ ॥

৬। মোহিনী গৃহদেশঞ্চ কটিস্তে বামনোহবতু ।

পৃষ্ঠং পরশুরামশ্চ তবোরা বাদরায়ণঃ ॥ ২০ ॥

মোহিনী তোমার গৃহদেশ এবং বামন তোমার কটি রক্ষা করুন । পরশু-রাম তোমার পৃষ্ঠ এবং বাদরায়ণ তোমার উরু রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

৭। বলো জাহ্নুদ্বয়ং পাতু জজ্জ্যে বুদ্ধঃ প্রপাতু তে ।

পাদৌ পাতু সগুল্কৌ চ কন্ধির্ধর্মপতিঃ প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবলরাম তোমার জাহ্নুদ্বয় ও বুদ্ধ তোমার জজ্জ্যদ্বয় রক্ষা করুন । ধর্মপতি প্রভু কন্ধি তোমার পাদদ্বয় ও মনোজ্ঞ গুল্ক রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

৮-৯। সর্ব্বরক্ষাকরং দিব্যং শ্রীকৃষ্ণকবচং পরম্ ।

ইদং ভগবতা দত্তং ব্রহ্মাণে নাভিপঙ্কজে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মণা শস্ত্রবে দত্তং শস্ত্রত্বর্বাসসে দদৌ ।

দুর্বাসাঃ শ্রীযশোমতৌ প্রাদাৎ শ্রীনন্দমন্দিরে ॥ ২৩ ॥

এই সর্বরক্ষাকর দিব্য পরম শ্রীকৃষ্ণকবচ ভগবান্ প্রথমে নাভিপঙ্কজজাত ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন ; তারপর ব্রহ্মা শঙ্করকে এবং শঙ্কর দুর্বাসাকে প্রদান করেন । তৎপর মহর্ষি দুর্বাসা নন্দমন্দিরে এই কবচ যশোদাকে দেন । [গোপীগণসহ যশোমতী এই কবচদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন] ॥ ২২-২৩ ॥

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ,—

১০ । দানোদরঃ পাতু পাদৌ জাহ্নুনী বিষ্ণুরশ্রবাঃ ।

উরু পাতু হরিনাভিং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

[“হে নন্দ ! হে ব্রজেশ্বরী যশোদে ! শোক করিও না, আমরা শিশুকে রক্ষা করিব, এই বালক চিরজীবী হইবে”—দ্বিজবরগণ এইরূপ বলিয়া কুশাগ্র ও নবপল্লবদ্বারা পবিত্র কুস্তজলে ঝক্-ঝঙ্-সামাদি স্তবের দ্বারা উত্তম স্বস্ত্যয়ন এবং যথাবিধি অগ্নিপূজাপূর্বক যজ্ঞাহুষ্ঠানদ্বারা শিশুর রক্ষাবিধান করিলেন ।]

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—শ্রীদানোদর তোমার পাদদ্বয় ও বিষ্ণুরশ্রবা জাহ্নুদ্বয় রক্ষা করুন ; হরি উরু এবং স্বয়ং পরিপূর্ণতম তোমার নাভি রক্ষা করুন ॥ ৫৩ ॥

১১ । কটিং রাধাপতিঃ পাতু পীতবাসাস্তবোদরম্ ।

হৃদয়ং পদ্মনাভশ্চ ভুজৌ গোবর্ধনোদ্ধরঃ ॥ ৫৪ ॥

রাধাপতি তোমার কটি, পীতবাসা উদর, পদ্মনাভ হৃদয় এবং গোবর্ধনধারী তোমার ভুজদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ৫৪ ॥

১২ । মুখঞ্চ মথুরানাথো দ্বারকেশঃ শিরোহিবতু ।

পৃষ্ঠং পাত্ত্বরঞ্চসী সর্বতো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

মথুরানাথ তোমার মুখ, দ্বারকেশ তোমার শির রক্ষা করুন । অম্বরঞ্চসী তোমার পৃষ্ঠ এবং স্বয়ং ভগবান্ তোমার সর্বাবয়ব রক্ষা করুন ॥ ৫৫ ॥

১৩ । শ্লোকত্রয়মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নানবঃ সদা ।

মহানৌথ্যং ভবেত্তস্য ন ভয়ং বিঘ্নতে কচিৎ ॥ ৫৬ ॥

যে মানব এই শ্লোকত্রয়ময় স্তোত্র সতত পাঠ করেন, তাঁহার মহানৌথ্য বৃদ্ধি হয়, কুত্রাপি তাঁহার ভয় থাকে না ॥ ৫৬ ॥

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম (১)

মুক্তজীবের শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারবার বলিতেছি যে,—যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম। জীবের নিত্য ধর্মের নাম—জৈবধর্ম। জীব যখন উপাধি-শূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম কি?—নিক্রপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধজীবের বৈষ্ণবধর্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যতপ্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত ইহাই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মঘাত-পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়; দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্তও যত্ন করা আবশ্যক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রার আশ্রম ও সমাজের আবশ্যকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে অর্ধোপার্জনের একটি উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্বাহিত হয়, তজ্জন্তু একটি আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্বন্দ্বর্ষ্য বা সন্ন্যাসগ্রহণই করুন একটি আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটি সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্শু ও মুক্ত সকলেরই একটি একটি সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুক্শু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না।—

এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুকু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়-মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এখানে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ভেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাহারা অবস্থিত, তাহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনাদ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিকার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্বাকগকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অক্ষীলনের আশঙ্ক্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

যাহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্মই বৈষ্ণবের বন্ধনশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণা-শ্রম-ধর্ম কি-প্রকার তাহা ত্রীচৈতন্য-শিক্ষামূর্ত্তে প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব এখানে পুনরা-লোচিত হইল না। কেবল এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে মহুয়া নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ এবং অবস্থাবশতঃ একটী জাশ্রম স্বীকার করিয়া জীবন নির্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা ‘কর্ম্ম ও ঘটনা-দ্বারা’ স্বভাব নির্মিত হয়। তন্মধ্যে জন্মও একটী ‘ঘটনা’ বিশেষ।

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদম্ব

ষট্ঠ্যক্রমে, আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অপদম্ব হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্মে অবস্থিত ব্যক্তি-গণের কোন কার্যের দক্ষতা হয় না। বর্ণাশ্রম-ধর্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সঙ্করস্ব লোকে ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসিগণ বর্ণ-ধর্মের উৎসন্ন কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্মের বিনাশদ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব ‘পুনর্মুখিকো ভব’ এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছদিগের আয় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিনাশ করা কোন ‘দেশহিতৈষী’ ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম ধর্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টি উপায় নির্দেশ

বর্ণাশ্রম-ধর্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা :—

১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব ক্রটির সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামের কতিপয় নিঃস্বার্থ বিজ্ঞাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপে প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যাইবে যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যায়। যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণ-লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ববৎ বিচারপূর্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটা সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূমামী ও পণ্ডিতগণকর্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্ত সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অমৃত্যু আধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ-বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে, এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আজকাল হইতে পারে কি না; আমাদের বিবেচনায় এইরূপ কার্য হইবার সুবিধা নাই। আমাদের রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্যন্ত তাহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং মরল সাহায্য বাতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেককে এই প্রার্থনীয় পরিবর্তনে মত্ত দিবেন না; বরং সংস্কার-সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্নবর্ণের লোকেরা মূর্থতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিভ্রাণে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহস্র ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে স্বত্তার সাহায্যে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিমোদনের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের কসীম আকাত্তা-

সত্তেও বিপদাশঙ্কা ও হতাশাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। একদিকে—কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চূর্ণ করিয়া থাকিলে অমদল বই মদল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীৰ্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আৰ্য্য-বংশের প্রত্যাপে বহুকালাবধি বহুক্ষরা কম্পমানা ছিল, সেই—

আর্য্য-সন্তানগণ এখন স্নেহগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছেন। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্ষ্যত্ব থাকে না। যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্বল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পর্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল স্নেহাচ্ছগতো বৃত্ত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও ‘হলস্থল’ পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট

দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম যে-পর্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদের দিগকে জর্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের বিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সত্ত সত্ত বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে খ্রীষ্টকল্পদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজ্যদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনর্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ নাশারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব মহাআগণ ‘ধনু কলি’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নাশারণ কলিযুগেই কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। ‘ধনু কলিযুগে’ আর কল্পি-অবতারের অপেক্ষা নাই। যে কলিযুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক, পরমগ্রেম-

মূর্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিয়ুগের আর কথা কি ? সেই করুণাময় মহাপ্রভুর রূপার অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোম বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও ‘বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্মের সংস্কার-বিষয়ে’ যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব। আশা করি যে, মহাদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত গম্ভীর। সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টির আলোচনা করা আবশ্যিক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিসিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌর-ভজন

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-ভক্তের নির্দেশ

গৌর-ভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরদেবের সহিত একটু পরিচয় করিতে হয়। ‘ভজন’ শব্দে সেবাকেই লক্ষ্য করে। সেব্যবস্তুর পরিচয়ের অভাবে অপর বস্তুর সেবা হইয়া পড়ে ; সে জন্যই বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বিষয়ের আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীভগবানই সম্বন্ধ ; ভগবান্, ভজম ও ভক্ত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞানই সেই বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। ভক্তের ভজনে ভগবান্ই সম্বন্ধ। ভগবান্, ভজম ও ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ ভগবান্ নহেন, তথায় ভক্ত ও ভক্তি নাই। ভোগময় বিচার তর্ক আবাহন করে। যেখানে ভক্তের ইন্দ্রিয় অনিত্য জড় নশ্বর ভোগে বাস্ত, তথায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গৌরহৃদয়ের স্বরূপ বন্ধজীবের

নেত্রে অদৃশ্য। বন্ধজীবের ভোগের অন্ততম নশ্বর বস্তু-প্রতীতি গৌরসুন্দরে সংবদ্ধ হইলে গৌরাঙ্গকে ভোগ্যজ্ঞান করা হয়—ইহা ভজনের নিত্যস্ত বিরোধী। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর ভোগময়ী ধারণামাত্র শোভনীয় নহে। গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া বাহারা নিজেদ্রিয়-তর্পণমাত্র সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গকে ভজনীয় বস্তু জানিবার প্রতিকূলে নিজ নশ্বর রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দগঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র, তাহাতে শ্রীগৌরভজন হওয়া দূরে থাকুক, অনর্থময় বিষয়গ্রহণ মাত্র হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—‘ভগবৎস্ব অধোক্ষজ’।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও অধোক্ষজ-তত্ত্ব

‘অধোক্ষজ’ শব্দে ইহাই বুঝায় যে, যিনি জড়ৈন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত বস্তু অর্থাৎ বন্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ নন্দভের কয়েকস্থানেই বলিয়াছেন,—‘অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ’। যেখানে ‘অধোক্ষজ’ শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষিত হন, তথায় গৌরসুন্দর আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন। অপর ভাষায় বলিতে গেলে, গৌরের রূপ জড়ের রূপ নহে। আমাদের নশ্বর স্থূল ইন্দ্রিয় জড়ের রূপভোগে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্ম বাস্তু হয়— তাহাতে কৃষ্ণবিশ্বাস্তি হয় মাত্র। শ্রীগৌরহরির অপূর্বরূপ আর কিছুই নয়— উহার দর্শনে আমাদের ভোগ-প্রতীতি উদ্রেক হওয়া দূরে থাক্, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা নিত্যকালের জন্ম ধামিয়া যায়। গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহাতে শ্রীরাঘ-রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণের দেবনীয় বস্তুবিজ্ঞান উচ্ছলিত হয়, নদীরা-নাগরীগণের জড় ভোগবাসনা প্রদীপ্ত হয় না। নাগরীগণ জড়-ভোগময়ী ধারণার তাত্‌কালিক বশবর্তিতায় কামরিপু-চরিতার্থতার জন্ম জড় নাগর অন্বেষণ করেন। তাহাতে উত্তরোত্তর জড়কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে হরিভজন হইতে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। ‘অহৈতুক নির্মল প্রেম তথায় তিরোহিত হইয়া নিজেদ্রিয়প্রীতি-তাৎপর্যে পর্য্যবসিত হয়। আমরা গেলাম নিজের নিঃশ্রেয়ঃ-লাভের জন্ম, গমনপথে বিপুলহস্তে পতিত হইয়া নিত্যকালের জন্ম নিত্য ভজন ধ্বংস করিয়া কণ্ঠকাণ্ডে ভোগের আবাঁহন করিয়া বসিলাম! গেলাম শ্রীজগদগুরুদেবের চরণপ্রান্তে পূজা করিবার জন্ম, পড়িলাম ভোগ-গর্ভে! নর্ত্তকীদিগের নৃত্য-গীতাদি যেরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের অন্ত্রটানে দুর্বল জীবকে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করে, আমাদিগকেও গৌরভজন করিবার নামে নাগরীর ভোগপিপাসা গ্রাস করিয়া ফেলে।

শ্রীগৌরহরিকে নাগররূপে কল্পনা—গৌর-বিদ্বেষ মাত্র

গৌরহরি ভোগের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি পূজার বস্তু—কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগস্পৃহারত ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুষ্টকের বশবর্তী হইয়া যে দৃষ্ট ভোগময় জগতে বিচরণ করেন, গৌরভজনের ছলনায়ও আমাদের তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়পরায়ণতাই বুদ্ধি লাভ করে। জড়ভোগরভ আমরা; আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য ভোগের বস্তু; গৌরাদি তাদৃশ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও নিরানন্দের আধারমাত্র নহেন। তিনি নদীয়ার নাগরীর ভোগের বস্তু নহেন বলিয়াই নিজ স্বরূপ প্রকট করাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত: যদি তাঁহাকেও জড় ভোগের অন্ততম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলিয়া খাড়া করি এবং আমরা ভোক্তা রমণী সজ্জায় নাগরী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে উহা ভজন না বলিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নামে অভিধান করাই আমাদের পক্ষে সত্যপ্রিয়তা। অবশ্য বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতিকূলে ভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়-ভোগপ্রবণা শক্তি-উপাসনা ত' অনেকদিন হইতেই আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গৌরভক্তি কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশে গৌরকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের ক্রিয়ায় সজ্জিত করিয়া কণকালের জন্য নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃষ্ণির কল্পনাকে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়া কি আমাদের গৌরবিদ্বেষ মাত্র নহে? গৌরের নাম ত' জড়বস্তুর সংজ্ঞাবিশেষ নহে, গৌরের রূপ ত' দৃষ্ট জড়বস্তুর অন্ততম নহে, গৌরের গুণ ত' প্রাকৃত নহর গুণমাত্রের অন্ততম নহে এবং গৌরলীলা ত' ইন্দ্রিয়পরায়ণের ভজন-ছলনামাত্র নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণাদি অপ্রাকৃত, তিনি

সন্তোগময় বিগ্রহ নহেন

শ্রীগৌরহরির নাম কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরির রূপ গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, নিত্য গৌররূপ বলিয়া কৃষ্ণেতর নহেন, তিনি মহাবদান্ত অর্থাৎ নির্বোধের প্রতিও তিনি সদ্যামাত্র রূপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কোন কৃষ্ণ কর্মের Black act-এর অনিত্যতা, অজ্ঞান-নিরানন্দরূপ অবরতা তাঁহাতে অবৈধভাবে আরোপ করিতে গেলে তিনি সেই আবরণ হইতে বন্ধজীবকে রূপা বিতরণে মুক্ত করেন। তাঁহাকে অবৈধ জড়ভোগ-তাড়নায় নাগর বলিতে নাই। নাগরীভাবে তাঁহার ভজন-সাধনের কল্লিত আবাহন কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল পথমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-অর্ধৈত প্রভুগণ-

দ্বারা শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামিঘটকের দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীদ্বারা, শ্রীগদাধর-নরহরি প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তদ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা জড়ভোগমিশ্র অনর্থময় সাধনকালের ভক্তির অল্পাধানে সিদ্ধিকালের ভক্তির অল্পাধানে অবৈধভাবে সংমিশ্রণে কতই না বাধা দিয়াছেন! কিন্তু আমরা অপরাধী ভক্তনিষ্ঠ-হৃদয়বিশিষ্ট অনর্থময় জীব সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে জড়বস্তুরবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে জড় দল্লোগের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে গড়িতে যাইতেছি! ইহা অপেক্ষা আর আমাদের শ্রীগৌরবিষেধ কি হইতে পারে? তাঁহাকে জগদাচার্য্য মুখে বলিয়া জড় কুভোগ-রাজ্যে ছুরাচার নাগর বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে যাই বলিয়াই মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত 'ভক্তমাল' লেখক চন্দ্র দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের কতিপয় জ্ঞান সমালোচক ও খৃষ্টানদিগের সাময়িক পত্র-প্রচাৰণ্য প্রবন্ধাদিতে শ্রীগৌর-বিগ্রহকে অবৈধ প্রচারক মাত্র বলিয়া সজ্জিত করায়।

ভজনাযুত-লেখক ঠাকুর নরহরি ও সিদ্ধ চৈতন্যদাসের প্রতি

নাগরীপদ আরোপ সত্যবিরুদ্ধ

বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন ছুরাচার অভিনয় নিজদীপায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে অবৈধ ভোগ্য নাগর বলিতে যাই? পরজ্ঞী-প্রেক্ষণপর, পরজ্ঞী-চিস্তনপর, অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর নাগররূপে গৌরভক্তগণ কোনদিনই তাঁহাকে কুস্মরুত বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তবে নবদ্বীপ-নাগরীবাদ কে উদ্ভাবন করিল, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থময় কালে ধর্মের সাধন-ভজন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল? 'ঠাকুর নরহরির সহিত কি এই ভজন-সাধনবিরোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে?' প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, কাহারো ঠাকুরের 'ভজনাযুত' দেখিয়াছেন, তাহাদের একরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস 'এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কিনা, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতিপরসিক্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধক চৈতন্যদাস বলিতে গিয়া স্বীয় কুর্নীতি-পুষ্টি চঞ্চল প্রতীতিদ্বারা নিজ ধারণায় সত্যানুষ্ঠানকে বক্রত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়াখুঞ্জের সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সহস্বে এই নদীয়া-নাগরীভজনের কথা অন্তায়পূর্বক আরোপ করা সত্যবিরুদ্ধ মাত্র।

আচার্য্যবর্গের প্রতি অবৈধ দোষারোপ পরচর্চা নহে—গুরুসেবা

চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভাব বুদ্ধিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দোষাত্মক অর্থাৎ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতীত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারণ বুড়ির রামায়ণের কথক ঠাকুরের দাড়ি-সঞ্চালন দেখিয়া ও পাঠ-শ্রবণের মত মহদং বৈষ্ণবগণের চরিত্র অনর্থক আমি বুদ্ধিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুবৃত্তিপুষ্ট ভাবের সংযোজন করা আদরনীয় নহে। বাঁহারা গৌরহৃদয়ের দাসগণের অলৌকিক চেষ্টা নিজের জড় ভোগময় ভাবের অন্ততমজ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে আমরা নির্দোষ বলিয়া স্থির করিলে আর গৌর-কথার অনুশীলন করিতে বলিতাম না। তাঁহারা নির্দোষ নহেন বলিয়াই নদীয়া-নাগরীবাদের দুর্গন্ধ তাঁহাদিগকে বিজড়িত না করিতে পারে এবং তাদৃশ সাধন-ভজন শুদ্ধভক্তির আদৌ অনুমোদিত নহে বলিয়া জানাইয়া দিবার জন্য সভা-সমিতি-পত্রিকাাদিতে আলোচনারূপ কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। ইহা পরচর্চা নহে, আচার্য্য বা গুরুসেবা। এই আচার্য্যসেবা রহিত হইলে বদ্ধজীব পরমার্থ-বিষয়ে নির্দোষ হইয়া পড়েন। হৃদয়প্রভাবে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টাই জীবকে গৌরভক্ত হইতে দেয় না।

ভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্তের হস্ত হইতে ত্রাণের নিমিত্তই

মহাবদান্ত গৌরহরির নিজজনগণকে জগতে প্রেরণ

শ্রীগৌরহরি মহাবদান্ত বলিয়া কালে কালে ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে কুবিষয়-ভোগমত তর্কনিষ্ঠ ভক্তিরহিত গৌরভক্ত প্রতিষ্ঠাকামী জনগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজজনসমূহ প্রেরণ করেন। যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেইকালে ভগবান্ এবং ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জীবকুলের দুর্ভাগনা-গঠিত ভজন-ছলনা হইতে নির্দোষ অশিক্ষিতগণকে উদ্ধার করেন। সত্যসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাতান-দোষ-দুষ্ট কোন কথায় শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোড়ীয়গণের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইতে দেন নাই। শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সেই গোড়ীয়চার্য্য শ্রীদামোদর-স্বরূপের সিদ্ধান্ত, ছয় গোবামীর সিদ্ধান্ত, অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীচরিতামৃত হইতে পাইতে পারিবেন। শুদ্ধভক্ত শ্রী ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে নদীয়া-নাগরীমতের অকর্ম্মণ্যতা-নিরূপণের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা বাঁহাদের আলোচ্য বিষয়

হয় না, তাহারা শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহার সন্ধান কখনই পাইবেন না। হরিভজ্ঞ বন্ধজীবের মনগড়া অহুষ্ঠান মাত্র নহে। যাহারা ভগবদ্ভজ্ঞ না করিয়া অল্প জড় ধারণার সহিত হরিভজ্ঞকেও ভোগময় অহুষ্ঠান মনে করেন, তাহারা এই ভক্তি যাজ্ঞের নামে নদীয়া-নাগরীবাদ অগ্রায়ণপূর্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলিয়া চালাইতে থাকিবেন।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী রাধারাণীর একই সিংহাসনে অবস্থিতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত- সম্মত কিনা ?

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা

পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ৩ ১।১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে দণ্ডব্রজিত পূর্ব্বিকেষম্—

* * * মহারাজ ! তোমার ২৫।১২।৫২ তাং এর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের স্তায় এ বৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্তত কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশনের ডাক নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারি না।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু মাফাদ্ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব বিগ্রহই নিত্যানন্দ। সুতরাং লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় নিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারাণীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না।

রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সকলেই শাক্ষাৎ কৃষ্ণেরই অংশ বা কলা। তাহারা বলদেব তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই

স্বরূপ রাখিতে হইবে। শালগ্রাম শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিময় তত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তজ্জন্য তিনি অর্চারূপে সর্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মীপতি। শ্রীমতী রাধারাগীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং শালগ্রাম শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারাগীর থাকিতে রসাত্তাস দোষ হয় না।

নিত্যানন্দ প্রভু, বলদেব, লক্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত বিচারে সবসময়ে একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন না। যেখানে রসাত্তাস দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক থাকেন। লক্ষণ বামচন্দ্রের কমিষ্ঠভ্রাতা বিষয়ে দেবরস্বরূপে জোষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাতঙ্গরূপে অবস্থান করিলে রসাত্তাস দোষ হয় না।

অধিক জ্ঞানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জ্ঞান থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পথে প্রশ্ন ও তদুত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

যথাবিহিত বৈষ্ণব-সম্মান পুরস্কার নিবেদনম্বেতৎ—

মাননীয় শরণ্যাবু,—*

আপনার সুদীর্ঘপত্র ও প্রশ্নাবলী যথাসময়ে পাইয়াছি। প্রশ্নগুলি বেশ সুচিন্তিত, হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা সম্ভব হয় না।

তারকব্রহ্মনাম (বোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র) উচ্চৈঃস্বরে সংখ্যাত বা অসংখ্যাতভাবে কীৰ্ত্তনীয় কিনা, এই প্রশ্নের শাস্ত্রবৃদ্ধি-মূলে সমাধান চাহিয়াছেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা লইয়া যখন বিদগ্ধ গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বহু আলোচনার অবকাশ দেখা দেয়, তখন এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তস্ব-

*শ্রীবৃত শরণ্যচন্দ্র ঘোষ (গ্রাহক নং ৪২৮৯), পোঃ কলামির্দা, জেলা—করিদপুর, পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ)।

যায়ী মতামত সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনের প্রয়োজন মনে করি। আপনি পারমার্থিক সভা-সমিতিতে শ্রীনাথের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সংরক্ষণে প্রয়াসী হইয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথিত “ভূরিদ” শব্দের ইহাই তাৎপর্য।

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বোলনাম-বজ্রিশ অক্ষরের উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন বর্জিত-ব্যবস্থা কখনই শাস্ত্রীয়বৃত্তি ও সিদ্ধান্তসম্মত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা নিখুঁত-ভাবে বিরুদ্ধবাদিগণের বিচার খণ্ডন করিব। আপনি মাতামহাদ গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত নামগ্রহণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পুস্তিকা থাকিলে সংগ্রহ করিয়া রেজিষ্টার পোষ্টে পত্রিকা অফিসের ঠিকানায় অবশ্যই পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেলেই উহা ফেরৎ পাঠাইতে পারিব। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অনেকেই হইতে পারেন। কিন্তু “মহাজ্ঞানের যেই মত, তাতে হব অস্থিরত, পূর্বাণের করিয়া বিচার” বাক্য অবলম্বন করিলে “নাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে” পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই তিনেরই বাক্য ও তত্ত্ব অভিন্ন। কখনও কোনক্রমেই পরস্পরের মধ্যে মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তবে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতে পারে। পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য এককথা নহে। পার্থক্য বিরোধ আনয়ন করে, আর বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করে।

“মহামন্ত্র” উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনের বর্তমান যে রীতি প্রচলিত দেখা যায়, উহা সুপ্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অম্বয় ও ব্যতিরেক পাশাপাশি অবস্থান করে। নাস্তিক আন্তিকেরই বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। “নাধু-শাস্ত্র” জগতে চিরকালই আছেন ও থাকিবেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরও অভাব নাই। সুতরাং এজন্ত ধর্ম-প্রচারকগণকে দর্কদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণবগণ সকলেই মহামন্ত্র গ্রহণকারী ‘লক্ষপতি’ নন। “লক্ষপতি” সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। মহাপ্রভু যাহাকে লক্ষপতি বলিয়াছেন তিনি সংখ্যাপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তনকারী; সেইরূপ লক্ষণের আবার অসংখ্যাতভাবে হরিনাম-মহামন্ত্রের উপদেশ-প্রদানকারী। যাহারা হ্রিনাম-সেবাপরাধী, তাহারা ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনের বিরোধী। তাহারা কষ্টকল্পনা করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বক্তব্য অস্থাবনে অসমর্থ হইয়াই মহামন্ত্রের পরিবর্তে “হরি-হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ” পদ মহামন্ত্র বলিয়া গাহিতেছেন। কিন্তু ভজন-পরায়ণ রাগমার্গীয় বৈষ্ণবগণ “হরে কৃষ্ণ” মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্বক জপ এবং অসংখ্যাতভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া থাকেন। মহামন্ত্র তারকত্রয়-নামের ইহাই একটা বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে সিংহাসনের একই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করা রম্যভাস-দৃষ্ট বিচার। অন্ততঃ একই সিংহাসনে পৃথক প্রকোষ্ঠে উহাদের স্থাপন প্রয়োজন। মহামন্ত্র কীর্তনের পরিবর্তে “জয় জয় রাধাকৃষ্ণ” ইত্যাদি কাল্পনিক নাম বা ছড়াগানের প্রচলন নামাপরাধেরই নামান্তর। উহা বিংশতি বৎসরেরই হউক আর শত বৎসর যাবৎই হউক, যেহেতু উহা কাল্পনিক—মহাজনানুগত নহে। তজ্জন্য সুধী ভক্তসমাজ শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। তবুও, রসজ্ঞ, সুধীভক্ত—শ্রীনাথ-ভজন-পরায়ণ। সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রম্যভাস-দোষ সম্ভবপর নয়। ঐস্থানে যাহারা কাল্পনিক নাম কীর্তন পরিত্যাগ করিয়া ‘মহামন্ত্র’ গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহাদের মহতী চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইহাকে তাহাদের স্ব-মত না বলিয়া শাস্ত্রীয় মত বলিয়াই গ্রহণ করা কর্তব্য। অশাস্ত্রীয়, মহাজনগণের অননুমোদিত, কল্পিত নাম বা ছড়াগান সর্বথা পরিবর্জনপূর্বক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সম্মত শ্রীনাথগ্রহণ-পদ্ধতি সর্বকালে সর্বসমত্যাগহীন—কর্তৃক সমাদৃত।

প্রশ্ন ৪—“ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক” তারকত্রয় মহামন্ত্র নাম সংখ্যা-গতভাবে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনীয় কিনা ?

উত্তর ৪—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ‘মহামন্ত্র’ শব্দে যে ষোলনাম বত্রিশ এক্ষরকে পক্ষ্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণ—

“মূখ’ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।

‘কৃষ্ণমন্ত্র’ জপ সদা,—এই মন্ত্রসার ॥

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ’বে সংসার মোচন।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবৈ কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।

সর্বমন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম ॥

* * *

কিবা মন্ত্র দিল্য, গোস্বামি, কিবা তার বল।

জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥

হাসায়, নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।

এত গুনি, গুরু মোরে বলিয়া বচন ॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত’ স্বভাব।

যেই জপে, তা’র কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭২-৭৪, ৮১-৮৩)

জপ ত্রিবিধ :—ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্রাস্ত্রস্ত ভেদান্নিবোধত ।

বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ ॥

জগৎপাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ আত্মতরোস্তরঃ ॥

যদ্বচনৌচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ ।

মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥ (নৃসিংহ পুরাণ)

জপযজ্ঞ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। ইহার মধ্যে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। উচ্চ, মীচ ও স্বরিত-নামক স্বরযোগে সুপরিষ্কৃত বর্ণদ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে উহাকে “বাচিক জপ” বলে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে “হরে কৃষ্ণেতু্য্যৈঃ” শ্লোকে যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্রের “বাচিক-জপ”-নীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু উহা সংখ্যাত; অসংখ্যাত নহে। তদ্বস্তরে যুক্তি এই যে, মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিবার যে প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতেই প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ও শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের লেখনী হইতেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মহাজনগণ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তনের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কি আমাদের গ্রহণযোগ্য নহে? ঠাকুর নরোত্তমাদির পদাবলীতে উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র কীর্তনের উল্লেখ বহুস্থলেই রহিয়াছে।

শ্রীগুরুদেব অপরের শ্রুতির অগোচরে শিষ্যের কর্ণে “মন্ত্র” উপদেশ করেন এবং সেই মন্ত্র অপরের নিকট অপ্ৰকাশ্য, ইহাও বলিয়া দেন। “সংখ্যা বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্” (হ: ভ: বি: ২।১১৭) অর্থাৎ সংখ্যা ব্যতীত কখনও মন্ত্র জপ করিতে পারিবে না এবং কাহারও নিকট মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে যে “মহামন্ত্র” উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি অপরের শ্রুতির অগোচরে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভক্তের কর্ণেই বলিয়াছিলেন, না—উহা বহু ভক্তের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দিয়াছেন? মন্ত্রের জ্ঞান ইহা অপরের নিকট অপ্ৰকাশ্য বা মনে মনে জপ্য, ইহা কি শ্রীমহাপ্রভু বলিয়া দিয়াছিলেন? লোকলিপিক শ্রীমহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহামন্ত্র অপর বিষ্ণু-মন্ত্রের জ্ঞান কেবলমাত্র জপ্য নহে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনীয়ও। ইহা যে কষ্টকল্পনা নহে, তাহা শ্রীমহাপ্রভুর নিজ আচরণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

“মন্ত্র” ও “মহামন্ত্রের” বিচার এই যে, যখন মন্ত্র বীজ ও প্রণব-পুষ্টি হইবে, চতুর্থাস্ত-পদযুক্ত ও নমস্-শব্দ প্রভৃতি যোগ হইবে, তখন ইহা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য এবং যখন ইহা বীজ ও প্রণব-রহিত হইবে, তখন ‘মহৎ’ বিশেষণে বিশেষিত হউক বা না হউক অথবা নমন্ প্রভৃতি যোগে চতুর্থাস্ত পদযুক্ত হউক বা না হউক, তাহা মহামন্ত্ররূপে আখ্যাত হইলেই সাধারণ্যে প্রকাশ্য, এমন কি উচ্চৈঃশ্বরে কীর্তনীয় বা সংকীর্তনীয়। ‘মন্ত্র’ শব্দটি মহৎ-শব্দের যোগে মহামন্ত্র হওয়ার দরুন ইহা মন্ত্রও বটে, মহামন্ত্রও বটে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১।২০২) বলেন,—“দান, যজ্ঞ, জ্ঞান, জপ ইত্যাদির দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, শুচি-অশুচি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ নিয়মাদি রহিয়াছে ; কিন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্তনে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মাদি নাই।”

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উপদেশচ্ছেলে বলিয়াছেন,—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ।

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রভু কহে,—কহিলাও এই মহামন্ত্র ।

ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নিরর্থক ॥

ইহা হৈতে সর্বদিকি হইবে সবার ।

সর্বলক্ষণ বন’ ইথে বিধি নাহি আর ॥

দশ-পাঁচ মিলি’ নিজ ধারেতে বসিয়া ।

কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৪-৭৯)

সংকীর্তন কহিল এ তোমা সবার্যারে ।

জ্ঞী-পুত্রে-বাপে মিলি’ কর’ গিয়া ধরে ॥

প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই’ সবার উল্লাস ।

দণ্ডবৎ করি’ সবে চলে নিজ বাস ॥

নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম ।

প্রভুর চরণ কায়-মনে করি’ ধ্যান ॥

সদ্ব্য হইলে আপনার দ্বারে সবে মিলি ।

কীর্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৮১-৮৪)

এখানে প্রথম পন্থারে শ্রীমদ্ব্যাপ্তভু “মহামন্ত্র” শব্দে কৃষ্ণ-নামকে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম-শব্দে কেবলমাত্র কলিতারণ মহামন্ত্রেরই উপদেশ করিতেছেন বা বলিতেছেন ; কিন্তু সংখ্যাত-জপ করিবার উপদেশ করিতেছেন না। এই কৃষ্ণ-নাম-মহামন্ত্রই যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক কলি-কলুষ-নাশন নাম, তাহা এই পন্থারের পরবর্তী পন্থারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তিধারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই মহামন্ত্রই সর্বমন্ত্রের অংশীস্বরূপ। অতএব ইহাতে মন্ত্রমিহিত আছে, সেইজন্ত পরপন্থারে জপের সময়ে সংখ্যাপূর্বক জপের বিধি “স্বয়ং মহাপ্রভুই” দান করিতেছেন।

“ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥”

—অর্থাৎ সর্বক্ষণ বল ; সর্বক্ষণ জপ—একথা নহে এবং এই বলার মধ্যে জপ-সংখ্যার লায় কোন বিধি নাই, যেহেতু জপ “নিষ্ঠারণে” বিবিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

“নাম-লীলা-গুণাদিসমুচ্চৈভাষা তু কীর্তনম্।”

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।৬৩)

নাম, লীলা, গুণাদির উচ্চৈশ্বরে কখনকে কীর্তন বলে। বৈষ্ণব-চিন্তামণি বাক্যেও “ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেন কীর্তনম্”—এই কথা বলিয়া থাকেন। ওষ্ঠ-স্পন্দন হইলেই কীর্তন হইয়া যায়। আভিধানিক অর্থে সংকীর্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, “সম-কৃ-ভাবে—অনট্ অর্থাৎ সম্যকরূপে উচ্চারণ করাকে সংকীর্তন বলা হয়।” অথবা :—

কায়-মন-বাক্যৈঃ সর্বৈক্টিয়ৈর্বা বহুভিমিলিত্বা খোল-করতালাদি সংযোগেন যৎ কীর্তনম্ তদেব সংকীর্তনম্।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণী শিক্ষাষ্টকেও বলিয়াছেন,—“পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্।” নাম সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

থাইতে গুইতে যথা তথা নাম লয়।

কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(টিঃ চঃ অঃ ২০।১৮)

সুতরাং মহামন্ত্র শ্রীনাম-সংকীর্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম এবং ইহাতে সর্বজীবের অধিকার বর্তমান।

শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ,—

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে ।
 তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
 হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
 এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ।

ষোলনাম বজ্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥ (১৫: ভা: আ: ১৪:১৪০)

এস্থলে, খাইতে শুইতে মহামন্ত্র লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । খাইতে শুইতেও মহামন্ত্র কিরূপে সংখ্যাপূর্বক লওয়া সম্ভবপর ? এখানে ত' সংখ্যাপূর্বক ঐ নাম গ্রহণের কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই । ইহাতেই 'স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, "সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" বাক্যে "মহামন্ত্র নির্বন্ধ"-সহকারে জপ, উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন এবং অসংখ্যাতভাবে কীৰ্ত্তনের ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে ।

"শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র গুনহ হরিষে"—শ্রীচৈতন্যভাগবতের (২৩:২২) পয়ায়ে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে যে মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, ইহা কি সংখ্যাপূর্বক হইয়াছিল, অথবা ইহা তাঁহার নির্বন্ধকৃত শ্রীনামের সংখ্যার মধ্য হইতে একবার বিতরণ করিলেন ? যদি তাহা না হয়, তবে এস্থলে অসংখ্যাতরূপেই শ্রীগৌর-সুন্দর মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন । যদি উহা সংখ্যানির্বন্ধ ব্যতীত জপ বা কীৰ্ত্তন করা নিষেধ হয়, তবে স্বয়ং প্রভু কেন অসংখ্যাতভাবে ইহা ভক্তগণকে উপদেশ করিলেন ? ইহা হইতেও মহামন্ত্র যে অসংখ্যাতরূপে কীৰ্ত্তনীয় তাহা প্রমাণিত হয় ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (উত্তর খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণৈষায়ন বেদব্যাস-ঋষি স্মৃতকে "হরিনামসংজ্ঞক পরমার্থসাধক" যে মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, সেই "সর্বসিকিপ্রদ হরিনামাখ্য মন্ত্র কি" এই প্রশ্নের উত্তরে ষোলনাম বজ্রিশাক্ষর মহামন্ত্রই (৫৫ শ্লোক) উপদেশ করিয়াছেন । "তদহং বোধিধাম্মি মহাভাগবতো হসি" বাক্যে উক্ত হইয়াছে, তুমি ভগবদ্ভক্তের শিরোমণি মহাভাগবত ; অতএব তোমায় আমি এই মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

এস্থলেও শ্রীব্যাসদেব উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতভাবে শ্রীস্মৃতকে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন । এই "মহামন্ত্র" পূর্বে ব্রহ্মা অদিরা ঋষিকে উপদেশ করিয়াছেন । স্তবরাং উভয়ক্ষেত্রেই গুরুপরম্পরাক্রমে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরেই উহা উপদিষ্ট হইয়াছে । কেবলমাত্র সংখ্যাপূর্বক জপোদ্দেশ্যেই ইহা কর্ণে প্রদত্ত হয় নাই ।

বাক্‌দেবী বৃষভাসুরাজকে “হরিণাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণভৃঙ্গি হয় না ; এ-
 কারণ চরমশ্রেয়জনক হরিণাম মহামন্ত্রের অমুকীর্তন কর” বলিয়া উপদেশ
 করিলেন। এস্থলে জপ বা সংখ্যাপূর্বক জপের কোনরূপ উল্লেখ করা হয়
 নাই ; বরং কীর্তন, অমুকীর্তন শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। গুরুর নিকট হইতে
 এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

তন্নাম কীর্তনং ভূয়স্তাপত্রয়-বিনাশনম্।

* * * *

নাম-সংকীর্তনাদেব তারকং ব্রহ্মদৃশ্যতে ॥

* * * *

নাম সংকীর্তনং তন্মাং সদাকার্য্য বিপশিতা—(৫৮, ৫৯, ৬০)
 ইত্যাদি শ্লোকেও তারকব্রহ্মনাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনের বিধি প্রদত্ত
 হইয়াছে। সুতরাং ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই যে জপ্য ও মৃদঙ্গ-
 করতালাদি-সহযোগে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্তনীয়, তাহা পূর্ববর্ণিত
 উক্তিসকল হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিতিক্ষু শ্রীমন্তুক্তিবদান্ত বাগন

বিজ্ঞপ্তি

বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞানভূষণ
 প্রভুবরের ‘গীতাভূষণ’-নামক ভাষ্যভাষ্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
 নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্তুক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী
 মহারাজ-সম্পাদিত এবং তৎকৃত ‘অমৃতভূষণ’-নামী টীকা সমন্বিত
 শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থ-
 প্রাপ্তিবিষয়ে আগ্রহী গৌরভক্ত ও সুখী পাঠকবর্গকে অনুসন্ধান
 করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

ব্রাহ্মণ বললেন,—ব্রাহ্মণবিবেচী, কুটিলমতি, লোভী, বিষয়াসক্তচিত্ত রাজার পাপকর্মবশতঃই আমার এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এতে আমার কোন দোষ নাই। কুটিলতা ও সরলতা দুটো কথা। সরলতার দ্বারা সকলকে ভালবাসা যায়। সরলতার দ্বারা স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রীতি, ভালবাসা—সবগুলো সম্ভব। সরলতা কি?—সরলতা হল আন্তরদর্শন, আন্তরদৃষ্টি। এরদ্বারা জগৎকে বশীভূত করা যায়। হিংসাবৃত্তি যে পশুর, সেও বশীভূত হয় স্নেহে। কুটিলতা হল কোটনামি। আমার সরকারের সঙ্গে বিদেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কুটনৈতি ভালকথা নয়। গালাগালি একদিক দিয়ে। সুনীতি, দয়ীতি হল—সরলতা। সরলতার অপর নাম স্নেহ-মমতা।

লোভী লোকের কখনও ভাল হয় কি? আমার ঘতটুকু আছে তাতে আমি সন্তুষ্ট কি? ‘যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো ধন্বাতীতো বিমৎসরঃ’—গীতা বললেন। তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আরও দাও, আরও চাই—এতে চরম অশান্তি মানুষ্যের।

“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—শাস্ত্রের বচন।

অতএব কর সবে লোভ সংবরণ ॥”

লোভ আসছে কোথা থেকে? Generated হচ্ছে কি করে? ঈশ্বার মধ্যে বলেছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সদ্ভক্তেবুপজায়তে।

সদ্যাং সংজায়তে কামঃ কাম্যাং ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধাভ্যবতি সম্রোহঃ সম্রোহাং স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রণশ্চতি ॥

কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ এইভাবে পর পর আসছে। কামনা-বাসনার কোনদিন শেষ আছে কি? সমস্ত পূর্তি কি সম্ভব? কখনই হবে না। ভগবানকে ভালবাসতে গেলে প্রাকৃত কামনা-বাসনা কমাতে হবে। Economics এর Theoryও তাই। আমাদের যে অসীম আকাঙ্ক্ষা, আমাদের যে অভাব বোধ, নেটাকে সীমিত করতে হবে। তবেই মানুষ শান্তি লাভ করতে পারবে। আর এটাকে যত বেশী বাড়িয়ে দেওয়া হবে ততই অশান্ত

জীবন, ততই অশান্তি লাভ। শান্ত্রে সেই কথাই বলা হয়েছে। কে শান্তি লাভ করবেন ? কৃষ্ণ বললেন গীতায়,—

অপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং, নমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি নরকৈঃ, সঃ শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমান্শরতি নিস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

যিনি কামনা-বাসনা কমিয়ে আনতে পেরেছেন, তিনি শান্তি লাভ করবেন। বিষয়াসক্তচিত্ত রাজা। রাজার বিষয় থাকবে না, রাজার রাজত্ব থাকবে না—এ আবার কি কথা! রাজার নিশ্চয়ই রাজত্ব থাকবে, প্রজা থাকবে, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি কত কি থাকবে। কিন্তু এখানে বলছেন,—বিষয়াসক্তচিত্ত রাজা প্রজাগণের কোন কল্যাণ করতে পারেন না। কাকে বলি বিষয়?—‘জড়-ভোগ্যকাজ্ঞা’—অধিক সংগ্রহ পিপাসাকে বলেছেন। সরকার প্রজাগণকে খাওয়াবেন, দাওয়াবেন; তার Food Corporation থাকবে, তা না হলে সরকার খাওয়াবেন কি করে? সে সব অফিস ত’ থাকবে। খাত্ত সংগ্রহ পূর্ব থেকে না করলে অসময়ে কি করে চালানো যাবে? আমি খাব, আমি পাব, আমি বাঁচব, অপরের কল্যাণচিন্তা যেখানে নাই—এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনাই বিষয়াসক্তি। আমি যদি আত্মকল্যাণ চাই, তাহলে সকলের কল্যাণ আমার প্রার্থনা করা উচিত। তার মধ্যে আমারও কল্যাণ নিহিত। আমি যদি অপরের কল্যাণ না চাই, তাহলে আমার কল্যাণ ব্যাহত হবে। এই Theory শান্ত্রে বলা আছে।

এখানে ব্রাহ্মণ বলছেন কি? রাজার পাপকর্মবশতঃ আমার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আমার ছেলে যে মারা যাচ্ছে, এজন্য আমার কোন দোষ নাই।

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্ ।

প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥

হিংসাপরায়ণ, অজিতেন্দ্রিয়, দুঃস্বভাব নৃপতির আশ্রয়ে প্রজাগণ দরিদ্র, নিত্যদুঃখিত ও ক্লেষণগ্রস্ত হয়। কথাগুলি ঠিকই। এতে একটুও ভুল নাই। ‘রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট’—কথা আছে। Collective যে অছায় তার দ্বারাও রাজ্য নষ্ট হয়। প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়, আবার রাজার পাপেও রাজ্য নষ্ট হয়। এই দুটি বিষয় এখানে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন ব্রাহ্মণ। এইরূপে রাজদ্বারে ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৃত-পুত্র নিক্ষেপ করে ব্রাহ্মণ রাজনিন্দা করতে লাগলেন। এখানে রাজনিন্দা—কৃষ্ণনিন্দা নয়।

তামজ্জুন উপশ্রুত্য কহিচিৎ কেশবাস্তিকে ।

পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥

কিংসিদ্ব্রহ্মজ্ঞম্বিবাশে ইহ নাস্তি ধনুর্ধরঃ ।

রাজন্তবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে ॥

কদাচিৎ তাঁর নবম বালকের মৃত্যু হলে অর্জুন কৃষ্ণের নিকট থেকে পূর্বের স্ত্রায় আক্ষেপ-বচন শ্রবণ করে ব্রাহ্মণকে বলতে লাগলেন,—হে ষিঙ্গবর ! আপনি কি জন্ম বুধা বোদন করিতেছেন ? এখানে কি এমন একজন অধম ক্ষত্রিয়ও নাই, যিনি আপনার গৃহে থেকে রক্ষকরূপে আপনার সন্তানকে রক্ষা করতে পারেন ? ইহারা ব্রাহ্মণের স্ত্রায় কেবলমাত্র যজ্ঞে সম্মিলিত হতে পারেন ? শুধু মিটিং করতে পারেন, প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, কাজে কিছু নয় । এই বলে সমালোচনা করলেন ।

ধনদারাজ্ঞাপূজা যত্র শৌচস্তি ব্রাহ্মণাঃ ।

তে বৈ রাজন্তবেষণে নটী জীবন্ত্যন্তস্তরাঃ ॥

যাহারা বর্তমান থাকতে ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী-পুত্র-ধন-বিরোগে শোকগ্রস্ত হয়েছেন, সেই আত্মপ্রাণ-তর্পণরত নটগণ যেন কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত রাজবেশ গ্রহণ করেছেন । রাজার সমালোচনাও করলেন অর্জুন । হে ভগবন্ ! আমি নিশ্চয়ই হুঃখগ্রস্ত আপনাদের সন্তানগণকে রক্ষা করব—প্রতিজ্ঞা করলাম । যদি প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হই, তাহলে অগ্নিতে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণের বিলাপ-শ্রবণ-জনিত পাপ হইতে বিমুক্ততা লাভ করব । ব্রাহ্মণ বললেন,—

সদ্বর্ষণো বাস্তুদেবঃ প্রত্যান্নো ধর্ম্মিনাং বরঃ ।

অনিক্রুদ্ধোহপ্রতিরোধো ন জাতুং শক্যুবন্তি যং ॥

তং কথং হু ভবান্ কর্ম্ম হৃদরং জগদীশ্বরৈঃ ।

অং চিকীর্ষসি বালিশ্চাং তন্ন শ্রদ্ধগ্ৰহে বয়ম্ ॥

সদ্বর্ষণ, বাস্তুদেব, ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ প্রত্যান্ন এবং অদ্বিতীয় রথী অনিক্রুদ্ধ, এঁরা যখন আমার পুত্রের সংরক্ষণে সমর্থ হইছেন না, সেখানে তুমি কিরূপে সমর্থ হবে আমার ছেলেকে রক্ষা করতে ? তুমি কেবলমাত্র মূর্খতাবশতঃ জগদীশ্বরেরও হৃদর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা করছ । জগদীশ্বরেরও হৃদর কর্ম্ম, তাঁর পক্ষেও কঠিন । কেন একথা বললেন ?—মাত্র কক্ষণে জন্মগ্রহণ করছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে । ভগবান্ কি কারও দায়িত্ব নিতে ষাচ্ছেন বা নিয়েছেন কি ? এ কথা পেয়েছেন কোথাও আপনারা ? তিনি আগের থেকে বলে দিয়ে বসে আছেন আমি প্রজাগণের কল্যাণ নিমিত্ত

আইন করে দিয়েছি। যারা স্বেচ্ছাবে আইন পালন করছে, তারা ফুল পাবে, আর যারা আইন অমান্ত—Violate করছে, তাদের সাজা হবে। আমাকে দোষারোপ কর না বাবা। আমি সবটার মধ্যে আছি, আবার নিলিষ্ট। গীতায় তাই বলা হয় নাই কি ?—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মানি লোকস্ত স্ফুটতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥

ন মাং কর্ম্মানি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজ্ঞান্নাতি কর্ম্মভিন্নং স বধ্যতে ॥

কর্ম্ম-কর্ম্মফল আমাকে বাঁধতে পারে না। হে অর্জুন! যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। আমার উপর দোষারোপ করবে কেন? আইন ত' করে রেখেছি। তুমি আইনটা যথাযথভাবে পালন কর, ফুল তুমি পাবে; আর অজ্ঞান করলে তোমার সাজা হবে। সেইজন্য ভগবান্ কোন দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। তবে জগৎকে দেখাবার জন্য, ভগবান্ আমি সর্ব্বসমর্থ, সেইটা দেখাবার জন্য মৃত-পুত্রগণকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ রাথতে পারেন নাই তাঁর নয়টা ছেগেকে। কেন রাথতে পারেন নাই? তাদের কর্ম্ম-কর্ম্মফল ত' পৃথক্, আর ব্রাহ্মণের কর্ম্মফল পৃথক্। পিতার আগে পুত্র চলে যাচ্ছে, মায়ের আগে কন্যা চলে যাচ্ছে, ভ্রাতার আগে ভগ্নী চলে যাচ্ছে। যার যেমন কর্ম্ম সেই অনুসারে ফলভোগ। তুমি কেবল মূর্খতাবশতঃ জগদীশ্বরেরও দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা করছ। আমার এতে বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে বলে আমার মনে হয় না, বিশ্বাস হয় না। অর্জুন বললেন,—

নাহং সর্ঘ্বণো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্কিরেব চ ।

অহং বা অর্জুনো নাম গাণ্ডীবঃ যস্ত বৈ ধনুঃ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ঘ্বণ, কৃষ্ণ, প্রহ্লাদ বা অমরক্ক নহি। ভগবানের ক্ষমতার উপরে আরও এককাটি চড়ে গেল। অহংকার যখন আসে, তখন মানুষের সব শেষ। দর্পহারী মধুসূদন কারও অহংকার রাখেন না। পরন্তু যার গাণ্ডীব নামক অস্ত্রিতর ধনু বর্ডমান, আমাকে সেই অর্জুন বলে জানবেন। ব্রাহ্মণকে বলছেন,—আমি সেই অর্জুন, আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তকে পরাভূত করে আপনার পুত্রগণকে এনে দেব। মৃত্যুর সময় লড়াই করে আপনার পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দেব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

এবং বিশ্রুতিতো বিপ্রঃ ফাঙ্কনেন পরস্তপ ।

জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্ববীৰ্য্যং নিশাময়ন্ ॥

অৰ্জুনের এইকণ বাক্যে বিশ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ তাঁর অসম্ভব ক্ষমতায় নমস্কৃত হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। অনন্তর ভাৰ্য্যার প্রদৰ্শনকাল আসন্ন হইলে দ্বিজবর কাতর-চিত্তে অৰ্জুনকে স্মরণ করলেন,—হে অৰ্জুন! তুমি ত' আমার ছেলেকে রক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছিলে, কই এখন আসছ না কেন? অৰ্জুন এসে হাজির হয়েছেন। তিনি নানাবিধ ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজিত করে স্মৃতিকাগারকে আবদ্ধ করলেন। উৰ্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে শর-পিল্লার নির্গমন করলেন। পুনরায় ব্রাহ্মণ পত্নীর নবম কুমার জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বোদিন করতে করতে দশদীর্ঘে আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন,—

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিমদন কৃষ্ণসমিধৌ ।

মৌচ্যাং পশ্চাত মে যোঃস্থং শ্রদ্ধধে ক্লীবকথনম্ ॥

অগো! আমার কি মূৰ্খতা! আমি এই ক্লীব অৰ্জুনের বাক্যে বিশ্বাসঘৃষ্ট হয়েছিলাম। 'ক্লীব' বলে অৰ্জুনকে গালাগালি দিচ্ছেন। কোন ক্ষমতা নাই যার দে-ই ক্লীব। সাংখ্যের পুরুষ কে?—ক্লীবব্রজ হলেন সাংখ্যের পুরুষ। দে পুরুষের কোন ক্ষমতা নাই, দেখানে প্রকৃতিই সকল ক্ষমতার অধিশ্বরী। ব্রাহ্মণ বলছেন এখানে,—আমি এই ক্লীব অৰ্জুনের বাক্যে বিশ্বাসপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, ষিক আমার! যার সন্তান-রক্ষায় বিশেষ ক্ষমতান্বিত প্রত্নায়, অনিরুদ্ধ, বলরাম এবং স্বয়ং কৃষ্ণও দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না, সেই কার্য্য ঈশ্বরভিত্তিমাত্র দ্বারা কি সম্পন্ন হতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন না সন্তানকে রক্ষার, দেখানে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন অৰ্জুন—আমি তোমার সন্তানকে বাঁচাব। এটা কি কখনও সম্ভব?

ধিগজ্জুনং শ্রবণাদং ধিগানুজ্ঞাষিনো ধমুঃ ।

দৈবোপস্থঃ যো মৌচ্যাদানিমীষতি হৃদম্ভিতিঃ ।

যে হৃদম্ভিতি মূৰ্খতাবশতঃ 'দৈবকটুক লোকান্তরে নীত মদীয় পুত্রকে' আনয়ন করতে ইচ্ছুক হয়। ব্রাহ্মণ তাহলে জানেন তাঁর ছেলেদের কি গতি, বাজার উপরে—ভগবানের উপরে তিনি ঠিক দোষারোপ করেন নাই। বললেন কি?—দৈবকটুক লোকান্তরে নীত মদীয় পুত্র। তাহলে ব্রাহ্মণ ত' সমাধান পেয়ে গেছেন। আমার ছেলেগুলো যে মারা যাচ্ছে, তারা তাদের কর্ম্মফলে মারা যাচ্ছে। এতন্ত তিনি কারও প্রতি দোষারোপ করছেন না। অথচ এখানে অৰ্জুন

কেন আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। একুপ প্রতিজ্ঞা করা কি তাঁর বোকামি হয় নাই? তাদৃশ মিথ্যাবাদী অজ্জু'ন এবং তাদৃশ আত্মপ্রাণহারত ব্যক্তির গাণ্ডীবকেও শিক্। ব্রাহ্মণ এইরূপ নিন্দা করতে থাকলে অজ্জু'ন বিজ্ঞাবলে যে-স্থানে ষমরাজ বর্তমান, সেই সংঘমনী পুরীতে গিয়ে হাজির হলেন। যার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, একটা জায়গা আছে সেখানে গেলে সন্ধান পাওয়া যায়। সেটা I. B. Department এর Headquarter। ওখানে গেলে বহু ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং বহু নতুন নতুন খবর পাওয়াও যায়। সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন অজ্জু'ন। দেখি, এখানে কোন হৃদিস্ মেলে কিনা ব্রাহ্মণের ছেলেদের—আমি যাদের বাঁচাব। কিন্তু সেখানে নাই তারা, তারা অন্তত নীত হয়েছে। কি করে পাবেন অজ্জু'ন? অজ্জু'ন সেখানে ব্রাহ্মণের পুরকে না পেয়ে উত্তত অস্ত্র ধারণপূর্বক ক্রমে ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, মিথাতলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, রমাতল, স্বর্গ এবং অন্যান্য লোকসমূহে গমন করলেন। সব জায়গায় যাচ্ছেন অজ্জু'ন। আর এখন সামান্য কিছু এগিয়ে গেলে ত' আমরা ভগবান্ বনে যাচ্ছি! চন্দ্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদিতে বর্তমানে কত কি অভিযান চলছে। ঐসব স্থানে দশরীয়ে যাওয়া অতি কষ্ট। অনেক সব আয়ুধ, বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে যেতে হচ্ছে। গ্যাস-সিলিণ্ডার নিয়ে যেতে হচ্ছে। তা না হলে কোথায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নাই। অজ্জু'ন তাঁর সাধনবলে স্বাভাবিকভাবে যাচ্ছেন সব লোকে। কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণপুত্রের সন্ধান পেলেন না। প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হতে না পেয়ে অগ্নিপ্রবেশে উত্তত হলে কৃষ্ণ তাঁকে নিবারণ করে বলতে লাগলেন,—

দর্শয়ে বিজস্বনুস্তে মাবজ্ঞাত্বানমান্বনা।

যে তে নঃ কীর্ত্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি ॥

হে সখে! আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখাইব, তুমি মরতে যাচ্ছ কেন? তুমি স্বয়ং নিজকে অবজ্ঞা করিও না। যারা এখন আমাদের নিন্দা করছে, তারাই পরে আমাদের বিমল কীর্ত্তি ঘোষণা করবে।

ইতি সন্তোষ ভগবান্ অজ্জু'নের সহেশ্বরঃ।

দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশং ॥

ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলে অজ্জু'নের সহিত স্বকীয় দিব্যরথে আরোহণপূর্বক পশ্চিম দিকে গমন করলেন। অনন্তর তিনি সপ্তপর্বত ও সপ্তসমুদ্রযুক্ত সপ্তদ্বীপ এবং লোকালোক পর্বত অতিক্রমপূর্বক ঘোর অন্ধকারে

প্রবেশ করলেন। সেই অন্ধকারে শৈব্য, স্থগ্ৰীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক-নামক
রথাস্থ-চতুষ্টয় গতিভ্রষ্ট হল। আর রথ অগ্রসর হতে পারছে না, ঘোর
অন্ধকার। ভগবান্ তখন সহস্রসূর্য্যতুণ্ডা সুদর্শন-চক্র রথ্যাগ্রে বসিয়ে দিলেন।
অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের গুণচ্যুত বাণ যেরূপ বাবণের সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করেছিল,
সেইরূপ অতি দ্রুতগামী সুদর্শনও প্রভূত তেজে প্রকৃতির পরিণামসমুত উক্ত
নিবিড় ঘোর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে তন্মধ্যে প্রবেশ করল। অজ্জুন
চক্রের পশ্চাদ্ভর্ত্তী দ্বারপথে উক্ত অন্ধকারের দূরে অবস্থিত সুবিস্তৃত অনন্ত অপার
উত্তম ভাগবত-জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক প্রতিহত দৃষ্টি হওয়ার নেত্রদ্বয় নিম্নলিখিত
করলেন। অজ্জুন ত' আরও যন্ত্র সময়ে চোখ বুজিয়েছেন। গীতার একাদশ
অধ্যায়—যখন বিষ্ণুরূপ দেখাছিলেন কৃষ্ণ, সেইদময়ও ত' চোখ বুজিয়েছিলেন
অজ্জুন। বাবা! সম্ব করতে পারছি না, থামাও থামাও, তোমার দিব্যরূপ
দর্শন করাতে হবে না, তুমি ঐ রূপ সম্বরণ কর। অনন্তদেব যেখানে বিরাজ
করছিলেন, সেই মহাকালপুরে গিয়ে হাজির হলেন। তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন
ব্রাহ্মণের নয়টী ছেলেকে। কেন?—এখানে বসেই তিনি কৃষ্ণকে দর্শন
করবেন।

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা ভৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্টিনা।

ওমিত্যান্মা ভূমানমাদায় দ্বিজদ্বারকান্ ॥

অবর্জ্যেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্।

বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ ॥

দর্শলোকধীশ্বর ভগবান্ এইরূপ আদেশ প্রদান করলে কৃষ্ণ এবং অজ্জুন
'তথাস্থ' বাক্যে তাহা স্বীকার করে দ্বিজবালকগণকে লইয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে
আগমন-মার্গান্তরারে মিজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট
যথাযথ বয়োব্রূপশালী পুত্রগণকে ফিরিয়ে দিলেন।

নিশাম্য বৈকং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।

যৎকিঞ্চিদ্ পৌকং পুংসাং যেনে কম্পাতুকম্পিতম্ ॥

অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হয়ে জীবগণের যাবতীয়
পৌকবই শ্রীকৃষ্ণের অলুকম্পাজাত বলে নির্ণয় করলেন।

ইতিদৃশান্তনেকানি বীৰ্য্যাপীহ প্রদর্শয়ন্।

বুভুজে বিবয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যুর্জিতৈর্দৈথৈঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই মন্তনোকে এইরূপে ঐদৃশ অনেক বীৰ্য্যযুক্ত চরিত প্রকাশ করে
লৌকিক-বিবয়-সকলের ভোগ এবং মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

প্রববধাখিলান্ কামান্ প্রজ্ঞাসু ব্রাহ্মণাদিষু ।

যথাকালং তথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যামাস্থিতঃ ॥

ইন্দ্র যেরূপ যথাকালে সর্বত্র বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ-পদাক্রুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের মধ্যে যাবতীয় অভীষ্ট বিতরণ করেছিলেন ।

হস্তা নৃপানধর্মিষ্ঠান্ ষাতিয়িত্বার্জুনাদিভিঃ ।

অজ্ঞান্য বর্ত্তয়ামাস ধর্ম্যং ধর্ম্মসুতাদিভিঃ ॥

তিনি স্বয়ং কংসাদি কতিপয় অধার্ম্মিক নরপতির বিনাশ করিয়া এবং অর্জুন প্রমুখ অমুগত বীরগণদ্বারা তদ্রূপ ব্যক্তিগণের বিনাশসাধন করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদিদেরা সাক্ষাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেছিলেন ।

প্রীক্ষেত্র দর্শন

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

নিদয়্যার ষাট দিয়া চৈতন্য ঈশ্বর ।

সন্ন্যাস করিল গিয়া কাটোয়া নগর ॥

নীলাচলে শেষলীলা নিজ প্রয়োজন ।

প্রকাশিলা রহি কাশীমিশ্রের ভবন ॥

বুঝিতে না পারি প্রভু ককণা-কৌশল ।

জগন্নাথ দরশনে হইলু বিকল ॥

বহুদিন হৈতে ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল ।

দেখিব সন্ন্যাস স্থান পুরী নীলাচল ॥

কৃপা করি এ অধমে করি আকর্ষণ ।

তব লীলাস্থান প্রভো করাও দর্শন ॥

পতিতপাবন তুমি জগৎ ঈশ্বর ।

নিজলীলা স্থানে বাস দেহ নিরন্তর ॥

সেইত' আনন্দ ধাম চিন্ময় ভবন ।

অধমের ভাগ্যে কিবা হবে দরশন ॥

কাশী মিশ্রালয় আর হরিদাস স্থান ।
দর্শনে হইবে ধন্য এ পাপ পবান ॥
হরিদাস সমাধি, সমুদ্র মনোরম ।
হেরিয়া অন্তর কবে জুড়াইবে মম ॥
এই মত বহু চিন্তা মনোমধ্যে হয় ।
কখনও বা করে আঁখি, ব্যাকুল হৃদয় ॥

কতদিনে ক্ষেত্রধামে করিয়া গমন ।
জগন্নাথ মুখচন্দ্র করিহু দর্শন ॥
দেখিহু সে মুখচন্দ্র কমল নয়ন ।
জগন্নাথ বিশ্বস্তর ভুবনপাবন ॥
বামপার্শ্বে বলদেব স্তূভদ্রা সহিত ।
নীলাচলে শ্রীমন্দিরে নিত্য বিরাজিত ॥
বিচিত্র ব্যাপার অতি সেবা রাজোচিত ।
শত শত দাসে সুখে করে অবিরত ।

গল্পড় স্তম্ভ সদন,
জগন্নাথ, জগৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীক্ষেত্র দ্বারকাপুরী,
জগন্নাথ রূপ হরি,
দাক্ষিণ্যরূপে অবতার ॥
বামে শ্রীরোহিনীসুত,
মধ্যে শ্রীশুভদ্রাযুত,
নিরুপম ঐশ্বর্য বিলাস ।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব,
মহাপ্রসাদ মহত্ত্ব,
রাগান্বিতা ভক্তি স্বপ্রকাশ ।
শ্রীমন্দির শোভা অতি, ব্রহ্মা আদি করে স্তুতি,
ভৃত্যগণে সেবে নিরন্তর ।
ভোগ হয় অবিরত,
সেবার বৈভব কত,
সে সৌন্দর্য্য অতি মনোহর ॥

নরসিংহ শ্রীদেবতা, কমলা-বিমলা মাতা,
শ্রীমন্দির নিকটে আবাস ।

রহি নীলাচল পুরী, স্বীয় প্রভু সেবা করি,
চুঁই সতী পান প্রেমোন্মাদ ॥

শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণ, চিহ্ন শোভে অতুলন,
মন্দিরের উত্তর অঙ্গনে ।

হেরি সেই শ্রীচরণ, কৃতকৃত্য ভক্তগণ,
আলিঙ্গন করে মনে মনে ॥

রাধাকৃষ্ণ একরূপ, গৌররূপ অপরূপ,
নবদ্বীপ ধামে অবতার ।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরি, আসি নীলাচল পুরী,
বিতরিল প্রেমের ভাণ্ডার ॥

লুকাইয়া নিজরূপ, রাধাকান্তি অপরূপ,
ধরি করে প্রেম আশ্বাদন ।

ভক্তসনে সঙ্কীর্ণনে, ভ্রমে প্রভু স্থানে স্থানে,
কভু যায় গুণিচা প্রাঙ্গণ ॥

বৃন্দাবনসম বন, দেখি' প্রভু হৃষ্টমন,
ব্রজপ্রেমে করেন রোদন ।

লভিতে সে প্রেমধন, কৃষ্ণনাম সুসাধন,
আচণ্ডালে করে বিতরণ ॥

সর্ব অবতার সার, শ্রীচৈতন্য অবতার,
সেই পদ করিয়া আশ্রয় ।

আমি প্রভু হীন ছার, তব কৃপা বিনা আর,
উদ্ধারের নাহিক উপায় ॥ (ক্রন্দনঃ)

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর আলোকে রথযাত্রা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৬ পৃষ্ঠার পর]

এইবার ধীরে ধীরে অরুণোদয় হইল সেই শুভ দিনের শুভ লগ্নের ।
শ্রীশ্রীগঙ্গাধরদেব অস্ত্র পাণ্ডুবিজয়ে শুভাগমন করিবেন শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে । গোপ-
বালাগণ কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ লাভ করিলেন না । একারণে আকাজক্ষা
করিলেন কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া তীহার নহিত ব্রজের মিলন-সুখ আশ্বাদন করিতে ।
শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচায় গমনকালে প্রভুর ভাব ছিল,—

“এই ধূয়া-গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর ।

কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই—এতাব অন্তর ॥”

এইভাবে লইয়া নৃত্যমধ্যে প্রভু একটা স্লোক পাঠ করিতেন,—

“এইভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক স্লোক ।

সেই স্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥

যথা :—

“যঃ কোমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তে চৌম্বীলিতমালতী-স্বরভয়ঃ প্রোঢ়া কদম্বানিলাঃ ।

সা চৈবাশ্মি তথাপি অত্র স্মরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোমসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠাতে ॥”

অর্থাৎ—“যিনি কোমারকালে রেবাতীরে আমার চিত্তহরণ করিয়াছিলেন,
তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন ; সেই মধুমানের রাত্রিও উপস্থিত ;
উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে ; কদম্ব-কানন হইতে বায়ুও মধুর-
রূপে বহিতেছে ; স্মরত-ব্যাপার লীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত ;
তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের
জন্তু নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥”

এই কারণে মহাপ্রভু অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানী ভক্তগণের সহিত অর্থাৎ
ব্রজগোপীগণ-সহিত “কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই”—এই ভাবে ভাবিত হইয়া
জগন্নাথদেবকে অদ্য পাণ্ডুবিজয়ে শুভাগমন করাইতেছেন নীলাচল-মন্দির হইতে
গুণ্ডিচা-মন্দিরে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনের প্রেমস্থলীতে ।

এই যাত্রার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু রাতে উঠিয়া নিজগণদিগকে সঙ্গে লইয়া
প্রাতঃস্নান করিলেন ও সকলের সহিত রথযাত্রা দর্শনে যাত্রা করিলেন । স্বয়ং

রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রগণ লইয়া মহাপ্রভুর গণকে বিজয় দর্শন করাইতে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু অধৈর্য, নিত্যানন্দ আদি ভক্তগণসহিত মহাস্থখে নীলচলপতির গমন দর্শন করিতেছেন।

শ্রীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠার পূর্বে শবরদেব মধ্যে শ্রীনীলমাধবরূপে ছিলেন। সেই নীলমাধব পরে জগন্নাথে রূপান্তরিত হওয়ায় শবর দয়িতাগণের জগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার জন্মিয়াছে। জগন্নাথদেবকে এই অধিকারে দয়িতাগণ রথোপরি উঠান। স্বয়ং ভগবানকে সিংহাসন হইতে রথে উঠানো তাঁহার নিজ ইচ্ছা ভিন্ন কখনই সম্ভব নয়। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন হাতীর শক্তিতে হাতাহাতি করিয়া পাণ্ডুবিজয় করান। কেহ স্বন্ধ লাগান, কেহ ধবেন শ্রীপাদ-পদ্ম, আবার কেহ কেহ কটিতে স্থূল পট্টভোরীদ্বারা বন্ধন করিয়া দুইদিক্ হইতে ধরিয়া তাঁহাকে রথোপরি উঠান। এবার বিশ্বস্তরের আপন-ইচ্ছায় সে রথ চলিতে আরম্ভ করে। মহাপ্রভু ‘মণিমা’ ‘মণিমা’ ধ্বনিতে কাতরস্বরে জগন্নাথদেবকে আহ্বান করিতে থাকেন। আর স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র ঝাড়ুদাররূপে—

“সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্বারজ্জন”।

এইভাবে রাজা মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। অপূর্ব সাজে সজ্জিত রথে জগন্নাথ, স্তম্ভা ও বলরাম এইভাবে যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথের দুপার্শ্বের শোভা অতি মনোহর,—

“সুশ্রু শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।

দুইদিকে টোটা নব—যেন বৃন্দাবন ॥

রথে চড়ি’ জগন্নাথ করিলা গমন।

দুইপার্শ্বে দেখি’ চলে আনন্দিত মন ॥”

গৌড়বাসিগণ মহানন্দে সেই স্তম্ভরজ্জু আঁকষণ করিয়া চলিয়াছেন। স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই রথ চালিত হইতেছে।

ফণে শিখ্র চলে রথ, ফণে চলে মন্দ ॥

ফণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে।

দৈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥

যাত্রাপথে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণকে স্বহস্তে মালা-চন্দন পরাইলেন। প্রভুর শ্রীহস্তের মালা-চন্দনের স্পর্শে ভক্তগণের আনন্দ শতগুণে বাড়িয়া গেল। প্রথমে প্রভু গুরুবর্গকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বাইন ও দোহারসহ-কীর্তন-সম্প্রদায়কে চারিটা দলে ভাগ করিলেন।

প্রথম দলে মূলগায়ক শ্রীশ্বরূপ-দামোদর, পাঁচজন দোহারসহ নর্তক শ্রীঅবৈতাচার্য্য। দ্বিতীয় দলে মূলগায়ক শ্রীবাস পাঁচজন দোহারসহ নর্তক শ্রীমিত্যানন্দ। তৃতীয় দলে মুকুন্দই মূলগায়ক পাঁচজন দোহারসহ নর্তক হরিন্দাস ঠাকুর এবং চতুর্থ দলে গোবিন্দ ষোড়শই মূলগায়ক ও পাঁচজন দোহারসহ বক্রেশ্বরই নর্তক। এই চার সম্প্রদায়ের সহিত কুলীনগ্রামের সম্প্রদায় ; শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিয়া মোট সাত সম্প্রদায়ে এই কীর্তন শোভাযাত্রা শুরু হইল। প্রতি সম্প্রদায়ে দুইটি করিয়া মাদল লইয়া চৌদ মাদলের কীর্তনসহ শ্রীজগন্নাথদেব যাত্রা করিলেন।

“জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।

দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ মাদল।

যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥”

রথযাত্রায় এই সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর এইবার একটা অপূর্ব লীলা শুরু হইল।—

কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি।

অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যার শুদ্ধভক্তি ॥

প্রভুর সে লীলা কেমন?—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু ‘হরি’ হরি’ বলি’।

‘জয় জগন্নাথ’ বলেন হস্তধ্বজ তুলি’ ॥

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।

এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥

সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।

অন্ত ঠাঞি নাহি যান, আমায়ে দয়ায় ॥

শ্রীবাসস্থলীতে যখন শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক হইয়াও বহুরূপে গোপীসঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন ; দ্বারকায় মহিবীবিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ‘বহু’ বিগ্রহ ‘প্রকাশ’ লীলা করিয়াছিলেন ; সেই শক্তি প্রকাশে মহাপ্রভু প্রত্যেক সম্প্রদায়ে নিজে নৃত্য করিতেছেন এই রথযাত্রায়। প্রত্যেক গোপী যেমন মনে করেন কৃষ্ণ কেবল তাহাব নিকটেই আছেন আর কাহারও নিকটে নাই, সেইপ্রকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাবিতেছেন,—প্রভু কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।

প্রভুর এই অপূর্ব লীলা ও কীর্তন দর্শনে জগন্নাথ হরবিতচিত্তে রথ স্থগিত

করিলেন। প্রভুর রূপায় রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর এই অলৌকিক লীলা দর্শনে প্রেমময় হইয়া উঠিলেন। রাজার তুচ্ছ সেবায়ই প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইভাবে রূপা করিলেন। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য রাজার সঙ্গ পরিহার করিয়া রহিলেন। মহাপ্রভুর এ লীলা একমাত্র সার্কর্ভোম ও রাজা দর্শন করিতে লাগিলেন।

“সার্কর্ভোম-সঙ্গে রাজা করে ঠারারূরি।

আর কেহ নাহি জানে চৈতন্তের চুরি ॥”

এইভাবে প্রভু নৃত্যরঙ্গে সবাইকে প্রেমের তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। নিজে নৃত্য করিয়া প্রভু ভক্তগণকে নাচাইলেন। আপনি মাতিয়া প্রভু সকলকে মাতাইলেন। শান্ত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া প্রভু স্বরূপের সহিত শ্রীবাস, রামাই, রঘুনাথ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ—এই নয়জনসহ উদঙ নৃত্য শুরু করিলেন জগন্নাথদেবের সম্মুখে।

“এই দশজন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায়।

আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায় ॥”

এই প্রচণ্ড নৃত্যমধ্যে কখনও প্রভু ছড়ার ছাড়িতেছেন, কখনও উর্দ্ধমুখে জগন্নাথদেবকে স্তবজুতি করিতেছেন, আবার কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। সেই সঙ্গে নৃত্যমধ্যে প্রভুর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার স্পষ্ট-ভাবে পরিস্ফুট।—

“স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।

নানা ভাবে বিবশতা, গর্জ, হর্ষ, দৈহ্য ॥

আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমি গড়ি’ যায়।

সুবর্ণ-পর্যন্ত যৈছে ভূমেতে লোটায়ে ॥”

রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যানন্দ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনটি দলে প্রভুকে বেষ্টিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ যেন শ্রীবাসস্থলীর মণ্ডলাকৃতি ব্যূহ। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল, দ্বিতীয় আবরণে কানীশ্বর, মুকুন্দাদি এবং রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসহ বাহিরে মণ্ডল রচনা করিয়া লোক নিবারণ করিতেছেন।

প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জগন্নাথদেবই চমৎকৃত হইলেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে রথকে স্থির করিয়া অনিমেষনেত্রে মহাপ্রভুরূপ ব্রজবিলাসিনীর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। স্তম্ভা, বলরামেরও মনে পরম-উল্লাস! এই নৃত্য দর্শনে।

এই উদগু নৃত্যে প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিকভাবের এমন বহিঃপ্রকাশ হইতে লাগিল যে, তাঁহার দেহের রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া মাংসখণ্ড ত্রণাকৃতি লাভ করিল ; সর্বদেহে শ্বেদবিন্দুর সহিত বক্তোদগম হইতে লাগিল। মুখে গদ গদ বচনে তিনি স্পষ্ট জগন্নাথ উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না, বলিতেছেন—‘জজ গগ’ ‘জজ গগ’। প্রভুর অশ্রুজল জলযন্ত্র ধারাবৎ চক্ষু হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার গৌরবর্ণ দেহকাস্তি কখনও অরুণবর্ণ ধারণ করিতেছে, কখনও মল্লিকা-পুষ্পদম রূপ লইতেছে। প্রভু কখনও স্তম্ভবৎ, কখনও শুক কার্দ্ধসম, কখনও ভূমিতে লুটাইতেছেন, আবার কখনও ভূমিতে শ্বাসহীন-ভাবে মৃতবৎ পড়িয়া রহিতেছেন। সে দৃষ্ট দর্শনে ভক্তদের প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

“কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।

অমৃতের ধারা চক্সবিশে বহে ঘেন।”

এইভাবে বহুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করিবার পর এইবার অন্তভাবে প্রভুর মন প্রবেশ করিল। তিনি স্বরূপ-দ্যমোদরকে গাহিতে আঞ্জা করিলেন। প্রভুর ভাব জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিলেন।—

“সেই ত’ পরাগনাথ পাইছ।

যাহা লাগি’ মদন-দহনে সুরি গেছ ॥”

এই ধূয়া সঙ্গে প্রভু এইবার মধুর নৃত্য করিয়া জগন্নাথের আগে আগে চলিলেন। আর জগন্নাথদেব—যিনি প্রভুর ‘প্রাণ বধূয়া’—ধীরে ধীরে প্রভুর সহিত চলিতে লাগিলেন বৃন্দাবন ধামে। ভক্তগণসহ এই নৃত্যকালে প্রভুর নেত্রগুগল জগন্নাথে নিমগ্ন। আর হৃহাতে তিনি গীতের অভিনয় করিতে করিতে চলিয়াছেন। এই অবস্থায় রাধাভাবস্বলিত প্রভু এবং জগন্নাথরূপে শ্রামের মধ্যে তখন যে ভাবের ঠেলাঠেলি চলিতেছে, সে ভাব হইল,—

“গৌর যদি পাছে চলে, শ্রাম হয় স্থিরে।

গৌর আগে চলে, শ্রাম চলে ধীরে ধীরে ॥

এইমত গৌর-শ্রাম দৌড়ে ঠেলাঠেলি।

স্বরথে শ্রামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥”

এই ভাবের ঠেলাঠেলির শেষে রাজবেশী কৃষ্ণের প্রতি গোপবধূ রাধিকার উক্তি,—

“অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।

সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব নঙ্গম ॥

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।

বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥”

অবশেষে রাধারাগীর প্রেমই জয়ী হইল—ক্রীষ্ণসুন্দর বলিলেন,—

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,

সেই প্রেম পরম প্রবল ।

লুকাঞা আমি আনে, সজ করায় তোমা মনে,

প্রকটেহ আসিবে সত্ত্বর ॥

অবশেষে প্রভু রথসহ প্রবেশ করিলেন বৃন্দাবনে । প্রভুর প্রেমের আকর্ষণে প্রাণ-বধূয়ারূপে আসিলেন জগন্নাথদেব ।

“আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ।

রথ রাখি’ জগন্নাথ করেন দর্শন ॥”

এইভাবে অপূর্ব নৃত্য, গীত, ভাব ও লীলার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সমাপ্ত হইল ।

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[“শ্রীচৈতন্য অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ”-নামক
পুস্তকের সমালোচনা]

কিছুদিন পূর্বে দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ সাল) “শ্রীচৈতন্য অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ”-নামে একখানি পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে । ঐ পুস্তকের প্রকাশক বিমল কান্তি সাহা, স্বর্ণা প্রকাশনী, ৯২, নিম্ন গোপালী লেন, কলিকাতা—৭০০০০৫ । পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছি । বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী প্রকালু জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে কলিযুগ-পাবনাবতারা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেছেন এবং সর্বত্র তাঁহার নাম প্রচারিত হইতেছে । কয়েকশত বৎসর পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—“পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম ।

সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥ (চৈ: তা: অন্ত্য ৪।১২৬)

আজ তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততত্ত্ব বিপ্রসত্ত-রসবিগ্রহ শ্রীম্মহাপ্রভুর অতুলনীয় গুণযুক্ত অলৌকিক শক্তি ও মহিমা জগতের সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এবং জনগণ শ্রীম্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করত তাঁহার প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হওয়ায় লেখক শ্রীম্মহাপ্রভুর এবিধ প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া এই পুস্তকে অতি কৌশলে শ্রীম্মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও অলৌকিকতাকে হয় প্রতিপন্ন করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন। লেখক এই পুস্তকে শ্রীম্মহাপ্রভুকে সাধারণ মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রতিবাদ না করিলে ইহার বক্তব্যকে পরোক্ষে সমর্থন করা হইবে এবং লেখকের অন্তায়, অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্য, কাল্পনিক ও অশাস্ত্রীয় কথা লোকে বিশ্বাস স্থাপন করত চৈতন্য-বিমূখ হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কায় শুদ্ধভক্তি-শিক্ষান্ত-কথনে কুণ্ড প্রকাশ করা পরহিংসা হইবে ভাবিয়া মাদৃশ বিত্তা-বুদ্ধিহীন অধম ব্যক্তি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কুপাশীর্বাদ যাক্রা করত পুস্তকখানির সমালোচনা লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। পুস্তকটির বাধাই ও প্রচ্ছদ-ছবির সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহার অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিকত্ব ও ভগবত্তা সম্পর্কে লেখক যে Challenging mood লইয়া লিখিতে পারেন, তাহা চিন্তা করা যায় না।

পুস্তকখানির নামকরণে যে, শ্রীচৈতন্য-লীলার সত্যতা সম্পর্কে নন্দেহ পোষণ করেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ‘অনন্ত জীবন’ বলিলে যে জীবনের অন্ত নাই অর্থাৎ শেষ বা নাশ নাই, তাহাই বুঝায়। যাহার নাশ নাই, তাহা নিত্য। সং বস্তুই নিত্য। গীতায় ২:১৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“নাসতো বিষ্ঠতে ভাবো নাতাবো বিষ্ঠতে মতঃ”—অর্থাৎ সং বস্তুর অভাব বা বিনাশ নাই এবং অসং বস্তুর নিত্যস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সত্য বস্তু, তাঁহার লীলার শতকরা শতভাগই সত্য; সেই সত্যের সত্যজ্ঞান কি হইতে পারে? শ্রীচৈতন্য-লীলাসমূহের নিত্যসত্য ও সনাতনত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত-বাণী—

‘আবির্ভাব’, ‘তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ ॥

(চৈ: ভা: আদি ৩:৫২)

আনন্ত্য-ধর্ম্মে লীলার অনিত্যতা ঘটে না। ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যত্ব এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

“সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ ।

সত্য মুই, সত্য মোর দান, তার দান ॥

সত্য মোর লীলা-কর্ম, সত্য মোর স্থান ।

ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান ॥”

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।৩২-৪০)

অনন্ত জীবন মানুষের হয় না । অনন্তেই অনন্ত জীবন হয় । দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করিলে বাজহংস দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া জনকে পৃথক্ করিতে পারে অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে Lactometer-নামক যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধে কতটা পরিমাণ জল মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় । যে-দুগ্ধ শতভাগই খাঁটি তাহাতে যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে জল পাওয়া যাইবে না, বরং সমস্তই খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া জানা যাইবে । সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকিলে সে-স্থলে সত্য উদ্ঘাটন করা যায় । কিন্তু বাণীর জীবনের সবটাই সুনির্মল ও বাস্তবসত্য, তাঁহার সত্যানুসন্ধান করিতে গেলে পূর্ব সত্যই প্রকাশ পাইবে । কিন্তু লেখক মহাপ্রভুর জীবনের সত্যতা অনুসন্ধান করিতে গিয়া অলৌকিকতা ও চরিত্রে অনত্য কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলিয়া কৌশলে লিখিয়াছেন এবং জনমনে শ্রীচৈতন্তের ভগবত্তা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন । লেখক নিজে সত্যানুসন্ধান কতখানি খাঁটি, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—বাঁহার সেখনীতে সঙ্গা বিদ্যমান, যিনি কর্ণফলবাধ্য মায়াবদ্ধ জীব মাত্র, সেই লেখক কোন্ মাগসে মায়াধীশ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্তের জীবন-চরিতের সত্যাসত্য যাচাই করিতেছেন ? লেখক বাস্তবসত্য সর্ককারণ-কারণ শ্রীমহাপ্রভুর জীবন-চরিতের সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া অহেতুক ছিদ্ৰা-নুসন্ধান তৎপর হইয়াছেন । লেখক-কর্তৃক উক্ত পুস্তকের নামকরণেই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর নিকলক চরিত্রে সংশয়াপন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ।

নিম্নে ঐ পুস্তকের মুদ্রিত অংশ হইতে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য, কাল্পনিক, অনত্য ও অশাস্ত্রীয় কথার উত্তরে দোষ ত্রুটি উল্লেখপূর্বক সমালোচনামুখে সংক্ষিপ্তভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উত্থাপন করিতেছি ;—

(১) লেখক তাঁহার পুস্তকে ‘লেখকের নিবেদন’ শিরোনামায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“গীতার সেই অমোঘ বাণী ‘ধর্মসংস্থাপনার্থ’র উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার স্বতোবিরোধী সমাজকে এলুমুক্ত করতে অবিসম্বাদী চৈতন্তের আবির্ভাব ।” (ক্রেশনঃ)

—শ্রীচৈতন্তচক্রকৃৎ দাসাদ্বিকারী



সেই ধর্ম প্রভু বাতে আশ্র-পরম ।

অধোক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিরশুত ।

অঙ্গ ধর্ম হুতুলপে পালে দেই জন ।

হৃদি-কথার রতি নৈলে পও সেই ভ্রম ॥

৪২শ বর্ষ { ১১ হুদীকেশ, গভোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগোবিন্দ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩১শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩২৭, ইং ১৭।৮।২০

সান্নিধ্যদং

মহামুনি-গর্গাচার্যকৃতং শ্রীবলরাম-কৃষ্ণনামকরণম্

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়ং গোলোকধাতু শ্রীনারদ-বহ্ননাথ-সংবাদে
শ্রীসঙ্কর্ষণ-কৃষ্ণনামকরণে পঞ্চদশোহধ্যায়ে]

শ্রীগর্গাচার্য উবাচ,—

১-২ । রোহিণী-নন্দনস্তাস্ত্র নামোক্তারং শৃণু চ ।

রমন্তে যোগিনো হুশ্মিন্ সর্বত্র রমন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥

গুণৈশ্চ রময়ন্ ভক্তাংস্তেন রামং বিদুঃ পরে ।

গর্ভসঙ্কর্ষণাদস্তা সঙ্কর্ষণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥

[শ্রীনারদ বলিলেন,—মহামুনি গর্গাচার্য উবাচ । ইয়া বালকদ্বয় ও নন্দ-
বশোদাসহ নিজ্জর্ন গোবর্জে গমনপূর্বক যথাবিধি সমস্ত গণনাধগণের পূজা ও

গ্রন্থাদির শুদ্ধি-সাধন করত বালকদ্বয়ের নামকরণ করিলেন এবং প্রসন্নহৃদয়ে নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন,—]

ত্রিগর্গমুনি বলিলেন,—এই রোহিণী-নন্দনের নামকরণ করিতেছি, শ্রবণ কর । যোগিগণ ইহাতে রমণ করেন বা ইনি সর্বত্র রমমাণ হন এবং ইনি স্বীয় গুণনিচয়ে ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, অতএব বিজ্ঞগণ ইহাকে ‘রাম’ বলিয়া বিদিত হন । দেবকীগর্ভ হইতে ইহাকে রোহিণীগর্ভে সন্নিবেশন করায় ইহার অপর নাম ‘সন্নিবেশন’ ॥ ২৫-২৬ ॥

৩। সর্ববাবশেষাদ্ যং শেষং বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ ।

সপুত্রস্যাপি নামানি শূনু নন্দ হত্যস্তিতঃ ।

সন্তঃ প্রাণিপবিত্রাণি জগতাং মঙ্গলানি চ ॥ ২৭ ॥

সমস্ত শেষ হইলেও ইনি অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া ‘শেষ’ এবং বলাধিক্যহেতু ইনি ‘বল’ বলিয়া বিদিত । হে নন্দ ! অত্যন্তিত হইয়া এক্ষণে স্বীয় তনয়ের প্রাণিগণের সদ্য পবিত্রতাকারী জগতের মঙ্গলকর নামসমূহ শ্রবণ কর ॥ ২৭ ॥

৪। ককারঃ কমলাকান্ত ঋকারো রাম ইত্যপি ।

ষকারঃ ষড়্ গুণপতি শ্বেতদ্বীপ-নিবাসকৃৎ ॥

ণকারো নারসিংহোহয়মকারো হৃক্ষরোম্মিভূক্ ।

বিসর্গো চ তথা হোতৌ নরনারায়ণদ্বয়ী ॥ ২৮ ॥

ককার অক্ষরে কমলাপতি, ঋকার অক্ষরে রাম, ষকার অক্ষরে শ্বেতদ্বীপ-নিবাসকারী ষড়্ গুণপতি, ণকার অক্ষরে নরসিংহ, অকার অক্ষরে অগ্নিভূক্, বিস্মদযাবিত্ত বিসর্গ অক্ষরে ঋষি নরনারায়ণ উদ্ভিষ্ট ॥ ২৮ ॥

৫। সম্প্রলীনাশ্চ ষট্ পূর্ণা যস্মিন্ শব্দে মহামুনৌ ।

পরিপূর্ণতমে সাক্ষাভ্যন্তে কৃষ্ণঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৯ ॥

যে মহামুনি শব্দবাচ্য পরিপূর্ণতমে পূর্ণস্বরূপ এই ছয়জন প্রলীন, তিনি ‘কৃষ্ণ’ নামে প্রকীৰ্ত্তিত ॥ ২৯ ॥

৬। শুক্লা রক্তস্তথা পীতো বর্ণোহস্তানুযুগং ধৃতঃ ।

দ্বাপরাস্তে কলেরাদৌ বালোহয়ং কৃষ্ণতাং গতঃ ।

তস্মাৎ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো নাম্নায়ং নন্দনন্দনঃ ॥ ৩০ ॥

ইনি সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন, দ্বাপরের অবসানে কলির প্রথমে ইনি বালকবেশে কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব এই নন্দনন্দন ‘কৃষ্ণ’ নামে খ্যাত হইবেন ॥ ৩০ ॥

৭। বসবশ্চৈন্দ্রিয়াগীতি তদ্বৈবাশ্চিন্তমেব হি।

তস্মিন্ যশ্চেষ্টতে সোহপি বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

বসু-শব্দে ইন্দ্রিয়—তাহার দেবতা ও চিত্ত। ইনি ইন্দ্রিয়াধিপতিরূপে এই ইন্দ্রিয়াদিতে বাস করেন বলিয়া ‘বাসুদেব’ নামে খ্যাত ॥ ৩১ ॥

৮। বৃষভাসুতা রাধা যা জাতা কীর্ত্তিমন্দিরে।

তস্তাঃ পতিরয়ং সাক্ষাত্তেন রাধাপতিঃ ॥ ৩২ ॥

বৃষভাসুর কন্যা রাধা যিনি কীর্ত্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইনি স্বয়ং তাঁহার পতি বলিয়া ‘রাধাপতি’-নামে অভিহিত ॥ ৩২ ॥

৯-১০। পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।

অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥ ৩৩ ॥

সোহয়ং তব শিশুর্জাতো ভাবাবতরণায় চ।

কংসাদীনাম্ বধার্থায় ভক্তানাং রক্ষণায় চ ॥ ৩৪ ॥

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে বিরাজিত। অধুনা তিনি কংসাদির বধে ভূভারহরণ এবং ভক্তগণের পালনের জন্য তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

১১-১২। অনন্তান্যস্ত নামানি বেদগুহ্যানি ভারত।

লীলাভিচ্চ ভবিষ্যন্তি তৎকর্ম্মশু ন বিস্ময়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অহো ভাগ্যন্ত তে নন্দ সাক্ষাচ্ছ্রী-পুরুষোত্তমঃ।

তদগৃহে বর্তমানোহয়ং শিশুরূপঃ পরাংপরঃ ॥ ৩৬ ॥

হে ভারত! ইহঁর বেদগুহ্য আরও নাম আছে; বহুলীলায় তাঁহার সে সকল নাম প্রকাশ পাইবে। ইহঁর কর্ম্মে কিছুমাত্র বিস্ময় কর্তব্য নহে। অহো নন্দ! তোমার বহু ভাগ্য যে, এই সাক্ষাৎ পরাংপর পুরুষোত্তম শিশুরূপে তদীয় গৃহে অদ্য বিদ্যমান ॥ ৩৫-৩৬ ॥

মহুয়া-সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম (২)

স্ব-নিষ্ঠিত ও পরিনিষ্ঠিত বৈষ্ণবের পার্থক্য

এই বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিব। মশ্রীত কতকগুলি ‘সংযোগী বৈষ্ণব’ আমাদের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট মন। তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যিক। আমরা ‘সংযোগী বৈষ্ণব’-রূপ প্রচার বিরোধী নই; কেবল তাঁহাদের ধর্ম-ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমাদের যত কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত আছে যে,—পরমার্থের জন্ম ভগবানকে ভজন করিবে; কিন্তু অত্যাশ্রিত প্রাকৃত ফলের জন্ম অত্যাশ্রিত দেবতার উপাসনা পদ্ধতি। যাহারা এইরূপ কার্য করেন, তাঁহারা স্বনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহুদেবতাশ্রমী ও কৰ্মাশ্রমী। যদি সংসারে বর্তমান হইয়া অহুদেবতা পরিত্যাগপূর্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাত্মিত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিনিষ্ঠিত নাম লাভ করা যায়। তাহাদের লক্ষণ ভাগবতে ঐশ্বলেই কৃত হইয়াছে; যথা;—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্বে অকামই থাকুক, সর্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মহুয়া তীত্রে গুহ্যভক্তিযোগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।]

তীত্রে ভক্তিযোগ-অভাবে সংযোগী বৈষ্ণব নহেন

সংসারী লোক মাত্রই সর্বকাম। সর্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জন্ম কৰ্মকাণ্ডান্তর্গত বহুদেবতা-ভজন পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই যজনা করা যায়, তবে স্বনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটা ঋতিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। ‘তীত্রেণ ভক্তিযোগেন’ এই শব্দদ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, তীত্রে ভক্তিযোগ অভাবে অচ্যুত-গোত্রই সম্ভব হয় না। অনাদি বেদসম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা তাহাতে নিষ্ঠাপূর্বক বর্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দোষী। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করত তীত্রে ভক্তির অভাব হইলে উভয় পদচ্যুত হয়। ‘তীত্রে-ভক্তিই’ একমাত্র অচ্যুতকুলের জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিলে ‘বর্ণাশ্রমী’ ও ‘সংযোগী’ উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন; কিন্তু সংযোগীর

পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীর ভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় ফলচ্যুত। কৃষ্ণ-ভক্তির জন্তু বর্ণাশ্রম পরিভ্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাকে কি বলা যাইবে? সে অবস্থা বর্ণাশ্রম-ত্যাগের জন্তু দোষী এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে। তাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করা যাইবে না।

তিন প্রকার বৈষ্ণব; ওষ্মণ্যে 'নিরপেক্ষ'—ত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ

সমাজ সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার—(১) অনিষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, (২) পরিমিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্মকাণ্ডত্যাগী অচ্যুতশ্রিত ব্যক্তিবিশেষ; ইহারা উভয়েই গৃহস্থ। (৩) নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্মত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিনজনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণভক্তির উন্নতিই প্রয়োজন। যেস্থলে পরিমিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সেস্থলে ভদ্রদ্বারের তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

কৃষ্ণ-ভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রম ত্যাগ বা ভেদাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

গৃহস্থ বা স্ত্রীসঙ্গীর কোপীন গ্রহণে অধিকার নাই

ইহাতে আর একটি নিগূঢ় কথা এই যে, অনিষ্ঠ ও পরিমিষ্ঠিত উভয়েই গৃহস্থ, অতএব কোপীন গ্রহণে অলম্বিকারী। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই শুণ্য নয়। অনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ পর্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয়। পরিমিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষসংস্কারস্থলে বর্ণাশ্রমান্তর্গত নামান্তর গ্রহণদ্বারা পরিচয় সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের কোপীন গ্রহণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কোপীন গ্রহণই বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্বধামান্ত সিদ্ধ। পরিমিষ্ঠিত ব্যক্তির কোপীন গ্রহণে অপরাধ হয়। কোপীন গ্রহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। একথা অত আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

ভ্যাগী ব্যতীত গৃহস্থের ভিক্ষা নিষিদ্ধ

পরিমিত ব্যক্তিদিগের পরিবার-পোষণের জন্য অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক। সেই অর্থ সঞ্চয় সদ্বন্ধেও বিচার আছে। এইস্থলে (ভাগবত) সপ্তম স্বকোক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষাদ্বারা সংসার-নির্বাহ করার যত্ন স্তবরাং দৃষ্টনীয়। তদ্বারা তাহারা পতিত হইবেন। যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিমিত ব্যক্তিদিগের স্বভাবানুসারে একটি একটি বর্ণ নিরূপণপূর্বক তত্ত্ববিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন।

এই সমস্ত বিষয়ের ক্রমশঃ বিশেষ আলোচনা করিব।

—জগদগুরু শ্রীম লচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভাগবত শ্রবণ

ভাগবত অর্থে 'ভগবানের'। ভাগবত বলিতে গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত বুঝায়। যে গ্রন্থরাজ্যে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সম্যক আলোচনা হইয়াছে, তিনিই গ্রন্থ-ভাগবত। আর যিনি অনন্ত চিন্তায় অনন্ত চেষ্টায় শ্রীভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিরন্তর গ্রন্থ ভাগবতের আশ্রয় ল'ন, তিনি ভক্ত-ভাগবত। উভয় ভাগবতই তদীয় তত্ত্ব, তত্ত্ববস্তু স্বয়ং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। স্তবরাং ভাগবত শ্রবণ আমাদের বিষয় কর্মের মধ্যে অন্ততম এক ব্যাপার হইতে পারে না। ভাগবত পাঠ ও ভাগবত শ্রবণদ্বারা আমরা ভগবানের সেবা করিতে পারি। সেবাবুদ্ধির অভাবে পাঠ ও শ্রবণে ফলবিপর্যয় ঘটিলে যায়। ভাগবত না হইলে কেহ ভাগবত কীর্তনে যোগ্য হইতে পারেন না, তাহার অভিনয় করিতে গেলে তাহা বিষয়কর্মই হইয়া যায়। ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করিলে তাহাও বিষয়ীর সঙ্গ হইতে ভাগবতের চলনায় বিষয়-ভোগ চেষ্টাই বর্ধন করে, ভাগবত শ্রবণ হয় না। শ্রীশ্রীমদ্ব্যপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ এই যে,—“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।” অবৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত শ্রবণ করিলে ভাগবত শ্রবণ হয় না, তাহার

পরিবর্তে অবৈষ্ণবের চিন্তাশ্রোত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পায়। তখন আমরা ভাগবত দাস হইতে না পারিয়া অবৈষ্ণবের আত্মগত্যে মায়াবাদী বিষয়ী হইয়া যাই, আমাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবতরসামৃত-তৃপ্ত পুরুষ ভিন্ন অস্ত্রে ইহার কি মর্ষ বৃষ্টিবে! তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থরাজে শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রভু চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে রসিকজন্মের সহিত ভাগবতাস্বাদন ভক্তি সাধনোপায় বলিয়াছেন।

এখন রসিক কে? যদি রসিক ভিন্ন অপরের সহিত ভাগবতালোচনা করিতে কেহ যান, তাঁহার ভাগবতরসাস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আজকাল রসিক বলিতে গেলে আমরা বৃষ্টি ঝাঁহারা স্নানতাবর্জিত হইয়া নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিষয় আলাপ করিতে অত্যন্ত আনন্দ পান, সভ্য সমাজের শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া বাক্য বা লেখনীতে স্ব স্ব কামজ্ঞ ভাবের প্রকাশদ্বারা শ্রোতা বা পাঠকের তাঁহার উদ্দীপনে প্রয়াস পান, তাঁহারাই আজ আমাদের অধঃপতনের দিনে রসিক আখ্যা পাইয়া থাকেন। আজকাল বলিয়া ইহা দুঃদশ বৎসরের কথা নহে, আজ দুইশতাব্দী বা সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী গত সমাজের এইরূপ প্রবণতা হইয়াছে। প্রাচীনকালে শ্রীশ্রীধাকৃষ্ণ-লীলাকথা একমাত্র ভক্তোত্তমগণেরই আলোচ্য ছিল। সাধারণ শিক্ত ভক্ত-লোকে উহার মধ্যে প্রবেশাধিকার না পাইয়া দাঙ্কিতভাবে তদাধার গৃহরূপ গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশগুলির অযথা বলপূর্বক দ্বারোদঘাটন করিয়া বিকৃতভাবে রস-স্বাদের জন্ত ব্যস্ত হন নাই। শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীবিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসাকরগুলির ভাণ্ডার লুণ্ঠনে অযথা সাহস প্রকাশ করেন নাই। এ ভাণ্ডারের রসরাশি অস্বাদনের যোগ্যতা অতি উচ্চ অধিকার। সকলের সে অধিকার না থাকায় রসচর্চা অত্যন্ত নিভৃত ছিল, সাধারণ লোকের উপাসনার মধ্যে রসের প্রাদুর্ভাব ছিল না। যে-সকল রসশাস্ত্রের উল্লেখ হইল উহাতে উজ্জল রসের বিলাস। সেই উজ্জল রস অপ্রাকৃত বা প্রকৃতি রাজ্যের অতীত তত্ত্ব। “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।” সেই অপ্রাকৃত রস আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের আধিপত্য থাকিতে উপলব্ধ হইতে পারেন না। আমাদের প্রাকৃত চেষ্টাসমূহ লইয়া অধিরোহ-মার্গাশ্রয়ে যদি আমরা অপ্রাকৃত রস লইয়া ষাঁট্যাঁটি করি, তাহা হইলে উহা-দ্বারা আমাদের প্রাকৃত রসেরই আলোচনা হইবে, তদ্বারা ইন্দ্রিয় চাক্ষু্যবর্দ্ধনই আমাদের লভ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহার উদাহরণ আমরা নাতিশর দুঃখের

সহিত স্বধী পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি যে, প্রাকৃত দর্শনে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আলাপ করিতে গিয়া কাব্যরসাস্বাদপর ব্যক্তিগণ শ্রীপাদ বিভাপতি, শ্রীপাদ চণ্ডীদাস, শ্রীপাদ জয়দেবের নামে নানাক্রমে কুৎসা রটনা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যাহারা জড়রসে মগ্ন নহেন, তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ রদগ্রন্থ রচনা করিতে পারেন? আবার কাহারও কাহারও পাষাণতা এত অধিক যে, চরম গুণার্থ্যাবতার বিগ্রহ স্বয়ং অবতারী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধেও অচিন্ত্য, অবাচ্য, অকথ্য কথার প্রস্তাব করিয়া তাহার স্ব স্ব ও অল্পগত ব্যক্তির অনন্ত রৌরব আবাহন করিয়া বসিয়াছেন। হায়! হায়! মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি জীবের কি দুর্ভাগ্য যে ঐ সকল দুর্ভাগ্যের কল্পনা বাস্তব রস বিজড়িত হইয়া নিজ নিত্য মঙ্গলের পথ রোধ করিয়া বসে। অথবা অনধিকার কালে রসমাধুর্য্য দেখিতে গিয়া আমাদের এই দুর্দশা আরব্য উপন্যাসে যেরূপ রাজ-কুমার অপসরাগণের নিষেধবাণী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিষিদ্ধ গৃহ উদঘাটন করিয়া পক্ষিরাজ্য অশ্ব দেখিতে পায় ও তাহার অথবা ব্যবহার করিতে গিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য আনয়ন করিয়াছিলেন, অনধিকারীর রসভাণ্ডারে হস্তক্ষেপও ঠিক তদ্রূপ আমাদের দুর্ভাগ্য লক্ষণ।

যতদিন না বঙ্গীয় সমাজ রসশাস্ত্র ব্যবসায়ীর কবল হইতে মুক্ত না হইবে, যতদিন না সমাজ হইতে বেতনভোগী ভাগবতজীবীর সমাদর বিদূরিত হইবে, যতদিন ভাগবত অবগম্যপদেশে স্ব স্ব ইন্দ্রিয় রসায়ন সম্পদের অহুসীলনের বস্তু থাকিবে, ততদিন শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া রহিবে। বেতনভোগিগণ বা 'চুক্তি' করিয়া না লইলেও বেতন আশায় ভাগবতপাঠিগণ ভাগবত পাঠ করেন না, তাঁহাদের মুখে ভাগবত উচ্চারিত হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবত্তিগ্রহ, তাহা অর্থ বিনিময়ে আদান-প্রদানের বস্তু নহে। অর্থলোলুপের ভাগবতাদিকার নাই, স্তূতরাং অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহার লোকরঞ্জনরক্ষমতার প্রশংসা করাও যা, আর যাত্রা-খিয়েটার গুনিয়া বাহবা দেওয়াও তাই। ইহার সহিত ভাগবত শ্রবণের ফল প্রেমোদয়ের সহিত কোন সাক্ষাৎকার নাই।

অনেকে অর্থ বিনিময়ে ভাগবত পাঠ না করিলেও তাঁহাদের ভাগবতালোচনা পুতনার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিবস্ত্র প্রদানের ছায়। তাঁহারা ভাগবতের প্রচ্ছন্ন শক্তি। তাঁহারা পাণ্ডিত্যজাল বিস্তার করিয়া ভাগবতার্থ আচ্ছাদনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব স্ব মতপোষক ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ প্রচারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যেও বেতনভোগী আছে, অথবা কেহ কেহ

সাধারণতঃ অপাপও থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট ভাগবত শ্রবণে আমাদের কত নৌভাগ্য অঙ্কুরিত প্রেমবীজ নাশপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী করিয়া তুলে। একপক্ষে এই সকল পণ্ডিতাভিমানী মায়াবাদিগণের, অপরপক্ষে চেতনালোলুপ অনধিকারী রম্যলাপী পাঠকগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ নিষেধ করিয়া পরমকরুণাকর শ্রীমহাপ্রভু আমার জায় জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।” আমরা কিন্তু তাঁহার এই আদেশবাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া কি অধঃপাতেই না যাইতেছি, এতদ্ব্যতীত দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যান আমাদের বহবার আলোচ্য। পাঠকগণ আকরগ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন।

শ্রীরূপ গোখাম্যী ভক্তিরসামৃতদিক্শু গ্রহে রসের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাদৃশ রসলাভ যাহারা করিয়াছেন, তাঁহারা ‘রসিক’ শব্দবাচ্য। নতুবা প্রাকৃত সহজিয়াগণ আপনাদিগকে ললনামোহন রসিক বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করেন এবং তাদৃশ পরিচয়ে ষষ্ঠ উপার্জন করিয়া মনকের পথে চলেন এবং আপনাদিগকে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে অযোগ্যতা হইতেও মুক্ত মনে করেন, তাহা তাহাদের ভ্রমমাত্র। উহা সহজিয়াদিগের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত সহজধর্ম হইতে স্বদূরে অবস্থিত। প্রাকৃত রসিকগণ বলেন,—যাহারা ব্যভিচারে প্রমত্ত না হইয়া রস লাভের জন্ত জড় সংযত মাত্র, তাঁহাদের জড় ইন্দ্রিয়তর্পণে অধিকার না থাকায় জড় রসের উপলব্ধি ঘটে না। সুতরাং তাহারা শান্ত রসের অবৈষ্ণব মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রস শব্দের বিকৃত অর্থ করায় প্রাকৃত সহজিয়া একরূপ ভ্রমে পতিত। রসের সংজ্ঞায় আমরা দেখিতে পাই যে,—

ব্যতীত্য ভাবনাবজ্ঞা যশ্চ মংকার ভাবভূঃ।

হৃদি সবে জ্বলে বাঢ় স্বদতে স রসোমতঃ ॥

আবার ব্যভিচারীর পাষণ্ডতায় বঞ্চিত হইয়া দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া নিত্যকালের জন্ত প্রাকৃত অক্ষজ ভোগের ভোক্তা হইয়া পড়েন।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ভোগী, দেহারামী, অলস ও ক্রোধীব্যক্তি মঠবাস ও হরিসেবার অনধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেজরিনাড়া

পো: নবদ্বীপ (নদীয়া) প: ব:

ইং ১২/৬/৬৩

স্নেহস্বাদেয়—

আপনার ৭/৬/৬৩ তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বর্তমানে মঠ রক্ষা করিবার মত লোকের অত্যন্ত অভাব। সকলেই স্বথ চায়। বিছানায় শুইয়া থাইতে পারিলে উঠিয়া বসিয়া থাওয়া কষ্টকর বোধ হয়। কেহ যদি চিবাইয়া দেয় তাহা হইলে দাঁতের পরিশ্রমও কম হয়।

বর্তমানে ক্রোধী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। তাহাদের ক্রোধের দরুণ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রের সহিত বসবাস করা সম্ভব হয় নাই। কাম-ক্রোধ সকলকে পাইয়া বসিয়াছে। আপনিই বা কি করিবেন, আর আমিই বা কি করিব। সংসারের কাজ করিতে পারিলে মঠে আসিবে কেন? সংসারে অচল বলিয়াই অনেকে মঠে আসে। পি-পু ফি.শোর দলই বেশী।

আমাকে আপনাকে দেখিয়াই মঠ করিয়াছিলাম। আপনি ওখান হইতে চলিয়া আসিতে চাহেন—ইহা অত্যন্ত নিরাশার কথা। আমার মতে আপনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন এখানেই থাকুন। নবদ্বীপের জমির টাকা এখনও মজুত রাখিয়াছি। আমার ইচ্ছা, উহা পুনরায় আপনার নিকট ফেরৎ পাঠাই। হরিসেবাই জীবনের উদ্দেশ্য। হরিসেবকের পক্ষে বিপদ-আপদই মজল-জনক। উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিব কেন?

* * * খুব ভাল ছেলে ছিল। সে টিকিতে না পারায় খুবই মর্মান্বিত হইলাম। * * * মহারাজকে তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে বলিবেন।

পি. ডব্লুকে আপনার জমি ছাড়িয়া দিবেন না। আপনার বহুকালের দখল এবং পি. ডব্লু আসিবার পূর্ব হইতে দখল। কোর্ট হইতে ইঞ্জাংশন জারি করিবেন। পি. ডব্লুর নোটিশ অগ্রাহ্য করিবেন। * * * কে গোলকগঞ্জে রাখিয়া দিবেন। সে পরিশ্রমী ও দরল প্রকৃতির। তাহার উপর যেন কেহ মুখখিস্তি না করে। আগামী পরশ চুঁচুড়ায় রথে যাচ্ছি। * * * মহারাজ ১০/১২ দিন কোথায় চলে গেছে, জানা যায় নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীক্ষেত্র দর্শন

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

একদিন আসি প্রভু এই রম্যস্থানে ।
জগন্নাথ দরশনে হৈলা অচেতনে ॥
সেই সিংহদ্বার সেই মন্দির প্রাঙ্গণ ।
গরুড়ের স্তম্ভ সেই ভুবনপাবন ॥
শ্রীনৃসিংহদেব আর জগন্নাথ রায় ।
এইস্থানে সার্ব্বভৌম দেখিলেন ধায় ॥
জীবভাগ্যে অতীবধি রয়েছে বিদিত ।
তব পাদপদ্ম নাথ পাবাণে নির্মিত ॥
পরশিয়া ধন্য হউ এই মূঢ় জন ।
অঙ্গুলির চিহ্ন আর তব শ্রীচরণ ॥
পাষণ্ড তবিল প্রভু শ্রীমঙ্গ পরশে ।
কি অদ্ভুত সেই প্রেম না জানি বিশেষে ॥

* * * *

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি এই পরম সুন্দর ।
তব লীলাস্থান দেখি জুড়ায় অস্তর ॥
একাকী অঙ্গমে বাসি' স্মরি অনুক্ষণ ।
একে একে তব লীলা প্রাণ বিমোহন ॥
গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলা অচিন্ত্য চিন্ময় ।
ভক্তিবলে অনুভব হয় সমুদয় ॥
হৃদয় নির্মল যার বিগুহ্ব ভকতি ।
সেই হৃদে গৌরচন্দ্র করে অবস্থিতি ॥
অস্তুরে প্রবেশি' প্রভু জানায় সকল ।
কৃষ্ণনাম নিত্যবস্তু মাধুর্য্য প্রবল ॥

নামে রূপ-গুণ ক্ষুদ্রি আনন্দ হৃদয় ।
 সাধনে স্বরূপসিদ্ধি মহা প্রেমোদয় ॥
 বিদ্বাংসতা সমলীলা ক্ষুরে নিরস্তুর ।
 কভু ক্ষুদ্রি হয় কভু সাক্ষাৎ গোচর ॥
 এই ত' চিন্ময় ভূমি গৌরভক্ত জন ।
 অনুভবে নিত্যলীলা করে দরশন ॥
 বলগণ্ডি উপবনে প্রভু প্রেমাবেশে ।
 গজপতি আসি পদ সেবিলা বিশেষে ॥
 মহাপ্রেমে মহারাজ গৌরকৃপা আশে ।
 রাসগীতা শ্লোক পড়ে, কৃপা অবশেষে ॥
 সমুদ্রে ষমুনা ক্ষুদ্রি আবেশে পতন ।
 লীলা অনুভবি' কভু করেন রোদন ॥
 শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গম্ভীর অপার ।
 অধিকারী ভেদে আছে সিদ্ধান্ত বিচার ॥
 অহৈতুকী কৃপা পায় ভাগ্যবান জন ।
 রস ভেদে প্রাপ্ত লীলা বিচিত্র কথন ॥
 অচিন্ত্য অগম্য সেই শাস্ত্র অগোচর ।
 জড়বুদ্ধিজনে কভু না হয় গোচর ॥
 সুরম্য সমুদ্রতীরে ক্ষুদ্রি বন্দাবন ।
 প্রেমোল্লাসে কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ ॥
 গোবর্দ্ধনভ্রমে চটকের প্রতি ধায় ।
 ভাবের আবেশে কভু লুপ্তি ধরায় ॥
 প্রভাত তপন জিনি রূপ মনোহর ।
 দীন-হীন বেশ, কৃষ্ণ বিরহে কাতর ॥
 সেই বেশ সেই শিক্ষা ভক্তে আচরণ ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণনামে ভেদ না জানে সে জন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ যার প্রাণধন ।
 এ সব লীলার অধিকারী সেই জন ॥

* * * *

প্রথমে যাইলুম মোরা কাশী মিশ্রালয় ।
 সন্ন্যাস করিয়া প্রভু রহিলা যথায় ॥
 স্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে রস আশ্বাদন ।
 রাধাভাবে কৃষ্ণলীলা স্বকৃতি অনুক্ষণ ॥
 ব্রজের মধুর ভাব সকল সিদ্ধান্ত ।
 জ্ঞানাইলা ভক্তগণে মাধুর্য্যের অন্ত ॥
 বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস গীত সঙ্গীতন ।
 কর্ণামৃত ভাগবত শ্লোকের পঠন ॥
 কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলা স্বকৃতি সর্বক্ষণ ।
 অধিকৃত মহাভাবে কভু অচেতন ॥
 দেখে যাব সে গন্তীরা অতীব সুন্দর ।
 করিলা এ লীলা যথা প্রাণের ঈশ্বর ॥
 দেখিলুম নয়ন ভরি গন্তীরা ভবন ।
 মনোহর সেই স্থান অতি সুনির্জ্ঞন ॥
 বিস্তৃত বৈষ্ণবগণ সেই লীলাস্থানে ।
 স্মরণ মঙ্গল পাঠ করিলা যতনে ॥
 অমিয় পুত্রিত স্তোত্র গৌরান্দ স্মরণ ।
 ভকতিবিনোদ প্রভু করিলা রচন ॥
 সংহতি ছিলেন তিনি মিশ্রের ভবন ।
 কহিলেন শ্রীচৈতন্য লীলা বিবরণ ॥
 গন্তীরা দর্শনে অতি প্রফুল্লিত মন ।
 গৌর-রূপ-গুণ-লীলা হইল স্মরণ ॥
 মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক শ্লোক অনুসারে ।
 ভজন নৈপুণ্যে লীলা পুরয়ে অন্তরে ॥
 গন্তীরা ভিতরে প্রভু নিজ অভিপ্রায় ।
 ব্রজরস আশ্বাদিলা শ্রীগৌরান্দ রায় ॥

তবে রাধাকান্ত দেব করিহু দর্শন ।
 সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত মদনমোহন ॥
 সর্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্য সুল্লর ।
 নবীন নীরদ জিনি রূপ মনোহর ॥
 শ্রীঅঙ্গে সৌন্দর্য্য তায় কমল নয়ন ।
 মধ্যম আকার প্রভু জিনিয়া মদন ॥
 শ্রীবিগ্রহরূপে তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 স্ব স্বরূপে বিহরয় হেন লয় মন ॥
 হেরিয়া যুগলরূপ আনন্দ অপার :
 মহানন্দে মগ্ন হই হেরি বার বার ॥
 তবে তথা হৈতে মোরা করিহু গমন ।
 করি সবে শ্রীসিদ্ধবকুল দর্শন ॥
 অতি সুনির্জ্জ্বল সেই হরিদাসাবাস ।
 ভজনপ্রভাবে নিত্য আনন্দ বিলাস ॥
 অগ্নাবধি আছে বৃক্ষ অমর অক্ষয় ।
 শ্রীসিদ্ধবকুল নাম কল্লবৃক্ষপ্রায় ॥
 তার তলে বসি' মোরা করিহু শ্রবণ ।
 হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থ বহুক্ষণ ॥
 প্রতিপদে সেই গ্রন্থ ভক্তিরসময় ।
 নামের মাহাত্ম্য যথা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
 পরিপাটী বিরচন মধুর শ্রবণ ।
 নামেতে অনন্তভক্তি লভে শ্রোতাগণ ॥
 শ্রদ্ধায় স্তনিলে কৃষ্ণভক্তির উদয় ।
 অনন্ত শরণ হয়ে করে নামাশ্রয় ॥
 কৃষ্ণকৃপা হয়, অতি স্বল্প দিনে তার ।
 শ্রীনাম-মহিমা গ্রন্থ অতি সুবিস্তার ॥

*

*

* (ক্রমশঃ)

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।

নে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥”

সাধু-সঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য । মহাজনগণ বলেন,—“যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ?”

তীর্থদর্শন বা তীর্থ পরিক্রমার আস্থান যুগ যুগ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে । স্বকৃতিবান্ পুরুষ সাধুসঙ্গে নেই স্বযোগ গ্রহণ করেন । কলিযুগে চারিসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গ ও তাঁহাদের অধস্তন শিষ্যবর্গ তীর্থদর্শন বা পরিক্রমার মাধ্যমে পানদেবনের স্বযোগ দিয়াছেন । তবে বিশেষ স্বযোগ তৎকালে ছিল না । জীবের কল্যাণের জন্ত শাস্ত্রের আলোচনাই ছিল তাঁহাদের মুখ্য কর্তব্য ।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীমদ্ গৌরানন্দ মহাপ্রভুই শ্রীব্রজমণ্ডল বা মথুরামণ্ডল পরিক্রমার প্রথম পথ-প্রদর্শক । স্বয়ং অবতারী পুরুষ হইয়াও আচরণমুখে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্ত কলিকালে ছন্ন অবতার-লীলা স্বীকার করিয়াছেন । পরিক্রমামুখে তিনি স্বয়ং শ্রীগ্রামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া শ্রীকৃপ-সনাতনাদি গোষ্ঠাস্বামীবর্গকে আদেশ করিলেন,—(১) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (২) শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপ্রকাশ, (৩) ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও (৪) ভক্তি-সদাচার প্রচার ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তসঙ্গে প্রেমাবেশে আবিষ্ট ছিলেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনে পাই,—

নীলাচলে ছিলো যৈছে প্রেমাবেশ মন ।

বৃন্দাবন যাইতে পথে হইল শতগুণ ॥

সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে ।

লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে ॥

অন্ত-দেশে প্রেম উহলে “বৃন্দাবন”-নামে ।

সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।২২৬-২২৮)

শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর পূর্বেও স্বাপর যুগে দেখা যায়,—কৌরবকুলের বিষ্ণু মহাবিষ্ণু স্বধীজনের হিতকামী শ্রীবিজয় মহারাজও তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন ।

শ্রীবলদেব প্রভু স্বয়ং লোকশিক্ষার জন্ত ভারত-তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীবিষ্ণুরূপ প্রভু শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীঅষ্টৈত আচার্য্য প্রভুও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কৃষ্ণ বহিন্মুখ জীবকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবকে সঙ্গে করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম, ব্রীহজ্জমণ্ডল ও অজ্ঞাত্য তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের মধ্যেও কেহ কেহ শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করিয়াছেন, অর্থাৎ তীর্থ পরিক্রমার বিধি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কালের প্রবাহে তাহা মাঝে মাঝে স্তিমিত হইয়া যাইত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন পরিক্রমার আয়োজন দেখিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ‘প্রহেলী’ বা সতকীকরণ করিয়া বলিলেন,—

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ, কোটি।

বৃন্দাবন যাইবার এই নচে পরিপাটী ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৬৬)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত বিনয় করিয়া বলিলেন,—

‘ভূমি যাহাঁ যাহাঁ রহ, তাহাঁ ‘বৃন্দাবন’।

তাহাঁ যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ ॥

তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।

সেই ত’ করিবে, তোমার যেই লয় চিন্তে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৮০-৮১)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদবর্গের লীলাসম্বরণের পর এই পরিক্রমার ধারা রুদ্ধ হইয়া গেল। পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়গগনে পারমার্থিক জগতের ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরিক্রমার বিধি ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণকে উৎসাহিত করিলেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বদগণসহ :৯০২ খৃঃ নিয়মসেবা বা উজ্জ্বলতকালে চৌরশীকোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র ভক্ত অংশ গ্রহণ করিয়া সংকীর্ণনমুখে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার ছিল। তখন প্রচুর হরিকথার বজ্রা বজিয়াছিল। ‘সাদুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে অল্প কোন বস্তু নাই ॥ ‘সাদুসঙ্গ’ ‘সাদুসঙ্গ’—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাদুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥’ সেই হেতু, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, প্রণয়ি ভকত

সঙ্গ-ব্যতিরেকে তীর্থ দর্শনের প্রকৃত ফল লাভ হয় না। অতএব তিনি কৌতুক করিয়াছেন,—

“রাধিকা ভাব-গম্ভীর, চিত্ত যেবা মহাধীর,
গণ নন্দ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে আশ্বাসনন্দ, রসসিন্ধু স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে ॥”

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের অপেক্ষার পর এই পরিক্রমার ধারা বৃদ্ধ হইয়া যায়। পরবর্তিকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অম্লগীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম পরিক্রমা পুনঃ প্রচলন করিয়া অগণিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার আশ্রিতজন পরিক্রমার ধারাকে বজায় রাখিয়াছেন এবং প্রতি বৎসরই ভারত-তীর্থ পরিক্রমার আয়োজন করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিমিত্তান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত শিষ্যগণের সেবকস্বত্রে বাঁহারা মঠ পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই পরিক্রমাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিতেছেন।

ভারতে অবস্থিত গুণ্ডাচল সম্প্রদায়ও কখনও কখনও তীর্থ পরিক্রমার আয়োজন করিয়া সন্মান্তন ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ইহা খুবই গৌরবের বিষয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত, গুণী, জ্ঞানী, কন্মী, ভক্ত তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অধ্যম লেখকেরও “শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা” ধারাবাহিক-ভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র ‘শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকাতে’ প্রকাশিত হইয়াছিল ৩১শ বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অট্টোতুকী রূপাতে ভগবৎ-সেবোন্মুখী জীবের চিন্তা ও ভাবধারার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখনীর ধারা ও ভাব পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাস্মৃক মাধুর্য্যময়ী কথা ও গুঢ় রহস্য বাহা মাধুর্থে শ্রবণ করিবার দৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহার কিঞ্চিৎ স্মরণ-পথে উদিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবার যত্ন লইতেছি।

মাদৃশ অধম ও অজ্ঞ ব্যক্তির লেখনীতে পাঠকবৃন্দের আনন্দ নাও হইতে পারে। কারণ, আমার ভাব নাই, ভাবার মাধুর্য্যও নাই। তবুও লিখিতে গেলে ভাবের আনন্দ আসে, স্মৃতিপটে মধুর ব্রজমণ্ডলের বহু দৃশ্যই উপস্থিত হয়। সেইহেতু, শ্রীকৃপাহৃগ-গুরুবর্গের আশুগতো শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের অর্হেতুকী রূপাকে একমাত্র ভরসা করিয়া লেখনী স্বারণ করিলাম।

হে অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ! এ দাসের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। সেই মাধুর্য্যসিন্ধুর উচ্ছ্বাসের এক বিন্দু যাহাতে স্পর্শ করিতে পারি, সেই প্রার্থনাই সর্ব বৈষ্ণবচরণে সকাতর নিবেদন করিতেছি।

“শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।

পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা ॥” (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)

পঞ্চরস সেবা-শিখাদ্বারা গৌড়ীয়ের আরতি

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচটি শ্রীকৃষ্ণে মূখ্য ভক্তিরস। হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, ককর্ণ, রোদ্র, বীভৎস ও ভয়—সাতটি গোণ রস। শ্রুতিতে শান্তরস বর্ণন—“সর্বং খৰিৎ ব্রজ তজ্জলানিতি শান্ত উপাসিত।” (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—এ সমস্তই সেই ব্রজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে এবং অন্তিমকালে তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি সকলই ব্রজ অর্থাৎ বস্তুতঃ-বিচারে ব্রজ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। এই উপাসনা মমতা-গন্ধহীন বলিয়া তাকে শান্তরস বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৬.৪৭ শ্লোকে—“মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উদ্ধমহিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ ॥” দিগম্বর উদ্ধরেতা, ভিক্ষু, শান্ত, গুরু, সন্ন্যাসী, ঋষিগণ (ব্রহ্মচর্যাদি ক্রেশ স্বীকার করিয়া কোনওপ্রকারে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শান্তরসে কৃষ্ণে নিরপেক্ষ ভাব—“স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ‘নরক’ করি’ মানে। ‘কৃষ্ণ-নিষ্ঠা’, ‘তৃষ্ণা-ত্যাগ’—শান্তের ‘হুই’ গুণে ॥ শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ হীন। ‘পরব্রহ্ম’-‘পরমাত্মা’-জ্ঞান-প্রবীণ ॥”

“জ্ঞান-যোগ-ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে।” “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে” অর্থাৎ অনেক তপস্বী, শুদ্ধবৈরাগ্য, কৃচ্ছসাধন করিয়া ব্রহ্মে প্রপন্ন পর্যন্তই সাধকের সমাপ্তি। তাতে কবিও নিস্পৃহ—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি? সে আমার নয়।

জ্ঞানীর ব্রহ্মস্নাতকের পর যোগীর পরমাত্ম-বিচার। তাই যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্মী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ ত’ বটেই। কিন্তু কোন্ যোগী? পাছে অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের যোগী হওয়ার উপদেশে ভুল করে ফেলেন, কারণ যোগী ত’ নানা প্রকার। তাঁদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—হঠযোগী ও রাজযোগী। হঠযোগিতায় ক্রমাল দেখিয়ে বশ করা, মাথার জটা নেড়ে অগ্নি ছিটানো, মাটির ঢেলাকে মণ্ডা মিঠাইয়ে পরিণত করা, জলের উপর দিবি হেটে যাওয়া—নানারূপ বুদ্ধকণী। নির্বোধ ব্যক্তির কাছে যিনি বুদ্ধকণী জ্ঞানেন, তিনিই সাধু। কিন্তু হঠাত মানবজন্মে বুদ্ধকণীই যথেষ্ট নয়। তাই অজ্ঞানের প্রতি সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধি-পত্র—যোগিগণের মধ্যে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণগত হইয়া মনে-প্রাণে অন্ধা-সহকারে তাঁর ভজন করেন, তিনিই যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সূদৃঢ় মন্তব্য। ‘প্রভা’ কি? “প্রভা-শব্দে বিশ্বাস কহে সূদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।” এখান হইতেই শ্রীকৃষ্ণ দাস্তবসের সূত্রপাত।

দাস্তবসে—দাস্তবস+সেবা। দাস্তবসে কেবল ‘স্বরূপজ্ঞান’ হয়, কিন্তু দাস্তবসে ‘স্বরূপজ্ঞানের’ সাধে ‘পূর্ণার্থ-প্রভু-জ্ঞান’ অধিক হয়। ঈশ্বরজ্ঞান, সন্ন্যাস-গৌরব প্রচুর নিরন্তর সেবা করে কৃষ্ণে সুখ দান। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হুম্মান এঁরা দাসাভিমানের কৃতার্থ। ঈশৈচৈতন্তমহাপ্রভুর পার্শ্ব গদাধর, শ্রীবাস, নিত্যানন্দপ্রভু ও অষ্টোত্তাচার্য্যও দাস্তবসই প্রার্থনা করেন। ব্রজের সখাগণও দাসাভিমান করেন; ব্রজা, শিবাদি লোকপালগণও নিজেদের দাস জেনে পরম সুখী; বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের দাসী হওয়ার জন্য লালায়িতা; শ্রীবাস-শুক সবাই দাসাভিমানী; অন্তের কথা কি, পিতা নন্দ-মহারাজও দাসত্ব প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী রাধিকাও দাসী অভিমান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস হেন পদবীকে অল্প জ্ঞান করিবে না। “অগ্রে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ নাশ। তবে ত’ হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।” বর্ণবিষয়ের দারুণ দুর্দিনে সাধারণ সমাজে জন্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পরিগণিত হয়। কিন্তু ত্রৈকালিক শাস্ত্র-বিচারে গুণ ও কর্মের দ্বারাই বর্ণনিরূপণ যথার্থ। গোড়ীয়া-আচার্য্যগণ জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর চতুর্বিধ উপাধিরূপ ব্যাধি হইতে

নিকৃতি করিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমীকে দাসের প্রস্তুতি ও গৃহস্থাশ্রমীকে দাসাধিকারী সম্মান দান করেন।

সখ্যরসে—শান্ত ক্রোড়ীভূত দাস্ত্ররস + বিশ্রান্ত-মমতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—“শান্তের গুণ, দাসের সেবন—সখ্যে দুই হয়। দাস্ত্রের সঙ্গম-গৌরব-সেবা, সখ্যে ‘বিশ্বাস’ময় ॥ কান্দে চড়ে, কান্দে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ। কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন ॥ বিশ্রান্ত-প্রধান সখ্য—গৌরব-সঙ্গম-হীন। অতএব সখ্য-রসের ‘তিন’ গুণ—চিহ্ন ॥ ‘মমতা’ অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম-জ্ঞান। অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥”

বাৎসল্যরসে—দাস্ত্র ক্রোড়ীভূত সখ্যরস + শ্রীকৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। শ্রীচৈতন্য-চরিতে “বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্ত্রের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহা নাম—‘পালন’ ॥ সখ্যের গুণ—‘অনঙ্ঘোচ’, ‘অগৌরব’ সার। মমতাধিক্যে ভাঙন-ভংসন-ব্যবহার। আপনারে ‘পালক’ জ্ঞান, কৃষ্ণে ‘পাল্য’ জ্ঞান। ‘চারি’ গুণে বাৎসল্য-রস—সমুত-সম্মান ॥”

মধুররসে—দাস্ত্র ও সখ্য ক্রোড়ীভূত বাৎসল্য + নিজাদ্ভাষা সেবা—“মধুর রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়। সখ্যের অনঙ্ঘোচ, লালন মমতাধিক্য হয় ॥ কাস্তভাবে নিজাদ্ভ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর-রসের হয় ‘পঞ্চ’ গুণ ॥ আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে। এক-দুই-তিন-চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার। অতএব আত্মদাধিক্যে করে চমৎকার ॥” শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাবাম্বিতা মহিষীগণাপেক্ষা ব্রজের গোপীগণ প্রেষ্ঠা। “তন্মধ্যে সর্বপ্রেষ্ঠা রাধা বিনোদিনী। সর্বাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের হয়েন আকর্ষণী ॥ সেই গোপী অংগুস্ত্য বিনে। ভজিলেহ নাহি মিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥” শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৮ শ্লোকে আছে—“অনয়াধিতো ন্যূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্তো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়ত্রহঃ ॥” মহাকবি জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের ৩য় সর্গের ১ম শ্লোকে তারই অংগুস্ত্যে বলেন,—কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বন্ধ-শৃঙ্খলান্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাভ ব্রজহৃন্দরীঃ ॥

—শ্রীমদাশ্বিনদাস ব্রজচারী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[প্রথম অধিবেশন]

[শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তা:-২৩৮।১৯৮১]

আজ আমরা কিছু ধর্মকথা আলোচনা করবার জন্য এই সভায় উপস্থিত হয়েছি। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং সনাতন ধর্ম।” আমার পূর্ববর্তী বক্তৃমহোদয়গণের মুখ থেকে আপনারা অনেক কথা এতাব্যকাল শুনলেন। সকলের শেষে আমাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমি অধিক ভাল কিছু বলতে পারি। কিন্তু বলার কিছু নাই, সব বলা হয়ে গেছে আমার আগে। আমার জন্য মৎসামান্য রয়েছে। তথাপি কিছু বলতে হবে আমাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে আজ আলোচনা করার কথা। প্রথমে আপনারা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব শ্রবণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে? সেই নিয়ে আমি সর্বপ্রথমে আলোচনা করতে চাচ্ছি।—

কৃষ্ণ হলেন তিনি, যিনি অনন্ত বিশ্বকে সবসময় তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁকেই বলা হয়েছে কৃষ্ণ। শুধু এইটুকুই নয়। অনন্ত বিশ্বকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে অনন্ত বিশ্বের জীবাত্মাকে তিনি প্রেমাম্বলের অধিকারী করতে পারেন। সেইজন্যই তাঁর নাম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন—
কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো গণচানন্দস্বরূপকঃ।

তথ্যোবৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

তাকে পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ বলছেন কেন?—তিনি Full magnetic power। অনন্ত বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, অনন্ত বিশ্বকে তিনি তাঁর কাছে টেনে রেখেছেন। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা দিয়ে তাদের লালন-পালন-পোষণ করেছেন। প্রয়োজন হলে তিনি শাসনও করেছেন তাদের। ঠিক এই যে তত্ত্বদর্শন, একেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

যদি বলা যায়, তিনি কি আমাদের মত মানুষ, ভুল হবে তাঁকে সাধারণ মানুষ বললে। সেইটুকু বিচার পুনরায় করতে চাই। তিনি লীলা করার জন্য এনেছেন নররূপে, কিন্তু তাঁকে সাধারণ মানুষ বললে ভুল হবে। তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। সেইজন্য শাস্ত্র তাঁকে বলছেন ‘অজ’। কৃষ্ণ স্বয়ং :

নিজে কি তবু, আমাদের গীতাশাস্ত্রে তিনি অর্জুনকে লক্ষ্য করে সেই উপদেশ করেছেন। আমরা সেখান থেকে পাচ্ছি—

অজোহপি সন্মব্যায়াস্তা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সন্তবাম্যাস্মায়য়া ॥

‘অজোহপি সন্’—তিনি অজ ভগবান্ । আমাদের জ্ঞায় তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। তথাপি সেই লীলাময় ভগবান্, প্রেমময় ভগবান্ এজগতে আমাদের কাছে অতি নিকটতর হওয়ায় অল্প জন্মলীলা প্রকাশ করেছেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তৃমহোদয় বলেছেন যে, জন্ম এবং আবির্ভাব—এ দুটোতে তফাৎ কি? সে কথাটা এখানে আলোচনা করবার বিষয়।—

‘আবির্ভাব’ তখনই বলা চলে যেখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত; আর ‘জন্মলীলা’ সেখানে বলা চলে, যেখানে ভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাব প্রকাশিত। মাধুর্য্যমণ্ডিত রনের পূর্ণ অধিদেবতা যখন এ জগতে আসছেন, তখনই তাঁর ‘জন্মলীলা’ এই কথাটি বলা হয়। তফাৎ হল এইখানে। কৃষ্ণ যখন জগতে আসছেন, দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন, তখন তিনি বাসুদেব কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যপর কৃষ্ণ। কিন্তু সাধারণ শিশু যেমন জন্মগ্রহণ করে, তাঁর জন্মগ্রহণ তরুণ নয়। বসুদেব-দেবকী তাঁকে পুত্ররূপে চেয়েছেন, ভগবান্ পুত্ররূপে এসেছেন। কিন্তু শিশুর যেমন জন্ম হয় মাতৃকৃষ্টি থেকে, সেভাবে অজ ভগবান্—বাসুদেব কৃষ্ণের জন্ম হয় নাই। বসুদেব দেবকীর নামনে বসেছেন, তাঁরই নামনে গজের জন্মলীলা রহত। চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে রাত্রি ত্রিপ্রহরে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন কংসের কারাগার আলোকিত করে। এখানে আবির্ভাব বলছেন কেন?—ঐশ্বর্য্যপর ভাব রয়েছে বলে। সেই ভগবান্ নীত হলেন গোকুলে নন্দ-যশোমতীর গৃহে। সেখানেও ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাদের যাদের শুধু ভাগবত আলোচনা আছে, তাঁরা জেনেছেন যে, কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন কংসের কারাগারে বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে।

সমস্ত শাস্ত্রের সকল বর্ণনা যদি স্তম্ভরভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, কৃষ্ণ দুই জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন। একবার কংসের কারাগারে বসুদেব-দেবকীর নামনে, আবার কৃষ্ণ পূর্ণস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন নন্দালয়ে মা যশোদার গর্ভে। সে বর্ণনা হরিবংশাদি শাস্ত্রে রয়েছে। তাই দেখা যায়, বসুদেব বাসুদেব-কৃষ্ণকে নিয়ে যখন গোকুলে গেলেন, সেখানে যা-যশোদা দুটি সন্তান প্রসব করেছেন। যশোদাদেবী বুঝতে পারেন নাই, দুটি সন্তান কি একটা সন্তান। বসুদেব যখন বাসুদেব-কৃষ্ণকে সেই পুত্রের কাছে রেখেছেন,

তখন নন্দনন্দন-কৃষ্ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণ একীভূত, মিলিত হয়ে যান। তাহলে তিনটি শিশুর বদলে দেখানে হচ্ছে দুটি। বাসুদেবকে রেখে বাসুদেব কণ্ঠাটিকে নিয়ে চলে এলেন। কণ্ঠাটি হলেন যোগমায়া। একই সময়ে অষ্টমী-তিথি থাকতে থাকতে কংসের কারাগারে ভগবান বাসুদেব-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন, আবার সেই অষ্টমী-তিথির মধ্যেই গোকুলে নন্দালয়ে মা যশোমতীও কৃষ্ণকে প্রসব করেছেন। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে না পেলেও আমরা মহাভারতের পরিশিষ্ট ‘হরিবংশের’ মধ্যে পাই। দেখানে ৮ মাসে অদম্পূর্ণকালে দুজনে সন্তান প্রসব করলেন বর্ণিত হয়েছে,—

গর্তকালে তদম্পূর্ণে অষ্টমে মানি তে স্ত্রিয়ৌ ।

দেবকী চ যশোদা চ হুব্বাতে সমং তদা ॥

অদম্পূর্ণ কাল, অষ্টম মাস, তখনই দেবকী ও যশোদাদেবী সন্তান প্রসব করছেন। একই সময়ে অষ্টমী-তিথির মধ্যে যুগপৎ ভগবান দুই স্থানে প্রসূত হয়েছেন, আবির্ভূত হয়েছেন। আর নবমী-তিথি যখন পড়ে যায়, তখনই যোগমায়া দেবীকে প্রসব করেন মা-যশোদা—এইটা বর্ণনার মধ্যে রয়েছে। স্মরণীয় আবির্ভাব এবং জন্মেতে কোথায় পার্থক্য, সেটা দেখা যাচ্ছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিচার রয়েছে, সেখানে আবির্ভাবের কথা বলা হল—বাসুদেব-দেবকীর কাছে আবির্ভাব। মাধুর্য্যমণ্ডিত-বিগ্রহ, বাৎসল্য রসের পূর্ণজন্মদেবতা ভগবান যখন নন্দালয়ে মা-যশোমতীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, দেখানে জন্মলীলা। স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাভাবিক মানে এখানে কোনরকম ধরনের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ব্যাপার নাই। পূর্ণমাধুর্য্যমণ্ডিত-রসবিগ্রহরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এইজন্ত জন্ম-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা অনন্তসাধারণকে সাধারণ ভেবে যেন ভুল না করি, যেহেতু জন্ম-শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে অষ্টমী-শব্দের পূর্বে। জন্মোষ্টমী বললে আমরা যেন কোন প্রাকৃত বিচার করে না ফেলি। সে সম্বন্ধে ভগবান কৃষ্ণ নিজেই সাবধান করছেন আমাদের। মাম্বের মত চেহারা নিয়ে এসেছেন তিনি, এইজন্ত ভগবানের কোন দোষ হয় নাই। শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে বলছেন,—“কৃষ্ণের যতক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।” ভগবানের আদি যে রূপ সেটাই হল নরাকার। সেইজন্ত তাঁকে বলা হচ্ছে ‘নরাকার পরব্রহ্ম’।

এ সম্বন্ধে বেদে, উপনিষদে সর্বত্র প্রায় একই ধরনের কথা বলা হয়েছে,—

‘জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতূলম্ শ্রামহুন্দরম্,’ ‘দ্বিজং শ্রামহুন্দরম্,’ ‘পরব্রহ্ম

মরাকৃতিঃ,’ ‘গুণং তৎ মনুষ্যালিঙ্গম্।’ তিনি যে সাধারণ মানুষ নন, মরাকার হলেও তিনি যে অপ্রাকৃত বস্তু প্রকট করেছেন এ জগতে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রকট করেছেন এ জগতে—সেই কথাই বলতে যাচ্ছেন এর মধ্যে। সেই বিচারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ভগবান্ অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। যদি বলা যায়—ভগবান্ মানুষ হয়ে এসেছেন আমাদের মত, স্বতরাং ভগবান্=মানুষ, আবার ফের উন্টিয়ে যদি বলা যায় মানুষ=ভগবান্, তাহলে বিচারে ভুল হবে। সেই বিচারটাও শাস্ত্রে যুক্তি দিয়ে বুঝান হয়েছে। আমাদের সনাতন আধ্যাত্মবিগণ যে বিচার দেখিয়েছেন, সেখানে বলছেন,—ভগবান্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের মত আকার দিয়ে। Original আকারটা হল ভগবানের। ঠিক একই কথা Christianityর মধ্যে দেখা যায়। বাইবেলের মধ্যে ঐ একই কথা এসেছে—“God created man after His own Image”. ঠিক একই কথা কোরাণ-শরীফের মধ্যে পাওয়া যায়,—“ইম্রাহীমা খালাকাহা মিনসুরাতিহী”—খোদা তাঁর আকারের মত করে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এটা Common factor, এগুলোকে বলে Axiomatic Truth, Universal Truth—নিত্যসত্য, বাস্তব সত্য। এগুলো কখনও পরিবর্তিত হয় না। সেই কথাই জানান হয়েছে।

সনাতন ধর্ম সৎশ্রদ্ধা আমার পূর্ববর্তী বজ্রমহোদয় যা ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে তাই আছে। সদা+তন=সনাতন, নিত্যবর্তমানকালে যেটা অবস্থিত, পূর্বে যাহা ছিল, বর্তমানেও তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। একই অবস্থা, তার কোনরকম হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, পরিবর্তন নাই, পরিবর্তন নাই। সেই বস্তুকে বলা হয়েছে সনাতন। সনাতন ধর্ম কাকে লক্ষ্য করে হয়েছে, সেই নিয়ে আধ্যাত্মবিগণ ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম-শব্দটা ব্যবহার করা হল। ধর্ম মানে স্বভাব। এই স্বভাব বলতে গিয়ে তিন রকম ধরণের জিনিসকে বিচার করা হল। নিত্যধর্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম কাকে বলা হচ্ছে?

দেহের ধর্ম, মনের ধর্ম জড়, তাৎকালিক, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। কিন্তু ‘আত্ম’-শব্দটা এসেছে, আত্মার উপর যখন ধর্ম-শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তখনই সেটা নিত্য, শাস্ত্রত, সনাতন। এই সনাতন ধর্মের অর্থ নাম আত্মধর্ম, ভাগবত-ধর্ম। এই ধর্ম অনন্ত বিশেষ অনন্ত জীবাত্মার ধর্ম। সেই ধর্মের কথা আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদিতে বিবৃত হয়েছে। এই ধর্ম বিশ্বের সকলেই গ্রহণ করতে পারেন, সকলেই গ্রহণ করবেন। এটা কোন Creedal Religion নয়, এটা কোন Cultural

Religion নয়। Irrespective of caste and creed—এই ধর্ম সকলেরই জন্ত। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত জীবাত্মার যে ধর্ম, তাকেই আমাদের সনাতন আর্য্যঋষিগণ ব্যাখ্যা করেছেন। স্মরণ্য এই ধর্ম ত' সবাইয়ের।

আমার পূর্ববর্তী বক্তৃমহোদয় বলেছেন যে, হিন্দুধর্ম বলে কোন কিছু আছে কিনা? 'হিন্দু ধর্ম' বললে ওটার মধ্যে একটা তাৎকালিক ভাব এসে যায়, For the time being সৃষ্টি হয়েছে। 'হিন্দু'-শব্দটা কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তা নিশ্চয় আপনাদের জানা আছে। আমাদের সনাতন আর্য্যঋষিগণ যখন দিক্চু নদীর তীরে এসে বাস করছিলেন, সেই সময় অনার্য্যগণ তাদের ঠাট্টার পরিভাষায় 'হৈদো হৈদো' শব্দ ব্যবহার করেছে। তার থেকে হিন্দু শব্দটি এসেছে। স্মরণ্য এটা ত' আমাদের সদ্গুণ নয়। আর্য্যঋষিগণের গুণাবলী প্রকাশ করতে গেলে হিন্দু শব্দটা তাঁদের কোন সদ্গুণ নয়। ওটা একটা ঠাট্টার পরিভাষা। যদি আমরা কোন্ ধর্মাবলম্বী তা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে 'সনাতন'-শব্দ আনতে হবে। কেন বলছি? এর পিছনে একটা যুক্তি আছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত যেখানে খুঁজবেন, কোন জায়গায় 'হিন্দু' শব্দটা নাই। কেন?—হিন্দু শব্দের উৎপত্তির অনেক আগে থেকে এগুপো আছে।

বেদ অপৌকুষেয়, বেদ ভগবানের মিশেখিত বাণী, বেদাঙ্গ গীতা-ভাগবত শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখের সাক্ষাৎ-বাণী। তাহলে হিন্দু শব্দের উৎপত্তির বহু আগে থেকে রয়েছে আমাদের আর্য্যঋষিগণের সনাতন শাস্ত্র। তার ভিতরে হিন্দু শব্দ পাওয়া যায় না। তাহলে কোন্ শব্দ পাওয়া যায়?—সনাতন-শব্দ পাওয়া যায়। সমস্ত শাস্ত্রে এই সনাতন শব্দটি দেখা যায়। সেই সনাতন ধর্মের কথা আর্য্যঋষিগণ আমাদের জানিয়েছেন। তার ভিতরে কোনরকম প্রাদেশিকতা নাই, তার ভিতরে কোনরকম ভাষাগত বৈষম্য বা ভাবাবিচ্ছেদ্য নাই, তার ভিতরে বিভেদ সৃষ্টির কোন কথা নাই। আছে সেখানে মিলন।

আজ রাজনীতিতে তিনটি শব্দ ব্যবহার হচ্ছে—Equality—সাম্য, Liberty—স্বাধীনতা ও Fraternity—মৈত্রী। কিন্তু এই তিনটি শব্দ রাজনীতি ধার করেছে কোথা থেকে?—ধর্মনীতি থেকে ধার করা হয়েছে এই শব্দ তিনটি। আর্য্যঋষিগণের শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এই তিনটি শব্দ। তাঁরাই এর সমাধান দিয়েছেন কি করে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে সাম্য-স্বাধীনতা, মৈত্রী। Equal Distribution কি করে হতে পারে, Co-existence কি করে হতে পারে, সেটা আর্য্যঋষিগণের ইতিহাসে সমাধান করা আছে। রাজনীতির

ভিতরে এটা কখনই সম্ভব হয় না। কেননা, যেহেতু রাজনীতি : হল কুটনীতি। ধর্মনীতি সরলনীতি। সরলনীতি কাকে বলে ?—আন্তরবৃত্তি, হৃদয়ের সহজ, সরল বৃত্তি। তাকেই বলা হয়েছে সনাতন ধর্ম, আত্মধর্ম, ভগবানকে ভালবাসা।

জীবাত্মা কে ?—ভগবানের অংশ। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশকে বলে জীবাত্মা। জীবাত্মার স্বরূপ কি ?—ভগবানের সঙ্গে মিলন, ভগবানের সেবা। জীবাত্মা যে পরমাত্মা ভগবানকে ভালবাসবে, সেটাই হল সনাতন ধর্ম। তাকেই সনাতন ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভক্ত ভক্তির দ্বারা প্রেমময় ভগবানকে ভালবাসবেন—এইটাই সনাতন ধর্ম। ‘এষ ধর্ম সনাতনঃ’। যেখানে ভগবান্ বলছেন,—আমি প্রাকৃত মানুষের মত জন্মগ্রহণ করি না, প্রাকৃত মানুষের মত আমার মৃত্যু নাই, সেইটাকে বোঝাচ্ছেন অর্জুনকে দিয়ে,—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতান্যামীশরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তখাম্যাত্মমায়য়া ॥

আমি সকলের ঈশ্বর, আমার থেকে সকলের সৃষ্টি হয়েছে, নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি ময়া ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমবিশ্বিতাঃ ॥

তাহলে ভগবান্ যদি Cipher হন, ভগবান্ যদি সাংখ্যের পুরুষ—নিষ্ক্রিয় পুরুষ হন, তাহলে সৃষ্টি কি করে আসে এ জগতে ? প্রশ্ন—ভগবানকে যদি আমরা নিরাকার, নির্বিশেষ বলি, নিগূর্ণ বলি, তাহলে এ সৃষ্টি কোথা থেকে এল ? ভগবান্ নিজমুখে বলছেন,—‘মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।’ সৃষ্টি কোথা থেকে হয় তাহলে ? সেই যে সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁর সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, তিনি সর্বশক্তিসমবিত তত্ত্ব, সেই কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন। তাঁর সব ক্ষমতা আছে, স্বজনী শক্তি আছে, তাই না তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যুগপৎ তিনি সাধন করছেন।—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যন্ত ভুবনানি বিভস্তি দুর্গা।

‘দুর্গা’ কাকে বললেন ?—দুর্গাশক্তি—মায়াশক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি। কিন্তু অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারাই ত’ সব অপ্ৰাকৃত সৃষ্টি হচ্ছে।

অথবা বহুর্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতম্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

ভগবানের যে সেই অচিন্ত্যশক্তি, অনন্তশক্তি, তার কণিকমাত্র তাতে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ‘একাংশেন স্থিতো জগৎ’ তাতেই অবস্থিত। স্বতরাং সেই যে ভগবান্ তিনি মিত্রিয় পুরুষ, সাংখ্যের পুরুষ, Non-Entity—এটা বলা চলবে না। তিনি Positive something—সেই কথাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাঁর সব ক্ষমতাই আছে। সর্বশক্তিমান্ বলা হয়েছে ভগবানকে। তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। তাঁর আনা-মাওয়া সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এ জগতে আসেন—কথাটা বলা হয়েছে। সেখানে কোন্ প্রকৃতি কথাটা আসবে?—ভগবানের প্রকৃতি হ্রস্বকম—অন্তরঙ্গ প্রকৃতি ও বহিরঙ্গ প্রকৃতি। বহিরঙ্গ প্রকৃতিকে বলে মায়া, মায়াশক্তি। আর অন্তরঙ্গ শক্তির দ্বারাই সব কিছু অন্তর্জগতের ক্রিয়া (লীলা) প্রকটিত হচ্ছে। ভগবান্ যে লীলা প্রকাশ করছেন, সেটা ঘোগমায়া শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। আর মহামায়া শক্তির দ্বারা সমগ্র ভূজগৎ পরিচালিত হচ্ছে। সেই ভগবান্ তিনি ত’ নিরাকার মন। তাঁর আকার আছে। কি আকার?—সচ্চিদানন্দাকার। সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু সেই ভগবান্।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অন্যাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অনাদি-আদিকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ ত’ স্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করলেন। তাহলে তাঁকে ‘আদি’ বলা হবে কেন? (ক্রমশঃ)

“অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণ পুতং হরিকথামৃতম্ শ্রবণং নৈব কৰ্ত্তব্যম্”

চৌষট্ঠী প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম প্রধান অঙ্গ—শ্রীহরিকথা শ্রবণ। শ্রবণ সূত্রেভাবে সম্পাদিত না হইলে কেহই শ্রীহরিকীর্তন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু শুকবৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য যে-কোন ব্যক্তির মুখে হরিকথা শ্রবণ করা হউক না কেন, তাহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গল-জনক অর্থাৎ শ্রেয়ঙ্গর নহে। ভক্তিভরে ভক্তগণ যেখানে ভগবানের নামকীর্তন করেন, ভগবান্ সেইখানেই আবির্ভূত হন। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নামই

হরিভজন। যাহারা হরিভজনকেও ইচ্ছিতত্বপূর্ণের একটি আশ্রয়স্থল-বিশেষ মনে করেন, তাহারা ধর্ম ও অধর্ম উভয় রাজ্য হইতেই আনন্দ অর্থাৎ মজা লুটিবার জগৎ চেষ্টাবৃত্ত। কিন্তু একইনঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না বলিয়া ইহাদের কোনকালে মঙ্গল হয় না। অনেকে বহু সাধন-ভজন ও সেবার অভিনয় করিয়াও ফললাভ করিতে না পারিয়া ভক্তির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়েন। অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন না করিলে কখনও হরিভজনে উন্নতি বা ফললাভ করা যাইতে পারে না।

শুক্লবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ বাদ দিয়া অনেকে দূর্বদর্শনের (T. V.) পর্দায় রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহা হইতে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ রামায়ণ ও মহাভারত দর্শনে দর্শকের মনোরঞ্জন হয় মাত্র। ইহাতে বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কোন কল্যাণ হয় না। কারণ রামায়ণ ও মহাভারতের রাম, রুক্ম, ভীষ্ম প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয়কারীরা কেহই বৈষ্ণব বা সদ্ভাচার পালনকারী সাধক নহেন। তাই T. V. দর্শনে দর্শকের গসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। T. V. প্রকৃতপক্ষে T. B. ব্যাধির ত্রায় সংক্রামক বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্ট, পুষ্ট ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এক্রূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পোচ্ছিষ্ট হইলে যেমন দুগ্ধের ক্ষিয়ার পরিবর্তে বিষের ক্ষিয়াই করিয়া থাকে, তদ্রূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অধৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদগীর্ণ বাহু আকারে হরিকথার ত্রায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। শ্রবণ ও দর্শনের নামে এইরূপ 'নামাপরাধ' আবাহন করা কখনই সাধকের কর্তব্য নহে। উহা শ্রবণ ও দর্শন করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ত্রায় জীবের অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। তাই অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন না করিলে সাধকের রক্ষাপ্রেম লাভ—সুদূরপর্যন্ত। শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।

তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৮।১৬)

আজকাল অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর, আটগ্লিণ প্রহর প্রভৃতি সংকীর্ণন যজ্ঞের বহুল প্রচলন দেখা যায়। গায়ক চোখে মিনারিণ মাখিয়া বা কৃত্রিম অশ্রুবন্তার সৃষ্টি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নয়নে বারিধারা আনয়ন করিয়া বিশেষ গৌরব বোধ করেন। T. B. রোগীর যুগপৎ ঔষধ ও আফিম সেবনের ত্রায় তাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু (ধূমপান, মজা-মাংসাদি) সেবন ও হরিনাম একই

সঙ্গে গ্রহণপূর্বক ইন্দ্ৰিয়তর্পণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের ও শ্রোতৃবৃন্দের কখনও মঙ্গল হয় না। কোন শুদ্ধভক্তই ভগবানের দ্বারা নিজের ইন্দ্ৰিয়-তর্পণ করাইবার জন্য ভগবানকে কৃত্রিম ভাবসহকারে ডাকেন না। ইহা ভগবানের সেবা নহে, ভগবানকে ভোগ করিবার চেষ্টা মাত্র। সেবার উন্মুখতা না হইলে সেবা-বস্তুর সেবা না হইয়া অসেব্য বস্তুর সেবা হইয়া যায়। “নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কড়ু নয়।” নাম ও নামী অভিন্ন। সেবা-সেবক-সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলে কেহই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বিধ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান পান না।

“চক্ষুর্বিদ্যা যথা দীপং যথা নর্পণমেব চ।

সমীপস্থং ন পশাস্তি তথা বিষ্ণুং বহির্মুখাঃ ॥ (পান্দ্যোক্তর ৫০ অঃ)

ভগবন্তুক্তিহীন ভাড়াটিয়া গায়ক, পাঠক, বক্তা, লেখক, সাহিত্যিক, কীর্তনীয়া বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী স্ববিধাবাদি-ব্যক্তিগণের হরিবিমুখ-গণের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ নিজ স্বত্ব-স্ববিধা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ভগবৎসেবা নহে—উহা তাহাদের ভোগ্যমি। হরিনামকে পণ্য ব্যবসারে পরিণত করিয়া তাহার বিনিময়ে যাহারা টাকা-পয়সা, যশোলাভ এবং অপরের বা নিজের ইন্দ্ৰিয়তৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের “শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাজিবার” চেষ্টা। যাহারা কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে কৃষ্ণের সম্পত্তি ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের চেষ্টা ভক্তির জায় মনে হইলেও, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভক্তি-বিরোধী।

স্বাত্মবঞ্চিত ও লোক-বঞ্চেদেরাই খাঁটি দুষ্ক পরিভ্যাগ করিয়া চূণ-গোলা গ্রহণের জায় বিদ্ধা বা ছলভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি মনে করিয়া তাহাকেই সর্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহ জগতে মকল ও কৃত্রিম দ্রব্যগুলি প্রকৃত দ্রব্য অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। একই ক্ষেত্রে শালি-ধান ও শ্যামা ধান ভজে, ইহাদের উভয়ের দল (পত্র), কাণ্ড প্রভৃতি দেখিতে একই রূপ; তাই কেবল আকার দেখিয়া সাধারণ লোক ইহার পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারে না, শস্ত্রের দ্বারা উভয়ের প্রভেদ বুদ্ধিতে পারা যায়। কৃষ্ণবহির্মুখ জন্মগণ প্রকৃত সাধুকে পরিভ্যাগ করিয়া ভণ্ডকেই ভক্ত ও সাধু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণনামযজ্ঞ সর্বযজ্ঞের সার। তাই শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে,—

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥

সেই ত' স্মেধা, আর কুবুজি সংসার ।

সর্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩।৭৭-৭৮)

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের বিহিত কীর্তনদ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে স্রষ্টাভাবে কৃষ্ণসেবন-যজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত হয়। মেধাবিশিষ্ট জনগণই 'কৃষ্ণ' এই বর্ণবর্ণয়ের সংকীর্ণমূলক যজ্ঞের অন্তর্ধান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রদক্ষে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের উক্তি,—“এমন যে গৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন ? তদন্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজা-সত্তার দ্বারাই আরাধনা করেন; যেহেতু 'ন যত্র যজ্ঞেশমথাঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ৫।১০২৩) দেবগণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে “সংকীর্ণন-প্রায়ঃ” এই বিশেষণদ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন, তন্মধ্যে 'সংকীর্ণন' অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহুলোকের যে শ্রীকৃষ্ণনাম গান, সেই সংকীর্ণন প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনবহুল যজ্ঞাদিদ্বারা এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সংকীর্ণনের প্রাধান্ত্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সংকীর্ণন-যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিধেয়, ইহা স্পষ্ট-ভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।”

কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণই শ্রীহরির সংকীর্ণন-যজ্ঞের অধিকারী। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবগণের মুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাস্থাপগা, ন সাধবো ভাগবতান্তদাশ্রয়াঃ ।

ন যত্র যজ্ঞেশমথা মহোৎসবাঃ, সুরেশলোকোহপি ন বৈ সঃ সেব্যতাম্ ॥

(ভাঃ ৫।১০২৩)

“যে-স্থানে ভগবৎকথারূপ স্থানসরিৎ প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী-নদীতটাপ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে নৃত্য-গীত-বাছাদি মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সংকীর্ণনযজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও স্মেধাগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করিবেন না।”

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

এক্ষণে গীতার ঐ শ্লোকটি হইতেছে,—

“পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃক্তাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” (গীতা ৪।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অস্ত্রের অসাধ্য তিনটি কার্য, যথা—সাধুগণের পরিভ্রাণ, হৃক্তিবিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন, তথা আমার ঐকান্তিক অর্চন-ধ্যানাদি লক্ষণযুক্ত শুদ্ধভক্তি যোগরূপ পরমধর্ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি স্বয়ং যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

যুগে যুগে এই উক্তির দ্বারা কলিকালেও ভগবানের অবতার স্বীকৃত হইতেছে। তাই এখানে ‘ধর্মসংস্থাপনার্থ’র উদ্দেশ্যে অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব বলিতে লেখক শ্রীচৈতন্যদেবকে ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন ।

আবার ‘নিবেদনের’ শেষাংশে লেখক লিখিয়াছেন,—“পরিশেষে সেই মহান মানুষটির কথায় আবারো ফিরে আসি । আমি যখন ছিলাম না, তখন তিনি ছিলেন । আমি যখন এলাম তখনো তিনি ছিলেন । আমি যখন থাকবো না তখনো তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ভক্ত কবির হৃদে হৃদে ছড়িয়ে পড়বে শাপলা-শালুক ধান মিঁড়ি আর শঙ্খচিল ওড়া বাঙলার আকাশে বাতাসে ।

‘অতাপিও সেই লীলা করে গৌররায় ।

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥”

এস্থলে ‘মহান্ মানুষ’ বলিতে শ্রীচৈতন্যদেবই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন ; আবার ‘অতাপিও সেই লীলা করে গৌররায়’ বলিতে শ্রীচৈতন্যলীলার নিত্য স্বীকৃত হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মহুত্রেও লিখিয়াছেন,—“লোকবত্তুলীলা-কৈবল্যম্ ।” লীলা—কৈবল্য স্বরূপ অর্থাৎ নিত্য । শ্রীচৈতন্যদেব নিত্য ও সত্য । তাই তাঁহার লীলা লোকিকের দ্বারা দেখা গেলেও তাহা নিত্য । মানুষ অশ্রুচৈতন্য জীব, সে সর্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর নহে । মানুষ মহান্ হইলেও সে ভগবদ্দাস মাত্র । ভগবান্ যাহা জানেন, মহান্ মানুষের পক্ষেও

তাহা সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব। মাহুষের ভুল হয়, কিন্তু অবতার-পুরুষ বা ঈশ্বরের ভুল হয় না। ঈশ্বর-বাক্য—দোষচতুষ্টয়-রহিত।

“ভয়, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।

ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৭)

সৃষ্টির পূর্বে ও পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অধিষ্ঠানের প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী,—

“অহমেবাসম্মেবাগ্রে নাগাদ্ যৎ সদস্যং পরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্মাহম্ ॥” (ভাঃ ২।২।৩২)

“শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মা পর্যন্ত অস্ত্র কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।”

গীতার শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

“অহং সর্বশ্চ প্রভবো মহতঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥” (গীতা ১০।৮)

“আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভক্তিমহাকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, আর যাহারা করেন না, তাহারা অপণ্ডিত।” সুতরাং এই পৃথিবীতে ভগবান্ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এখন আছেন এবং পরেও থাকিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবই স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ,—

“সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।

আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ২।১০২)

চৈতন্যলীলার নিত্যতা কেন? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই একটা না একটা লীলা বর্তমান, এজন্য লীলার ‘নিত্যতা’,—

“কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।

তাতে লীলা ‘নিত্য’ কহে আগম-পুৰাণ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩২৫)

সার্বকালিকী শ্রীচৈতন্যলীলা নিত্য বলিয়া লীলার প্রপঞ্চে অবতরণ এবং প্রপঞ্চ হইতে অভিযান-দর্শনে তাঁহাকে ‘কাপক্ষোভা’ বিচার করা উচিত নহে। জড়ভোগমত্ত কর্মী ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণ চৈতন্যলীলা-দর্শনে বঞ্চিত হয়,

পরন্তু ভগবৎরূপালক শুদ্ধভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণকীর্তন-লীলা সর্বদাই দর্শন করেন ।—

“এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।

আবির্ভাব, তিরোভাব—এই কহে বেদ ॥

অত্মাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।

যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে ॥

সেই দেখে,—আর দেখিবারে শক্তি নাই ।

নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য-গোসাঞি ॥”

(১৫: ভা: মধ্য ১০ ২৮৩-২৮৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের পরমবৈচিত্র্য চমৎকারময় অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত—

“অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার ।” (১৫: চ: আদি ১৭/৩০৬)

প্রকৃতির অতীত বা মায়াতীত যে ওহ, তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ ।—

“এইমত গীতাতোহ পুনঃ পুনঃ কয় ।

সর্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি ধর ॥” (১৫: চ: আদি ৫৮৮)

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই প্রকাশিত । তাই শ্রীচৈতন্যদেব ‘মহান্ মাছুষ’ মাত্র নহেন, তিনি ‘অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্’ । লেখক ‘নিবেদনে’ ধর্মসংস্থাপনার্থর উদ্দেশ্যে—গীতার বাণী শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে লীলার নিত্যতাও স্বীকার করিতেছেন । তথাপি আবার শ্রীচৈতন্যদেবকে মহান্ মাছুষ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন । মহান্ মাছুষ ত’ ঈশ্বর-ধীন জীব মাত্র । যদি বলা যায় মহাক্ষয়ের চরম বিকাশই মহান্ মাছুষের পরিচয়, তথাপি সেই মানবত্ব পূর্ব পরমেশ্বরের সর্বোচ্চ পারমার্থিক প্রকাশ নহে । তাই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সেই মানবত্বের মধ্যেও থাকিতে পারে না বা সেই মহান্ মাছুষ ভগবানের সমানও হইতে পারেন না । সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবকে মহান্ মাছুষের পর্যায়ভুক্ত করা অলায় ও অযৌক্তিক । যিনি ঈশ্বর, তিনি আবার ঈশ্বরধীন জীবরূপে কথিত হইতে পারেন কি ? তবে শ্রীচৈতন্য-লীলার ঘটনাবলীতে ভগবানের ভগবতা তাঁহার সচ্চিদানন্দ মাছুষীভূত হইতে হৃন্দর-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বলা যাইতে পারে

(২) লেখক তাঁহার পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“একজোড়া প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর ঘৌন সাহচর্যের (Sexual Companionship) ফলস্বরূপ কোন জাতক বা জাতিকার জন্ম হয়ে থাকে ।” “কোন মাছুষের ঘরে মাছুষের

সন্তান-সন্ততিরূপে মানুষই জন্মগ্রহণ করে থাকে। এর থেকে মহান বা মহত্তর পরিচয় আর কিই বা থাকতে পারে। ধন নয়, মান নয়, একজন মানুষের শেষ বা শ্রেষ্ঠতর পরিচয় হওয়া উচিত সে মানুষ। ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ ঈশ্বরের চেয়েও বড়ো। কেননা ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ নয়।”

“উপরোক্ত কথাগুলি বলার প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, মানবপুত্র মানব চৈতন্যকে আমরা ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছি। আর এ’ অতি কাল্পনিক অপবাদ তাঁর মাথায় বর্তেছে জন্ম লয় থেকেই।”

লেখক ‘ঈশ্বর’ ও ‘মানুষ’—শব্দের অর্থ না বুঝার জন্যই ঐরূপ অবাস্তব কথা লিখিয়াছেন। ঈশ্বর কে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—“কর্তৃমকর্তৃমু অথবা কর্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ”—অর্থাৎ যেসবাল-খসীমত যাঁহা ইচ্ছা করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই ঈশ্বর। আর ‘মানব’ বলিতে মনু-শব্দের উত্তর ‘ক’ প্রত্যয় করিয়া ‘মানব’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ যাঁহারা মনুর অন্তর্গত তাঁহারা ই মানব। ‘মনোরপত্যং পুমান্’—মনুরই সন্তান মানব জাতি। মহাভাগবত মনুই ঈশবাস্ত বা স্মাত্ৰবাস্ত ঋতি কীর্তন করিয়া তাঁহার বংশধর-গণের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। মনু ঈশ্বরের অন্তর্গত; যাঁহারা মনুর অন্তর্গত তাঁহারা ঈশ্বরের ও অন্তর্গত হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। মানুষদের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

“লক্সা স্তুহুর্ভমিদং বহুসন্তবান্তে

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমদীহ ধীরঃ।

তুর্গং যতেত ন পতেদনুমুত্যা যাবৎ

নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্কতঃ স্যাৎ ॥” (ভাঃ ১১।৯।২৯)

“বহু জন্মান্তরের পর আমাদের এই স্তুহুর্ভ মনুষ্য শরীর লাভ হইয়াছে। ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ, পরম শাস্তিপ্রদ। ইন্দ্రిয়-তর্পণাদি স্তুথের বিষয়সকল প্রতি-জন্মেই লাভ হয়; কিন্তু ভগবদ্ভজন মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও জন্মে সম্ভবপর নহে। অতএব মৃত্যু পর্য্যন্ত ধীর ব্যক্তি শীঘ্রই পরম শাস্তিময় পুরুষ ভগবানের ভজন কর।”

জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্ণনা করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

“জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে সম।

জলদগ্নিরাশি যৈছে ক্ষুদ্রিকের ‘কণ’ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১০)

জীবের স্বরূপ বিচারে খ্রীষ্টেতত্ত্বচরিতামৃত-বাণী,—

“জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস ।” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮)

সুতরাং ঈশ্বরের সংজ্ঞা কি মানুষের প্রয়োজ্য হইতে পারে ? মানুষের শক্তি ও যোগ্যতা কতটুকু ? ঈশ্বর মায়াধীশ, আর মানুষ মায়াবশ । জীব তথা মানুষ মুক্ত ও বদ্ধ সর্বাবস্থাতেই মায়াধীশ পরমেশ্বরের নিত্যবশ । ঈশ্বর কর্মফল-প্রদাতা, আর মানুষ কর্মফলভোক্তা । কোন ক্ষেত্রেই মায়াবশ মানুষ কি মায়াধীশ ঈশ্বরের চেয়েও বড় হইতে পারে ?

আর মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে নাই, বরং ঈশ্বরই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন । গীতার শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজ্যামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥” (গীতা ৯।৮)

“স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্মনিমিত্ত প্রকৃতির বশ হেতু কর্মপরতন্ত্র এই সমগ্র ভূতসমূহকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃজন করি” শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত সংবাদে (১১।৯।২৮ শ্লোকে) বর্ণিত হইয়াছে,—

“সৃষ্ট্বা পুরানি বিবিধান্নজয়াস্মশক্ত্যা

বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগ-দ্বন্দ্বশুকান্ ।

তৈস্তিস্তরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়

ব্রহ্মাবলোকধীষণং মৃদামাপ দেবঃ ॥”

“ঈশ্বর নিজশক্তিভূতা মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী এবং হিংস্র প্রাণীরূপ বিবিধ শরীরের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদয়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পরিশেষে ব্রহ্মা সাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানযুক্ত এই মহত্ত্ব-শরীর সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ।”

খৃষ্টানদের Bibel-এ আছে—“God created man after His own Image” অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহার নিজ আকারের মানুষ সৃষ্টি করিলেন । লেখক ‘নিবেদনে’ স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—ধর্মসংস্থাপনার্থ অবিনশ্যাদী চৈতন্ত্বের আবির্ভাব । যে চৈতন্ত্বদেব ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কি মানব হইতে পারেন ? ধর্মসংস্থাপন-কার্য্য কি মানবের দ্বারা সম্ভব ? গীতার যে শ্লোকটি হইতে লেখক “ধর্মসংস্থাপনার্থ” শব্দটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকের পূর্ববর্ত্তী শ্লোকটি এস্থলে আলোচনা করিতেছি ;—

“যদা যদা হি ধর্মস্তা গ্রানির্ভবতি ভাষত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্তা তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥” (গীতা ৪।৭)

“হে ভারত ! যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাণ্ডুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি আমাকে প্রকট করি।” অতএব কালদোষে বেদবিরুদ্ধ অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে সেই দোষ নিবারণ করিতে ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হন না ; তাই ইচ্ছাময় ভগবান্ জীবের প্রতি রূপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ঐ স্লোকে ‘ধর্মস্ত’ একবচন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ লোকসমক্ষে প্রকটিত হন। সেই ধর্মটি কি ? সেই ধর্ম ভাগবত ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। ‘ধর্ম’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধৃ+মন্=ধর্ম, অর্থাৎ যাহা ধরিয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম বলিতে স্বভাব বুঝাইতেছে। বস্তুর ধর্মের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের ধর্ম বা স্বভাব বিচারের দ্বারাই জীব বস্তুটিকে জানা যায়। জীবাশ্মার স্বভাবই ভগবানের সেবা করা। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। সমস্ত বস্তুসকলকে আকর্ষণ করে। যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে আকর্ষণ নাই।

যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত (জৈবজগৎ) জাত হইয়াছে, যাঁহা কড়ক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে এবং যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে তাঁহার সহিত প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তিনিই সর্বকারণকারণ সচিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জীবাশ্মার স্বাভাবিক ধর্মই আত্মধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষক, জীবাশ্মা আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাশ্মার মধ্যে যে আকর্ষণ ব্যাপার রহিয়াছে তাহাই ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।২৭) বলেন,—“ধর্মো মড্ভক্তিকৃৎ” —তাই শ্রীকৃষ্ণদাস্তই জীবের স্বরূপের ধর্ম। জীবের জায় ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই এবং কর্মকলজনিত দেহসংযোগরূপ জন্ম হয় না। কুর্খপুরাণ বলেন,—“দেহদেহিবিভাগশ্চ নেশ্বরে বিজতে কচিৎ।” তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাভিন্ন দেহকে তিনি প্রাকৃত ধাতু-সম্বন্ধ বা শুক্র-শোণিত সম্বন্ধ ব্যতীতই স্বেচ্ছায় এই জগতে প্রকট করেন। ভগবানের দেহ মহুদেহের জায় পংকভৌতিক নহে। তাই ভগবানের পৈত্রিক ধাতু সম্বন্ধীয় জন্মাদি না হইয়া আবির্ভাবাত্মক জন্ম হইয়া থাকে। লেখক ‘নিবেদনে’ গীতার বাণী মান্য করায় গীতা হইতেই ভগবানের জন্ম-কর্মের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি ;—

“অজোহপি স্রব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মায়য়া ॥” (গীতা ৪।৬)

“ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি জন্মরহিত, অব্যায়াত্মা, সর্বভূতগণের ঈশ্বর

হইয়াও স্বীয় শুদ্ধা সৎসাহিত্য প্রকৃতিকে স্বীকারপূর্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই।”

“জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঙ্কুৰ্ন ॥” (গীতা ৪।২)

“হে অঙ্কুর! যিনি আমার এইরূপ আলৌকিক জন্ম এবং কৰ্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ অন্তে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না। অধিকন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।”

“অবজানন্তি মাং দুচা মানুযীং তদুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥” (গীতা ৯।১১)

“সর্বভূতের মহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মূৰ্খগণ আমাকে মহাশরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে।”

শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নরলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বলিয়া তাহার সক্তিদানন্দময় বপুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করা বা জড়ীয় শৌক্য বিচার আরোপ করা অপরাধ। শ্রীমদ্রূপাঙ্কু কাশীবাসী জনৈক বিপ্রকে বলিয়াছিলেন,—

‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণরূপ’—দুই ত’ সমান ।

‘নাম’, ‘বিগ্রহ’, ‘স্বরূপ’—তিন একরূপ ।

তিনে ‘ভেদ’ নাহি,—তিন ‘চিদানন্দরূপ’ ॥

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কক্ষে নাহি ‘ভেদ’ ।

জীবের ধর্ম নাম-দেহ-স্বরূপে ‘বিভেদ’ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩২)

এমতাবস্থায় ভগবানের নিত্যশরীর যে মানবের স্তায় নহে তাহা প্রমাণিত হইল। অতএব ‘ধর্মসংস্থাপনার্থ’র উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকিলে তাঁহাকে কখনই মানব জ্ঞান করা যায় না। অতবজ্ঞ ব্যক্তি ভগবানের এই নরলীলার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারে না।

লেখকের উক্ত পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠার বক্তব্যে বুঝা যায়, লেখক সাধারণ মানবের স্তায় চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার লীলার সত্যাত্মসম্মানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখকের কথামুসারে যদি চৈতন্যদেবকে মানুষ হিসাবেই ধরা হয়, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে হইলে তাঁহার সঙ্গী-পার্শ্বদের নিকট হইতেই জানিতে হইবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—
A man is known by the company he keeps অর্থাৎ একটা মানুষকে জানিতে হইলে তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারাই জানা যাইবে। যিনি যেমন ব্যক্তি,

তিনি সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করিয়া থাকেন। সঙ্গীদের দেখিয়া ও সঙ্গীদের নিকট গুনিয়া ব্যক্তিটির চরিত্র ও ব্যবহার ধারণা করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী কাঁহার? শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীধরুপ দামোদর, শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গোস্বামী প্রমুখ ভাগবতগণ তাঁহার সঙ্গী-পার্বদ। তাঁহাদের লেখনীতেই চৈতন্যলীলার সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত। অতএব রূপাঙ্গুগজনের নিকটই শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানা যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীলা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—“শ্রীশচী-জগন্নাথের নিত্যসিদ্ধান্ত-হেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধস্বয়ময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের জায় নহে। বিশুদ্ধস্বয়ের নাম ‘বসুদেব’, বসুদেবেই চিদ্বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত। জড়োদ্ভিদ-তর্পণময় প্রাকৃত-রক্ত-মাংসময়-দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামজীড়া ও গর্ভের জায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন এবং শ্রীশচীদেবীর গর্ভ সঞ্চার হয় নাই। স্তত্রাং মনে মনে একরূপ চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎ-সেবামুখী চিন্তে বিচার করিলে শুদ্ধস্বয়ময়ী শ্রীশচীদেবের অপ্রাকৃত গর্ভ-মহাত্মা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তাঃ ১০।২।১৬ শ্লোকের টীকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—‘মন আবিবেশ মনসি আবির্ভূত্ব, জীবানামিব ন ধাতু সঙ্ক ইত্যর্থঃ।’ এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু লঘু ভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—কৃষ্ণ প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপরে বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীয় হৃদয়ে প্রকট হন।”

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরুবর্গের নিকট কৃপা প্রার্থনা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাধো জয়তঃ

বদিরহাট

শ্রীগুরু-পূর্ণিমা

৮।৭।২০

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণসহ সকল শিক্ষাগুরুবর্গের শ্রীচরণে শ্রীগুরু-পূর্ণিমার অনন্তকোটি দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনে নিবেদন :—

পরম পূজনীয়—

শ্রীল বামন মহারাজ! সর্বপ্রথমে আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় আমার সম্রাট দণ্ডবৎ-প্রণতি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।

আজিকার এই তিথিবসাতেই ত’ শ্রীগুরুদেবের বিরহের স্বর শিখের হৃদয়ে সূতন করিয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিনীতে বাজিতে থাকে। সেই স্বরের মূর্ত্তনায়

হৃদয় আকুলি-বিকুলি করে গুরুদেবের সামিথ্যের লালনায়। যিনি অপ্রকট, তিনি কিভাবে প্রকট হইয়া শাস্ত্রনা দিবেন ?

আম্রিকার শুভদিনে আপনার প্রেরিত প্রীতি-উপহার—“শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য”-গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীমত্যানন্দ প্রভুর হস্তে পাইয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

চৈতন্যগুরুরূপে শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দিলেন—‘সাক্ষ্যকরিষ্মেন সমস্তশাস্ত্রৈ’ রূপে যিনি আমারই গুরুপাদপদ্ম, তিনিই জগতে সকল মদগুরু-হৃদয়ে একই-ভাবে প্রকট হইয়া একইভাবে কৃপা করিয়া আমার জ্ঞান অজ্ঞানাত্ম জীবের সকল দুঃখ দূর করেন। আমার সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহ-রূপে আপনার মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া আমার জ্ঞান মায়াকুষ্ট কীটকে জানাইতে ও শাস্ত্রনা দিতে আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় এই উপহার পাঠাইয়া দিলেন। ইহা কি অপূর্ব কৃপা শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আর শুধু কি উপহারের কৃপা ? প্রকট থাকাকালীন যেভাবে তিনি অল্পপ্রেরণা দিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াশক্তিরূপে এই ‘খধীনাকে’ দিয়া লিখাইবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু বাঁহার অপ্রকটের পর আমি ভাবিয়াছিলাম,—“আমি মরিয়া গিয়াছি, আমার লেখনী স্তব্ধ হইল শ্রীগুরুদেবের শক্তির অভাবে”—সেই গুরুদেবই আপনার মাধ্যমে একইভাবে এতদিনে পুনরায় অল্পপ্রেরিত করিতেছেন, লেখনী চালাইবার জ্ঞান। শ্রীগুরুদেবের কি অপূর্ব লীলা !

কিন্তু আমার শক্তি কোথায় ? আমি তা’ জড়ের জ্ঞান। একে চালনা করিতে হইলে সকল মদগুরুর মধ্যে যে অখিল শ্রীহরির অভিন্ন গুরুশক্তি বিরাজিত, সেই শক্তির সঞ্চালনের প্রয়োজন। তাই আজ শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় সকল মদগুরুর হৃদয়ের সেই অভিন্ন গুরুশক্তিকে এবং সেই শক্তির প্রতিনিধিরূপে আপনি যে আমাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—সেই আপনাকে আমার হৃদয়ের সর্বাঙ্গ অনন্তকোটি দণ্ডবৎ-প্রণতি জানাইতেছি। আপনি কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে শক্তি সঞ্চার করুন, তবেই আপনার আদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারিব। ইতি—

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থিনী—

—(শ্রীমতী) মান্না সরকার

শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

কর কৃপা অভাজনে ।

বিনয় করিহে হরি ডাকি তোমায় ঘনে ঘনে ॥

শ্রীকৃষ্ণ করুণাময়, তব নামে ঘুচে ভয়,

অনাদি অনন্ত তুমি বলে মুনি-ঋষিগণে ।

বনমালী চক্রপাণি, করি আমি যুক্তপাণি,

অসংখ্য প্রণতি করি চাহ করুণা নয়নে ॥

লক্ষ্মীকান্ত বংশীধারী, ভব-জলধি কাণ্ডারী,

দিবানিশি ভঞ্জে তোমায় বিধি-শেষ-পঞ্চাননে ।

ব্রাহ্মনাথ জনার্দন, তুমি মদনমোহন,

সর্ব্বঘটে স্থিতি তব বলে থাকে বিজ্ঞজনে ॥

মধু-কৈটভ-নাশন, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বলে খ্যাত ত্রিভুবনে ।

কুমতি করিয়া নাশ, স্তমতি দাও শ্রীনিবাস,

এই আকিঞ্চন প্রভু করি কায়-প্রাণ-মনে ॥

মাধব শ্রীমধুসূদন, নমো পতিতপাবন,

অন্তর্ঘামী চিন্তামণি বন্দি রাতুল চরণে ।

রসরাজ দর্পহারী, ওহে মুকুন্দ মুরারি,

এসে চিন্ত-নবকুঞ্জে মম হৃদি বৃন্দাবনে ॥

—শ্রীবলরাম কুমার,

সাহিত্যরত্ন, কবি পদ্মরাগমণি (গোল্ড মেডালিস্ট) পি. এইচ. ডি.

কাড়ক (পুন্ডলিয়া)

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২য়	৫৭	১০	Transparament	Transparent
৩য়	২১	১২	(নিয়মিত)	(নিয়ন্ত্রিত)
৫ম	১৬২	৫	বদনা	বদনা
৮	১৮৬	১২	প্রবৃত্ত	প্রবৃত্ত

। শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধাত্তে আত্ম-পরমর ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিশ্বশুভ ॥

অজ ধর্ম স্থত্বরূপে পালে যেই জন্ম ।

হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ

১২ পন্থমাস, সপ্তম, ৫০৪ শ্রীগৌরাক

৩১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩২৭, ইং ১৭৯৯০

৭ম সংখ্যা

সাক্ষ্যবাদঃ

শ্রীচতুর্ন্থ-ব্রহ্মকৃতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলস্তোত্রম্

[শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুল্লাস-সংবাদে
শ্রীরাধিকা-বিবাহবর্ণনে ষোড়শোধ্যায়ৈ]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১। অনাদিমাছুং পুরুষোত্তমোত্তমং

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং নিজভক্ত-বৎসলম্ ।

স্বয়ং হৃদস্থ্যাগুপতিং পরাংপরং

রাধাপতিং ত্বাং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

[শ্রীমদ নিজক্রোড়ে বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোচারণ করিতে করিতে
নিজাবাসের দূরদেশে যমুনাতীরস্থ ভাগীরবনে গমন করিলেন । তখন

ভগবদিচ্ছায় বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল ; কৃষ্ণ নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে থাকিলে নন্দও ভয়ার্ত হইয়া পরেশ শ্রীহরির শরণ লইলেন । নন্দরাজ হঠাৎ শত শশধর কাঙ্ক্ষিত দীপ্তরাগমধ্যে বৃষভাসু-নন্দিনী রাধাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাজলিপুটে প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—আমার ক্রোড়স্থ শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, আর তুমি তাঁহার সর্বদা প্রধানা প্রিয়কারিণী—আমি গর্গমুনির নিকট হইতে গুপ্তভাবে ইহা শুনিয়াছি ; অতএব আমার ক্রোড় হইতে নিজমাথাকে গ্রহণ কর । তুমি আমায় রক্ষা কর, ভূতলে অনন্ত-হর্ষভ অভীষ্ট প্রদান কর, তোমাকে মনস্কার । অনন্তর রাধা নন্দের ক্রোড় হইতে নিজপ্রিয় হরিকে গ্রহণপূর্বক ভাগীরবনে প্রবেশ করিলেন । তখন সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীহরি কৈশোর দেহ ধারণ করিলেন । তিনি পীতাম্বর কোমলভরঙ্গ-ভূষিত বংশীধারী ও মদনমোহন মূর্তি হইলেন এবং প্রিয়াকে করস্বয়ে গ্রহণপূর্বক হাসিতে হাসিতে স্বন্দর বিবাহ-মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন । উত্তম সিংহাসনে দম্পতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইলে চতুর্মুখ-ব্রহ্মা আকাশপথে পরম-পুরুষের সম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া কৃতাজলিপুটে বক্ষ্যমাণ চাক্রবাক্যে স্তবমুখে বলিতে লাগিলেন,—]

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি অনাদি, আন্ত, পুরুষোত্তমোত্তম, নিজন্তজ-বৎসল, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি, পদাংপর সাক্ষাৎ রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ; তোমার চরণে শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২১ ॥

২ । গোলোকনাথস্বমতীৰ লীলো
লীলাবতীয়াং নিজলোকলীলা ।
বৈকুণ্ঠনাথোহসি যদা স্বমেব
লক্ষ্মীসুদেয়াং বৃষভাসুজা হি ॥ ২২ ॥

হে গোলোকনাথ ! তুমি অনন্ত লীলাময় ; আর এই রাধাও স্বীয় লোকলীলায় অসীম লীলাবতী । তুমি যখন বৈকুণ্ঠপতি, তখন এই বৃষভাসুজতা রাধা তোমার লক্ষ্মী ॥ ২২ ॥

৩ । স্বং রামচন্দ্রো জনকান্নজেষ্য
ভূমৌ হবিস্তং কমলালয়েয়ম্ ।
যজ্ঞাবতারোহসি যদা তদেষ্য
শ্রীদক্ষিণা শ্রী প্রতিপত্তিমুখ্যা ॥ ১৩ ॥

তুমি রামচন্দ্র, ইনি জনকনন্দিনী সীতা ; তুমি হরি, আর রাধা

কমলাঙ্গী ; তোমার যখন যজ্ঞরূপে অবতার হয়, তখন ইনি তদীয় দক্ষিণারূপা
মুখ্যপত্নী ॥ ২৩ ॥

৪ । স্বং নারসিংহোহসি রমা হৃদীয়ং

নারায়ণত্বঞ্চ নরেন যুক্তং ।

তদা হিয়ং শান্তিরতীব সাক্ষা-

চ্ছায়েব যাতা চ তবানুরূপা ॥ ২৪ ॥

তোমার নরসিংহাবতারে ইনি তোমার হৃদয়গত রমা ; নরনারায়ণ অবতারে
ইনি ছায়ার স্তায় তোমার অত্যন্ত অনুরূপা শান্তি ॥ ২৪ ॥

৫ । স্বং ব্রহ্ম চেয়ং প্রকৃতিস্তটস্থ্য

কালো যদেমাঞ্চ বিহুঃ প্রধানম্ ।

মহান্ যদা স্বং জগদঙ্কুরোহসি

রাধা তদেয়ং সগুণা চ মায়া ॥ ২৫ ॥

তুমি ব্রহ্ম, ইনি তটস্থ্য প্রকৃতি ; তুমি কাল, ইনি প্রধান । তুমি যখন
জগতের বীজস্বরূপ মহান্, তখন এই রাধা তোমার সগুণা মায়া ॥ ২৫ ॥

৬ । যদাস্তুরাত্মা বিদিতশ্চতুর্ভি-

স্তদা হিয়ং লক্ষণরূপবৃন্তিঃ ।

যদা বিরাট্ দেহধরত্বমেব

তদাখিলং বা ভূবি ধারণেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

চারিপ্রকার অন্তঃকরণধারা তুমি যখন পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও, তখন
ইনি তোমার সেই সেই অন্তঃকরণের লক্ষণরূপা বৃন্তি । তুমি যখন বিরাট্
দেহধারী, তখন ইনি পৃথিবীতে ধারণারূপে অবতীর্ণা ॥ ২৬ ॥

৭ । শ্রামঞ্চ গৌরং বিদিতং দ্বিধা মহ-

স্তবৈব সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তম ।

গোলোক-ধামাধিপতিং পরেশং

পরাম্পরং স্বাং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

হে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তম । শ্রাম ও গৌর—তোমার এই দ্বিবিধ তেজ ;
তুমি গোলোকধামপতি, পরেশ ও পরাম্পর ; আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ২৭ ॥

৮ । সদা পঠেদ্ যো যুগলস্তবং পরং

গোলোকধামপ্রবরং প্রয়াতি সঃ ।

ইহৈব সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি-সিদ্ধয়ো

ভবন্তি তস্মাপি নিসর্গতঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই পরমশুভ সত্ত্ব পাঠ করেন, তাঁহার সর্বধাম-
প্রবর গোলোকে গতি হইয়া থাকে; আর ইহলোকেও আপনা আপনি
সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি ও সিন্ধিমুহ লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

২। যদা যুবাং প্রীতমুতো চ দম্পতী

পরাত্পরো তাবহুরূপরূপিতৌ ।

তথাপি লোকব্যবহার-সংগ্রহা-

দ্বিধিং বিবাহস্ত তু কারয়াম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

আপনারা সনাতন পরাত্পর ও প্রীতিযুক্ত দম্পতি এবং পরস্পর অমুরূপ ;
তথাপি আমি লোকব্যবহার রক্ষার জন্য ভবদীয় ইচ্ছামুযায়ী বিবাহ-বিধির
অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৯ ॥

[স্বয়ং হরি শ্রীকৃষ্ণ বিধিকে বলিলেন,—তুমি যথেন্দ্ৰিয় পুরোহিত-দক্ষিণা
প্রার্থনা কর । ব্রজা বলিলেন,—হে প্রভো ! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার
ভক্তি থাকে, এই দক্ষিণা আমাকে দান কর । শ্রীহরি তখন ‘তাগাই হউক’
বলিলে ব্রজা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমশুভদ শ্রীচরণকমলে করদ্বয় ও মস্তকদ্বারা প্রণাম
করিয়া স্তম্ভান্তঃকরণে স্বগৃহে গমন করিলেন ।]

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (৩)

ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতির কারণ

সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত মানব-সমাজের যে নিগূঢ় সংঘর্ষ, তাহা প্রথম
প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে । সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে-প্রকার সমাজ প্রচলিত,
তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে । কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি
বর্ণ-চতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, সনাতন-ধর্ম্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা
বলা দুঃসাধ্য । উপযুক্ত পাত্র উপযুক্ত কার্য্য না পাইলে—না দেশের উন্নতি,
না পাত্রের উন্নতি হয় । এইজন্য ধর্ম্মের এত দুর্গতি । অতএব সমাজ-
সংস্কারের নিত্যান্ত প্রয়োজন ।

সমাজ-সংস্কারে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও বীরভদ্র প্রভু

পরম কারুণিক চৈতন্যপাশদ প্রভু নিত্যানন্দ সমাজের এইপ্রকার হৃদশা দেখিয়া এই বঙ্গভূমিতে একটি অচ্যুতবর্ণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ প্রভু বীরচন্দ্রের হস্তে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর আজকাল একটি বৃক্ষরূপে বর্তমান আছে। হে পাঠকবর্গ! আপনারা যে একটি বৈষ্ণব-জাতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লিখিত বৃক্ষ।

জাতি-বৈষ্ণবের আচার, ক্রিয়া-কলাপ ও উপজীবিকা

জাতি-বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্মের গুণ-দোষ হইতে পৃথক। ইহারা পুতি-পত্নীরূপে সংসারে বর্তমান হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করেন। ইহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম-সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইহাদের যে ক্রিয়াসকল আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব-জাতির মধ্যে কোন ব্রাহ্ম-কর্তৃক ক্রিয়া হয় না। তাহারা সকল কর্ণই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। অন্য দেবদেবীর পূজা, হোম, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করেন না। মৃত্যুশোচ ও জাত্যশোচ অঙ্গীকার করেন না। বিবাহে কেবল মাল্য বদল করেন। কোন বৈষ্ণব-পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া, দেবদেবীর আরাধনা এবং জীলোক-পরম্পরা কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। এইসকল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের দেবা, পর্কদিনে উৎসব, বিশেষ বিশেষ কার্যে মহোৎসব, হরিবাসর প্রভৃতির অহুষ্ঠান দেখা যায়।

এই বৈষ্ণব-জাতি প্রায়ই ভিক্ষাদ্বারা জীবন নিব্বাহ করে। কোন কোনস্থলে উহারা অগ্ন্যুৎসব ব্যবহার দ্বারা গর্ভ সঞ্চয় করে। কোন কোন প্রদেশে উহারা কৃষিকার্য্য করে, কোন কোন প্রদেশে অগ্ন্যুৎসব বণিক-ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই গীত-বাজ্যাদি অভ্যাস করত তন্দ্বারা উদর পালন করে।

কীর্ত্তন ব্যাডীও বৈষ্ণব-জাতির অন্য ব্যবসায়ে দোষ নাই

প্রভু বীরচন্দ্র যে-সময়ে সংযোগী বৈষ্ণবের পত্তন করেন, তখন তাঁহার এইমাত্র অচ্যুতমতি ছিল যে, তোমরা যদিও ইন্দ্রিয়-পরবশ হও, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনদ্বারাই সংসার নির্বাহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,—তাঁহার সময় কেবল বারশত নেড়া-নেড়ী ছিল। কিন্তু আজকাল সেই বারশত নেড়া-নেড়ীর স্থলে আমরা সমস্ত বঙ্গভূমিতে বহু বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখিতেছি। বারশত ব্যক্তির অবশ্যই গান-কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবন নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু বর্তমানের জীবনযাত্রা কেবল কীর্ত্তন ও ভিক্ষার দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না।

অতএব বৈষ্ণব-জাতি যে অগ্ৰাঙ্গ ব্যবসায় করিতেছে, তাহা তাহাদের পক্ষে দুষণীয় নয়।

বৈষ্ণব-জাতির সামাজিক অবস্থিতি কোথায় ?

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্বাস্থ্য-অবস্থায় থাকিলে বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিত। সেই ধর্ম কতকগুলি উপাত্ত উপস্থিত হওয়ায়, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। বৈষ্ণব-জাতিও যদি সেই বর্ণ-ধর্মের মূল আকর্ষণ করে, তবে এই জাতির উভয় কূল নষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণব-জাতি সর্ববিষয়ে পবিত্র না থাকিতে পারিলে, সকল সমাজের অধম হইবে—সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-জাতি হয় সর্ব সমাজের নমস্কৃত সমাজ হইবে, নতুবা সকল সমাজের হেয় হইয়া পড়িবে। এই বৈষ্ণব-জাতির কোন মধ্যবর্তী অবস্থান নাই। কিরূপে থাকিলে এই বৈষ্ণব-জাতি সর্বোচ্চ জাতি হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিধি-বিধানমত কার্য করিলে তাহারা পূজনীয় হইবে।

বৈষ্ণব-জাতির সর্বোচ্চতা-লাভের উপায়

১। তাহাদের সমাজটীকে একমাত্র কৃষ্ণসেবার যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া রাখুন। বহির্মুখ-জ্ঞান-কর্ম একেবারে দূর করুন। কৃষ্ণসেবার বাধক হইতে পারে না—এরূপ যে-সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াও ব্যবহার আছে, তাহা সতর্কতার সহিত অবলম্বন করুন।

২। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ অবশ্য বৈজ্ঞানিক গঠন-বিধি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন বর্ণ ও আশ্রম-বিধান গ্রহণ করুন। বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত যে, কোনপ্রকারে সমাজ যেন জন্মদ্বারা নির্ণীত, অথবা বর্ণবিধি ও অধিকার-দৃষিত আশ্রম-বিধি গ্রহণ না করে।

৩। এই পত্রিকার (সজ্জনতোষণী) ১২৩ পয়ে এক দুই ক্রমে যে দশটি বিধির সঙ্কলন হইয়াছে, সেই বিধিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালিত হউক।*

৪। আশ্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধি প্রতিপালিত হউক; যথা :

(ক) বিবাহযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মহাজনগণের অনুমোদন সহকারে বিবাহিত হইয়া একপত্নী, একপতি ব্রত গ্রহণপূর্বক সংসার নির্বাহ করুন।

* বর্তমানে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।—প্রকাশক

(খ) বিজ্ঞার্থী ব্যক্তি দেশ ভ্রমণার্থে ব্রহ্মচর্য ও গুরুকূলে বাস-দ্বারা বিজ্ঞা উপার্জন করুন। এবিধ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তিনি গুরু থাকিতে পারিবেন।

(গ) অধিক বয়সে অবস্থা বিবেচনাপূর্বক বাণপ্রস্থ অবলম্বিত হউক।

(ঘ) ব্রাহ্মণ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কৃষ্ণভক্তি-জন্মিত বিরক্তি উদ্ভিত হইলে সম্মাসাশ্রম অর্থাৎ ভেকাশ্রম স্বীকৃত হউক।

(ঙ) সাক্ষ্য লক্ষিত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ সমাজ-বহিষ্কৃত হইবেন।

৫। যে কেহ সরলতা-সহকারে এই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গৃহীত হইবেন।

৬। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষ্ণভক্তির সাধক সমস্ত পার্থিব ও পারমার্থিক বিজ্ঞা ও শিল্পের অল্পশীলনদ্বারা জাতীর মূল উন্নতির চেষ্টা করা যাউক।

মহুয়া-সমাজ সংস্কারের জন্য নির্দেশ

বৈষ্ণব-জাতি এইরূপে সংস্থাপিত হইলে আর এতদেশে কোন ক্লেশ থাকিবে না। বোধ হয়, সকল আর্থা-সন্তানগণ অল্পকালের মধ্যেই এই জাতিকে পুষ্ট করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়, উপযুক্ত বৈশ্য ও উপযুক্ত শূদ্র-দ্বারা ভারতের মুখশ্রী পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। ইহা হইলেই সত্যযুগ আনিয়া জগতে পুনরায় রাজ্য করিবে। খ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই উন্নতির বীজ লাভ করিয়াছি। এখন প্রার্থনা করি যে, সমস্ত সঙ্কল্প পুরুষ এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিয়া কার্য আরম্ভ করুন।

বর্তমান ভারতের কর্তব্য-নিক্রপণে ঠাকুরের নির্দেশ

এই বিষয়ে যত্ন করিলে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর সকল লাভই হইবে। জাতি-সংস্কার, বিবাহ-বিধি-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার ও শরীর-সংস্কার সম্বন্ধে আজকাল যে-সকল খণ্ড উদ্যম হইতেছে, সে-সকল উত্তমের আর প্রয়োজন থাকিবে না। বৈষ্ণব-সমাজকে যথোচিত উন্নত করিয়া তাহাতে সকলের প্রবেশ করাই কর্তব্য। তাহাতে সমস্ত ভাল কথাই পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণই জগৎভূষণ। তাহারা কৃপাপূর্বক এ বিষয়ে সাহায্য করুন। তাহাদের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া এইস্থলে নিবৃত্ত হইলাম।

(সঙ্কলিতোষণী ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অত্যাশ্রয় জ্ঞান

“দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান।” (চৈঃ চঃ)

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। আমরা যখন ভগবৎ-সামুখ্য বজ্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আত্মহনপূর্বক আমাদের তটস্থ অধিকারের অপব্যবহার ও মায়ার বস্ততা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন ‘আমি কে?’ তাহা ভুলিয়া অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই বিবর্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশরাশি। প্রথমে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া ‘সমস্ত তত্ত্বই আমাদের মনোবলের আয়ত্ত’ এই অহংকার আমাদের প্রবল হয়, তাহাতে আমরা আত্মায়-পারম্পর্যক্রমে প্রাপ্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘনপূর্বক অক্ষুদ্র জ্ঞানেই অধিক সমাদর করিয়া যুক্তিবাদী হইয়া দাঁড়াই বা আরোহণহী হইয়া উঠি। অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান অর্থাৎ অবতরণ-মার্গ বা অবরোহ-পন্থা আমাদের প্রীতিকর থাকে না, গুরুজ্ঞাই আমাদের তখন কৃত্য হইয়া পড়ে। মনের নেতৃত্বে আমরা বিভোর হইয়া গুরু লঙ্ঘন করিতে করিতে ভগবদ্বৈমুখ্য-বর্জনশীল হইয়া ভগবদ্বিশ্রুতি লাভ করি বা নরক প্রাপ্ত হই, ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে যত বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে অচিৎ বা জড়ে অস্থপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধিই প্রবল হয়। তখন দেহেই আশ্রয় আরোপ করিয়া দেহ-সম্পর্কেই সমস্ত আপন পর বিচার করিতে বসি। যাহারা আমাদের দেহের তুষ্টিসাধন করিতে পারে, তাহারাই আমাদের প্রিয়; যাহারা তাহা করে না, তাহাদিগের প্রতি আমরা উদাসীন, আর যাহারা এই দেহের কোনরূপ অস্থবিধা সংঘটন করে, তাহারাই আমাদের শত্রু—এই ধারণাই বলবতী হয়। তখন আমরা বিচার করি না যে, এই যে দেহরূপী আমি, ইহার নারবত্তা কতটুকু, ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণের, ইহার পরিণাম কি, ইহার গঠনে কি? তখন এই পাক্‌ভৌতিক দেহ অনিত্য স্থলের নিলয় দেখিয়া আমরা দিশেহারা হইয়া পড়ি, আমরা তাহারই সেবার সকল সময় নিয়োগ করিয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলের কথায় উদাসীন হইয়া যাই। এই দেহ এখন একরূপ আছে, কয়েক বৎসর মধ্যে ইহার বিকৃতি সাধিত হইবে—শিথিল চর্ম্ম, পলিত ক্লেশ, গলিত দন্ত আমাদের পুনঃ পুনঃ দেহের অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহাতে কর্পণাত করিতে প্রস্তুত হই না! প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির দেহাত্মায় দেখিয়াও দেহের ভঙ্গুরত্ব সূক্ষ্মে নিরন্তর প্রমাণ পাইয়াও আমরা দেহকে ‘আমি’ জ্ঞান করা ছাড়িতে পারি না—আমাদিগের স্নায় গোথর বা বুদ্ধিহীন ভারবাহী গর্দভ আর কে হইতে পারে? প্রাণবিচ্যুত শত শত দেহকে দুর্গন্ধ-আবাস দেখিয়া, শৃগাল-শকুনির ভক্ষণ

পরিণত জ্ঞানিগণ আমাদের কি কোন জ্ঞানোদয় হইতেছে—আমরা কি দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছি? বরং দার্শনিক সাজিয়া দেহ-তত্ত্বের ভাবুক হইয়া দেহকেই সকল পুরুষার্থের ক্ষেত্র মানিয়া তাহারই সেবার উত্তরোত্তর যত্নপর হই।

মনোরূপী স্বামী ও বাহ্যে স্থূল দেহে 'আমি' বুদ্ধি যতদিন না আমাদের ত্যাগ করিবে, যতদিন না আত্মজ্ঞানী নিরন্তর ভগবৎ-সেবাতৎপর সাধু মহা-পুরুষের চরণাশ্রয়ে আমাদের এই দুই প্রকার দেহাত্ম-বুদ্ধির হাত হইতে অবসর না পাই, ততদিন নরকবাসীই থাকিয়া যাইব, আমরা নিজেদেরই মঞ্চ লাতে যত্ন করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হইব না।

—জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ নহে

শ্রীশ্রীগুরুগোরাচাঁদে জয়ত:

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পো: চুঁচুড়া

ভুগলী (পঃ বঃ)

ইং ৮।১০।৬০

স্নেহভাজনেষু—

* * * ! বৈষ্ণবের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে আশ্বিন-কা্তিক মাসের সংখ্যাতেই প্রবন্ধ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার নির্দেশ-অনুসারে এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে অনেক জায়গায় বৈষ্ণবগণ চাষ-আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের ওখানেও বৈষ্ণবগণ চাষ-আবাদ করিলে কোন প্রকারে অন্তায় হইবে না।

যাহারা বৈষ্ণবগণের চাষ-আবাদ অবৈধ মনে করিবে এবং বৈষ্ণবগণকে চাষ করিতে বলপূর্বক নিষেধ করিবে, তাহারা ভণ্ড এবং পাষাণ। ঐরূপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণবধর্ম কাঁহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। সুতরাং তাহারা বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃত উপদেষ্টা হইতে পারিবেন না বা তাহাদিগকে তৎশ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

জনমন্ত আর বাস্তব-সত্য এককথা নহে। যাহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাহাদের সহিত জনমন্তের কোন সংঘর্ষ নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইতি—

আশীর্বাদক—

—শ্রীভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব

প্রীক্ষেত্র দর্শন

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৪ পৃষ্ঠার পর]

তথা হৈতে গৃহে আসি সে রাজি বসিয়া ।

প্রভাতে সমুদ্রতীরে উপনীত হয় ॥

সমাধি দিলেন হরিদাসে গৌররায় ।

সমুদ্রে যমুনা জ্ঞানে হৃদয় জুড়ায় ॥

সমাধি অঙ্গনে বসি হরিনাম গাই ।

আনন্দে উন্নত চিত্ত কিরিতে না চাই ॥

তবে টোটা গিয়া দেখি বলদেব সাথ ।

সেবিলা পণ্ডিত যথা প্রভু গোপীনাথ ॥

শাস্ত্র-সাধুযুখে শুনি প্রভু গৌররায় ।

ভক্তসঙ্গে ভাগবত শুনেন তথায় ॥

নিভৃত টোটায় গৌর-গদাধর সনে ।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস করে আশ্বাদনে ॥

গোপীনাথ শ্রীচৈতন্য একই স্বরূপ ।

ন্যাসিরূপ বংশীযুথ ভিন্ননাত্র রূপ ॥

সুবর্ণের রেখা আছে জামুর উপরে ।

লুকাইলা গৌর গোপীনাথ কলেবরে ॥

একদিন বহু নৃত্য উচ্চসঙ্কীর্ণন ।

কৃষ্ণনাম প্রেমানন্দে ভরিত অঙ্গন ॥

অঙ্গন পবিত্র প্রভু শ্রীপাদ পরশে ।

দেখি ধন্য হই এবে লীলা অবশেষে ॥

তিস্তিভীর শাক যথা পণ্ডিতঠাকুর ।

ভোগ দিত গোপীনাথে অতি সুমধুর ॥

গৌরচন্দ্র সেই শাক করি আশ্বাদন ।

পণ্ডিতের মহাপ্রেমে মগ্ন সর্ববক্ষণ ॥

গোপীনাথ দক্ষিণেতে শ্রীরোহিণীসুত ।
 দেখিয়া গুণ্ডিচা গৃহে হৈল উপনীত ॥
 কি অদ্ভুত সেই স্থান অতি মনোরম ।
 বৃন্দাবননম বন শোভা অমূল্যম ।
 নানাজাতি বৃক্ষ সব শোভে চারিভিত ।
 গুল্মলতা ফুলদলে সে স্থান বেষ্টিত ॥
 বৃক্ষোপরি পক্ষিগণ আনন্দেতে গায় ।
 বহু লতাকীর্ণ স্থান জনশৃঙ্খ প্রায় ॥
 রত্নময় শ্রীমন্দির সুন্দর প্রাঙ্গণ ।
 মন্দির মার্জ্জনলীলা হয়ত' স্মরণ ॥
 গুণ্ডিচা মন্দির প্রভু করি প্রক্ষালন ।
 কীর্তন করিলা লয়ে নিজ ভক্তগণ ॥
 প্রভুর পূর্য লীলা করিয়া স্মরণ ।
 নয়নে আনন্দ অশ্রু বহে অনুক্ষণ ॥
 হা গৌরান্ধ দয়াময় পতিতপাবন ।
 ক্ষেত্রধামে তব লীলা বিচিত্র কথন ॥
 সেই জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দির ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নরেন্দ্রের তীর ॥
 সেই পথ সেই জ্যোৎস্না সমুদ্রের কূল ।
 চটক পর্বতরাজ সুবমা অতুল ॥
 আইটোটা রাজপথ সেই উপবন ।
 জগন্নাথ বল্লভের সুন্দর কানন ॥
 বহু নৃত্য ভক্তসঙ্গে ভ্রমণ উঠানে ।
 সর্বত্র লীলার চিহ্ন আছে বর্তমানে ॥
 হরিদাস সিদ্ধিস্থান নিকট ভবন ।
 ভজন কুটীর নাম প্রসিদ্ধ এখন ॥
 সেইস্থানে প্রভু সঙ্গী নিজ ভক্তগণ ।
 থাকিত সমুদ্রকূলে শুনি' বিবরণ ॥

তদবধি সিদ্ধভক্ত কভু কভু রয় ।
 ভজন কুটীর নাম বিজ্ঞজন কয় ॥
 সে স্থানে ছিলেন এবে ভক্ত মহাজন ।
 শ্রীভক্তিবিনোদ নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
 নবদ্বীপ গাদিগাছা জাহ্নবী নিকটে ।
 স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী তটে ॥
 'হুদিন তথা বাস করি' প্রভুবর ।
 বহুগ্রন্থ কৃষ্ণনাম প্রকাশি' বিস্তর ॥
 চৈতন্যের শেষ লীলা ভূমিতে গমন ।
 রহিয়া সমুদ্রতীরে করিলা ভজন ॥
 তাঁহার শ্রীমুখে লীলা করিয়া শ্রবণ ।
 নীলাদ্র কাহিনী এই করিহু বর্ণন ॥
 ভক্তগণ অধর্মের ক্ষমি' অপরাধ ।
 লীলা পাঠে কর দীনে উত্তম প্রসাদ ॥
 আমারে কল্পন্ দয়া চৈতন্য ঈশ্বর ।
 শ্রীধামে হটক মোর বাস নিরন্তর ॥
 শ্রীমান্দর সন্নিকটে নরেন্দ্রের কুল ।
 রাধাকুণ্ডলীলা স্ফুটি সর্বসুখমূল ॥
 অচিরে তথায় বাস হটক আমার ।
 জগন্নাথ দেহ দানে সেই অধিকার ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ ধার প্রাণধন ।
 এ অধম জীব সেই অতি অকিঞ্চন ॥

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগুরুদেবের আরিভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয়। গুরুদেব সেই তিথিতে মন্যদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিয়া অনুগতজনের জন্ত শ্রীব্যাসের রূপাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কারণ শ্রীগুরুদেব ব্যাসাত্মিন। ‘অভিন্ন’ শব্দে ভিন্ন নহেন। শ্রীল বেদব্যাস জীবের আত্মকল্যাণলাভের জন্ত বেদ বিভাগ, বেদান্ত সূত্রের প্রকাশ, মহাভারত ও পুরাণাদির প্রণয়ন করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার যে ভাবনা ও যত্ন করেন, শ্রীগুরুদেব সেই নীতি ও আদর্শ হইতে ভিন্ন নহেন। মূলে শ্রীল বেদব্যাস স্বয়ং নারায়ণ। ‘শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।’

আচার্য্য শঙ্কর যেমন স্বয়ং শিবঠাকুর, তেমনই শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। ‘নারায়ণ’ শব্দে ‘নার’ অর্থে সমগ্র জীবদমষ্টি এবং ‘য়ম’ অর্থে আশ্রয়, অর্থাৎ সমগ্র জীবের যিনি আশ্রয়। যিনি জীবের সুখশান্তির জন্ত মঙ্গল চিন্তা করেন এবং জীব যাহার আশ্রয়ে সুখশান্তি লাভ করেন, তিনিই নারায়ণ। কৃষ্ণবিরহিনী গোপীগণের নিকট চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্তিও গুরুতত্ত্ব, প্রেমোদ্ভূত শ্রীভগবৎতত্ত্ব নহেন। তাই তাঁহাদের প্রার্থনা—“নমো নমো নারায়ণ, করহ প্রসাদ। কৃষ্ণসঙ্গ দিরা মোদের ঘুচাও বিবাদ॥” স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনই সুখশান্তির পরম বিষয়বস্তু। চতুর্মুখ ব্রহ্মার স্তবে শ্রীকৃষ্ণই মূল-নারায়ণ। শ্রীগুরুদেব সেই বিষয়ের আশ্রয় বা পাত্র। শ্রীগুরুদেবের শরণাগত চরণাশ্রিত জন সেই ভগবৎবিষয়ের সেবাসুখ লাভ করিতে পারেন। যাহার মাধ্যমে জীব শ্রীভগবানের সেবাসুখের সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন—শিক্ষা পান, তিনি ‘ব্যাস’ পদবাচ্য। ‘কৃষ্ণলীলার ব্যাস শ্রীবেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥ বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যভাগবত। যাহার অরণে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড।’

সনাতন ধর্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন ‘অধোক্ষজ’, ‘অতীন্দ্রিয়,’ ‘অবাঙ্মনসোগোচর’—বাক্য, মন, এমন কি, চক্ষুরও গ্রাহ্যবস্তু নহে। যাহাকে জানিতে ব্রহ্ম-শিবাদিও ভুলক্রমে আগুনকে জল এবং জলকে মাটি বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণের অতীত সেই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান যিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভজনোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার রূপা প্রার্থনা করেন, তখন তাহারই নিকট সেই পরমাত্মা তাঁহার প্রকাশ-তহ চৈতন্যগুরুকে প্রকট করেন। চৈতন্যগুরুর প্রেরণায় জীব বিচার করিবার

বিবেক-বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। বাহিরে নন্দগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সাধকের মূল লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দু। একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ছোটবড় বহু বৃত্তচাপ রেখা অঙ্কন করা যায়। রেখা একাধিক বিন্দুর পাশাপাশি অবস্থান। চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কনযন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রবিন্দু যেক্রপ বৃত্তের স্রষ্টা, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাক্ষতায় কারণাক্রিয়ায় মহাবিশ্ব প্রথম পুরুষের দ্বারা জড়মায়া প্রকৃতির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলির সৃষ্টি। তাহাতে জীবরূপ বীজপ্রদানকারী ‘অহং বীজপ্রদপিতা’—শ্রীকৃষ্ণ। চতুর্দিকস্থ ব্রহ্মাণ্ড-গুলির কেন্দ্রস্থ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জীবরূপ বিন্দুর সমষ্টি-বৃত্তের স্রষ্টা।

বৃত্তস্থ কোন বিন্দুর কখনও কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার অভিলাষ করা উচিত নহে। যদি বৃত্তের বিন্দু কেন্দ্রবিন্দু বলিয়া দাবী করে, তবে তাহার বৃত্তস্থ বিন্দুও তাহাকে অন্যায়সে অস্বীকার করিতে পারিবে। বৃত্তের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কেন্দ্রবিন্দুগামী বিস্তৃত সরল রেখাকে ‘ব্যাস’ বলিয়া থাকি। কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধহীন বৃত্তস্থ বিস্তৃত সরলরেখাকে আমরা ‘জ্যা’ বলিয়া জানি।

কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধযুক্ত বিস্তৃত সরলরেখা ব্যাস—‘গুরু’। ‘গুরু-ব্যাস’ অপেক্ষা ‘জ্যা’ লঘু, যেহেতু জ্যা কেন্দ্রবিন্দুগামী নহে। ‘জ্যা’ বৃত্তস্থ দুইটী বিন্দুর সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে। লৌকিক পার্থিব গুরু খাওয়া-পরা, বাঁচা-বাড়ার আপাত মনোহর চাকবাক্যের সাহায্য দিতে পারেন, কিন্তু অশোক-অভয়-অমৃত-আধার-শাস্ত্র শান্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচরণের সম্বন্ধ ঘটাইতে পারেন না। কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধহীন জ্যা-তুল্য শ্রীকৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তি ব্যাস বা গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। ব্যাসতুল্য শ্রীগুরুদেবই কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ? না, কেন্দ্রবিন্দু যেমন ‘ব্যাস’ নহে, ব্যাসও তেমন ‘কেন্দ্রবিন্দু’ নহে। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রবিন্দুর সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাস, ব্যাসের মধ্যেই কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক তজ্রপ, শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, শ্রীকৃষ্ণও গুরুদেব ছাড়া নহেন। কারণ, ব্রহ্ম-মাক্ষ-গৌড়ীয়-গুরু-পরম্পরায়—‘শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ - সংজ্ঞকান্’। শ্রীকৃষ্ণ আদিগুরু। ব্রহ্মা—গুরু, শিবও—গুরু। কিন্তু আমার দীক্ষা-শিক্ষাদাতা গুরুদেব—একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন না। যেমন, জনক—পিতা, তাই বলিয়া পিতা, জনক নহেন।

“যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকৃত্তাদিদেবতৈঃ।

সমন্তেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্রবম্॥”

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

সাধু-সজ্জনগণ নর ও দেবকুলের মান্ত 'ঈশ্বর'-আখ্যাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা ও শিবকে গুরু বলিয়া জানেন। 'বৈষ্ণবানাং যথা শত্ৰুঃ' 'শিব-বিরুদ্ধিতং শরণ্যম্', 'দাসস্তে হর-নারদ-প্রভৃতয়ঃ' বাক্যে ব্রহ্মা ও শিবেরও আরাধ্য হরিহর একাত্মা—সদাশিব বিযুক্ত। শিবের গুরু সত্বর্ষণ অস্ত্রগুণভেদে শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী নারায়ণ। শঙ্খ—বৈদিকজ্ঞান, পদ্ম—লীলাসঞ্চালন, গদা—কুম্ভ বিতরণ ও চক্র—কুদর্শন-নাশের প্রতীক। শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী সেই নারায়ণের আবেশাবতার শ্রীল ব্যাসদেব।

শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মা ও শিবাদির আরাধ্য নারায়ণ হইলে, আরাধক ব্রহ্মা ও শিবের পুত্র ও শিষ্ঠ-স্থানীয় নারদকে কি করিয়া গুরুত্বে বরণ করিতে পারেন? শ্রীল ব্যাসদেব সঙ্গুরু। সঙ্গুরু শিষ্টকে 'গুরু' করিতে পারেন। সঙ্গুরুর ভাবনায় জগতের সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণের দাস। ভাগ্যবান জীব তাহা মানিয়া লইতে পারেন। জীবের শ্রীকৃষ্ণদাস্ত ভাবনা না থাকে—চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তবে, কেহ শ্রীকৃষ্ণকে মানুক বা নাই মানুক, অদ্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জগতের সকলের কাছেই তাঁহার শিক্ষার বিষয় আছে। তাই সঙ্গুরুই জগৎগুরু। স্বয়ং গুরু-অভিমানী অপরকে 'গুরু' করিতে পারে না। জীবনে কাহারও ছাত্র না হইলে, যেমন কেহ আদর্শ শিক্ষক হইতে পারেন না, পরমার্থ-বিজ্ঞার ক্ষেত্রে বৈদিক শাস্ত্রীয় শাসনযোগ্য শিষ্ট না হইলে কি করিয়া সঙ্গুরু হইতে পারেন? শ্রীল ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে গুরুত্বে বরণ করিয়া ভক্তের মহিমাই প্রচার করিয়াছেন।

শাস্ত্রার্থ—অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্যকরূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীৰ্ত্তিত। 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ' শ্লোকে যথার্থ অনুশীলন-কারিগণ মহর্ষি মজ্জু ও শ্রীল ব্যাসদেবের অভিহিত ও কীৰ্ত্তিত প্রামাণিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের অনুগমন করেন। আচার ও প্রচার-পরায়ণ আচার্য্য সকলের গুরু হওয়ার যোগ্য ও জগতের পূজ্য। সেই কথাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—

আপনে আচরে কেহ, না করেন প্রচার।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥

আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য।

তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আৰ্য্য ॥

আচার্য্যের আচরণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় কি? তাহাই আচার্য্যের নীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা—“আপনি আচারি’ তক্তি শিখামু সবারে।” শ্রীমদমহাপ্রভু আচার্য্যের আচরণ করিলেও, তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির প্রমাণে শ্রীভগবৎতত্ত্ব। ক্ষুদ্র জীবকে স্তাবকগণ শ্রীভগবৎ-নীলাভিনয় করাইলেও শাস্ত্রপ্রমাণাভাবে ভগবান্ ভ’ দূরের কথা, শাস্ত্রদর্শীর নিকট সঙ্গুরু আচার্য্যও অবোধ্য হইয়া পড়েন। ভগবানের আসন দখল করায় অপরাধে ভগবৎকৃপা হইতে আত্মবঞ্চিত ও জগৎবঞ্চকরূপ দোষে তাহাদিগকে দুষ্ট হইতে হয়। অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-সমাজে ইহাদিগকে অশাস্ত্রীয় নিত্য নূতন অবতারের বিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরকে কলহে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

সনাতন ধর্মের প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের শ্রৌত, জেয়, দৃষ্ট ও অমুভূতির শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করিয়া নূতন কিছু পাইবার ও সমাজকে দিবার আশা করিলে সত্যরূপ আদর্শ দর্শাইবার কিছু থাকে না। তাই সুধীজনগণ শ্রীল ব্যাসদেবের শ্রৌতপন্থায় বৈদিকধর্মের আচারবান্ প্রচারককেই ‘গুরু’ বলিয়া জানেন। গুরু, শিষ্য ও শাসনবাণী বৈদিক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাক্রমে দ্রষ্টা, দর্শনার্থী ও দৃষ্টবস্তু। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়।

দ্রষ্টা না থাকিলে, দর্শনার্থীকে দৃষ্টবস্তু কে দেখাইবেন? আবার দর্শনার্থী না থাকিলে, দ্রষ্টা দৃষ্টবস্তু কাহাকে দেখাইবেন? আর দৃষ্টবস্তু যেখানে নাই, সেখানে দ্রষ্টা দর্শনার্থীকে কি-ই বা দেখাইবেন? অতএব দ্রষ্টা, দর্শনার্থী ও দৃষ্ট—এই তিনটির যে কোন একটির অভাব হইলে বৈদিক দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। এ প্রসঙ্গে শ্রুতি সঙ্গুরু ও সংশিষ্যের হ্রস্বভতা স্মরণ করায়—

শ্রবণান্নাপি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ

শৃংস্তোহপি বহবো যৎ ন বিদ্যাঃ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলাহুশিষ্টাঃ ॥ (কঠ ১।২।৭)

যদি বলি—‘আমি চক্ষুমান্ ব্যক্তি, আমার দ্রষ্টার প্রয়োজন নাই, আমিই দেখিয়া লইব।’ তাহা হইলে, সঙ্গুরু প্রথমেই হুর্ভুক্কে দর্শাইয়া দেন—‘চক্ষু থাকিলেই দেখা যায় না; কাণ ব্যতীত।’ প্রমাণ? আমরা দিবসের

সূর্যালোকে বৃক্ষ-লতা, ধর-বাড়ী, কাগজ-কলম, আসবাবপত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় দেখি। রাত্রে অন্ধকারে আমরা দেখি না কেন? অন্ধ বিষয়বস্তু ত' দূরের কথা, নিজের শরীরটাকেও দেখি না। তখনও ত' বিষয়বস্তুগুলি থাকে, আমাদের দেখার গর্বেষ বিষয়—চক্ষুও থাকে, কিন্তু দেখি না কেন? আলোর অভাব। যদি দেখতে চাই, তবে আলো জ্বলাইতে হইবে, আলোর ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই যদি আলো ছাড়া চক্ষু দিয়া দেখা না যায়, তবে অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ বিষয়কে চক্ষুদ্বারা দেখার গৌরব চরম মূর্থতা। অতএব, চক্ষুমান্ গাবত ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে,—‘আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ’।

যদি বলি—‘যাহার চক্ষুতে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নাই, তাহার সম্মুখে হাজার শক্তির আলোক জ্বলাইলেও সে দেখিতে পারে না। অতএব, অন্ধের দিনরাত্রি সমান। সুতরাং আলো যেমন দ্রষ্টা, চক্ষুও তদ্রূপ দর্শনের সহায়ক।

তাহার জবাব—দিন-দুপুরে একটি চক্ষুমান্ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটয়াছে, দেহাঙ্গুবুদ্ধি-পরায়ণের মৃতের দেহটি কি কিছু দেখে? না তাহার চক্ষুতে কোন যন্ত্র দর্শনের সহায়ক হয়? তবে দেখে না কেন? দর্শনার্থী জীবাত্মা দেহে নাই। প্রতিতে আত্মাকেই দর্শনার্থী বা দর্শক, প্রবণকারী ও বক্তা বলিয়াছেন। অতএব আত্মতত্ত্বই শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্য ও শ্রুতব্য। অন্ধেরও পাঠশালা আছে, সেখানে শিক্ষকের চাতুর্য্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের স্কুরণ ঘটানো হয়। আর জ্ঞানালোকেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। অতএব ‘মনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্মাঙ্ক’—এ কথা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবের অর্কাচীনতা।

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র ও নারদ-পঞ্চরাত্রে সেই আত্মদর্শনের আলো আছে। আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছুক জীবাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি দেবোন্মুখ হইয়া তাঁহার রূপা প্রার্থনা করিলে পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন। কঠোপনিষদের ‘নাগমাং আ প্রবচনেন লভ্যঃ’—মন্ত্রে তাহাই উক্ত। শ্রীভগবানই আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছুক জীবের প্রতি রূপা করিয়া তাঁহার আত্ম-পার্বদকে সদ্গুরুরূপে প্রেরণ করেন। অথবা জীবের অন্তরে সদ্গুরুর নিকট যাইবার প্রেরণার সঞ্চার করেন।

কৃষ্ণ যদি রূপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

শুক অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।

যিনি জীবের অন্তরে সৎ ও অসৎ বিচার করিবার বিবেকশক্তির প্রেরণা ঘোগান, তিনি ‘চৈতন্যগুরু’—পরমাত্মার প্রকাশ। বাহিরে সদ্গুরু শিক্ষাদাতা

ও দীক্ষাদাতারূপে দুইপ্রকার। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে যত্ন-অবধূত ব্রাহ্মণ-সংবাদে অবধূত ব্রাহ্মণের (২৫) চব্বিশজন শিক্ষাগুরুর স্বীকৃতি পাই। অতএব শিক্ষা-গুরু বহু, কিন্তু দীক্ষাগুরু একজনকেই করার বিধান। হিন্দুধর্মে সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব-পঞ্চোপাসনার ক্রম-পদ্ধতিতে পরিশেষে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উপদেশ আছে। জড়বিচার ক্ষেত্রেও কোন ছাত্রের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার শিক্ষক যদি আরও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ না দিয়া পূর্বোক্ত পাঠশালাতেই রাখিতে চাহেন, তবে উহা শিক্ষকের আদর্শ নহে। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব-মন্ত্রোপাসক গুরুগণ অল্পগতজনকে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া শিক্ষাগুরুর আদর্শ রক্ষা করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল রামানন্দ রায়-মুখে

শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর সাধ্য-সাধন রসকথা প্রচার

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীমুত-পদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশচ
 শ্রীকৃষ্ণং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথারিতং তং সজীবম্ ।
 সার্বভৌমং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্ত-দেবং
 শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা শ্রীবিশাখারিতাংশচ ॥

অজ্ঞান-তিমিরাক্ষস্ত জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্ত-নাম্নে গৌরভিষে নমঃ ॥

রাগময়ী ভক্তির অবতার শ্রীগৌরদাসুন্দর রাগময়ী ভক্তি প্রচারেচ্ছায়
 নপার্বদ অবতরণ করিলেন শ্রীরাধার ভাব ও ছাতি লইয়া ।

“নানামতে ভক্তমুখে, ভক্তি-কথা শুনি’ সুখে,

জীব শিক্ষা দেন সুযতনে ॥”

অন্তর্ধামিরূপে তিনি ভক্ত-হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিভিন্ন ভক্তমুখে বিভিন্ন
 তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীহরিদাসের মুখে নাম-মাহাত্ম্য, শ্রীসার্বভৌমমুখে

মুক্তি-তত্ত্বকথা ; শ্রীরামানন্দ রায়মুখে সাধ্য-সাধন রসকথা ও শ্রীকৃষ্ণের মুখে রসবিচার করিয়া মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে আনন্দ লাভ করিয়াছেন । শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীমুখে মহাপ্রভু প্রেমোত্তরের মাধ্যমে যে চরম সাধ্য-নির্ণয় ও সাধন-প্রণালী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের রসভাণ্ডারের সন্ধান দিয়াছেন, সে রস কিঞ্চিৎ পরিমাণেও গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদের একান্ত অতুগত হওয়া আবশ্যক । শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা করিয়া অন্তর্ধামি-চৈতন্যগুরুরূপে হৃদয়ে সে তত্ত্ব প্রকাশ করান, তাহা হইলেই কিছু রসগ্রহণে সক্ষম হইব ।

“জগদ্বাস্তু যতোহনুয়াদিতরতশ্চার্থেহভিজঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে নৃহৃতি যৎ সুরয়ঃ ।

তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র জিহর্গোহমুখা

ধাম্না শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অনন্য-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম ‘স্ব-তত্ত্ব’ অর্থাৎ ‘স্বরূপতত্ত্ব’ বলিয়া স্থির হন ; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্ররাজা ; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্ধামিক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান পণ্ডিতের মূহমূহ মোহ জন্মিয়া থাকে ; যাঁহাতে তেজোবারিমৃদিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথকরূপ সত্তা ; যাঁহাতে তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদ্রূপক সৃষ্টি, জীবাণুপ্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি সত্যরূপে বর্তমান ; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহকশূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি ।”

যিনি সেই আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে অন্তর্ধামিক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই রামানন্দ-হৃদয়ে অধিষ্ঠানপূর্বক চরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রবণ করিয়াছেন ।

প্রভু কহে,—“পড় শ্লোক নাথ্যের নির্ণয় ।”

রায় কহে,—“স্বধর্ম্মাচরণে বিফুভক্তি হয় ॥”

শ্রীগোবিন্দসুন্দর সংসারচক্রে আশ্রিত কর্মফলাহত ত্রিতাপজালায় জর্জরিত জীবের চরমকল্যাণ লাভের উপায় যে সাধ্যবস্ত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়কে শ্লোক পড়িতে বলিলেন । প্রথম শ্লোকে রায় জীবের জন্ম অন্তসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সঠিকভাবে পালন করাকেই জীবের সাধ্যতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । ভগবানের দৃষ্টান্তই সাধ্যতত্ত্ব । মানবের স্বীয় কর্ম্মভূয়ান্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটা বর্ণধর্ম্ম এবং বেদনির্দিষ্ট ব্রহ্মচর্যা,

গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রমধর্ম সঠিকভাবে পালন করিলেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ইহার অতীতা হইলেই নরকগমন অনিবার্য। পরমার্থপথ অনুসরণ করিতে হইলে এই বর্ণাশ্রম ধর্মজীবনই প্রথম সোপান। একারণে রায় সাধ্য-নির্ণয় করিতে গিয়া প্রথম উত্তর করিলেন—‘স্বধর্ম্যাচরণ’। মহাপ্রভু ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া রায়কে ইহার উপরে কি আছে, তাহা প্রকাশ করিবার জ্ঞান প্রশ্ন করিলেন।

প্রভু কহে,—“এহো বাহু, আগে কহ আর।”

রায় কহে,—“কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ—সর্বসাধ্যসার ॥”

গীতার বলিয়াছেন,—“হে কৌন্তেয়! যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্বী হইবে, সে-সমস্তই আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর।”

মহাপ্রভুর স্বধর্ম্যাচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধ্য-নির্ণয়ের প্রশ্নে রায় এবার উত্তর করিলেন,—বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত সকল কর্ম্মকে যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয় তখনই প্রকৃত সাধ্যবস্ত লাভ হয়।

কিন্তু মহাপ্রভুর প্রশ্ন এইখানেই স্থগিত হইল না। তাহার প্রশ্নের উত্তর ইহারও উর্দ্ধে। অতএব—

প্রভু কহে,—“এহো বাহু, আগে কহ আর।”

রায় কহে,—“স্বধর্ম ত্যাগ—এই সাধ্যসার ॥”

শ্রীভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অজ্ঞানকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্, আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

সাধ্য-নির্ণয়ে মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরেও রায় এবার তাহাই বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের উর্দ্ধে তিনি নির্দেশ করিলেন স্বধর্ম ত্যাগকে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সমস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ যেমন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, অপর বর্ণসকলও তদনুসারে বৈরাগ্য-লক্ষণ প্রকাশ করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন। এই ত্যাগধর্মে শ্রীহরি পরিতোষ লাভ করেন।

কিন্তু প্রভু রায়ের এই উত্তরকেও বাহু বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং রায়কে আরও উত্তর উত্তর দিতে কহিলেন।

প্রভু কহে,—“এহো বাহু, আগে কহ আর ।”

রায় কহে,—“জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার ॥”

প্রভুর প্রশ্নে এবার রায় জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণনা করিলেন ।

গীতার বলিয়াছেন,—“অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চা দ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, শোক ও বাঞ্ছা-বহিত ও দর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরা ভক্তি প্রাপ্ত হয় ।”

ইহার পূর্বপৰ্য্যন্ত কৰ্ম্মমিশ্রাভক্তির উল্লেখ ছিল । প্রথমে সকাম কৰ্ম্ম, তৎপরে নিকামকৰ্ম্ম, দর্ব্বশেষে কৰ্ম্মত্যাগ । এবার শ্রীরামানন্দ রায় প্রবেশ করিলেন—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে । কৰ্ম্মমিশ্রাভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি যে উৎকৃষ্ট ইহা স্বীকার করিয়াছেন মহাপ্রভু । কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন রায়ের এ উত্তরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকেও তিনি বাহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কারণ ইহাও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত । “শ্রীভগবান্ গোঁরহরি নিম্মধ্যম বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যভূতিকে বাহু-সাধ্য বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ‘অগ্রসর হইতে বলিলেন ।’ আবার প্রশ্ন করিলেন,—

প্রভু কহে,—“এহো বাহু, আগে কহ আর ।”

রায় কহে,—“জ্ঞানশূন্য ভক্তি—সাধ্যসার ॥”

প্রভুর প্রশ্নে এবার রায় উত্তর করিলেন,—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সাধ্যগণের সার ।

শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন,—“হে ভগবন্ ! নির্ভেদব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখ-বিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য-মধ্যে আপনি দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট স্থলভ হইয়া পড়েন ।”

রায়ের উত্তরে ‘জ্ঞানশূন্য ভক্তির’ কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—এবারে সাধ্য নির্ণীত হইল ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা আছে তাহা বলিতে নির্দেশ করিলেন । “কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন অপেক্ষা কৰ্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কৰ্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধন্দ্যত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মহুশীলরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও, সে সমুদয়ই বাহু ; কেননা, সাধ্যবস্ত যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার দিক্কাণ্ডে নাই ।

সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, তাহা অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্যাদি দ্বারা অনাবৃত। আত্মকুল্যভাবে কৃপাশীলন; উহাই সাধ্যবস্তু।”

কর্মমিশ্রা ভক্তিতে জীবের গতি—চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। কর্ম-অনুসারে জীব এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডই পরিক্রমা করিয়া থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জীবের গতি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইয়া বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় থাকিয়া যায়—ব্রহ্মে লীন বা নিঃস্বের মুক্তি কামনার জীবের মূল-উদ্দেশ্য থাকে, শ্রীহরির পরিতোষ মুক্তি-কামনার মধ্যে থাকে না। ফলে চিৎধামে প্রবেশাধিকার ঘটে না। একারণে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পর্যন্ত মহাপ্রভু বাহু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জানশূন্য ভক্তিকে তিনি সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন,—

প্রভু কহে,—“এহো হয়, আগে কহ আর।”

রায় কহে,—“প্রেমভক্তি—সর্বসাধ্যসার ॥”

প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় কহিলেন,—প্রেমভক্তিই সর্বসাধ্যসার। কিন্তু শুদ্ধভক্তি প্রথমে শাস্ত্রভক্তি-অবস্থায় উদ্ভিত হয়। একারণে প্রেমের প্রগাঢ়ত্বে পৌঁছাইতে প্রেমভক্তির সঙ্গে রসযোজন্য প্রয়োজন হয়। প্রেমের বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আশ্রয়ের সাহায্যে তিনি এই প্রেম আশ্বাদন করেন। আশ্রয়ের রসের তারতম্য অনুসারে বিষয়ের আশ্বাদনেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এবারে মহাপ্রভু রায়কে প্রশ্ন করিতে থাকিলেন—প্রেমের সেই চরম অভিব্যক্তিতে পৌঁছাইবার জন্ত।

প্রভু কহে,—“এহো হয়, আগে কহ আর।”

রায় কহে,—“দাস্ত্রপ্রেম—সর্বসাধ্যসার ॥”

শাস্ত্র-অবস্থায় শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা বোধ থাকে না। ফলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। “ভগবান্‌ই আমার প্রভু—এইরূপ মমতাবোধ যুক্ত হইলেই সাধারণ প্রেম দাস্ত্রপ্রেম হইয়া পড়ে। ইহা সাধারণ প্রেম অপেক্ষা উচ্চ।” সাধারণ প্রেম হইতে দাস্ত্রপ্রেমে আসিলে ভগবান্‌ “মমতা” রূপ একটা ভাবের দ্বারা সেবিত হন।

প্রভু কহে,—“এহো হয়, কিছু আগে আর।”

রায় কহে,—“সখ্যপ্রেম—সর্বসাধ্যসার ॥”

রায়ের এই উত্তর শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—ইহাও হয়, কিন্তু আরও একটু চলিলেই আমরা চরমসাধ্যে পৌঁছাইব।

তাহার উত্তরে রায় সখ্যপ্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া নির্দেশ করিলেন।

এই সখ্যাপ্রেমে আসিয়া ছুটি ভাবের সংযোজন হইতেছে। মমতা এবং কৃষ্ণ ও সখাদের মধ্যে মমতা-ভাব। দাস্ত্রপ্রেমে মমতা থাকিলেও ভগবান্ যে প্রভু, —এই বুদ্ধির জন্ম একটা ভয় বা সন্দেহ থাকিয়া যায়। এই ভয় বা সন্দেহকে দূর করিয়া বিশ্রান্ত বা একান্ত বিশ্বাসকে বরণ করিতে পারিলেই তাহা সখ্যাপ্রেম হইয়া যায়।

কিন্তু এ উক্তরের পরেও প্রভু রাগকে আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন।

প্রভু কহে,—“এহো উত্তম, আগে কহ আর।”

রাগ কহে,—“বাৎসল্যাপ্রেম—সর্বসাধ্যসার ॥”

প্রভুর প্রশ্নে এবার রাগ বাৎসল্যাপ্রেমকেই সর্বসাধ্যসার বলিয়া উল্লেখ করিলেন। সখ্যরসের যে বিশ্রান্তাত্মক প্রেম, তাহাতে অধিকতর স্নেহসংযুক্ত হইলে “বাৎসল্যরসের” উদয় হয়।

প্রভু কহে,—“এহো উত্তম, আগে কহ আর।”

রাগ কহে,—“কান্ত্যভাব—প্রেমসাধ্যসার ॥”

“প্রভু কহিলেন,—ইহা পর পর হইয়া উত্তম হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর একটা রস আছে, যাহাকেই সাধ্যসার বলিতে পার। রাগ উত্তরে কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্ত্যভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার। তাৎপর্য্য এই, সাধারণ প্রেমে ‘মমতার’ অভাব। দাস্ত্র-রসে ‘বিশ্রান্ত’ বা ‘বিশ্বাসের’ অভাব, সখ্যরসে ‘স্নেহাধিকো’র অভাব এবং বাৎসল্যরসে ‘মিসন্ধোচ-ভাবে’র অভাবহেতু সাধ্যাপ্রেমের পূর্ণতা তব্দ-রসে হয় নাই। কৃষ্ণে যখন কান্ত্যভাবের উদয় হয়, তখনই ঐ সকল অভাবশূন্য সকল সাধ্যের সার একটা অখণ্ড প্রেমতর পাওয়া যায়।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বলিরহাট, (২৪ পরগণা উঃ)

“রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ববিষয়েই স্বাধীনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। স্বাধীনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের উদাসীন্য পরিহার করা প্রয়োজন।”

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

রূপ ও সৌন্দর্য

মানবযাত্রাই সৌন্দর্যের পূজারী। চিরকালের জন্ত হৃন্দরকে বরণ করিয়া লইবার জন্ত তাহার চেষ্টার অন্ত নাই। তাহার পক্ষে হৃন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ত' স্বাভাবিক। কারণ তিনি যে সৌন্দর্যময় ভগবানের সন্তান। আজকাল বেশীরভাগ নর-নারীই বিকৃত অর্থাৎ অস্থায়ী সৌন্দর্যকে প্রকৃত সৌন্দর্য মনে করিয়া ভুলের ফাঁদে পা রাখিয়া অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। জড়ীয় রূপের মোহ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক ও আত্মবিনাশক। রূপের মোহই জনক-জননীকে সম্পূর্ণরূপে সন্তান-সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে; আপনজনকে 'পর' উপাধি দান করিতেছে। ভোগবুদ্ধিতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ বিফুমায়া-রচিত জগতের ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া অগ্ন্যালোকমুগ্ধ পতঙ্গের স্থায় আপনাকে ভোক্তা মনে করে এবং জড় ভোগের আগার বলিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিবার প্রয়াস করে। সেই অসংযত চঞ্চল বন্ধজীবগণ অগ্নির উজ্জল আলোকময় রূপের মোহে প্রাধান্ত পতঙ্গের স্থায় অগ্নিতে বা অন্ধকারেই পতিত হইয়া আত্মবিনাশ প্রাপ্ত হয়—ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে আজকাল “রূপ ও প্রাধান্ত” বিভাগে জড়দেহের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বজায় রাখিবার জন্ত কতপ্রকারই না পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা রহিয়াছে। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বাজারে রূপ-সৌন্দর্যের অন্তান্ত পুস্তকেরও কোম অভাব নাই। প্রাকৃত জীব ও ভক্তের সৌন্দর্য উপলব্ধির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ভক্ত ভগবানের সৌন্দর্যমুগ্ধ পান করিবার জন্ত ঐহিক স্তনের মুখে ছাই প্রদান করেন। স্বয়ং শিবঠাকুর রুক্ষ-নামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া “ভবভোলা” নাম ধারণপূর্বক দিগম্বর বেয়ে নৃত্য করেন।

প্রাকৃত সৌন্দর্য—জগৎস্থায়ী ও দুঃখজনক

প্রাপঞ্চিক উন্নতিকামী অভাবগ্রস্ত জনগণ ভ্রান্তিবশে মনে করেন যে, বিজ্ঞা, ধন, রূপ, যশ ও বংশমর্যাদা—সকলই প্রয়োজন তত্ত্ব। এই সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, এইপ্রকার বাসনা তাঁহারা মনে পোষণ করেন। তাহাদের মন্দভাগ্য—ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে লোভের সঞ্চার হয় না। বন্ধজীব খণ্ডকালরূপ নর্পের দংশনের যোগ্যতা লাভ করিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অনিত্য ভোক্তা হয়। উহাই সংসাররূপে পতিত হইবার কারণ।

অনেকে বলেন,—“Beauty is full and symmetrical development of nature”. অর্থাৎ সৌন্দর্য্য অর্থে প্রাকৃতিক পূর্ণ ও সামঞ্জস্যযুক্ত গঠন। কিন্তু কাহাও প্রাকৃত দেহের সৌন্দর্য্য ও বল নিত্যকালের জন্য থাকিবে না। ধন, পরিজন এবং যৌবন এ সকলই জোয়ারের জলের ন্যায় অস্থায়ী। “ধন জন যৌবন জোয়ারের জল।” কোন এক প্রাকৃত কবিও গাহিয়াছেন,—

যৌবন বসন্তসম স্তম্ভময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন ॥

পদ্যপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল। পুরুষের চিত্তহারী রমণীর এবং রমণীর চিত্তহারী পুরুষের যৌবনধন ক্ষণস্থায়ী। রূপ ও যৌবনের জন্য বৃথা অহংকার অভ্যস্ত মূর্খাগিরি পরিচায়ক। “গরব কর যৌবনের ভরে, কাঁদতে হবে অন্ধকার ঘোরে।” তাই বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

দেহের সৌন্দর্য্য-বল—নহে চিরদিন।

অন্তএব তাহা ল'রে, না থাক গর্ব্বিত হয়ে,
তোমা' প্রতি এই অন্তনয় ॥

তিনি অতীতও গাহিয়াছেন,—

রূপের গৌরব কেন ভাই।

অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।

এ অঙ্গ নীতল হবে, আখি স্পন্দহীন রবে,
চিতার আগুনে হবে ছাই ॥

যে মুখসৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
ঋ-শিবর হইবে ভোজন।

জীবের স্থূলশরীর গৃহের সহিত সমান। যেরূপ স্তম্ভ ও ছত্রের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের কাঠগুলি গৃহের সহায়, তদ্রূপ মানবের স্থূলশরীরের অস্থি, মাংস, লোম, নখ প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা নির্মিত। এরূপ শরীরের পরিণতিক্রমে মলমূত্রাদি বিসর্জনের যোগ্যতা আছে। সুতরাং মন্বর পরিণামশীল জগতের বস্তুগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বাহ্যিক কৃষ্ণদেবী পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহব্রত হইয়া পড়েন, তাহাদের হুঁতোগ্যের তুলনা নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎস

ভগবান্ শব্দে সৌন্দর্য্যময়। ‘ভগবৎ’ শব্দে ‘সৌন্দর্য্য’ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ স্বীয় ‘সৌন্দর্য্যে’ ভক্তগণকে আকর্ষণ করেন। ভক্তগণের ভজন-সৌন্দর্য্যই ভগবান্কে আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য্যবিহীন বস্তুতে জীবের রুচি হয় না। সৌন্দর্য্য দর্শনের অভাবেই জীবগণ অসুন্দর-বস্তুদর্শন-বিচারে অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তথায় ঐশ্বর্য্য, বীর্ঘ্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি সমুদিকে জড়ভোগে আবদ্ধ করে এবং এই ছয় প্রকার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্কে বিশ্বস্ত হন। যেই কালে তিনি এই ছয়টি সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ভগবানেই লক্ষ্য করেন, সেই সময় ভোগের অসৌন্দর্য্য তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয়। ভগবানের সৌন্দর্য্য দর্শনভাবে জীবগণ মায়িক জগতে বর্ডৈশ্বর্য্যকে সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া ভ্রান্ত হন। ভগবৎসৌন্দর্য্য-দর্শনে জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি সেবানুগ হইলে ভগবান্ই একমাত্র সৌন্দর্য্যের আকর—এইরূপ নিত্য উপলব্ধি হয়।

আত্মিক অর্থাৎ ভগবানের সেবাসৌন্দর্য্যই—

ভক্তগণের একমাত্র কাণ্ড

ভক্তিপথের পথিক ভক্তগণ বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া জড় বিষয়াহ্বসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন,—

কি করিলে বিঘ্না, ধন, রূপ, যশ, কুলে।

অহঙ্কার বাড়ি’ সব পড়য়ে নির্মলে ॥ (১৫: ভাঃ মধ্য ৯২৩৪)

প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের দ্বারা ভক্ত কখনও আকর্ষিত হন না। তাই লক্ষ্মীরা বেশার অপরূপ সৌন্দর্য্যও নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের মনকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। ভক্ত সৌন্দর্য্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। ভাগবতে (১০, ৬০।৪৫) কৃষ্ণিণী দেবী প্রাকৃত রূপমোহ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে দ্বিকার দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—“যে জীলোক কখনও ভবদীর্ঘ পদকমলমকরন্দ আশ্রাণ করে নাই, সেই রমণীই চন্দ্র, শশ্বত, রোম, মথ, কেশাচ্ছন্ন ও অভ্যন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ুসম জীবিত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামীজ্ঞানে দেবা করিয়া থাকে।” কবি কীটন্ বলিয়াছেন,—“Beauty is truth, truth is beauty”—অর্থাৎ সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর। উক্তিটি পারমার্থিক জগতের বিচারে সত্য। কিন্তু কীটন্ তাঁহার উক্তিটিকে পার্থিব জগতের উল্লে লইয়া যাইতে

সক্ষম হন নাই বলিয়া তাহা মধুর ও ভ্রান্তিমূলক। প্রাকৃত জগতের গাণ্ডার সীমাবদ্ধতার মধ্যে সুন্দর কখনও সত্য নহে, আবার সত্য কখনও সুন্দর নহে। ভক্ত “সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমে”র উপাসক। ভগবানের মেবাই তাঁহার নিকট সত্য ও সুন্দর।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতে হইলে আত্মার সৌন্দর্য্য একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র ব্যায়ামে শরীরকে পুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সুন্দর করিতে পারে না। আত্মার সৌন্দর্য্য বা পবিত্রতা ভগবৎসেবা হইতে সংরক্ষিত হয়। আত্মার সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা বাহিরের পুষ্টিকে একটি অপূর্ব্ব কমনীয়তা ও মনোজ্ঞ জ্যোতি প্রদান করিয়া থাকে—তাহার ফলে দেহটিকে একদিকে সুগঠিত এবং অন্তদিকে সুন্দর করিয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবার রূপই রূপ এবং কৃষ্ণসেবার সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইলে উহা বাহিরে প্রতিফলিত হইতে কয়দিন সময় লাগে? অন্তদিকে যতই ব্যায়াম করা হউক না কেন, যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন না কেন, যতই বেশভূষা ও পারিপাট্যের দ্বারা সুসজ্জিত হউন না কেন, সৌষ্ঠব, কমনীয়তা ও পবিত্র জ্যোতির অভাবে দেহের মনোজ্ঞতা অথবা কাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইলে কদাকার দেহেও উহা ফুটিয়া উঠে। “Nothing ill can dwell in that temple”—অর্থাৎ এ প্রকার পবিত্র দেবমন্দিরে কোনও দুষ্ট জিনিস থাকিতে পারে না। ভারত-বর্ষের পূতাবু ঋষি, ভক্ত ও তপস্বীগণ এজন্যই এত কমনীয় হইতেন। আত্মার পবিত্রতার ফলে তাঁহারা বাহিরে অনিন্দ্যসুন্দর দেখাইতেন।

অব্যবসায়ী চঞ্চল-হৃদয় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি ভোগে নিযুক্ত থাকায় নানাপ্রকার ধারণা পোষণ করে। তজ্জন্ম প্রাকৃত জগতের গুণ-দোষ প্রভৃতি চিন্ত্যনীয় বিষয়সমূহ তাহার উপর বিক্রম প্রকাশ করে। বিভিন্নদিকে প্রবহমান বায়ু যেরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তদ্রূপ প্রাকৃতরূপ ও সৌন্দর্য্য জীবের সংযম-ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া গুণ-দোষাদিতে ব্যাপ্ত হয়। সুতরাং ব্যবসায়াজ্ঞিকা বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া একাধা পদ্ধতিতে হারসেবা করিলেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করা সম্ভব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভজ্ঞানাস ত্র্যম্বকচাঁদী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর]

তার আগে ত' ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন। তারও আগে অগ্ন্যস্ত্র অবতারগণ এসেছেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরে এসে Fountain Source, Supreme Lord, Almighty Lord-এর বিশেষণ কি করে পাচ্ছেন, প্রশ্ন আসে। তার সমাধান করেছেন শাস্ত্রে। একই ব্যক্তি বার বার স্টেজে Part play করতে আসেন। তাহলে একই ব্যক্তি পূর্বে ও পরে বার বার করে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন, সুপ্রাচীন; পুরাণ-পুরুষ সেই ভগবান্। তিনি Supreme Lord। ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে এলেন, তাঁকে কি বলা হবে?—বিশেষণে বলা হয়েছে তিনি 'মর্যাদা-পুরুষোত্তম'। আর শ্রীকৃষ্ণকে বলা হল 'লীলা-পুরুষোত্তম'। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে বলছেন—একজন অবতারী, আর একজন অবতার। একজন হলেন অবতারের মূল, আর একজন হলেন অবতার। সেইকথাই ব্রহ্মাজী স্তবে বলেছেন, ব্রহ্ম স্তবের মধ্যে রয়েছে,—

স্বাসাদিমূর্তিষু কলানিগমেন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোজ্জ্বলেনৈষু কিস্ত।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো

গোবিন্দসাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥

অগ্ন্যস্ত্র অবতার সব পরে এসেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ আদি, অনাদি, Main Fountain Source। শ্রীমদ্ভাগবতে সব অবতার-সংস্থান বর্ণনা করেছেন। তার ভিতরে কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী। সেই কথাটি পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্তু কবি জয়দেব গোস্বামী 'দশাবতার-স্তোত্রম্' রচনা করলেন। প্রত্যেক Stanza-র শেষের দিকে রয়েছে,—'কেশবধৃত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে, কেশবধৃত রাম-শরীর জয় জগদীশ হরে, কেশবধৃত কঙ্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে।' সেখানে একই কথার প্রতিধ্বনি। পাছে লোকের ভুল বুঝাবুঝি হয় এইজন্তু "দশাবতার-স্তোত্রম্" লিখে শেষের দিকে কবি জয়দেব আবার একটি পৃথক্ স্তোকে স্তব করেছেন।—

বেদান্তকরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুখিভ্রতে

দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুরুতে।

পৌলস্ত্য জয়তে হংস কলয়তে কাঞ্চন্যমাতহতে

শ্লেচ্ছান্ মুর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় ভূভাং নমঃ ॥

কৃষ্ণ অবতারী। স্তবরাং সেই যে কৃষ্ণ, তিনি আগেই আস্বন, আর পরেই আস্বন, বার বার করে আস্বন, তিনি সুপ্রাচীন, পুরাণ-পুরুষ। সেই কথাই শাস্ত্রে বলছেন সব জায়গায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণের ত্রায় জন্মগ্রহণ করেন না, অসাধারণ জন্ম তাঁর দেখাচ্ছেন যখন দেবকীর কাছে আবিস্কৃত হয়েছেন। দেবকীর গর্ভস্থিতি করতে এসেছেন দেবতারা। তাঁর গর্ভস্থ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে তাঁরা স্তব-স্ততি করছেন।—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্বধোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যশ্চ সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্য্যাকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

দেবতাগণ সত্যস্বরূপ ভগবান্কে কেবল ‘সত্য’-শব্দ দিয়ে তাঁর বন্দনা করেছেন। প্রত্যেকটি ‘সত্য’-শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ রয়েছে। তুমি সত্য-স্বরূপ, তুমি সত্যশক্তি, তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভৃতি। সত্য তোমার থেকে এসেছে। সত্য-মিথ্যা এজগতে কোথা থেকে এল? সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি কি? ভগবান্ হলেন সত্যের মূল নীতি-আদর্শ।

সত্য কাকে বলা হবে? মিথ্যা কাকে বলা হবে? একজন বলেছেন,—মহাশয়! আমি ভগবান্কে মানি। কিরকম মানেন?—ভগবান্কে মানি, নীতি-আদর্শ মানি। এই জগতে যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী, তার ভিতরে যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মবিগণ পরিস্কারভাবে বলেছেন শাস্ত্রে,—মানুষই হল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—Best creation of God। একজন কবি বলেছেন,—‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ ‘More than a man you cannot be’—মেকলে বলেছেন। তার ব্যাখ্যা রয়েছে শাস্ত্রে। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’—কথাটা কেন বলেছেন? মনুষ্যত্বের যে চরম বিকাশ সেইটাই কবি দেখাতে, বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ডারউইন সাহেবের Evolution Theory আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই,—From ape to man। সেই বিচারের সঙ্গে সনাতন আধ্যাত্মবিগণের বিচারের একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কোথায়?—ডারউইন সাহেব বললেন, এই যে মানুষ এই হল চরম, এর পরে আর কিছু নাই। কিন্তু আধ্যাত্মবিগণ বললেন, এর পরেও কিছু কথা আছে। ‘More than a man you can not be’—তার পরেও কিছু কথা আছে। কি?—‘Manliness is next to godliness’—তাহলে একটু উপরের কথা হল। মানব দেবত্ব লাভ করে।

‘Manliness is next to godliness, but not Supreme Godliness’—
 নেকথা আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে। সৈদিক দিয়ে এটা প্রমাণিত। ঋষিগণ যখন
 এটার একদিক দেখিয়েছেন, আবার আর একদিকে দেখাচ্ছেন যে, এই
 মানুষ যদি মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশটা না দেখাতে পারে, যদি মনুষ্যত্বের অপব্যবহার
 করে, তাহলে তার পুনরায় Diversion—অবনতি, অধঃপতন। সেকথাও
 কৃষ্ণই গীতায় বলেছেন,—‘কীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি।’ এরূপ বিচার
 বর্ণিত হয়েছে ভাগবতেও। গীতার মধ্যেও আপনারা শ্লোক পাচ্ছেন—
 যেখানে ভগবান্ কৃষ্ণ দৈবাস্ত্বসম্পদ বিভাগযোগ ব্যাখ্যা করেছেন, সেই গীতার
 ষোড়শ অধ্যায়েও আস্থরিক সম্পদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার চরম ক্ষেত্রে
 বলছেন,—

তানহং বিষতঃ ক্রূপান্ সংসারেযু নরাধমান্ ।

ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশুভানাস্থরীষেব যোনিষু ॥

আস্থরীং যোনিমাপন্ন্য মৃচা জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপৈষ্যব কোন্তেয় ! তন্তো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥

এই হল তাদের Diversion—অধঃপতন। মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বের
 বিকাশ, প্রকাশ, অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারে, তখন তার অধঃপতন
 অনিবার্য, শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং আমাদের ঋষিগণের নীতিটা মিতে
 হবে। ঋষিগণ বলছেন যে, এই মানুষ অবস্থা-বিশেষে উন্নতি লাভ করতে
 পারে, আবার অবনতিও তার আছে। উন্নতি ও অবনতির যথেষ্ট উদাহরণ
 আছে।—

আমাদের দেশের একজন রাজা কুকলাস হয়ে গেলেন, অহল্যা পাঁচালী
 হয়ে গেলেন, সুদর্শন বিত্তাধর সর্প কুলে জন্মগ্রহণ করলেন, ধনকুবেরের দুই পুত্র
 নলকুবের ও মণিগ্রীব বৃক্ষজন্ম লাভ করলেন—যমলাজ্জ্বল বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ
 করলেন। এগুলো নিশ্চয়ই অধঃপতনের উদাহরণ। ঠিক ঐ রকম ধরণের
 উন্নতিরও উদাহরণ আছে। সুতরাং আর্ষাঋষিগণের যে বিচার তার উপরে
 কারও কোন কথা নাই, বলবার কোন ক্ষমতা বা অধিকার নাই। তাঁরা
 বিচার-যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন সবকিছু। ভগবান্ এ জগতে আসছেন, সেটা
 অজের জন্মলীলা রহস্য। আজ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, সেটাকে
 ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে অজের জন্মলীলা রহস্যরূপে। সত্যই রহস্য এটা।
 যিনি জন্মগ্রহণ করেন না, বার প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই, তিনি আবার কি
 করে জন্মগ্রহণ করছেন মানুষের মত? আকারটা নরাকার, কিন্তু সাধারণ

মানুষের যে দোষ-ক্রুটি, অদম্পূর্ণতা, অজ্ঞতা—এগুলো সেই ভগবানের নাই। তিনি সর্বজ্ঞ ভগবান্, আমরা অজ্ঞ। তিনি Omnicient Lord, Omnipresent Lord, Omnipotent Lord—সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ ভগবান্। তিনি সেইজন্ত অজ্ঞমকে বললেন,—

অজোহপি সমব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠায় সমব্যায়াত্মমায়য়া ॥

আমি অজ হয়েও জন্মলীলা প্রকাশ করছি। কেন?—জগজ্জীবের পরে প্রেম-প্ৰীতি-ভাসবাসা প্রকাশ করার জন্ত প্রেমময় ভগবানের—এই আবির্ভাব। শাস্ত্রে কৃষ্ণ নিজেকে বলছেন যে, আমার জন্মের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্ম এক কর না, ভুল হবে, অপরাধ হবে, অম্মায় হবে। There is a great difference between my birth and that of others. I come to this world accordingly as I desire, whereas the Jeevas are hurled down into this world and born under the influence of my Deluding Energy Maya. I am the Lord of Maya, but the Jeevas are under her clutches. এই ত' পার্থক্য। ঈশ্বরের আবির্ভাবে এই পার্থক্য দেখাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের জন্ম ওরকম নয়। প্রাকৃত বলে পার্থক্য রয়েছে সেখানে। ভগবানের আবির্ভাবেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা সবটাই Identical প্রমাণ করছেন। ভগবান্ এবং ভগবানের নাম দুই-ই এক। যদি ভগবানের নাম ধরে আমরা গাহান করি, তাহলে স্বয়ং ভগবান্ আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দেন। প্রাকৃত জগতের যে শব্দ, সে শব্দে যদি আমি সম্বোধন করি, সে শব্দে ঠিক সাড়া পাচ্ছি না। কিন্তু ভগবানের যে কোন মূখ্যনাম যদি উচ্চারণ করি, সেই নামে ক্রন্দন করি, তাহলে ভগবান্ সাধক-সাধিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন দেন। তক্ষাৎ হচ্ছে এখানে। Identity কবেছেন সেখানে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা সবটাই Identical স্বয়ংরূপ ভগবানের সঙ্গে।

শাস্ত্রে নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। Absolute Sound—শব্দব্রহ্ম—নামব্রহ্ম। ব্যাখ্যা করেছেন পরব্রহ্মের কথা,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিৎসাস্ত তদেব ব্রহ্ম ॥

পরব্রহ্ম ভগবান্ কে? তিনি যে Non-Entity মন, তাঁর যে সব ক্ষমতা

আছে, সেটাই দেখাচ্ছেন। আর সেই ভগবানের যে নাম আর নামী দুইই অভিন্ন, সেটাও দেখাচ্ছেন।—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-বসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নতান্নামনামিনোঃ ॥

এই কলিকালে স্বয়ং ভগবানের দর্শন মেলে না, তজ্জন্মই নামের সাধনের কথা বলছেন। নামের সাধনই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম—Medium। নামের সাধনের কথা কেন বলছেন?—নামের সাধনের দ্বারা পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ হবে। সেইজন্ম এই কলিকালে নামই হল—Proper Medium—উৎকৃষ্ট মাধ্যম, উপযুক্ত মাধ্যম। এর থেকে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আর নাই। গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে দেখবেন এই কথাই আছে।—

কৃতে যদ্ব্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্বিকীর্তনাত্ ॥

দত্যযুগে ধ্যান-ধারণা, তপশ্চা করে মানুষ ভগবানকে লাভ করত, ত্রেতাযুগে যাগ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত, দ্বাপরযুগে বিশেষতঃ পূজা-অর্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত। ‘কলৌ তদ্বিকীর্তনাত্’—কলিকালে একমাত্র হরিনাম কীর্তনে সেই ফল লাভ হয়।—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥

এছাড়া গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। এখানে হরি-শব্দ আছে, কৃষ্ণ-শব্দ আছে। যখন শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষি মৈমিষারণ্যে ভাগবত-সভায় বসে আছেন, সেইখানে ৬০ হাজার ঋষি প্রশ্ন করছেন সূত গোস্বামীর নিকট, —এই কলিকালে আমাদের উপায় কি হবে? কেন আপনারা এত চিন্তা-ভাবনা কিসের, এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন আপনারা? দাক্ষণ কলিকাল এসে যাচ্ছে, দ্বাপর যুগের শেষের কথা, ঋষিগণ খুব চিন্তিত, ভাবিত—আমরা আমাদের সাধন-ভজন কি করে রক্ষা করব? তাঁরা খুব উদ্ভিগ্ন। শ্রীসূত গোস্বামী বললেন,—এই একই প্রশ্ন ত’ আমার গুরুদেবের নিকট করেছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই প্রশ্নের সমাধান করেছেন, উত্তর দিয়েছেন। আমি এখানে আর নূতন করে কি বলব? সেই প্রশ্নের সমাধানটা আপনারা কাছে বলি পুনরায়। সেখানে উত্তর দিয়েছেন কি?—

কলেদৌষনিধে রাজহস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসদঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলি অশেষদোষের আকর সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋষিগণ আপনারা যাহা বলেছেন, কথাটা ঠিক। কলি মানে বিবাদ-বিসম্বাদ, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, ঈর্ষা, হিংসা, মাংসর্ষ্য। সেই কলিকাল সর্বতোভাবে ঘৃণিত। কিন্তু কলির অশেষ দোষ থাকলেও একটা মহৎগুণ আছে। মহৎগুণ কি?—“কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেন ॥”—কৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তনের দ্বারা, ভগবানের নাম-কীৰ্ত্তনের দ্বারা কলিজীব উদ্ধার লাভ করবেন। সুতরাং আপনাদের ব্যবস্থা ত' হয়ে আছে। হে ঋষিগণ! আপনারা চিন্তা করছেন কেন? আপনারা অহরহঃ নিরন্তর সেই ভগবানের নাম করুন। তাহলেই ত' আপনাদের জন্ত সবকিছু আছে।

‘মুক্তি’ সম্বন্ধে যে ধারণা দিয়েছেন শাস্ত্রে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ। কেউ ‘মুক্তি’ বলতে ভাবছেন—ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব। নিখিলেশবাদী যারা ‘নেতি নেতি’ করছেন, তাদের বিচার—ভগবানের সঙ্গে মিশে ভগবান্ হয়ে যাব। ভগবানের নাম করতে করতে ভগবানের সেবা করা উচিত, সেবা করতে না গিয়ে আমি ভগবান্ হয়ে গেলাম, সেবা ত' হল না! ওটাকে কি ‘সেবা’ বলা হবে?—ওটা Anarchism। এটাকে মিসন্দেহে Anarchism—রাষ্ট্রহিংসিতা, রাজহিংসিতা বলা চলবে। সুতরাং রাজহিংসিতা হয়ে আমাদের লাভ নাই। ঈশ্বরের ভজন-সাধন করতে গিয়ে তাঁর সেবা করা উচিত। তাঁর সেবায় ধন্য হওয়া উচিত। তাঁর সেবারূপ যে অমৃত, সেইটা আশ্বাসন করা উচিত। সেইটা শাস্ত্রে বললেন। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে আমরা মিশে যাব—Dialuted হয়ে যাব, কি স্বয়ং ভগবান্ হয়ে যাব, কি ভগবানের সিংহাসন দখল করব—এ আশা কখনই ভজনপ্রয়াসী তত্ত্ব পোষণ করেন না। ভক্তের প্রার্থনা,—হে ভগবান্! আমি তোমার সেবা করতে চাই, আমি তোমার সেবা করে ধন্য হতে চাই।

তাই আপনারা লক্ষ্য করবেন—আর্য্যঋষিগণের বিচার। পাশ্চাত্য দেশে Christianity তে বলুন, আর মুসলিম ধর্মেই বলুন, সেখানে শাস্ত্র রসের সেবা, দাস্ত্যভাবে সেবা আছে মাত্র। Christianity তে কি বলা হয়েছে?—“Fatherhood of Godhead”. তার মানে হে ভগবান্! তুমি আমাদের কৃষ্ণি-রোজগার দাও। God! give us our daily bread. ভগবান্ যদি আমাদের father হন—পিতা হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের Maintain করবার জন্ত—ভরণ-পোষণের জন্ত বাধ্য আছেন।

Sonhood of Godhead—এই নিয়ে আজ আলোচনা। আজ যে

আমাদের জন্মোৎসব-তিথি, এটা Sonhood of Godhead এর বিচার। ভগবান্ স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করে এসেছেন বহুদেব-দেবকীর, নন্দ-যশোদার। আমরা সেবা করে ধন্য হতে চাই। মা-যশোদা প্রার্থনা করেছেন—তুমি আমার পুত্র হও, আমি তোমার সেবা করব। আধ্যাত্মবিগণের শিক্ষা এর উপরে আরও কথা রয়েছে। মধুর রসের কথা যেখানে বলছেন, আরও উচ্চ ধরনের কথা Consort hood of Godhead—ব্রজগোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণসেবা করেছেন। এসব বিচারগুলো আধ্যাত্মবিগণের অবদান। যারা সামান্য বিচারের মধ্যে আবদ্ধ নন, তাঁরা বলছেন ভগবানের সেবা করতে হবে আমাদের। ভগবান্কে দিয়ে খাটিয়ে নেব না। ভগবান্, তুমি আমাদের জন্ম দিবানিশি খাট, পরিশ্রম কর, এটা Fatherhood of Godhead এর মধ্যে চিন্তা আছে। কিন্তু Sonhood of Godhead এর মধ্যে ও চিন্তা নাই, সেখানে বাৎসল্যরসের সেবাচিন্তা আছে। Consort hood of Godhead—মধুররসের মধ্যে বিশেষ সেবাচিন্তা আছে। উন্নত ধরনের বিচার দেখিয়েছেন স্ববিগণ। এটা আমাদের আধ্যাত্মবিগণের অবদান। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যে মন্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩ পরিচ্ছেদে আমরা পাই,—

‘জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।

জ্যোতির্খয় ধাম যোপ হৃদয়ে পশিল ॥

আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।

হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥”

সুতরাং সাধারণ মানবের জন্মের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী-পার্বদ ও তদন্তগত জন ব্যতীত আর কাহারও লেখনী বা বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ভক্ত না হইলে কি ভগবান্কে চেনা যায়? ভক্ত ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হয় না। জহরীতেই জহর চেনে। ভক্তের সংস্পর্শে না আসিলে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বৈশিষ্ট্যাদি বুঝা যাইবে না।

লেখক ‘নিবেদনের’ ২য় পৃষ্ঠায় ধর্মসংস্থাপনার্থের উদ্দেশ্যে চৈতন্যের আবির্ভাবাত্মক জন্ম স্বীকার করায় তাঁহার জন্ম যে মানুষের জায় পৈত্রিক ধাতু সম্বন্ধীয় জন্মাদি হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কস্মকল-বাধ্য মানুষের জন্মকে ত’ আবির্ভাব বলা হয় না। আবার লেখক ২০ পৃষ্ঠায় বক্তব্যে মানব চৈতন্যকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া ঘোষণা কাল্পনিক অপবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—“দেই চিরশাস্তি স্বর্ঘ হ’লো ‘মানুষ চৈতন্য’। ‘ভগবান চৈতন্য’ দেই স্বর্ঘকে প্রচ্ছন্ন রাখার কজিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র।”

লেখকের ঐ ‘নিবেদনে’র ২য় পৃষ্ঠায় বক্তব্যের সহিত ২০ পৃষ্ঠা ও ২২ পৃষ্ঠায় বক্তব্যের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হইতেছে কি? গীতার অমোঘ বাণী ধর্মসংস্থাপনার্থে ধীর অবিশ্বাস্য আবির্ভাব, তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া মানুষ বলাই যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে গীতার ‘ধর্মসংস্থাপনার্থ’ শব্দটি যে স্লোকে আছে, দেই ৪৮ স্লোকের অর্থ যথাযথ নির্ণীত হয় কি? সুবী তত্ত্বপাঠকগণ ইহা বিচার করিবেন।

(৩) আবার ১৯ পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য—“এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

‘সর্বশেষ ভূত্যা তান বৃন্দাবন দাস।

‘অবশেষ-পাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥’

(চৈ: ভা: ৩/৬২২১)

এবং চরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

‘নারায়ণী-চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভোজন।

তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥’

[চৈতন্যচরিতামৃত ১/৮৩৭]

কিন্তু উচ্ছিষ্ট পান খেয়ে কোন রমণী মসজিদ হয় কেমন করে এ বিজ্ঞানের যুগে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে।”

লেখকের উক্ত বক্তব্যের উত্তরে জানাইতেছি যে, লেখক ‘খ্রীষ্টচৈতন্যচরিতামৃত’ হইতে যে স্লোকটি লিখিয়াছেন তাহা ছাপা ভুল আছে; উহা নিম্নরূপ হইবে;—

“নারায়ণী-চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভোজন।

তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥”

(চৈ: চ: আদি ৮/৪১)

শ্রীবৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী শিশুকাল হইতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ প্রাপ্ত হইতেন।

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
 নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
 শ্রীবাসের শ্রাতৃহুতা—বালিকা অজ্ঞান।
 তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান ॥
 পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
 সকল বৈষ্ণব তা'রে করে আশীর্বাদ ॥
 ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
 বালিকা-স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥
 খাইলে প্রভুর আশ্রয় হয়—‘নারায়ণী’।
 কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি গুনি ॥”
 হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
 ‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব ॥
 অজ্ঞাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধরনি।
 ‘গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী ॥’

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।২২১-২২৭)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপরোক্ত পয়ার শ্লোকগুলির মর্ম্মানুসারে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী নারায়ণীদেবী শিশুকাল হইতেই শ্রীমন্নমহাপ্রভুর কীৰ্ত্তনান্তে ভোজন-উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন। অতএব চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট পান খাইয়া নারায়ণীর গর্ভবতী হওয়ার কথা লেখক বাহা লিখিয়াছেন তাহা অবাস্তব। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে ঐ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখা মানেই সেই ব্যক্তিই চরিত্রহীন। সুতরাং ঐরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়া লেখক শ্রীমন্নমহাপ্রভুর প্রতি অবৈধ দোষারোপ করিয়াছেন।

‘চৈতন্যচরিতামৃত’ আদি ৮।৪১ শ্লোকের অল্পভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণাচাৰ্য্য পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীমন্তজিসিন্ধাস্ত নরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“শ্রীনারায়ণীদেবী সম্বন্ধে শ্রীকবি কর্ণপূর শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় লিখিয়াছেন,—“অধিকায়াঃ স্বদা যাসীমাম্মা শ্রীল-কিলিষিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুজ্ঞানাং সেবং নারায়ণী মতা ॥” শ্রীকৃষ্ণের স্তনদাত্রী—‘অধিকা’, তাঁহার ভগিনী—‘কিলিষিকা’। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই শ্রীগৌরবতাবে ‘নারায়ণী দেবী’।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তানই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস। জননী ঠাকুরানী শ্রীগৌরহৃদয়ের বিষদাশী বা রূপাপাত্রী। তাঁহার পরিচয়ে ঠাকুর মহাশয় পরিচিত, সুতরাং পূর্বপুরুষের পরিচয় বৈষ্ণবের পরিচয়ে আবশ্যিক নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১৭শ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভাগে শ্রীকৃপাভূষণাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আবণ্ড স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—“কোন কোন চরিত্রহীন পাণ্ড ও প্রকৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসকে প্রাকৃত বুদ্ধিবশে নিন্দা ও বিবেচ্য করিবার নিমিত্ত বলেন—শ্রীমদগাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট বা তাগদুল ভোজন ফলে শ্রীমতী নারায়ণীর বিধবাবস্থায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। একপ নিন্দা-প্রলাপ নিতান্ত অপরাধময়, সুতরাং অশ্রাব্য।”

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী হইতে কিয়দংশ বিবৃত করিতেছি,—“শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিরোধ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের নেবা-মিরত হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবনদাসের পরিচয় হয় নাই।”

উপরোক্ত অবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার পিতৃদেব বৈকুণ্ঠ বিপ্রেস জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার শিশুকালে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। সুতরাং পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় নারায়ণীদেবীর গর্তবতী হওয়া সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

(৪) লেখক ঐ পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“সেই চির শাশ্বত সূর্য হলো ‘মাক্ষণ চৈতন্য’। ‘ভগবান্ চৈতন্য’ সেই সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র।

একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ : নীলাম্বর চক্রবর্তী চৈতন্যের জন্ম-পত্রিকা গণনা করে চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান (নারায়ণ) বলে বায় দিয়েছেন।

“বিপ্র বোলে, “এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ইহা হইতে সর্কধর্ম হইবে স্থাপন ॥”

[চৈতন্যভাগবত ১।২।২৬৬]

এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, চৈতন্য ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ’। এবং দ্বিতীয়ত, চৈতন্য কতৃক ‘সর্কধর্ম স্থাপন’। ধরেই নিলাম এ’ বক্তব্য ‘হানড্রেড - পার্সেন্ট’ নীলাম্বর চক্রবর্তীর। বেশ। কিন্তু এই যদি জ্যোতিষী নীলাম্বর

চক্রবর্তীর বক্তব্য হয়, তাহলে, ভাগবতের ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ,’ ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ এ স্বীকৃত হলেন না কেন ?”

লেখক আবার ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“জ্যোতিষী নীলাদ্র যদি চৈতন্যকে “স্বয়ং নারায়ণ” বলে স্থাপন করেন। তাহলে সেটা তো ইতিহাস-সত্য কথা। তা নীলাদ্র চক্রবর্তী শত কল্পনাপ্রসূত হয়ে বললেনও।

* * * *

সুতরাং নীলাদ্র চক্রবর্তী কথিত চৈতন্য ‘স্বয়ং নারায়ণ’ কথাটি যদি সর্বান্ত সত্যি হতো, তাহলে, সে কথা শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতে থাকতো না, মুরারির ‘কড়চা’তেও থাকতো। এবং সেক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতেও চৈতন্যকে একাধিকবার ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা ভক্তের তুলিতে আঁকা মিছক ভগবানের ছবি।”

লেখকের লিখিত ‘চৈতন্য ভাগবতের’ পয়ার শ্লোকটি আদি ৩।১৬ হইবে। উহা নীলাদ্র চক্রবর্তীর উক্তি নহে। নীলাদ্র চক্রবর্তী শ্রীচৈতন্যের লগ্ন-বিচারে সর্বদমক্ষে অতীব বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করিতে থাকিলে তথায় একজন পরমার্থবিৎ-মহাজন ব্রাহ্মণরূপে উপস্থিত হইয়া শিশু চৈতন্যকে সাক্ষাৎ নারায়ণ, শুদ্ধ সনাতন ভাগবতধর্ম-সংস্থাপক ও আরও অলৌকিক গুণের অধিকারী বলিয়া কীর্তন করেন। লেখকের লিখিত চৈতন্যভাগবতের ‘বিপ্র বলে; এ শিশু’—শ্লোকটির পূর্বশ্লোক পাঠ করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়—

“সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।

প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম করয়ে কখন ॥”

[চৈঃ ভাঃ আদি ৩।১৫]

অতএব লেখক ঐ ২০ পৃষ্ঠায় চৈতন্যভাগবতের যে শ্লোকটি নীলাদ্র চক্রবর্তী-কথিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বরং ঐ শ্লোকটি নীলাদ্র চক্রবর্তীর বক্তব্য না হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে এক বিপ্রের বক্তব্য হইতেছে। এক্ষেত্রে বিপ্র-কথিত ‘চৈতন্য সাক্ষাৎ নারায়ণ’ কথাটি লেখক ইতিহাস-সত্য কথা বলিয়া মান্য করিবেন কি ?

উক্ত পৃষ্ঠায় লেখকের আরও বক্তব্য—‘চৈতন্যভাগবতের’ ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ,’ ‘চৈতন্য চরিতামৃত’-এ স্বীকৃত হইলেন না কেন ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাদিকারী

। শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতাব্দী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২২শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

॥ শ্রীশঙ্করগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

১২ পদ্মনাভ, ৫০৪ শ্রীগোরাঙ্গ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডব্রতিপূর্বিকেষু—

সাদর সন্তোষণপূর্বিকেষু—

আগামী ২২শে পদ্মনাভ, ১৭ই আশ্বিন, '২৭ (৪।১০।২০) বৃহস্পতিবার শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগোড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অম্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-ত্ৰিবিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২২শ বর্ষপূর্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে ।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবাস্থবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে রূপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা । পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জ্জনীয় ।
ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৩২৭

শুকভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সত্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

১৭ই আশ্বিন (ইং ৪।১০।২০), বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

অপরাহ্নে—৫-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন ।

বিঃ দ্রঃ—পত্র লেখা সেবাসূচী প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক-এ"র নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য ।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ দাত্ত আত্ম-পরমর ।

অধোকজে 'অহতুক' ভক্তি বিরাজত ॥

অন্য ধর্ম হৃদরূপে পালে ঘেই জন ।

হরি-কথার রক্তি নৈলে পও সেই ভ্রম ॥

৪২শ বর্ষ	<p>৪ চামোদর, কারণোদশায়ী, ৫০৪ শ্রীগোবিন্দ ৩১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৭, ইং ১৮।১০।৯০</p>	৮ম সংখ্যা
----------	---	-----------

সাম্বাদং

শ্রীহরীসামুনিরুতং শ্রীশ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রম্

[শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং গোলোকধামে শ্রীনারদ-বহুলাঙ্ঘ-সংবাদে
শ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রবর্ণনে বিংশেছধ্যায়ৈ]

শ্রীহরীসামুনিরুবাচ.—

১। বালং নবীন-শতপত্র-বিশালনেত্রং
বিস্বাধরং সজলমেঘরুচিং মনোজ্ঞম্ ।
মন্দস্মিতং মধুর-সুন্দর-মন্দযানং
শ্রীনন্দনন্দনমহং মনসা নমামি ॥ ২৪ ॥

[হরীসামুনি বিরজা পার হইয়া গোলোকধামে প্রবিষ্ট হইলেন; তথায়
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাগুলিন দর্শনপূর্বক প্রসন্ন হইয়া গোপ-গোপীগণাবৃত,

গোপন-সম্বিত নিকুঞ্জমধ্যে জ্যোতির্ময়মণ্ডলস্থ দিব্য লক্ষদলপদ্মে গোলোকপতি
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডনাথ রাধাপতি হরি পরিপূর্ণতম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ
বিরাজমান প্রত্যক্ষ করিলেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতেছিলেন; হর্যাসা
পুনরায় যমুনা-সমীপে মহাবনের পুণ্য রমণীয় সৈকতে বালকগণসহ ভগবান্
বিচরণ করিতেছেন দেখিলেন। ঋষি হর্যাসা তাঁহাকে পরাংপরতত্ত্ব বলিয়া
জানিতে পারিয়া নন্দনন্দনকে বারবার প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিতে
লাগিলেন,—]

শ্রীহর্যাসামুনি বলিলেন,—বালক নবীন কমলতুল্য বিশাললোচন, বিদ্যধর,
সজ্জলজলদকান্তি, মনোজ্ঞ মন্দহাস্যকরী মধুর-সুন্দর, মন্দগামী শ্রীনন্দনন্দনকে
আমি মনে মনে প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥

২। মঞ্জীর-নুপুররগনব-রত্নকাঞ্চী

শ্রীহারকেশরিনখ-প্রতিঘ্নসজ্জবৎ।

দৃষ্টান্তিহারি-মসিবিन्दু-বিরাজমানং

বন্দে কলিন্দভল্লজাতট-বালকেলিম্ ॥ ২৫ ॥

শকারমান মঞ্জীর ও নুপুরবৃত্ত উজ্জল রত্নকাঞ্চীধারী সংগ্রথিত সিংহনখ-
শ্রেণীর হার-ভূষিত হৃৎখহারক-দৃষ্টিকারী, মসিবিन्दু-শোভিত, যমুনাতীরে
বালকীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥

৩। পূর্ণেন্দুসুন্দর-মুখোপরি কুক্ষিতাগ্রাঃ

কেশা নবীনঘন-নীলনিভাঃ ক্ষুরন্তঃ।

রাজন্ত আনতশিরঃ-কুমুদস্তা যন্ত

নন্দাভুজায় সবলায় নমো নমস্তে ॥ ২৬ ॥

বাঁহার পূর্ণেন্দু-সদৃশ সুন্দর বদনের উপর কুক্ষিতাগ্র কেশকলাপ নবীন
মেঘের নীলপ্রভা বিচ্ছুরিত করত শোভিত হয়, ঘিনি আনতমস্তক, সেই
কুমুদবদন নন্দনন্দনকে বলরামের সহিত বারবার প্রণাম করি ॥ ২৬ ॥

৪। শ্রীনন্দনন্দন-স্তোত্রং প্রাতরুথায় যঃ পাঠেৎ।

তন্মৈত্রগোচরো যাতি সানন্দো নন্দনন্দনঃ ॥ ২৭ ॥

যে মানব শ্রীনন্দনন্দনের এই স্তোত্র প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগাস্তে পাঠ করেন,
নন্দনন্দন সানন্দে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হন ॥ ২৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ,—

৫। ইতি প্রথম্য শ্রীকৃষ্ণং চুর্কাসা মুনিসত্তমঃ ।

তং ধ্যায়ন্ প্রজপন্ প্রাগাঙ্গদর্য্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—মুনিসত্তম চুর্কাসা শ্রীকৃষ্ণকে এইপ্রকারে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে উত্তম বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

[এই অদ্ভুত গোলোকখণ্ড পরমশুভ ; শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নিকুঞ্জমাধো রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধার নিকট ইহা প্রকটরূপে কীৰ্ত্তন করেন । রাধা আমাকে ইহা দান করেন ; আমি সর্বার্থপ্রদ এই উত্তম গোলোকখণ্ড তোমাকে দান করিলাম ও শ্রবণ করাইলাম । বিপ্র ইহা পাঠ করিলে সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন ; ক্ষত্রিয় শুনিলে দাশ্য্য প্রচণ্ড বিক্রম রাজচক্রবর্তী হন ; বৈশ্য শুনিলে ধনপতি এবং শূদ্র শ্রবণ করিলে বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে । জগতে কেহ যদি নিকমভাবে ইহা শ্রবণ করেন, তবে তিনি জীবমুক্ত হন । যিনি ভক্তিভাব-সম্বিত হইয়া ইহা নিত্য নম্যক পাঠ করেন, তিনি প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন ।]

পরমার্থী কে ?

পরমার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ে পূর্বপক্ষ

পরমার্থ কি ?—এই প্রশ্ন অনেকে করিবেন ; অতএব অগ্রেই ইহার উত্তর দেওয়া কর্তব্য । শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অনেকেই মানবগণকে স্মার্ত্ত ও পরমার্থ—এই দুইটা ভাগে বিভক্ত করেন । তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিলে বোধ হয় যে, যাহারা স্মার্ত্ত-বিধিসকল মানেন না, কেবল হরিভক্তিবিলাস-মতে ব্রতাদি ধারণ করেন—তাঁহারা ই পরমার্থী । অল্প কোন স্থানে আমরা এরূপ শুনিয়াছিলাম যে, যাহারা মাংস-ভোজনে বিরত, তাঁহারা ই পরমার্থী ; কোন সময় কোন পুরাতনকল্প লোক বাহুলিধ-সকলকেই পরমার্থ-চিহ্ন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠা করেন । এই প্রকার সিদ্ধান্তদ্বারা মূল পরমার্থ-তত্ত্ব বহুদিবস হইতে আচ্ছাদিত হইয়া আসিতেছে । অতএব ‘পরমার্থ’ শব্দের তাৎপর্য প্রকাশ করিতে আমরা যত্ন করিতেছি ।

‘পরম’ ও ‘অর্থ’ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা ও প্রতি কল্পাই ‘অর্থ’-মূল

‘পরমার্থ’-শব্দে ‘পরম’ ও ‘অর্থ’ এই দুইটি সংযোজিত আছে। ‘পরম’ শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং ‘অর্থ’ শব্দে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। কৰ্ম্ম-মাত্রেরই একটা না একটা নিকট উদ্দেশ্য আছে। বাস করাই গৃহের উদ্দেশ্য; ভোজন করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য; জ্ঞান সংগ্রহ করাই পাঠের উদ্দেশ্য; পুণ্য সঞ্চয় করাই সংকর্ম্মের উদ্দেশ্য।—এই সকল উদ্দেশ্য ঐ ঐ কর্ম্মের অর্থ। যাহাকে এক ‘কর্ম্মের’ অর্থ বলিয়া লক্ষ্য করি, তাহা আবার ‘কর্ম্ম’ না হইয়া অন্য ‘অর্থ’ প্রসব করে। ক্ষুদ্রবৃত্তি আবার কর্ম্মরূপী হইয়া কার্য্যক্ষমতা ও শরীর-পুষ্টিরূপ ফলোৎপত্তি করে।

কর্ম্ম ‘অর্থ’হীন অর্থাৎ উদ্দেশ্য-শূন্য হইলে পরমার্থ হয়

এবস্থি কৰ্ম্মও অর্থ-শূন্যরূপে ক্রমাগত অবশেষে জীবন-যাত্রারূপ একটা ‘অর্থ’কে প্রাপ্তি করায়। জীবন-যাত্রাও পরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ অর্থকে উদ্দেশ্য করিতে পারে। এইরূপ ‘কর্ম্ম’ ও ‘অর্থ’ পর্যায়ক্রমে চলিতে চলিতে অবশেষে যে অর্থ উদয় হয়, অর্থাৎ যে অর্থের কর্ম্মরূপতা ও অন্ত্যর্থ উৎপাদকতা থাকে না—সেই অর্থই পরমার্থ। পরমার্থই সর্ব্ব কর্ম্মের চরমার্থ। যাহারা অর্থানু-সন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা অর্থী। যাহারা পরমার্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পরমার্থী।

অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ

অর্থী ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্যভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ মাত্র। যথা, ভাগবতে—

ধর্ম্মস্ত হ্যাপবর্গস্ত নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থস্ত ধর্ম্মৈকান্তস্ত কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

কামস্ত মেল্লিঃপ্রীতিলীভো জীবতে যাবত।

জীবস্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমধ্বম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।২০-১১)

স্মৃত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! অনেকেই ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম ও কামের ফল স্মৃৎ—ইহা বলিয়া জীবসকলকে ধর্ম্মে প্রলোভিত করেন। কিন্তু পরমার্থী লোক এরূপ নৈকৈতব সিকান্ত করেন না।

অপবর্গ ধর্মই পরমার্থ

তাহারা বলেন যে, আপবর্গ্য ধর্মই ধর্ম। যে-ধর্মের চরমার্থ অপবর্গ অর্থাৎ জীবের স্ব-স্বরূপে পুনরবস্থিতি, তাহাকে আপবর্গ্য ধর্ম বলি। নীতি-ধর্মের ন্যায় ঐ ধর্মের ফল কেবল অর্থ, অর্থের ফল কাম—একুপ নয়। ধর্মচরণে অর্থ অবশ্য উৎপন্ন হইবে এবং উৎপন্ন অর্থ অবশ্য কামকে প্রসব করিবে; কিন্তু কাম প্রসূত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফলকে উদ্দেশ্য করিবে না। অর্থাৎ আপবর্গ্য-ধর্মশীল পুরুষের ধর্ম, অর্থ, কাম সমস্তই জীবন-নির্বাহকরূপে আদৃত হয়। জীবন বঞ্চিত হইলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ পরমার্থ লাভ হইবে। অবয়-জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবন্তত্ত্ব।

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মিজ পরিচয়

আমরা মিজ পরিচয় দিতে গিয়া তিন প্রকারে পরিচয় দিয়া থাকি। যখন স্থূল শরীরের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন স্থূল শরীরটাকে রূপভাবে পাইয়াছি সেই স্থূলভাবই পরিচয়ের বিষয় হয়। আবার স্থূলের অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত হইয়া যে বৃত্ত বা স্বভাব অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করি—ইহাই আমাদের দ্বিতীয় জন্ম বা সূক্ষ্মবৃত্তগত পরিচয়। আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয় ব্যতীত আমাদের আত্মগত পরিচয় আছে। আত্মগত পরিচয় সূক্ষ্মাবৃত্ত হইলেই বৃত্তগত জন্ম এবং সূক্ষ্মাবৃত্ত জীবের স্থূল ভূমিকায় দৃশ্য জগতের বস্তু-অভিমানই স্থূল-সূক্ষ্মাবৃত্ত শৌক্ৰ জন্ম।

বন্ধজীবমাত্রই শৌক্ৰজন্ম লাভ করেন। যে-সকল শৌক্ৰজীবের স্থূল শরীর স্ব স্ব অন্তর্নিহিত বৃত্ত বা স্বভাবে অপরাপর শৌক্ৰজাত জীবের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদেরই সংস্কার আবশ্যক হয়। যাহার সংস্কার আবশ্যক হয় না, তাহারা সংস্কারহীন শূদ্র এবং যাহারা বৃত্তগত পরিচয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাহাদের সমাজ বাল্যকাল হইতেই সংস্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বিজাতি করান। ইহাই বালকের উপনয়ন। আর

ব্যক্তিবিশেষের বয়ঃপ্রাপ্তিতে ন্যূনাধিক বৃত্তগত স্বভাব পরিস্ফুট হইয়া লক্ষণ-
 দ্বারা যে বৃত্ত-পরিচয়ে উপনীত হইবার ব্যবস্থা, তাহা অস্ফুটবৃত্ত বালকের
 উপনয়নমাত্র নহে। এরূপ বৃত্তগত পরিচয় কালে কালে পরিবর্তিত হয়।
 দ্বিজ সংস্কারবহিত হইলে শূদ্রতা লাভ করেন, দ্বিজ বণিক বাণিজ্য-বিনিময়াদি
 পরিত্যাগ করিলে সমাজবক্ষণ, শাসন, করগ্রহণ প্রভৃতি স্বভাবদ্বারা ক্ষত্রিয়
 হন এবং দ্বিজ ক্ষত্রিয় নিজ বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপন, যাজন,
 প্রতিগ্রহ প্রভৃতি স্বভাবদ্বারা ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া
 ক্ষত্রিয় হন, বণিক-স্বভাব স্বীকার করিয়া বৈশ্য হন; ক্ষত্রিয় ও বণিক-স্বভাব
 গ্রহণ করিয়া বৈশ্য হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজাতি ভূতক
 হইয়া শূদ্রতা লাভ করেন। ভূতক শূদ্র ভূত্য-স্বভাব ছাড়িয়া দ্বিজ-স্বভাব
 গ্রহণ করিলে দ্বিজ হইতে পারেন এবং সংস্কার গ্রহণ করেন। ‘অষ্টবর্ষে
 ব্রাহ্মণের উপনয়ন’ এই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা ব্রাহ্মণের শুভাশুভায়ায়ী স্থূল
 শরীরগত সমাজে অভিলাষমাত্র। অনেক সময়ে সেই অভিলাষ ভবিষ্যতে
 পূরণ না হইতেও পারে। কিন্তু গুণকর্মদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব পরিস্ফুট
 হয়, তখন গুণকর্মদর্শী বিজ্ঞ আচার্য্য লক্ষণদ্বারা বর্ণনির্ণয়-বিচার
 পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শৌক্য-পরিচয়ের প্রস্তাবিত বর্ণদ্বারা
 ব্যক্তিবিশেষের বর্ণবিধান করেন না। তাঁহার স্থূল শরীরের ধর্মকাল অতিক্রান্ত
 হইয়াছে বলিয়া গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোময়ন, জাতকর্ম, নামকরণ,
 নিষ্কামণ, অন্নপ্রাশন, চোড়, কর্ণভেদ মন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন করিতে পরাজু্য হন এবং
 মূর্ত্যবশে তত্ত্ব সংস্কারোচিত চিহ্নাদি-ধারণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন।
 বয়োব্যবস্থাকাল অতিক্রান্ত হইলেও তত্ত্ববৃত্ত-যোগ্যতা লক্ষিত হইবার পরেও
 সংস্কার-চিহ্নাদি দেওয়া হইবে না বলিয়া মিথ্যা ওজর আপত্তি উত্থাপন করেন।
 বৃত্তবিচার অনেক স্থলে না হওয়ায় উপনীত দ্বিজকে ভূতকের কার্য্য করিতে
 দেখা যায়। ভূতকের কার্য্য দোষাবহ কি গুণাবহ, তাহার বিচার পর্য্যন্ত
 বিলুপ্ত হইতেও দেখা যায়। ভূতককার্য্যে নিপুণ মন্ত্রজীবী, ভাগবত-জীবী,
 অর্চন-জীবী দেবল শাস্ত্রালোচনার ভার বহন করিয়াও ভূতককার্য্যের দোষ
 বুদ্ধিতে পারেন না ও তাদৃশ শূদ্রোচিত ব্যবস্থা অবাধে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া
 মুখের চক্ষে ঐন্দ্রজালিকের তায় ভ্রান্তি উৎপন্ন করেন। বেদের অঙ্কশাসন
 না মানিয়া স্মৃতির বিধি উৎসাদিত করিয়া শাস্ত্রীয় কথা গোপনপূর্বক উচ্চ
 দ্বিজাতি হইতে নামিয়া আসিয়া সংস্কারহীন শূদ্র বা ভূতক হইতে লজ্জাবোধ
 করেন। আর প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির লক্ষণসমূহ দেখিয়া শুনিয়াও নীচ

স্বার্থবলম্বনে মতের অমর্যাদায় সিদ্ধহস্ত হন—ইহারই নাম কলিকাল বা সত্য-বিপর্যয়ের ভূমিকা। বৃত্ত বা স্বভাব-দর্শনে বর্ণ নির্দেশ করিতেও উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যিক। তাহা অষ্টবর্ষ প্রভৃতি কালের দ্বারা আবদ্ধ নহে। যেরূপ প্রাপ্তবৃত্ত ব্যক্তির শৌক্য বালক সন্তানকে জ্ঞানের অভ্যাসে অষ্টবর্ষেই উপনয়ন প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা, সেরূপ বৃত্তবিচারক্রমে যে কোনকালে বাজসনেয়ি-শাখার কাত্যায়ন সূত্রানুসারে সংস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। তবে শৌক্য-পদ্ধতিতে বর্ষের বিচার অবশ্যই গ্রহণীয়। শৌক্যজন্ম বা সাবিত্র্যজন্মের দ্বায় ব্রাহ্মণের তৃতীয় জন্ম আছে। উহাই দৈক্ষ জন্ম। আর অবরোহ-বাদ্যবলম্বনে দৈক্ষের উত্তরকালে সাবিত্র্য-বিধানের ব্যবস্থা বেদের শাখা-বিশেষেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ নিজ শাখার কথা অপরা-শাখানিপুণের প্রতিবাদের বিষয় হওয়া উচিত নহে—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। একাঙ্গন শাখা-বিরোধী শ্রীঅপ্যয়দীক্ষিতাদির কুমত বিশিষ্টভাবে কান্দীরাগম-বিচারেই খণ্ডিত আছে।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

নিষ্ঠাবান গুরুবৈষ্ণবের পক্ষে সংস্কারবিহীন অদীক্ষিত
ব্যক্তির পাচিত অনগ্রহণ অনুচিত; শিষ্যের পক্ষে
গুরুপাদপদ্মের বিচারধারা গ্রহণ ও তদনুকূল
আচরণ কর্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা

পোঃ—চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং—৩১/৩/৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

* * * প্রভো! আপনার ২২/৩/৬৩ তারিখের পত্র ২৪/৩/৬৩ তাং নবদ্বীপে বিলি হইয়াছে। আমি তাহার পূর্বেই চুঁচুড়ায় আসিয়াছি। বামন মহারাজ আপনার পত্র লইয়া ২৭/৩/৬৩ তাং আমাকে দিল। সেইদিন ১৩ই চৈত্র বুধবার। সুতরাং আপনাকে পত্র দিলে ১৫ই চৈত্র তারিখের পূর্বে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সুতরাং আপনাদের * পড়ুয়ার বাড়ীতে তাম্রলিপ্ত নমিত্তির অধিবেশনে যোগদান করা সম্বন্ধে আমার কোন সতামত দিবার সুযোগ হয় নাই। তবে এই সম্বন্ধে আমি পূর্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, আপনারা অধিবেশনে যোগদান করিবেন এবং * মহারাজের দীক্ষিত ব্যক্তিকে সংস্কার না দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিবেন এবং আপনারা সংস্কারহীন অদীক্ষিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য অল্পগ্রহণ করিবেন না।

বাসন-পত্রাদি দিয়া সহায়ভূতি করিতে কোন আপত্তি নাই। কারণ আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারাই নিরামিষ খাওয়া হইলে কোন দোষের হইবে না। তবে আপনারা আমার পত্র না পাওয়া সত্ত্বে আমার পূর্বকথিত উক্তপ্রকার নিয়ম পালন করিয়াছেন কিনা জানাইবেন। গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুকেও আমি এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। আপনারা কি করিয়াছেন, আমাকে জানাইবেন।

দ্বিতীয় কথাটির উত্তর এই যে—অর্থাৎ * মহারাজ আমাদের নবদ্বীপ মঠের হোম করিলেন কেন? তৎসম্বন্ধে আমি সঠিক সংবাদ জানাইতেছি—

* মহারাজকে শ্রোতী মহারাজ আমার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া হোমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি নিযুক্ত করি নাই। আমি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রবেশ করিলাম, তখন * মহারাজকে হোমের ওখানে বলিয়া স্থতিবাচন পাঠ করিতে শুনিলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রোতী মহারাজ ছিলেন। আমি তখনই শ্রোতী মহারাজকে বলিলাম,—আপনি কেন * মহারাজকে হোমের কার্য্যে বনাইলেন? তিনি ত’ প্রভুপাদের আচার-বিচার মানেন না। আমি একরূপ ব্যক্তির দ্বারা হোম করাষ্টতে হুচ্ছা করি না। আপনি জানেন, আমি এদব বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকি।

তখন শ্রোতী মহারাজ আমাকে বলিলেন,—আপনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন কেন? আমি তদুত্তরে বলিলাম,—আমি * মহারাজকে নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি যেকূপ আপনাদিগকে পৃথক পত্র দিয়াছি, * মহারাজকে সেরূপ পত্র দিই নাই। মামুলী ছাপান পত্র সকলের নিকট পাঠান যেকূপ হয় সেইরূপ হয়ত পাঠান হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমি জ্ঞাত নহি।

তবে আমি শুনিতে পাইলাম, * মহারাজ কালনাথ তাহার বার্ষিক উৎসবের সময় আমার অবিচ্ছিন্ন নবদ্বীপ হইতে একটা তাঁবু ও শামিয়ানা লইয়া গিয়াছিলেন এবং যখন উহা ফেরৎ দিয়া যান, তখন বামন মহারাজ

ভদ্রতা করিয়া * মহারাজকে পরিক্রমা ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিতে বলেন। তদনুসারেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে স্পেশাল অর্থাৎ বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র দিই নাই।

শ্রোতী মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন,—আমি ত' ইহা জানি না। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে হোম করিবে? আমি তখন বলিলাম,—পণ্ডিত রাঘবচৈতন্য হোম করিবে। তিনি তখন গভর্মন্দির হইতে বারান্দায় আসিয়া * কে স্বস্তিবাচন হোম ইত্যাদি করিবার জন্ত বদাইয়া দিলেন। আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন, হোমের নিকটে * মহারাজের বামপার্শ্বে রাঘবচৈতন্য বসিয়া হোম করিয়াছে। সংক্রিয়ানার-দীপিকাগ্রন্থ উভয়ের হস্তেই ছিল।

তৎপরে * মহারাজের দ্বারা কোন কার্যই করান হয় নাই। গঙ্গাজল ও পঞ্চামৃতে অভিষেক ও স্নান ইত্যাদি আমি স্বয়ংই করিয়াছি। বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মন্দিরের অভ্যন্তরে আমি করিয়াছি। শ্রোতী মহারাজ পৌরহিত্য করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ মন্দিরের দারোদঘাটন করিয়াছেন। * মহারাজ পৃথক্ ঘরে বসিয়া একাকী প্রসাদ পাইতেছিলেন, তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম,—আপনি সমাজে না বসিয়া একঘরে হয়ে প্রসাদ পাইতেছেন? তাহার পর চলিয়া আসিলাম। * মহারাজ প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমায় সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান নাই।

তথাপি আমরা তাঁহার কল্যাণ কামনা করি অর্থাৎ তিনি যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং তদনুসারে আচরণ অবলম্বন করিতে পারেন, তজ্জন্ত চেষ্টিত আছি। এমনকি, বামন মহারাজ তাঁহার সঙ্গে আমাদের মঠের কথা আলোচনা করেন, তজ্জন্ত তিনি আমাদের মঠের আচার-বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং আমাদের ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’র নিরপেক্ষতার প্রশংসা করিয়া গৌড়ীয়-পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ দিয়াছেন। আমরা গৌড়ীয়-পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি ও করিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন। তিনি পণ্ডিত লোক এবং লেখালেখির বিষয়ে বিশেষ সুপটু। তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

গৌরগোবিন্দ প্রভু অনেকদিন নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি বাতের চিকিৎসা করিবেন—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন কিনা ও তাহার শরীর কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবেন।

ভেটুরিয়ার আপনার একটা জমি বিক্রয় করিয়া পিছলদায় জমি কেনার কথা ছিল। তাহার কি হইল জানাইবেন। আমি সুন্দরবনে প্রচারে যাইব। তথা হইতে ফিরিয়া আসাম যাইব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবানুগমনে

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠার পর]

“কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্বদা আসক্তি।

কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্বদা বসতি ॥” (১৫: ৫: মঃ ২৩/৩১)

শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীমথুরা ধাম-প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ দিগদর্শন করিতেছি।

শাস্ত্র বলেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মথুরায় তত্রাপি রাসোৎসবান্

বৃন্দারণ্যমুদারপানি-রমণান্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ ।

রাধাকুণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্রাবনাং

কুর্ধ্যাদস্ত বিবাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥

“বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা “মথুরা”-নগরী।

জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥”

সেই মথুরা-নগরীর কথাই এখানে আসিতেছি। ‘মথুরা’ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিৎ ও ঐতিহাসিকগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। মথুরা-নগরীর ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ছ’ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রজ্ঞান, তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ। ঝারকালীলার অবসানে ষড়বংশ লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গেলে বজ্রনাভ ও তাঁহার মাতা উষাদেবী হস্তিনাপুরে আগমন করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পূর্বে বজ্রনাভকে শূরসেন-রাজ্যে (মথুরামণ্ডলে) অভিষিক্ত করেন। মুনি-ঋষিগণের আদেশক্রমে বজ্রনাভ চৌরাশী ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাস্থলীর মধ্যবর্তী গ্রামসমূহের লীলাভূমায়ী নামকরণ করেন। অত্ৰাপিও গ্রামসমূহের সেইসব নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে।

বজ্রনাভ শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, শ্রীকেশবদেব, শ্রীহরিদেব, গোপালজীউ (শ্রীনাথজী), সাক্ষীগোপাল, বৃন্দাদেবী ও মহাদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তিকালে ভারতে ক্ষাত্রশক্তি ক্ষয় পাইতে থাকে এবং দেশ বহুরাজ্যে বিভক্ত হইয়া বিপুলতা উপস্থিত হয়। এই দুর্বলতার সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ক্রমে ক্রমে ভারতে প্রবেশ করে। শক, হুণ, গ্রীক আক্রমণের পর জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় হয়। পরে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবেশ করে। ১০১৮ খৃঃ মামুদ গজ্জনী কাবুল হইতে আশিয়া মখুরা আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। পাঠান-বংশীয় ফিরোজ শাহ চতুর্দশ খৃঃ মখুরা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে।

এরপর ১৫২৬ খৃঃ পানিপথের যুদ্ধাবসানে মোঘল বংশীয় সম্রাটগণ দিল্লী অধিকার করে। তাহাদের সময়ে আবার মথুরা-নগর নির্মিত হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে ১৫২৭ সালে কুরুদাস কপূর, শ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির নির্মাণ করেন। ১৫২০ সালে রাজা মানসিংহ-কর্তৃক শ্রীগোপীনাথের মন্দির নির্মিত হয়। ১৬১০ সালে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে বীরসিংহদেব বহু অর্থব্যয়ে আদিকেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। পুনরায় ১৬৬৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব-কর্তৃক উক্ত মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়। আদিকেশবের মন্দির যে-স্থানে ছিল ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে সে-স্থানে বাহ্যদর্শনে মন্দিরাদির কোন অস্তিত্ব ছিল না। কেবল ভগ্নাবশেষ ও উচ্চ ভিটামাত্র দৃষ্টিগোচর হইত। তাহারই নগ্নস্থানে বিপুলাকার এক মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ঐ মসজিদ এখনও বর্ত্তমান আছে।

বর্ত্তমানে যে আদিকেশবের মন্দির আছে, তাহা গোয়ালিয়রের জমিদার-কর্তৃক ১৮১০ খৃঃ নির্মিত হয়। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের সময় শ্রীনাথজী গোপালদেব রাজপুতনার নাথদ্বারে চলিয়া যান। ১৬৭০ খৃঃ জয়পুরের মহারাজার সাহায্যে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধা-দামোদর, গোকুলানন্দ, শ্রীরাধাধর্ম-বিগ্রহাদি জয়পুরে গমন করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমদনমোহনজীউ করৌপিতে অবস্থান করিতেছেন।

এইসকল বিগ্রহগণ আর বৃন্দাবনে বা মথুরামণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাহাদের প্রতিভূ বা প্রতিমূর্তি দিল্লী-অধিপতি মহম্মদ শাহের সময়ে ১৭৪৮ খৃঃ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়। ১৭৫১ সালে নাদির শাহ মথুরা আক্রমণ করে এবং তাহার সেনাপতি আমেদ শাহ ছবানী মথুরায় ঔরঙ্গজেবের পর যাহা কিছু

অবশিষ্ট ছিল সমুদয় ধ্বংস করে। এই প্রকারে মথুরা-সহর চারিবার মুসলমান-কর্তৃক ধ্বংস হয় এবং চারিবারই হিন্দুগণ মথুরা-সহর নির্মাণ করেন। বর্তমানে বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ ও মদনমোহনের যে মন্দির আছে, তাহা কলিকাতার শ্রীনন্দকুমার বসু-কর্তৃক ১৮১৯ খৃঃ নির্মিত হয়।

শ্রীরামায়ণ-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্তায় তুষ্ট করিয়া মথুরা বা মধুপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা হৃদ্যক মধুদৈত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাভারতের যুগে প্রবল যদুবংশীয়গণ আধিপত্য লাভ করেন। পিতা উগ্রদেনকে পরাজিত করিয়া কংস মথুরার রাজা হইয়াছিল। এর পরবর্ত্তী ঘটনা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিবৃষণ)

শ্রীব্যাসপূজা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর]

যদি কেহ বলেন, আমার গুরুদেব 'সর্বজ্ঞ', তাই তিনি পাঁচজনকে পাঁচ প্রকার মন্ত্র দিতে পারেন। তাহার উত্তরে বলা যায়, উহা দীক্ষা-শিক্ষা নীতি নহে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একজন শিক্ষক একই সময়ে পাঁচটা শ্রেণীতে পাঁচটা বিষয়ে পড়াইতে পারেন না। তাই সমরকে ভাগ করিয়া শিক্ষকের সুবিধার্থে পাঠের বিষয় বিচারপূর্ব্বক প্রধান-শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। যদি কোন শিক্ষক পাঁচবারে পাঁচটা শ্রেণীতে একাই পাঁচটা বিষয় শিক্ষা দিতে চাহেন, তবে অপর শিক্ষকের কোন বিষয়ের বিশেষত্বকে অস্বীকার করা হয়। কোন নির্দিষ্ট শিক্ষকের গুরুপন্থিত্তিতে প্রধান-শিক্ষক বা তাঁহার অপর সহকারী পাঠ্যক্রম চালাইয়া লইতে পারেন, সে কথা স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবগুরু শিবাদি দেবতার নিন্দা করিবেন না, নিত্য বন্দনাও করিবেন না। শিবাদি দেব-মন্দিরে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকারের মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়া কৃষ্ণভক্তি বর প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিবেন।

সৌর-শিবাদি মন্ত্রের উপদেশককে সৌর, শাক্ত, শৈব বলা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দের তক্ত বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণ ।

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তান্তে তু ভাগবতা মতা ।

সৰ্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন তক্তা জনাৰ্দনে ॥

যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁহারা শূদ্র নহেন । শাস্ত্র তাহাদিগকে ‘ভাগবত’ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও যদি জনাৰ্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করেন, তবে তাঁহারা শূদ্র ।

ষট্‌কৰ্ম্মনিপুণো বিপ্রো মদ্র-তদ্র-বিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্ত্রাঈষ্ণবঃ স্বপচো গুরুঃ ॥

যজ্ঞন, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কৰ্ম্মনিপুণ এবং মদ্রতদ্র-বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না ; কিন্তু চণ্ডালরূপে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য । বৈষ্ণবই সৰ্ববর্ণাশ্রমীর গুরু,—

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্ ।

শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি । কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব । বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য ।

উপনীয় তু যঃ শিষ্ঠাং বেদমধ্যাপয়েদ্ভিঃ ।

সঙ্কল্পং সরহস্তঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥

যে ব্রাহ্মণ শিষ্ঠকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিজ্ঞা ও উপনিষদ্ সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত করেন ।

উক্তের নিকট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের পরিচয় করাইতেছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবশ্যেত কৰ্হিচিং ।

ন মৰ্ভাবুকাংসুয়েত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কথা আচার্য্য গুরুদেবকে ‘মাং বিজানীয়াৎ’ মৎস্বরূপ, আমাকে জানিবে । ‘আমিই আচার্য্য’ ইহা বলার অভিপ্রায় নহে । হইলে ‘আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ’ না বলিয়া ‘অহমেবাচার্য্য’ বলিতে পারিতেন ।

প্রিয়ত্রে অভেদক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি ভরসা করিয়া বলিতে পারেন,—
 তিনি ও আমি, আমরা এক। ‘এক’ শব্দে ‘এ’ স্বরবর্ণ, ‘ক’ ব্যঞ্জনবর্ণ।
 একটির উচ্চারণ নিরপেক্ষ, অপরটি স্বরবর্ণের আপেক্ষিক। ‘নিরপেক্ষ’ মানে
 নিশ্চিতরূপে অপরের জ্ঞান অপেক্ষা যাহার গৌরবোজ্জ্বল, চমৎকার। স্বরবর্ণ
 ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারণ করাইয়া গৌরবান্বিত, ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্যে
 উচ্চারিত হইয়া ধ্বনি, কৃতার্ব। একটা আশ্রয়, অপরটি আশ্রিত।

ভক্তশ্রেষ্ঠ জগদগুরু আচার্য্য সমগ্রজীবকে লইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের
 আশ্রয়ে স্থখী হইতে চাহেন। শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ ভক্ত সদ্গুরুর আশ্রয়ে স্থখে
 থাকেন। সদ্গুরুর ভাবনায়,—আমি কিছু পাইলে উহা শ্রীভগবানে সমর্পণ
 করিব। শ্রীভগবানের ভাবনায়,—সদ্গুরুকে কেহ কিছু দিতে চাহিলে, আমি
 উহা অবশ্যই পাইব। সদ্গুরু জানেন,—শ্রীভগবান্ই একমাত্র উপযুক্ত
 ভোক্তা, আমাদের সেবাচেষ্টা তাঁহার প্রিয়ভোগের উপকরণ। শ্রীভগবান্ও
 জানান—‘তম্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং’। দানের বস্তু যদি কিছু থাকে,
 সদ্গুরুকেই দিবে, তাঁহার নিকট হইতেই উপদেশ লইবে। কারণ সদ্গুরুর
 নিজেকে ভোক্তা ও আরাধ্যাভিমান নাই। তিনি সর্বদাই শ্রীভগবানের
 সেবকাভিমানী—নিত্যপার্বদ—আরাধক—গুরুজীব। শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখ হইতে নিজে
 বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চক কর্মফলবাধ্য বহিস্মৃথ জীব নহেন বলিয়া গুরুকে
 সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করিতে নিষেধ। গুরুকে মর্ত্যমনুষ্য বুদ্ধি না করিতে
 সতর্কতার কারণ? সর্পে রজ্জুভ্রম বা রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু
 অশ্বখবৃক্ষের ভ্রম হইতে পারে না। গুরুকে কখনও মনুষ্যবুদ্ধি হইতে পারে,
 তজ্জন্য সতর্কতার উপদেশ। কিন্তু গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ অথবা
 শ্রীরাম—একপ বুদ্ধি হওয়া সাধু-সজ্জনের পক্ষে অসম্ভব।

‘সর্বদেবময়ো গুরুঃ’ অংশে গুরুদেবই ব্রহ্মা, গুরুদেবই বিষ্ণু, গুরুদেবই
 মহেশ্বর এবং গুরুদেবকেই পরমব্রহ্ম বলিলে, আরাধক ব্রহ্মা ও শিবকে
 আরাধ্য পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ সদাশিব বিষ্ণুতত্ত্বকে সমান বিচার
 করার অপরাধে পাষণ্ডী আখ্যায় নারকী হইতে হয়।

তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব কি করিয়া সর্বদেবময় হন? তাহাই বিচার্য্য।
 পূর্বে বলিয়াছি, রেখা একাধিক বিন্দুর পাশাপাশি অবস্থান। বৃত্তস্থ
 কেন্দ্রবিন্দুগামী ব্যাস-নামক সরলরেখাও বহু বিন্দুর সমষ্টি। এই বিন্দুগুলির
 অবস্থান বৃত্তস্থ বিন্দু হইতে পৃথক্। ব্যাসস্থ বলিয়া প্রতিটিই গুরুপদবাচ্যের
 একে অপরের সহায়ক। বৃত্ত হইতে কেন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত এবং কেন্দ্রবিন্দু হইতে

বৃত্ত পর্য্যন্ত বিন্দুগুলি পর পর দরল রেখাক্রমে ব্যাসের সম্পূর্ণতা। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সনাতন ধর্মের অন্তান্ত গুরুবর্গ। তন্মধ্যে 'হরিভক্তি আছে যার, সর্বদেব বন্ধু তাঁর।' বৈষ্ণবগুরুই সর্বদেবময়—

যশাস্তি ভক্তিভগবতাকিঞ্চন। সর্বৈশ্বর্যৈশ্বর্য সমাসতে স্বরাঃ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা মনোরথেনাস্তি ধাবতো বহিঃ ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে ঘাহার নিকাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাহাতেই সমাগ্ররূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি অশ্রীতিলাষ, কর্ম-জ্ঞান-যোগবৃত্ত বা গৃহাসক্ত। স্বতরাং তাহাতে কেবলাভক্তি নাই। মনোদর্শনের দ্বারা সে অসং বহির্বিষয়ে ধাবিত। তাহাতে মদেগুণসমূহের সম্ভাবনা কোথায়? গীতায় 'কামৈশ্তৈশ্তৈ হতজ্ঞানা প্রপদন্তে অন্তদেবতা' বাক্যে দেখা যায়,—কামনা-বাসনার দ্বারা আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে জীব কৃষ্ণেতর ব্রহ্ম-শিবাদি দেবদেবীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র দৈশ্বরবুদ্ধিতে শরণাগত হয়। 'আব্রহ্মভূবনাং লোকাঃ পুনরাবুত্তিমোহজ্জুন'—উপদেশে জন্ম-কর্ম-মৃত্যুর অকিঞ্চিৎকরতা দর্শাইয়া 'বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদন্তে' বাক্যে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতির পরম উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন। শিবানীর প্রতি শিবের উপদেশ,—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি, তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

অর্থাৎ স্বর্ঘ্যাদি আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবের আরাধনা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু হে দেবি! 'তদীয়ানাং সমর্চনম্,' অংশে 'তৎ' মানে? সেই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর আরাধনা কেহ না করিলে 'তদীয়' হইতে পারে না। 'সমর্চনম্'-শব্দে সম্যকরূপে অর্চন। অর্থাৎ সর্বোপরে বৈষ্ণব-গুরুর অর্চন এবং তাঁহার আছুগত্যে বা শিক্ষায় বিষ্ণুর আরাধনা। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব-গুরুর শিক্ষায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আছুগত্যে বিষ্ণু-আরাধনা 'সম্যক'—সর্বোৎকৃষ্ট আরাধনা পদ্ধতি।

সনাতন-ধর্মের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রবিন্দু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'অদ্বিতীয়' শব্দে 'ন তৎ সমশ্চ অধিকশ্চ দৃশ্যতে' 'ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' 'ও কৃষ্ণ বৈ সচ্চিদানন্দধনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ হা উ কশ্বাদিমূলং' প্রভৃতি সিদ্ধান্তে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয়। তাঁহার বিলাসমূর্তি নারায়ণ বা বিষ্ণু অথবা রাম-নৃসিংহ

প্রভৃতি লীলাবতার কেহ অংশ এবং কেহ বা অংশের অংশ কলা,—‘এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।’ সনাতন ধর্ম্মে শ্রীভগবানের বিভিন্নরূপ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয়ত্ব বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে ধর্ম্মনাশে যে-সকল কথা চলিতেছে, তাহার কতকগুলি সনাতন-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, আর কতকগুলি সনাতন ধর্ম্মের পরিচয় দিতে চাহে; যেমন—‘ঈশ্বরের যতক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।’ কোন কোন ধর্ম্মে ‘নরবপু তাঁহার স্বরূপ’ বাক্যাংশের অস্বাভাব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের সর্বোত্তম নরলীলা, খেলা ও খেলার সাথী স্বীকৃত হয় নাই। নেইজ্ঞ ‘অদ্বিতীয়’ আখ্যায় ও অযোগ্য।

‘একমেব’-শব্দে সনাতন ধর্ম্মের আদি-মধ্য-অন্ত্যে ‘নং’ বস্তুবিষয়ে ত্রিসত্য অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করায়। ‘এমেব মাতা চ পিতা তুমেব’ ‘জনক-জননী-দায়িত-তনয়। প্রভু-গুরু-পতি তুই সর্ব্বময়।’ প্রভৃতি ভক্তের প্রার্থনায় শ্রীভগবানের নিত্যলীলার বর্ণনা। ‘সর্ব্বময়’-শব্দে প্রাচুর্য্যার্থে ও বস্তুনির্দেশার্থে ‘মণ্ট’ প্রত্যয়। প্রাচুর্য্যার্থে যেমন—লোচনময়, জলময়, বালুময়, অরণ্যময় প্রভৃতি। বস্তু নির্দেশার্থে—‘হিরণ’ স্বর্ণের যাহা চিহ্নায়, ‘মৃৎ’ মাটির যাহা মৃন্ময়, ‘চিৎ’ অপ্রাকৃত-অজড়-চেতন বস্তুর যাহা ‘চিন্ময়’। কিন্তু শ্রীভগবান্ ‘সর্ব্বময়’। সেই সর্ব্বময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূদ-সম্বর্ষণ হলধর শ্রীবলদেব প্রভুর পুরুষরূপে প্রকাশ। তাঁহা হইতে চতুর্ভূজ গদা-শঙ্খ চক্র-পদ্মধারী বাসুদেব, গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধারী নৃসিংহ, চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মধারী প্রহ্লাদ ও চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মধারী অমরকন্দের প্রকাশ। দ্বিতীয় চতুর্ভূজ সম্বর্ষণের নদাশিব তত্ত্ব হইতে কারণাক্ষিপায়ী মহাবিশ্ব প্রথম-পুরুষ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় মায়া-প্রকৃতির সাহায্যে অমল্য ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। সেইসকল ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ত্তোদকশায়ী বিষ্ণু ও স্রষ্টা অবতার। “বৈকুণ্ঠ-জগতে হয় সবার অবস্থান। মর্ত্ত্যে অবতরি ধরে অবতার নাম ॥” অবতার ছয় প্রকার—(১) পুরুষাবতার—প্রথম-পুরুষ কারণাক্ষিপায়ী বিষ্ণু, দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ত্তোদকশায়ী বিষ্ণু ও তৃতীয়-পুরুষ জীবান্তর্ধামী ক্ষীরাক্ষিপায়ী বিষ্ণু—এই পুরুষত্রয়। (২) যুগাবতার—চারিযুগে শুরু (হংসমূর্ত্তি), রক্ত (যজ্ঞমূর্ত্তি), কৃষ্ণ (নন্দনন্দন), পীত (জগন্নাথ-সুত গৌরহরি)। (৩) মহান্তরাবতার, (৪) গুণাবতার—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণাদিত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর—হৃষ্ট, স্থিতি (পালন) ও সংহারার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। (৫) লীলাবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দশরথী রাম, বলরাম, বুদ্ধদেব (শাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন) ও কল্কি। (৬)

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু ও ব্যাস । সমস্ত অবতারের অবতারী বা উৎস মূল-সদ্বর্ষণ বলদেব প্রভু । ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, গৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপাৰ্শদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল-গুরুতত্ত্ব । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় গুরুষ্টকের সপ্তম স্তবকে—

সাংস্কারিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈক্যকল্পতথা ভাব্যত এব সক্তিঃ ।

কিন্তু প্রভোর্থ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাংস্কার্য হরি বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন, সাধু-সজ্জনগণও তাহাকে তজ্রাই জানেন ; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জন । আমি সেই গুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি । শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রিয়জন ? কক্ষ তাহাই তাঁহার প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

ন চ সদ্ধরণে ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

হে উদ্ধব ! ব্রহ্মা, সদ্বর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমিও আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয় ।

মোদ্ধবোহবপি ময়ানো যদুগ্ধৈর্নৈর্দিতঃ প্রভুঃ ॥

আম্মা হইতে উদ্ধব কিঙ্কিমাত্রও ন্যূন নহেন ; যেহেতু ইনি গোস্বামী—জড় বিষয়দ্বারা স্কন্ধ হন না ।

“গচ্ছোদ্ধব, ব্রজং সৌম্য ।”

হে সৌম্যদর্শন উদ্ধব ! তুমি ব্রজে গমন কর । বাক্যে মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসীগণের এবং ব্রজবিরহকাতর কৃষ্ণের মাথে সন্দেশ বার্তার যোগ্য বাহক ।

নেই উদ্ধব হইতেও ব্রজবাসিগণ শ্রেষ্ঠা । উদ্ধবও ব্রজদেবীগণের চরণবৎ প্রার্থনা করেন,—

আনামহো চরণবৎ জুগামহং স্রাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মগতোষধীনাং ।

যা দ্রুতাজং স্বজনমার্ধ্যপথক হিত্বা

ভেজুম্ কৃন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমুগ্যাম্ ॥

অহো ! আমি যেন ব্রজহৃদরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্মগতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি । যেহেতু তাঁহারা দ্রুতাজা স্বজন ও মার্ধ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন ।

ব্রজগোপীগণ ব্রহ্মা, শিব ও নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীরও শ্রেষ্ঠা—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা কদ্রুশ্চ পার্থিব ।

ন চ লক্ষ্মী ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো যম ॥ (আদিপুরাণ)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জুন ! ব্রহ্মদেবীগণ মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ—এ সকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম ।

তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে শ্রীরাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা,—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তম্ভাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।

সর্বগোপীযু নৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ড ও তাহার সেইরূপ প্রিয়স্থান । সমস্ত গোপীগণের মধ্যে রাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা ।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বেশ্বরের স্বরূপ, শ্রীমতী রাধাও তেমনই সর্বেশ্বরের স্বরূপী । অগ্নি ও তাহার দাহিকায় যেমন ভেদ নাই, সূর্য্য ও তাহার কিরণে যেমন ভেদ নাই, মুগমদ কস্তুরী ও তাহার গন্ধে যেমন ভেদ নাই, তেমন সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ হইতে মূখ্য শক্তি রাধারও ভেদ নাই । শ্রীকৃষ্ণের সেবাস্বত্বের ক্ষমতা সখীরূপা গুরু বা সখীর দানীরূপা মঙ্গরী গুরুতর রাধার বামে থাকেন । সদগুরুর ভাবনায় মাধুর-বিরহকাতর ব্রহ্মদেবীর চরণেগুই চরম আকাজক্ষার বিষয় ।

গোপী আশ্রয়ত্যা বিনা কেবল ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ।

ভজিলেহ নাহি পায় ব্রহ্মজ্ঞানদানে ॥

‘শ্রীরাধার কৃপা বিনা যুগলের সেবা ।

বল না কোনকালে পাইয়াছে কেবা ॥’

কিন্তু শাস্ত্রেই আছে,—গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

অর্থাৎ গুরুর মাধ্যমেই কৃষ্ণের কৃপা শিষ্টের নিকট পৌঁছে এবং শিষ্ট গুরুর কৃপাতেই কৃষ্ণের নিকট পৌঁছিয়া যুগলসেবার অধিকার পান । তাই বলিয়া সদগুরু শিষ্টের নিকট ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন এবং শিষ্টও সদগুরুর নিকট কৃষ্ণভোগ্য রাধা নহেন । ‘গুরুই কৃষ্ণ’ বিচার যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ‘শিষ্টই রাধা’ তদ্রূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিরোধী । গুরুই কৃষ্ণ, উপদেশে যেমন কৃষ্ণকে দূর করিয়া গুরু শিষ্টের ভোক্তা হয়, তেমন শিষ্টই রাধা-বিচারে কৃষ্ণের নিত্য-সহচরী রাধাকে দূর করিয়া শিষ্ট ভোগ্যের অধিকার চায় । মাধু-সজ্জনগণ এ দুই শ্রেণীকেই দুঃসঙ্গ জানিয়া বর্জনপূর্ব্বক ‘যুগলমুরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়’—উপদেশক সদগুরুর গুরুভক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

উপদিষ্ট শিল্পের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলসেবার পূর্বেই শ্রীগুরুদেবের অর্চন করিবেন। যেহেতু ‘মন্ত্রমূলং গুরুমন্ত্র, পূজা মূলং গুরুপূজা।’ গুরুর চরণে তুলসী অর্পণ সম্বন্ধে শ্রীঅনন্তসংহিতার সিদ্ধান্ত,—

তুলস্তা বিষয়ং তবং বিষ্ণুঃস্ব সমর্চয়েৎ ।

না দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা ॥

অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্তপদে সমর্পয়েৎ ।

অর্পণে তদ্বহানিঃ স্তাৎ সেবাপরাধ এব চ ॥

অতবজ্জন্ত পাষণ্ডো গুরুক্রবস্ত্র পাদয়োঃ ।

অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জয়েন্নরকং পদম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণবল্লভা তুলসীদ্বারা বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণুর সম্যক্ অর্চন করিবে। অতএব বৈষ্ণবী তুলসীদেবীকে আশ্রয়বিগ্রহ গুরুর চরণে কখনও অর্পণ করিবেন না। অর্পণ করিলে তদ্বিসিদ্ধান্তের হানি হইবে এবং সেবাপরাধ ঘটিবে। অতবজ্জন্ত পাষণ্ড গুরুক্রবের পদে তুলসী অর্পণে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।

শ্রীমতী রাধারাণীরও চরণে তুলসী অর্পণে নিষেধ,—

পূর্ণাশক্তি-স্বরূপা চ শ্রীমতী বার্ষভানবী ।

বৈভবকপিণী তস্তা বৃন্দাদেবী প্রকীর্তিতা ॥

মিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেব্যতে বার্ষভানবীম্ ।

অন্তোন্তমেধ বিশ্রুতভাবস্তয়োবস্থিতঃ ॥

দন্ত্যাং শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রীদেব্যোঃ করপল্লবে ।

স্তব্বো হি বৈষ্ণবো মিত্যং পাদয়োর্ম কথঞ্চন ।

মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্ত ভবেত্তদ্রাপরাধবান্ ॥

পূর্ণাশক্তি-স্বরূপা শ্রীবৃষভানন্দিনী রাধার বৈভব তুলসীদেবী। বৃন্দাসখী মিত্যই শ্রীরাধার সেবা করেন, রাধাও বৃন্দার আদর-পরিচর্যা করেন, উভয়েই পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী। সেইজন্ত সঙ্গুরু ও তাঁহার অঙ্গুগতজন শ্রীমতী রাধার শ্রীহস্তে তুলসী অর্পণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সেবাদানের অধিকারিণী শ্রীরাধা তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিবেন। শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণ কখনও রাধার পায়ে তুলসী দিবেন না। মোহবশে যদি কেহ তুলসীকে নিজপদে গ্রহণ করেন বা অঙ্গুগতজনের নিকট সে রীতি প্রবর্ত্তন করেন, তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই অপরাধী হইবেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী সখী অঙ্গুগামী শ্রীগুরুর শ্রীতির জ্ঞাত তাঁহার সেব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের সেবার গুরু ও রাধার পদে পুষ্প এবং শ্রীহস্তে তুলসী অর্পণ করিবেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল রামানন্দ রায়-যুখে

শ্রীমদ্‌মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন রসকথা প্রচার

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৩ পৃষ্ঠার পর]

এই পর্যন্ত শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় कहিলেন। সাধন-অবস্থায় যাঁহার যাহা ভূমিকা, সেই অবস্থায় সেই সাধকের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিশেষ করিয়া রস-চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি যে রসের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই রসই উত্তম। আপন ভূমিকা ত্যাগ করিয়া উচ্চ রস আবাদন করিতে যাওয়া সাধকের পক্ষে অতীব অকাল-পক্‌তার মিন্দর্শন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে তারতম্য আছে।—

পূর্ব পূর্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয়।

এক-দুই-গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়।

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।

শাস্ত-দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

এই কারণে ভাগবত বলেন,—“মধুর রসোৎকৃষ্ট প্রেমে কৃষ্ণ নিত্যাক্ত বশ হন।” কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—যে তাঁহাকে যেভাবে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে ভজনা করেন। অগ্ন্যগ্ন রসের প্রতিদান দিতে কৃষ্ণ সমর্থ হন। “কিন্তু মধুররসোৎকৃষ্ট প্রেমে ভজনের অল্পকণ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ कहিলেন,—হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি তোমাদের স্বর্ণ শোধ করিতে পারিলাম না।”

যতপি সৌন্দর্য—কৃষ্ণ-মাধুর্যের ধূর্য।

ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য ॥

শ্রীকৃষ্ণের আপন সৌন্দর্য যত অতুলনীয়—যত চিত্তাকর্ষকই হউক না কেন, শ্রীরাধাধীন কৃষ্ণসৌন্দর্য মাধুর্যহীন। একারণে মধুররসের কোন ভক্তই রাধাহীন কৃষ্ণের ভজনে প্রয়াসী নহেন। একারণে গোপীজনবল্লভ-প্রেমই সর্বভক্তের সাধ্যসার, সর্বজীবের একমাত্র প্রয়োজন।

মহাপ্রভু রায়কে এই সাধ্যসাধের উপরে যদি আর কিছু থাকে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে कहিলেন। রায় তখন শ্রীরাধার প্রেমকেই সাধ্যশিরোমণি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্কোপণ ।

তাঁহাতেই অল্পমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥

এবার প্রভু রাগকে কৃষ্ণ, রাধা, রস ও প্রেমের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণনা করিতে অল্পরোধ করিলেন ।

রায় কহে,—“ইহা আমি কিছুই না জানি ।

তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী ॥”

কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রায় প্রথমেই বলিলেন,—

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।

সর্ব-অবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা—সবার আধার ॥

সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ।

সর্বৈশ্বর্য্য-সর্বশক্তি-সর্বরস-পূর্ণ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের কারণ । তাঁহা হইতেই সব কিছুই উৎপত্তি । তিনি সর্ব-অবতারের অবতারী । তাঁহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, তিনিই সর্বৈশ্বর্য্যের, সর্বশক্তির এবং সর্বরসের মালিক । তিনিই একমাত্র ভোক্তাপুরুষ । তিনি ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন । সাবার তিনি—

বৃন্দাবনে ‘অপ্রাকৃত নবীনমদন’ ।

কামগায়ত্রী, কামবীজে ধীর উপাসন ।

নিত্যধাম চিন্ময়ধাম শ্রীবৃন্দাবনধাম । সেই বৃন্দাবনধামে ‘অপ্রাকৃত নবীন-মদন’—“জড় বা প্রাকৃত ও তদ্বিপরীত চিন্ময় বা অপ্রাকৃত, উভয় অবস্থাতেই কাম বর্ত্তমান বটে ; তবে জড়কাম কালদ্বারা স্কন্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই ইহার অল্পভূতি এবং পরক্ষণে মলিন হয় ও থাকে না, আর অপ্রাকৃতকাম—নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ কালে তাহার সমাপ্তি নাই, সর্বদাই উজ্জ্বল থাকে ।”

“চিন্ময়ধামরূপ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনরূপে বিরাজমান । কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয় । সেই অবস্থা দুইপ্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত । তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু ‘বস্তুতঃ’ এখনও জড় সম্বন্ধ বিগত হয় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্বের কথঞ্চিদুদয় হইলে ‘স্বরূপগতঃ’ বৃন্দাবনে অবস্থিতি হয় । স্বরূপাবস্থিতিতে সাধনা আছে, সেই সময় চিন্ময়ী কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের

উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম, সকলকেই সেই সৰ্ব-
চিন্তাকৰ্ষক মন্থমন্মথস্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।”

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মুগ্ধিধর।

অতএব আত্মপর্যাপ্ত সৰ্ব-চিন্তহর ॥

শৃঙ্গার রসরাজময় শ্রীকৃষ্ণ এমনই চিন্তাকৰ্ষক যে তাঁহার নিজেকে পর্যাপ্ত
নিজের রূপ আত্মাদানের আকাজক্ষা জন্মায়। গৌর-অবতারের মুখ্য কারণের
মধ্যে ইহা পড়িয়া থাকে।

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।

আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সংক্ষেপে কিছু আভাস দিয়া এবার রায় রাধাতত্ত্ব বর্ণন আরম্ভ
করিলেন। তিনি কহিলেন,—কৃষ্ণের অনন্তশক্তি থাকিলেও, তিনটাই
প্রধানশক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থশক্তি। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপ-
শক্তিই সকলের উপরে। এই স্বরূপ বা চিৎশক্তির আবার তিন প্রকার রূপ।

আনন্দাংশে ‘হ্লাদিনী’, সদংশে ‘সন্ধিনী’।

চিদংশে ‘সচ্চিদ্র’, যারে জ্ঞান করি’ মানি।

চিচ্ছক্তির এই হ্লাদিনী অংশই কৃষ্ণকে পরম আনন্দদান করিয়া থাকেন।

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার ‘প্রেম’ নাম।

আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥

প্রেমের পরম-সার ‘মহাভাব’ জানি।

সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

অতএব রাধাতত্ত্ব বর্ণন করিতে বসিয়া রায় প্রথমেই কহিলেন,—আনন্দাংশের
সারতত্ত্বের সার মহাভাবরূপা রাধারাণী। প্রেমই তাঁহার স্বরূপ, প্রেমের
দ্বারাই তিনি অলুক্ষণ ভাবিত। একারণে তিনি কৃষ্ণপ্রেমসীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
আসনে অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণের স্বথবিধান করাই তাঁহার অষ্টকর্ণের চিন্তা, কিন্তু
রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমকে পুষ্ট করিতে প্রয়োজন সখীগণের। একারণে বলা
হইয়াছে,—

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।

ললিতাদি সখী—তার কাণব্যূহরূপ।

শ্রীরাধাবিগ্রহ-বর্ণনে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঘাঘা বলিয়াছেন, তাহা
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে’ নিম্নরূপভাবে কহিয়াছেন।—

রাধারাণী—“মহাভাবে উজ্জলচিন্তামণি-ভাবিত-বিগ্রহ। কৃষ্ণপ্রতি সখীর

যে প্রণয়, তাই সদগন্ধকুসুমাদি দ্বারা স্বন্দর কাঙ্ক্ষিপ্ৰাপ্ত ॥ ১ ॥ পূর্বাঙ্কে
 কারুণ্যামৃত, মধ্যাঙ্কে তারুণ্যামৃত ও সায়াঙ্কে লাবণ্যামৃত স্নাত বাহার
 বিগ্রহ ॥ ২ ॥ লজ্জারূপ পটবস্ত্রপরিধান, নৌদর্ঘ্যারূপ কুসুমশোভিত শ্রামবর্ণ,
 শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরীদ্বারা চিত্রকলেবর ॥ ৩ ॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ,
 গদগদ স্বর, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টি উদ্ভবরত্নে অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥
 নৌদর্ঘ্য-মাধুর্যাদি গুণসকল পুষ্পমালারূপে বাহার শরীরে বিবাজমান ; ধীর
 ও অধীরভাবেকে তিনি পটবাস অর্থাৎ কপূরাদি দ্বারা পরিচ্ছিত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥
 প্রচ্ছন্নরূপে মানই বাহার ধমিল অর্থাৎ বন্ধকেশবশ (খোঁপা), নৌভাগ্যরূপ
 তিলকে বাহার কপাল উজ্জল ; কৃষ্ণনাম বা যশঃপ্রবণই বাহার কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥
 অঙ্গুরাগরূপ-তাম্বুলদ্বারা বাহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত ; প্রেম-কৌটীলাকেই যিনি
 কজ্জলরূপে ধারণ করিয়াছেন ; নগ্ন অর্থাৎ উপহাসভেদে মুহূর্ত্তস্বরূপ কপূরদ্বারা
 যিনি স্বেদিত ॥ ৭ ॥ সৌরভরূপ অস্ত্রপুর্বে যিনি গরুরূপ পর্যাঙ্কে শায়িত হইলে
 বিপ্রলম্বরূপ-হার প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ তরলরূপে দোলায়িত ॥ ৮ ॥ প্রণয়ক্ৰোধরূপ
 কাঁচুলীদ্বারা বাহার স্তনযুগল আবৃত ; সপত্নীগণের ন্যবক্ষ্যঃশোষণকারী যশঃশ্রী
 বাহার কচ্ছপী-বীণা ॥ ৯ ॥ যিনি 'যৌবনরূপ-সখীর স্বক্কে স্থায়ী লীলারূপ
 করকমল রাখিয়াছেন ; যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণ কন্দর্পানন্দি মধু
 পরিবেশন করিতেছেন ॥ ১০ ॥"—এইসকল ভাংভূষণ শ্রীরাধার সর্ব্বঅঙ্গে
 বিবাজিত । তাঁহার গুণাবলী কৃষ্ণ নিজের গণনা করিতে পারেন না । এই
 রাধা ভিন্ন কৃষ্ণকে পূর্ণ আনন্দদান করিবার শক্তি কাহারও নাই ।

এপর্যন্ত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ববর্ণন করিয়া রায় এবার 'বসপ্রেম-তত্ত্বে প্রবেশ
 করিলেন ।—রায় কহে,—কৃষ্ণ হয় 'ধীর ও ললিত' ।

নিরন্তর কামক্রীড়া—বাহার চরিত ॥

রাজিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে ।

কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥

প্রভু কহিলেন,—“হে রামানন্দ ! তুমি যে সাধ্য-নির্ণয় করিলে, রাধাকৃষ্ণের
 বর্ণন করিলে এবং উভয়ের বিলাস-মহত্ত্ব বলিলে, তাহাই সত্য ; কিন্তু ইহার
 পর আর যে কিছু আছে তাহা বল । রায় কহিলেন,—ইহার পর বৃদ্ধির
 আর গতি দেখিতে পাই না । তবে 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' বলিয়া একটা ভাব
 আছে, তাহা বলিতেছি ; ইহা শুনিয়া তোমার স্মৃতি হয় কিনা, বলিতে পারি
 না । তাৎপর্য্য এই,—এ পর্যন্ত আমি 'প্রেমবিলাসের স্বরূপ' বর্ণন করিলাম ।
 প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে অর্থাৎ ন্যস্তোগ ও বিপ্রলম্ব ।

বিপ্রলস্ত ব্যতীত সন্তোগের স্মৃতি হয় না। বিচ্ছেদের নামই ‘বিপ্রলস্ত’; তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিকৃতাব-বশতঃ সন্তোগভাবেও সন্তোগ-স্মৃতি। রায় রামানন্দ নিজকৃত ঐ রদের একটি সঙ্গীত গান করিতে না করিতে মহাপ্রভু স্বীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি—বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, স্তবরাং বিপ্রলস্ত-দশায় সন্তোগ-স্মৃতি।”

সন্তোগের পরে বিপ্রলস্ত না আসিলে প্রেমের পরিপূর্ণতা হয় না। যেখানে যত বিরহ সেখানেই তত মিলন। মহাপ্রভুর মহাভাবে বিপ্রলস্তের চরম অবস্থায় শেষ জীবনে কাটিয়েছেন। রাধারাগীর ‘মাদনাখ্য-মহাভাবে’ এই অবস্থার চরম অভিব্যক্তি।—

শ্রীরায় রামানন্দের গীত :—

পহিলেহি রাগ নয়নভঞ্জে ভেল।
অহুদিন বাচল, অবধি না গেল ॥
না দো রমণ, না হাম রমণী।
ছুহঁ-মন মনোভব পেষল জামি’ ॥
এ সখি, সে-নব প্রেম কাহিনী।
কাসুঠামে কহবি বিছুরল জামি’ ॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
ছুহঁকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহ ভেলি দূতী।
সুপুরুষ-প্রেমক এইন রীতি ॥

এই অবধি ভনিয়া প্রভু কহিলেন,—

প্রভু কহে,—‘সাধ্যবস্তুর অবধি’ এই হয়।
তোমার প্রমাদে ইহা জামিলুঁ নিশ্চয় ॥
সাধ্যবস্ত ‘সাধন’ বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি’ কহ, রায় ! পাবার উপায় ॥

প্রভু চরমসাধ্যবস্ত পাইবার উপায় রায়কে জিজ্ঞাসা করায় রায় উত্তরে কহিলেন,—“দাস্ত-বাৎসল্যরসে এই গূততর পাওয়া যায় না ; ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্তের প্রবেশ অসম্ভব ; ব্রজসখীর ভাব গ্রহণপূর্বক সখীর আত্মগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্ত পাওয়া যায়, অত্র উপায় নাই।”

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারস সখীগণভিন্ন বিস্তার বা পুষ্টীলাভ করে না। সখীগণের নিজ ইন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলনদ্বারাই তাঁহাদের অধিক সুখ হয়।

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্ললতা।

সখীগণ হয় তাঁর পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥

কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাতে সিঞ্চয়।

নিজ-সুখ হইতে পল্লবাণের কোটি সুখ হয় ॥

সুতরাং দুর্লভ মানব-দেহধারী সকল জীবের কর্তব্য—সখীরূপা শ্রীগুরুদেবের আত্মগত্যে ভজন-মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

“প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা ‘জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

অনুক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥”

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট, (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর]

Lord Shri Krishna বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এখানে আর একটি শব্দ লাগাতে চাচ্ছি—Supreme Lord, Almighty Lord, Omnipotent Lord, Not only Lord। কেননা শাস্ত্রে আছে,—He is Lord of Lords। ভগবান্ সবটার স্রষ্টা, স্বয়ংরূপ বস্তু তিনি। সেটা প্রমাণিত হয় কিভাবে? উপনিষদের ভিতরে বর্ণনা রয়েছে,—

ন তত্ত্ব কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে ন তৎ সম্ভাভ্যাধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব জ্ঞতে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

সেই ভগবান্ কারও সঙ্গে সমান নন—সকলের উদ্ধে অবস্থিত তিনি, সেই ভগবানের সমান কেউ নাই এ জগতে, তাঁর অধিক কেউ নাই এ জগতে। ‘ন

তৎ সম্যচ্চাভ্যধিকশ্চ'—তিনি হসেন ভগবান্। সেই ভগবান্ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর।

তুমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, অং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্, বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥

হে ভুবনপূজ্য ভগবান্! তোমার আমি প্রণাম করি। কে তুমি?—
'তুমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্'—তুমি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর।
Supreme Command, Supreme God. তুমি নিখিল বিশ্বে যত ঈশ্বর
আছেন তাঁদেরও ঈশ্বর—অধিপতি। তাঁর পরে কোন কথা নাই। 'ঈশ্বর'
কাকে বলা হচ্ছে?—আধিকারিক দেব-দেবীকে god-goddess বলা হয়, কিন্তু
সেই 'ঈ' হল Small letter, আর যখন God এর 'G' Capital letter
লিখি আমরা, তখন নিশ্চয়ই Supreme Lord, Almighty Lord এইরূপ
অর্থ হয়। 'অং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্'—তুমি নিখিল দেবতারও দেবতা,
স্বতরাং তুমি পরমদেবতা। 'পতিং পতীনাং'—এই জগতে পতি-পত্নীর সম্পর্ক
রয়েছে, কিন্তু হে ভগবান্! তুমি অনন্ত বিশ্বপতি, তুমি জগৎপতি—জগদ্রাধ,
অনন্ত জগতের সকলের উপরওয়াল তুমি। 'পরমং পরস্তাং'—এই জগতে
যাহা পরম শ্রেষ্ঠ—Superlative degree, তাহলে ভগবান্ হলেন—Super-
lative-এরও Superlative degree। Superlative এর Superlative—
এরূপ ব্যবহার আছে কি?—হ্যাঁ, কবি-জগতে, কাব্য জগতে আছে। বিশ্ব-
বিখ্যাত Poet, Novelist, Dramatist Shakespeare বলেছেন,—Most
unkindest। Most unkindest-শব্দের যদি ব্যবহার আছে, তাহলে
'পরমং পরস্তাং' কেন হবে না? স্বতরাং Superlative-এর Superlative
degree-র ব্যবহার আছে, দেখা যায়। সেই যে পরতত্ত্ব ভগবান্, তাঁর থেকে
শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই। সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্কে প্রণাম করছেন।

সেই যে পরতত্ত্ব ভগবান্ তিনি অনন্ত জীবকে তাঁর দিকে সর্বক্ষণ আকর্ষণ
করছেন, তাকে প্রেমানন্দের অধিকারী করছেন। এইটাই তাঁর সব থেকে
বাহ্যাহরী। হরি ত' তিনি। 'হরি' মানে হরণ করেন। কি হরণ করেন?—
ভব-পাপ-তাপ তিনি হরণ করেন, তিনি জীবের দুঃখ মোচন করেন।
সেই ভগবানের নাম হল 'রণছোড়'। আজ সেই রণছোড়রায়েরই জন্মদিন
—জন্মাষ্টমী। 'রণ' মানে দুঃখ, যিনি দুঃখ হরণ করেন, দুঃখ বিদূরিত
করেন, দুঃখ মদ্বিত ও মথিত করেন, তিনি হলেন হরি, জনাৰ্দ্দন। 'হরি'-
শব্দের কি শুধু এইটুকু ব্যাখ্যা? সেই ভগবানের কি আর কোন বিশেষ

সদৃশ নাই? শাস্ত্র বলছেন,—আরও কিছু বিশেষ গুণ আছে—“হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ।” যিনি জীবের বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন, তিনিই হরি। যিনি জীবের যাবতীয় পাপ-তাপ, শোক-দুঃখ সবকিছু মোচন করেন, তিনিই হরি। এরপরে কি আছে?—যিনি জীবকে প্রেমানন্দ দান করেন, তিনিই হলেন হরি। এইটাই হল হরিনামের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

ভগবান্—শ্রীমুকুন্দ। ‘মুক্তিং দদাতি যঃ স মুকুন্দঃ’—যিনি মুক্তি দান করেন, তিনি মুকুন্দ। বনি—এইটুকুই শুধু? তিনি শুধু মুক্তিদান করবেন, আর কিছু নয়?—“মুক্তিস্থং তুচ্ছং কৃত্বা প্রেমানন্দং দদাতি যঃ স মুকুন্দঃ।”—মুক্তি-স্থকে তুচ্ছ করে যিনি প্রেমানন্দ দান করেন জীবকে, তিনিই হলেন ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ। শাস্ত্রে সবটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আমাদের কেবল part part করে ব্যাখ্যা দিতে হবে। কে ভগবান্, কে প্রেমময় ভগবান্, তিনি বিশ্বের কি কল্যাণ-চিন্তা করেন, তিনি কি মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ রেখেছেন, তিনি কি মানুষের ভিতরে দ্বৈধা-হিংসা-মাংসর্ঘ্য বাড়িয়ে তুলেছেন? আমাদের সনাতন আখ্যায়িকাগণ কি কেবল ঝগড়া-বিবাদ-বিনশ্বাদ বাড়িয়ে তুলেছেন, লোককে কি ঘৃণা করতে বলেছেন, লোককে কি অসম্মান করতে শিখিয়েছেন, তাদের কি অমর্যাদা করতে বলেছেন, শাস্ত্রে কি এমন কথা লেখা আছে কোথাও?—কোথাও নাই, বরং সকলে মিলেমিশে চলব আমরা—এই নীতি-আদর্শ-উপদেশ-নির্দেশই শাস্ত্রের সব জায়গায় লেখা আছে। সেখানে Provincialism—প্রাদেশিকতার কোন কথা নাই। দুটো কুকুর ঝগড়া করে Provincial হয়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থে—তার অঞ্চলে অল্প কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না সে। এই প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদ Narrow-minded ব্যক্তিগণেরই উপজীব্য; তারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-চিন্তা না করে নিজস্ব অঞ্চলের উন্নতির চিন্তায় ব্যস্ত। ভগবান্ তার অনেক উর্দ্ধে, অধিগণও তার অনেক উর্দ্ধে। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, দ্বৈধা, হিংসা, মাংসর্ঘ্য নাই, কারণ তাঁরা নির্গুণস্বর। তাঁরা অপ্রাকৃত স্নেহবৃত্ত ও প্রেমময়। সেখানে ওদব কোন কথা নাই, যেখানে জীবাশ্মার স্বরূপের বিচার করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এ জগতে এসেছেন, তিনি জীবাশ্মার স্বরূপ সন্মুখে কি বল লেন?—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্ণো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্কা।

কিন্তু প্রোগ্রেন্সিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাক্তে-

গৌপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাস-দাসাহুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি। তাহলে তুমি কে? জীবের স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছেন স্বয়ং সেই নিখিল বিশ্বের অখিল লোকশিক্ষক—World-Teacher। তিনি বলছেন,—“কিন্তু প্রোগ্রেন্সিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাক্তেগৌপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাস-দাসাহুদাসঃ ॥”—আমি নিত্য স্বতঃ-প্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্রস্বরূপ ভগবানের পদকমলের দাস-দাসাহুদাস। আমি যদি ভগবানের দাস বলি, তাহলে কিছুটা অহঙ্কার এসে যায়; কিন্তু যদি ভগবানের দাসাহুদাস, তার দাস—এই কথা বলি, তাহলে অহঙ্কার নাই। সেইজন্য দেখা যায়, ভক্তের যে প্রার্থনা সেখানে সম্রাট কুলশেখর বলছেন,—

মঞ্জন্মনঃ কলমিদং মধুকৈচিভাবে, মৎপ্রার্থনীয়-মদজুগ্রহ এষ এব।

তদভূত্যা-ভূত্যা-পরিচারক-ভূত্যা-ভূত্যা-ভূত্যাশ্চ ভূত্যা ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

হে লোকনাথ ভগবান্! তুমি আমাকে তোমার ভূত্যের ভূত্যের ভূত্যা বলে মনে কর। তাহলে আমি জানব—আমার প্রতি তোমার স্নেহ, মমতা, দয়া আছে। হৃন্দর বিচার দেখিয়েছেন। সেখানে কোনরূপ হিংসা, মাৎসর্যের স্থান নাই। ঋষিগণ পরম রূপালু, দয়ালু, জগতের কল্যাণ-চিন্তা করেছেন তাঁরা—জগজ্জীব কি করে সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হবে, বিভেদ ভুলে যাবে। যেখানে আমাদের বহু উপাস্ত্র, সেখানেই গুণগোল বেশী। ৩৩ কোটি দেব-দেবী যেখানে উপাস্ত্র, সেখানে ৩৩ কোটি রকমের চিন্তাধারা। যদি উপাস্ত্র নির্ণয় করতে হয়, তাহলে শাস্ত্র যেভাবে উপাস্ত্র নির্ণয় করেছেন, সেভাবে আমাদের উপাস্ত্র নির্ণয় করতে হবে। সেখানে বলছেন, আমাদের একায়নশাখী হতে হবে। ঋষিগণের নীতি হল একায়ন, বহুয়ন নহে। রাস্তাটা এক, The only Road, The only well-Mecadamised Road। সনাতন ধর্মপথ এক, সিঁড়ি—Step অনেক হতে পারে। সেখানে কর্ম, জ্ঞান, ধোঁগ, তপস্শ ইত্যাদি step—সিঁড়ি, সোপান। আমি এটা গীতা থেকে প্রমাণ করতে পারি। আপনারা গীতা আলোচনা করেছেন, সেখানে কৃষ্ণ অজ্জুনকে বলছেন,—ব্যবসায়িক বুদ্ধিরেকহ কুরুমন্দন।

বহশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥

ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাকে বলে ? আমি ব্যবসা করতে বসেছি। ব্যবসা করা মানে—আমি লাভ করব। তবে আমাকে আগে থেকে জেনে নিতে হবে, চিন্তা করে নিতে হবে—ব্যবসার Merits, Demerits। ব্যবসা করতে গেলে আমার লোকসান হতে পারে, সেটা আগেই আমাকে চিন্তা করে রাখতে হবে। তা না হলে যদি আমার লাখ টাকা লোকসান হয়ে যায়, তাহলে হয়ত হার্ট ফেল করে মারা যেতে পারি। সেইজন্ত আগে থেকে Demerits গুলো জেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধি কি ?—আমি লাভ করব। এখানে গীতায় ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাকে বলছেন ?—নিষ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ভগবানকে পাওয়ার যে নিশ্চিত বুদ্ধি। সে পথ ত' এক। আজ বহু পথের কল্লনা যারা করছেন, তারা অব্যবসায়ী; তারা ব্যবসা বোঝেন না, কি করে ব্যবসা করতে হয় তা তারা জানেন না—নিষ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে।

বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠির মহারাজকে চারটি প্রশ্ন করেছেন, মহাভারতে আছে,—কা চ বার্তা, কিমা'র্চ্যাম, কঃ পস্থাঃ, কশ্চ মোদতে।

বদ মে চতুরঃ প্রশ্নান্ মৃত্যু জীবন্ত বান্ধবাঃ ॥

আমার এই চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহলে তোমার এই আত্মীয়স্বজন যারা মরে গেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে এখানে, তারা সব বেঁচে উঠবে। 'কা চ বার্তা'—জগতের খবর কি ? হুমিয়ার সংবাদ কি ? আমাদের জিজ্ঞাসা করলে আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির খবর সব বলে দেব। আমরা খেতে পারছি না, পরতে পারছি না—এই সমস্ত আর্জি পেশ করব নেতাদের কাছে। কিন্তু এখানে জগতের বার্তা বলেছেন কি ?—

মানস্তু দর্শী পরিষট্টমেন, সূর্য্যাগ্নিনা রাজি-দিবেক্ষমেন।

অশ্বিনু মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥

একটু রূপক করে জিনিষটা বললেন। মান এবং ঋতু দর্শী (হাতা) কাজ করছে। রান্না করতে গেলে একটা খুন্তী, চামচ ত' লাগবে নাড়বার জন্ত। সেইটাকে বলছেন দর্শী। 'পরিষট্টমেন'—হাতা-খুন্তী দিয়ে ঘাঁটা হচ্ছে। সূর্য্য, অগ্নি, রাত্রি, দিব্য এরা ইন্ধনের—Fuel এর কাজ করছে। 'অশ্বিনু মহামোহময়ে কটাহে'—রান্না করার জন্ত একটা পাত্র দরকার। সে পাত্রটা হল জীবের মায়া-মোহময় কটাহ। 'ভূতানি কালঃ পচতি'—দুঃস্বপ্ন কাল ভূতগণকে—প্রাণীগণকে পাক করছে এই মায়া-মোহময় কটাহে। এটা বুঝিয়ে দিলেন রূপক করে। এইটা হল হুমিয়ার সংবাদ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—‘কিমাশ্চর্য্যাম্’ এর উত্তর দিয়েছেন,—

অহংহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।

শেষাঃ স্থিরতমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥

প্রতিমুহূর্তে আমার চোখের সামনে আমারই কত আত্মীয়-স্বজন চলে যাচ্ছেন—মারা যাচ্ছেন । কিন্তু তাতেও আমার কোন ভ্রক্ষেপ নাই । মনে করছি, আমরা নিশ্চয়ই বেঁচে থাকব । আমার চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, তাতে আমার প্রত্যয় নাই । আমি মনে করছি,—আমি অজর, অমর । নীতিশাস্ত্রে আছে,—“মজ্জরামরবৎ প্রাঞ্জো বিতামর্ষণ চিন্তয়েৎ ।” যখন আমি অর্থ রোজগার করব, তখন আমি ভাবব—আমি অজর, অমর । তা না হলে অর্থ রোজগার হবে না, বিত্যালাভ হবে না । “গৃহীত এব কেশেযু মৃত্যুনা ধর্ম্মাচরৎ ॥”—আর ধর্ম্মাচরণ যখন করতে হবে, তখন মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করছে—এটা চিন্তা না করলে ধর্ম্মাচরণ করা যায় না । যদি আমি Adamant—বেপরোয়া হয়ে যাই, তাহলে ধর্ম্মচিন্তা—নীতি-আদর্শ সংরক্ষণ করা যায় না । সেইজন্য ‘গৃহীত এব কেশেযু’ বিচারটা পাশাপাশি রাখতে হবে, যদিও ওটা ভয়ের কথা নয়, মিথ্যাকথারই উদাহরণ । ধার্ম্মিক, তাঁরা ভীক, কাপুরুষ নন ; যারা অধার্ম্মিক তারাই ভীক । ধার্ম্মিক ভীক নন যেহেতু তিনি নীতিবাদী, জীবনে চলার পথে নীতি-আদর্শকে তিনি দর্ব্বতোভাবে বজায় রাখতে চান । সেইটাই তাঁর জীবনের Summum bonum ।

প্রতি মুহূর্তে যে ঘটনা ঘটছে, তার কোন প্রত্যয় নাই আমার—এর থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ! এখানে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য বা আজকাল যে সব Atom and Hydrogen Energy, Electronics যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, Computer বা রোবট ইত্যাদির কথা বলা হয় নাই । এখানে আশ্চর্য্য বলছেন কি ?—চোখের সামনে যেটা ঘটছে তাতে বিশ্বাস নাই, এটাই সব থেকে আশ্চর্য্য ব্যাপার !

তারপরে প্রশ্ন হয়েছে,—‘কঃ পস্থাঃ’—ভগবানকে পাওয়ার প্রকৃষ্ট পথ কোন্টা ? উত্তরে বলছেন,—

বেদা বিভিদ্মাঃ স্মৃতয়ো বিভিদ্মাঃ, নালাবুবির্ষস্ত মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পস্থাঃ ॥

‘বেদা বিভিদ্মাঃ’—বেদের মধ্যে কন্দী, জ্ঞানী, যোগীর পক্ষে বহু কথা বলা হয়েছে । তার থেকে সার-সঙ্কলন করা বড় কষ্টকর । তার থেকে চূনাও

করে যে আমি আমার আত্মকল্যাণ বিষয়টা লাভ করব, সেটা প্রায় অসম্ভব। ‘স্বতরো বিভিন্নাঃ’—স্বতীশাস্ত্রে বহুপ্রকার বিচার, বহু নির্দেশ, বহু রকমের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তার থেকেও আমার সাব-সঙ্কলন করা মুশ্কিল। ‘নানা-বৃষিষস্ত মতং ন ভিন্নম্’—এমন কোন ঋষি নাই, যিনি ভিন্ন মত প্রকাশ না করেছেন। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক মত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। অধিকারিভেদে মত বিভিন্ন বলতে পারেন, কিন্তু তার সামঞ্জস্যকারীও আছেন। সামঞ্জস্য কে করছেন? বিভিন্ন রকমের কথা আসছে, আমি তার মীমাংসা করতে পারি না কোমদিন। তাহলে ধর্মপথটা আছে কোথায়? আমি রাস্তাটার অনুসন্ধান পাচ্ছি কোথায়? “ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্”—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে। ‘গুহা’ বলতে কি পাহাড়ের গুহার মধ্যে নিহিত আছে?—না তা নয়, মহাজনের হৃদয়-গুহায়। সে মহাজন কে? ধান-চালের ব্যবসা করা মহাজন?—না, মহাজন মানে—যাঁরা ভগবানের সঙ্গে কারবার করেন, লেনদেন করেন, ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখেন, তাঁর সঙ্গে আত্মকল্যাণজনক আলোচনা ও আদান-প্রদান করেন, তাঁরা মহাজন। তাঁদের হৃদয় গুহাতে ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে। “মহাজনো যেন গতঃ সঃ পদ্মাঃ” ॥—সেই মহাজনগণ যে পথে গিয়েছেন, সাধন-ভজন করেছেন, সেই পথটা হল প্রকৃত বাস্তব পথ। ‘সঃ পদ্মাঃ’ একবচন। বিবচন বা বহুবচন নয়। Singular number, Plural number নয়। তাহা The only way, The only Mecadamised Royal Road। ভগবানকে পাওয়ার যে রাস্তা সেটা এক, বহু নয়। যদি কেউ বলেন—রাস্তা বহু, তাহলে বুঝতে হবে ভুল করে বলছেন। সেই পথ একটা। তথায় বহু step বা নোপান অতিক্রম করতে হয়। Step গুলোকে কেউ রাস্তা বললেও তাহা রাস্তা নয়। যদিও step গুলোকে নিয়েই রাস্তা, তথাপি রাস্তার একটা পৃথক সংজ্ঞা আছে। Road টাকে নিশ্চয়ই step বা সিঁড়ি বলা হয় না, কিন্তু নোপানগুলোকে নিয়েই সড়ক বা রাস্তা হয়।

শ্রীগৌরান্দ-মহিমা

গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে

জীবের কল্যাণ করিবারে দান।

গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে

এমন অকুণ্ঠ মহাবদাশ, হন পূর্ব-ভগবান্।

গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে

কলিযুগ-ধর্ম নাম-মহামন্ত্র শিখাইতে।

গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 সাধিতে সাধ্য-প্রেম, ভক্তি—সাধন !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 জানাতে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সন্দেশ !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 নামাতে ধরায় ব্রজের প্রেম !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 ‘পরং বিজয়তে কৃষ্ণনাম’, নিভাতে ত্রিতাপ !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 অহৈতুকী ভক্তি শ্রীরাধাকান্তে !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 আচরি’ আত্মধর্ম প্রচার করিতে !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 শিখাতে “জীবের স্বরূপ—নিত্যকৃষ্ণদাস” !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 বৈষ্ণব-আনুগত্যে হয় শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ জয় !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 ‘জীব’ বলিতে ‘আত্মা’ জানিহ. শুদ্ধা নিত্যা !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 জানাতে যেই “কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা” সেই গুরু হয় !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 জীব-ঈশ্বরে ভেদাভেদ তত্ত্ব-প্রকাশিতে !
 গৌরান্দের পূর্বে কে ছিল জগতে
 সন্ন্যাসী হয়ে নেচে গেয়ে প্রেম দিয়েছে জনে জনে !
 মুকুন্দ-চরণ করিবারে বরণ
 সদগুরুচরণে করি আত্মনিবেদন ।

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(ডাঃ পরিতোষ রাহা)

শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সর্ব জীবাত্মার অধীশ্বর ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পুত-পবিত্র জন্ম-জয়ন্তী শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারাবিশ্বের এক সার্বিক (স্বাতন্ত্র্যজাতিক) উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে জনজীবনে নেমে আসে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা, সর্বত্র বয়ে যায় আনন্দের জোয়ার। সেই জোয়ারে অবগাহন করার জন্য অজ্ঞাত বৎসরের ছায় এই বৎসরও বিভিন্ন মঠ হতে সম্মানীয় ও ব্রহ্মচারিগণ এবং দূর-দূরান্তর হতে অগণিত ভক্তবৃন্দ জগদগুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে উপনীত হন। দিক্ দিগন্ত বিস্তৃত গগনস্পর্শী গারো পাহাড়ের কোলে অবিসৃত সুন্দরী তুরা নগরের অন্তর্গত 'শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ'।

পূর্বেরকার ছায় বর্তমান বৎসরেও শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-তিথি শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য ও প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আত্মগতো বিপুল স্মারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে গত ২৭শে শ্রাবণ (ইং ১৩৮।২০) সোমবার শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারে বিরাট তোরণ নির্মাণ করা হয়। শ্রীমন্দিরসহ সমগ্র উৎসব প্রাঙ্গণ বিচিত্র রঙ্গীন বস্ত্রাদি, আত্মপল্লব ও পূর্ণকুসুমহ কদলীবৃক্ষদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-গোরাঙ্গ-গাঙ্ঘরিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউ এবং সর্ববিশ্ববিনাশ-কারী শ্রীনৃসিংহদেবের জয়দানপূর্বক এই মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৩৮।২০), মঙ্গলবার ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে মঙ্গলারতি ও তুলসী পরিক্রমার পরেই সুসজ্জিত ট্যান্ডিতে শ্রীগোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও সমিতির বর্তমান আচার্য্য-সভাপতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য স্থাপনপূর্বক এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহকারে মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমান্তে উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্যারায়ণ হয় এবং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হতে ব্রহ্মচারিগণ স্থললিত কর্ত্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে পূজাপাদ ত্রিদিগ্‌নামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের সভাপতিত্বে এক

মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল,—“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব।” উক্ত সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসিংহ মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, বিশেষ অতিথি Principal R. Bhattacharjee (Tura Govt. College) ও শ্রীহৃদাংগ-মোহন ঘোষ (Manager of Apex Bank, Bagmara) প্রমুখ বক্তৃতা বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে সভার সভাপতি শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ বিশেষ বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষে শ্রীশ্রীমলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

পরদিবস ২২শে আষাঢ় (ইং ১৫।৮।২০), বুধবার শ্রীনন্দোৎসব দিবসে দুপুর ১২টা হতে সন্ধ্যা ১০টা পর্য্যন্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আহৃত, অনাহৃত ও স্বাহৃত প্রায় চারি সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মহাজন পদাবলী কীর্তনান্তে ধর্মসভার কাজ আরম্ভ হয়। পরম পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসিংহ আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—“শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও বৈদিক সাম্যবাদ।” অঙ্ককার সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীদাম ব্রহ্মচারী, Prof. K. P. Chowdhury (Tura Govt. College) ও শ্রীরায়নরেশ পাণ্ডে (প্রধান শিক্ষক, তুরা হিন্দী হাইস্কুল) প্রমুখ বক্তৃতা ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজের ভাষণান্তে রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়।

৩০শে আষাঢ় (ইং ১৬।৮।২০), বৃহস্পতিবার শ্রীসমিতি-পরিচালিত “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যালয়ের” (English Medium School) ছাত্রছাত্রীগণ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসিংহ আচার্য্য মহারাজ কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে Mr. Biren Hajong (Ex. D. I. of Schools) প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। সর্বশেষে শ্রীশ্রীমলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান করেন।

এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ত স্থানীয় স্থধী ভক্তবৃন্দের ও P. W. D., P. H. E. ও B. S. F. প্রভৃতি সরকারী বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। মঠের Decoration ও বিশাল তোরণদ্বার নির্মাণে শ্রীপাদ নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীখগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিধান শর্মা প্রমুখের

সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরাম অবতারের নীলামূর্তি প্রদর্শনী। প্রতিদিনই অগণিত দর্শনার্থী প্রকৃতি ও স্থানের বিপদ সঙ্কলতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দুর্দমনীয় গতিতে উৎসবের মহানন্দ আনন্দনে ছুটে আসতেন। বিশাল জনসমাগম দেখে মনে হত এই উৎসব শুধু তুরা বা গারো পাখাড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব নয়, সমগ্র মেঘালয়ের গৌরবের বিষয়।

বলাবাহুল্য শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব সমিতির প্রধানকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তদধীন শাখামঠসমূহে মহাসমারোহে অঙ্কুশিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর]

লেখক ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—নীলাধর চক্রবর্তী-কথিত চৈতন্য ‘স্বয়ং নারায়ণ’ কথাটি যদি সর্বাত্মক সত্য হইত, তাহা হইলে সে কথা শুধুমাত্র চৈতন্য ভাগবতে থাকিত না—সেক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত্তেও বর্ণিত হইত অবশ্যতাবীরূপে। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় নাই।

ইহার উত্তর খুবই স্পষ্ট যে, “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তের” নীলাধর চক্রবর্তী শিশু-চৈতন্যের ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে ‘নারায়ণ’-শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন ;—

“চিহ্ন দেখি’ চক্রবর্তী বলেন হাদিয়া।

লগ্ন গণি’ পূর্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥

বজ্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।

এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে-সব লক্ষণ ॥

তথাহি সামুদ্রকে তৃতীয়-শ্লোক :—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূত্রঃ সপ্তরক্তঃ ষড়্রতঃ।

ত্রিহস্ত-পৃথু-গভীরো দ্বাত্রিংশলক্ষণো মহান্ ॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত ত্রিহস্ত-চরণ ॥

এই শিশু সর্বলোকে করিবে তারণ ॥

এই ত’ করিবে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ॥

ইহা হৈতে হ’বে দুই কুলের নিস্তার ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ১৪।১৩-১৭)

শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসীতে অবস্থানকালে কানীবাসী একদণ্ডী শাক্তর সন্ন্যাসি-গণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার-মানসে জ্ঞানৈক বিপ্র-কর্তৃক অহুত-হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকারপূর্বক সন্ন্যাসীদের সভায় গিয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পরে তাঁহাদের নিকট বেদান্তসূত্রের মন্ত বিবৃত করিয়া মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বহু শাস্ত্রযুক্তি-অবগে সন্ন্যাসিগণনহ তাঁহাদের গুরু শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী মিন্ধিশেষবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদেত অসারতা উপলব্ধি করেন ও সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ’ বলিয়া স্তব করেন। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ বর্ণিত আছে,—

“এইমত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।

সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥

বেদময়-মুক্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ক্ষম অপরাধ,—পূর্বে যে কৈলু নিন্দন ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪৭-১৪৮)

শ্রীমদমহাপ্রভুকে দেখিয়া লব্ধহুত্ব লোকের নারায়ণ-বুদ্ধি হয়।—

লোকে কহে—‘সন্ন্যাসী তুমি জগদ-নারায়ণ ॥’

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১০২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যত্র দৃষ্ট হয়;—প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জ্ঞানৈক শিষ্য সভাস্থলে সমালোচনা-মুখে মহাপ্রভুকে ‘নারায়ণ’ জ্ঞান করেন।

“প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।

সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ’।

‘ব্যাসসূত্রের’ অর্থ করেন অতি-মনোরম ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৩-২৪)

“শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে” মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দ-সমীপে এক বিপ্র শ্রীমদমহাপ্রভুর মধ্যে ভাগবত-কথিত ঈশ্বর-লক্ষণসমূহের বিত্তমানতা জ্ঞাপন করেন,—

এক বিপ্র দেখি’ আইলা প্রভুর ব্যবহার।

প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥

“এক সন্ন্যাসী-আইলা জগদাধ হৈতে।

তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥

সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন ।
 প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চন-বরণ ॥
 আজাহুলদিত ভুজ, কমল-নয়ন ।
 যত কিছু দেখরের সর্ব সঙ্গক্ষণ ॥
 তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—‘এই নারায়ণ’ ।
 যেই তাঁয়ে দেখে, করে কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন ॥
 ‘মহাভাগবত’-লক্ষণ শুনি ভাগবতে ।
 সে-নব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥
 ‘নিরন্তর কৃষ্ণনাম’ জিহ্বা তাঁর গায় ।
 দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥
 ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ।
 ক্ষণে হহকার করে,—সিংহের গর্জম ॥
 জগৎমঙ্গল তাঁর ‘কৃষ্ণচৈতন্য’-নাম ।
 নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ১৭।১০৫-১১৩)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ’-কথাটি চৈতন্যচরিতামৃতেরও বহুবার স্বীকৃত হইয়াছে। স্মরণ্য চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত—দুইটি গ্রন্থেই অভিন্ন কথার উল্লেখ থাকায় লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠার বক্তব্য অনুযায়ী চৈতন্য ‘স্বয়ং নারায়ণ’ কথাটি সর্বাস্তম্য বলিয়া স্বীকার করিবেন ত ?

লেখক আরও লিখিয়াছেন—‘সেই চির শাস্তত স্মৃষ্ হলো ‘মাছুষ চৈতন্য’ । ‘তগবান চৈতন্য সেই স্মৃষ্কে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ-স্বরূপ আভরণ মাত্র ।’ এই কথাটির প্রমাণের জন্য লেখক যে একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত অবস্থায় অধৌক্তিক ও অনত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই ঐ উদাহরণের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত বক্তব্যটির অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

লেখক বলিতে চাহেন—‘মাছুষ চৈতন্য’ হইতেছেন চির শাস্তত স্মৃষ্। এস্থলে লেখক শ্রীচৈতন্যকে জন্ম-মরণশীল মাছুষ জ্ঞান করিতেছেন। মানবাত্মা শাস্ত হইতে পারে, কারণ গীতাতে জীবাত্মাকে “অজো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং” বলা হইয়াছে, কিন্তু দেহকে আত্মা মনে করা বিবর্ত বা ভ্রান্তি। তাই মনুষ্য-দেহ শাস্ত হইতে পারে না।

‘ভগবান্ চৈতন্ত’ সেই ‘মাহুঘ চৈতন্ত’ রূপ শাস্ত্রত সূর্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৃত্রিম মেঘ স্বরূপ আভরণ মাত্র—বলিয়া লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলে ভগবান্ চৈতন্ত কৃত্রিম মেঘস্বরূপ হইয়া যান। সূর্য্যকে কি মেঘ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? মাহুঘের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হয়। স্বপ্রকাশ সূর্য্য নিরন্তরই নিখল। সূর্য্যকে প্রচ্ছন্ন ঢাকিয়া রাখার মত কৃত্রিম মেঘ থাকে না। ভগবান্ চৈতন্ত কৃত্রিম মেঘস্বরূপ আভরণমাত্র বলিলে সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ চৈতন্তের কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। ‘ভগবান্’ শব্দের অর্থে ‘ভগ’ আছে বাঁহার, তাহাকে ভগবান্ বলা হয়। ‘ভগ’ বলিতে বুঝায়—

“ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্ত বীর্য্যস্ত যশসঃ প্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব বলাং ভগ ইতীদৃশা ॥”

অর্থাৎ,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তিমত্তা, যশঃপূর্ণতা, সৌন্দর্য্যপূর্ণতা, সমগ্র জ্ঞানজনিত চিৎস্বরূপ বস্তু এবং বৈরাগ্য-সমন্বিত স্বতন্ত্রতা ও নির্লিপ্ততা—এই ছয় চমৎকারিতা শ্রীভগবানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। কৃত্রিম মেঘ আদল মেঘেরই মত এবং তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টি করিতে পারেন; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের উপর আর কে আছেন, যিনি কৃত্রিম ভগবান্ সৃষ্টি করিবেন? হুশ্চর-তপস্তালভ্য ভগবান্ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাভাবচ্যুতি-সুবলিত চৈতন্তরূপে মাহুঘের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া মাহুঘের রূপ ধারণ করিয়া অনর্পিতচর ব্রজপ্রেম-সুধারস জগৎকে বিলাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্তদেব মানবের জ্ঞান দেহ-সম্মিষ্ট ও মানবোচিত বহু কার্য্য করিলেও পাক্ভৌতিক শরীরধারী নহেন। বাঁহাদের বিষৎ-প্রতীতি উদ্ভিত হইয়াছে, তাঁহারাই চৈতন্তদেব-স্বরূপকে ‘নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব’ বলিয়া বুঝিতে পারেন। শ্রীচৈতন্তাবতার সাক্ষাৎ নারায়ণ; জগদুদ্ধারার্থ তাঁহার নরলীলা।

“মহুঘ্য নহেন তি’হো—নর-নারায়ণ।

নররূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১২৩)

এমতাবস্থায় লেখকের পুস্তকে চিরশাস্ত্র সূর্য মাহুঘ চৈতন্ত, আর ভগবান্ চৈতন্ত সেই সূর্য্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৃত্রিম মেঘ স্বরূপ আভরণ মাত্র—কথাটির অর্থোক্তিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

আবার ৩০ পৃষ্ঠায় শেবাংশের বক্তব্যে দেখা যায়—‘যদিও চরিতামৃত চৈতন্তকে একাধিকবার ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা ভক্তের তুলিতে আঁকা মিছক ভগবানের ছবি।’

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন আনে যে, চৈতন্তদেব ভগবান্ হিসাবে কি কেবল ভক্তের

তুলিতেই শোভা পাইয়াছেন? গোড়াধক্ষ যবন রাজা—হসেন শাহ বাদশাহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন।

“রাজা কহে শুন, মোর মনে যেই লয়।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহ নাহিক সংশয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮০)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখা যায়,—মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যোন্মেষপূর্বক বাদশাহের প্রভুকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া প্রতীতি,—

“হিন্দু ধারে বলে ‘কৃষ্ণ’, ‘খোদায়’ যবনে।

সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে ॥

* * *

তঁাহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।

ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে?”

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৫৫, ৫৮)

এহলে বাদশাহ হসেন শাহের বক্তব্য কি ভক্তের তুলিতে আঁকা নিছক ভগবানের ছবি হইতে পারে? হসেন শাহ কি কখনও মহাপ্রভুর শিষ্টাঙ্গ গ্রহণ করিয়া ভক্ত হইয়াছিলেন?

আবার চৈতন্যচরিতামতে দৃষ্ট হয়,—মহাপ্রভুর প্রতি বৌদ্ধাচার্য্যের ষড়মুখ নিষ্ফল হইলে ও পাষণ্ডী বৌদ্ধদের শাস্তি হইলে গুরুর দশা-দর্শনে বৌদ্ধ-শিষ্টগণের মহাপ্রভুর চরণে শরণাগতি,—

“হাহাকার করি’ কান্দে সব শিষ্টগণ।

সবে আমি’ প্রভু-পদে লইল শরণ ॥

তুমি ত’ ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।

জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৫৭-৫৮)

এইভাবে পাষণ্ড আচরণকারী বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করার পর বৌদ্ধগণকে মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম-দীক্ষা দান করেন। সুতরাং বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর ভক্ত হইবার পূর্বেই যে তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেন, তাহাও কি ভক্তের তুলিতে আঁকা ভগবানের ছবি?

(৫) লেখক ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“আমরা জানি, চৈতন্য প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। বরং বৈষ্ণব বিদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু সুপণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, অদ্বৈত পণ্ডিত তাঁর বিজ্ঞা-বুদ্ধি ও ধী শক্তির জোরে চৈতন্যকে টেনে এনেছিলেন বৈষ্ণব শিবিরে।”

আবার ২০০ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন,—“১৬।১৭ বছর বয়সে নিমাই অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে বেদ ও ভাগবত পাঠ নিয়েছিলেন।”

লেখকের উক্ত বক্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, চৈতন্যের ১৬।১৭ বৎসর বয়সের পূর্বে লেখকের মতে চৈতন্য বৈষ্ণব-বিদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু লেখকের ঐরূপ ধারণার ভিত্তি কোথায়? লেখক ‘নিবেদনে’ লিখিয়াছেন,—‘ধর্ম-সংস্থাপনার্থ’র উদ্দেশ্যে...অবিশ্বাস্যদ্বী চৈতন্যের আবির্ভাব। লেখকের নিবেদনের বক্তব্য সত্য হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হইলে তিনি কি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব-বিদেষ্টা হইতে পারেন? লেখক মহাশয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-বিদেষ্টা বলিলেই ত’ হইবে না, তাহার প্রমাণ কোথায়?

লেখক “চৈতন্যচরিতামৃত” ও “চৈতন্যভাগবত”—এই দুইটি প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, শিশুকালে নিমাইকে একমাত্র হরিনাম ব্যতীত নাহুমা দিব্য আর কোন উপায় ছিল না।—

“ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।

নারী সব ‘হরি’ বলে;—হাসে গৌরধাম ॥” (চৈ: চ: আদি ১৪।২২)

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোক্রমবীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশ পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে, প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা একাদশী দিবসে প্রচুর পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অর্থাৎ শিশু নিমাই সেই নৈবেদ্য খাইবার আশায় তাঁহার পিতাকে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ীতে পাঠান। হিরণ্য-জগদীশ শিশু নিমাইয়ের প্রার্থনা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, শিশু নিমাইয়ের মধ্যে অবশ্যই কোন ঐশী শক্তি আছে।

“তুই বিপ্র বোলে,—মহা অভূত কাহিনী!

শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥

কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।

কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর ॥” (চৈ: ভা: ৫।২৮-২৯)

“এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।

হৃদয়ে বলিয়া সেই বোলায় বচন ॥

মনে ভাবি’ তুই বিপ্র মর্ক-উপহার।

আনিয়া দিলেন করি’ হরিষ অপার ॥” (চৈ: ভা: ৫।৩১-৩২)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।

অধোক্ষমে অহৈতুক্য ভক্তি বিশ্বশৃণু ॥

অতঃ ধর্ম বহুজপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ {	১৫ কেশব, ক্ষীরোদশাখা, ৫০৪ শ্রীগৌরান্দ ৩০শে কাব্রিক, শনিবার, ১৩৩৭, ইং ১৭।:১১৩০	} ৯ম সংখ্যা
------------	--	-------------

সামুদ্রাদং

শ্রীচতুর্থ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্ততিঃ

[শ্রীমদগার্সংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্ব-সংবাদে
ব্রহ্মস্তুতো নবমোহধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মাবাচ,—

১। কৃষ্ণায় মেঘবপুষে চপলাস্থরায়

পীযুষমিষ্ট-বচনায় পরাৎপরায় ।

বংশীধরায় শিখিচন্দ্রকয়াদিতায়

দেবায় ভ্রাতৃসহিতায় নমোহস্ত তস্মৈ ॥ ১ ॥

[গোলোকপতি দাক্ষাৎ হরিকে গুপ্ত গোপালবেশে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা
পূর্বকর্ম শ্রবণ করত ভীত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণকে প্রণম্য করিবার জন্ত স্বীয় বাহন

হইতে অবতরণপূর্বক লঙ্কায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন । তিনি ঈশকে বারবার প্রণামপূর্বক অর্ঘ্য প্রদান করিয়া দণ্ডের দ্বারা ভূপতিত হইলেন । তিনি ভক্তিমুক্তচিত্তে করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ লুপ্তিত হইয়া গদগদ-বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—]

ব্রহ্মা বলিলেন,—মেঘকান্তি, চপলাধর, অমৃততুল্য-মিষ্টিভাষী, পরাংপর, বংশীধর, বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণদেবকে ভ্রাতা বলরামসহ নমস্কার করি ।১।

২ । কৃষ্ণস্ত সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমঃ স্বয়ং
পূর্ণঃ পরেশঃ প্রকৃতেঃ পরো हरिः ।
যশ্চাবতারংশকলা বয়ং সুরাঃ
সৃজান বিশ্বং ক্রমতোহস্ম শক্তিভিঃ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, পূর্ণ, পরেশ, প্রকৃতির অতীত এবং পরব্রহ্ম হরি । আমরা দেবগণ বাঁহার অংশ ও কলাবতার ; তাঁহার শক্তিতেই আমরা ক্রমশঃ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ২ ॥

৩ । স ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারো
নন্দস্তাপি পুত্রতানাগতঃ কো ।
বৃন্দারণ্যে গোপবেশেন বৎসান্
গোপৈশ্চুর্থেষ্যচারয়ন্ ভ্রাজসে বৈ ॥ ৩ ॥

সেই তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং পৃথিবীতে নন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ । তুমি প্রধান প্রধান গোপগণের সহিত গোপবেশে বৃন্দাবনে গোচারণ করিয়া বিরাজ কর ॥ ৩ ॥

৪ । हरिं कोटिकन्दर्प-लीलाभिरामं
स्फुरत्कौस्तुभं श्यामलं पीतवस्त्रम् ।
ব্রজেশন্ত বংশীধরং রাধিকেশং
পরং সুন্দরং তং নিকুঞ্জে নমামি ॥ ৪ ॥

কোটী কন্দর্পের লীলায় অতিরাম, স্ফুরৎপ্রভ-কৌস্তুভ-ভূষণ, শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র, বংশীধর, ব্রজেশ, রাধিকেশ, পরমসুন্দর হরিকে নিকুঞ্জমধ্যে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

৫ । তং কৃষ্ণং ভজ হরিমাদিদেবমস্মিন্
ক্ষেত্রজং খমিব বিলিপ্ত-মেঘমেব ।

স্বচ্ছাদং পরমধিযজ্ঞ-চৈত্যরূপং

ভক্ত্যাদ্যৈর্বিশদ-বিরাগভাব-সজ্জৈঃ ॥ ৫ ॥

যিনি আকাশে বিলিপ্ত মেঘের ন্যায় এই দেহের ক্ষেত্রজ, যিনি অধিযজ্ঞের চৈত্যস্বরূপ, স্বচ্ছাদ পরব্রহ্ম এবং যিনি নির্মল ভক্তি আদি বিশদ বিরাগভাবলভ্য, সেই আদিদেব হরি কৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

৬। যাবন্মনশ্চ রজসা প্রবলেন বিদ্বন্

সঙ্কল্প এব তু বিকল্পক এব তাবৎ ।

তাভ্যাং ভবেনমনসিজস্বভিমানযোগ-

স্তেনাপি বুদ্ধিবিকৃতিং ক্রমতঃ প্রযাস্তি ॥ ৬ ॥

হে সর্বজ্ঞ! যখনই মনে রজোভাবের উদয় হয়, তখনই মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক হইয়া থাকে; সেই সঙ্কল্প-বিকল্পবশে মন হইতেই অভিমান জন্মে; আর তাহাতেই ক্রমে বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয় ॥ ৬ ॥

৭। বিদ্যাদ্যুতিস্তুতুগুণো জলমধ্যরেখা

ভূতোন্মুকঃ কপটপান্থয়তির্ঘণা চ ।

ইথাং তথাশ্চ জগতস্তু সূখং মূষেতি

দুঃখাবৃতং বিষয়ঘূর্ণমলাত-চক্রম্ ॥ ৭ ॥

কণহায়াঁ বিদ্যাত্তের চমক, স্বতুর গুণ, জলমধ্যগত রেখা, পিশাচের আঙন এবং কপট পথিকের রতির মত জগতের সূখ মিথ্যা, উহা অলাতচক্রবৎ ॥ ৭ ॥

৮। বৃক্ষা জলেন চলতাপি চলা ইবাত্র

নেত্রেন ভূরিচলিতেন চলেব ভূশ্চ ।

এবং গুণৈঃ প্রকৃতিজৈর্ভর্মতো জনস্বং

সত্যং বদেদগুণসুখং ইদমেব কৃষ্ণ ॥ ৮ ॥

দুঃখাবৃত বিষয়মোহে ঘূর্ণ্যমান নেত্র সত্যন্ত ঘূর্ণিত হইলে যেমন অচলা ভূ চলিতবৎ প্রতিভাত হয়, তরুগণ না চলিলেও জল চলিত হওয়ায় চলার মত দেখায়। হে কৃষ্ণ! এইরূপ প্রকৃতি-প্রসূত গুণবশতঃ ভ্রান্ত জগৎ তাদৃশ সূখকে সত্য বলিয়া ধারণা করে ॥ ৮ ॥

৯। দুঃখং সুখক্ মনসা প্রভবক্ সুপ্তে

মিথ্যা ভবেৎ পুনরহো ভুবি জাগরেহস্ম ।

ইথাং বিবেক-ঘটিতস্ত জনস্ত সর্বং

স্বপ্ন-ভ্রমাদৃত-জগৎ সততং ভবেদ্ধি ॥ ৯ ॥

স্বপ্ন ও ভ্রম মনের দ্বারাই উদ্ভূত হয়, স্বপ্তাবস্থায় তাহা লুপ্ত হইয়া থাকে ; আর জাগরণকালে তাহা পুনরায় অনুভূত হয় ; যাহার এই বিবেক আছে, তাহার নিকট এ জগৎ সতত স্বপ্নভ্রম বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

১০। জ্ঞানী বিশৃঙ্খল মমতামভিমান-যোগঃ

বৈরাগ্যভাব-রসিকঃ সততং নিরীহঃ ।

দীপেন দীপকশতঞ্চ যথা প্রজাতং

পশ্যন্তথাঅবিভবং ভুবি চৈকতত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানী মমতা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্বদা বৈরাগ্যভাব-রসিক ও নিরীহ হইবেন এবং একটা দীপ হইতে যেমন শত শত দীপের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্মা হইতে সমস্ত উৎপন্ন—এই একমাত্র তত্ত্ব দর্শন করিবেন ॥ ১০ ॥

১১। ভক্তো ভজেনজপতিং হৃদি বাসুদেবং

নিধূর্মবহ্নিরিব মুক্তগুণঃ স্বভাবঃ ।

পশ্যন্ ঘটেষু সজ্জলেষু যথেন্দুমেক-

মেতাদৃশঃ পরমহংসবরঃ কৃতার্থঃ ॥ ১১ ॥

ভক্ত নিধূর্ম বহ্নিশিখার ন্যায় গুণবৃত্ত ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া হৃদয়ে ব্রহ্মেশ বাসুদেবের ভজনা করিবেন ; আর একই চন্দ্রবিধ যেমন ঘটমধ্যস্থ জলেও দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মার একত্ব দর্শনে শ্রেষ্ঠ পরমহংসও কৃতার্থ হইবেন ॥ ১১ ॥

১২। স্তবন্তি বেদাঃ সততঞ্চ যং সদা

হরের্মহিম কিল ষোড়শীং কলাম্

কদাপি জানন্তি ন তে ত্রিলোকে

বক্তুং গুণাংস্তস্মৈ জনোহস্তি কঃ পরঃ ॥ ১২ ॥

বেদসমূহ সতত যাহার মহাত্মা কীৰ্ত্তন করিতে গিয়া, কখনও তাহার ষোড়শাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না, ত্রিলোকে সেই হরির গুণবর্ণনে অপর কে সমর্থ হইবেন ? ১২ ॥

নামাশ্রয়ের ফল

পূর্ণতম ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা দেদীপ্যমান আছে। মধুর রসাস্রিত শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ অপ্রাকৃত দেহে তাহা অম্লভব করিয়া থাকেন। সেই অষ্টকাল লীলার মধ্যে সন্তোগ-বিপ্রলম্বরূপে দ্বিবিধ রস। শ্রীমতী রাধিকা ও তৎপরিচারিকাগণ তাহা আন্বাদন করেন। বিপ্রলম্ব ব্যতীত সন্তোগের স্ফূর্তি হয় না, এজন্য অষ্টকালীয় লীলা মধ্যে সময়ে সময়ে পূর্বরাগ, বিরহ ইত্যাদি ভাব হইয়া থাকে। সে মাধুর্য্য নব নবভাবে প্রকটিত হন, এককালে সমস্ত ভাবোদয় হয় না।

শুকনাম-পরায়ণ ভক্ত-পুরুষ নামান্বাদকালে যখন ভক্তিশ্রোতে ভাসিতে থাকেন, তখন তাহার অপ্রাকৃত দেহে সমস্ত তত্ত্ব আনিয়া উদ্দীপিত হয়। ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন সে লীলা প্রকটিত করেন, শুদ্ধভক্ত নামের বলে অনায়াসে তাহা দেখিতে পান। ইহা শাস্ত্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তদ্বারা কিছুই অবগত হওয়া যায় না। একমাত্র সদ্গুরু আশ্রয় করিয়া নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে স্বল্পদিন মধ্যেই অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীনামে নির্ভা হইলে সমস্ত সিদ্ধিই হয়। নামাপরাধ থাকিলে নামের ফল হয় না। ভেমনি হৃদয়-দৌর্বল্য, অসতৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইলে ভক্তিনিষ্ঠা হয় না। যাহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব পাইবার প্রয়াসী তাঁহারা সর্বত্রই অনর্থমণ্ডলী যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহারই উপায় করিবেন।

অনর্থ একদিনে যায় না, নিরপরাধে নাম করিবার যত্ন পাইলে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়। এই অনর্থই ভজনের প্রতিকূল। অনর্থ থাকিলে কোনক্রমেই ভজনোন্নতি হইবে না। অনর্থ-চতুষ্টয় এককালে নিবৃত্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ক্রমোন্নতি অমুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; শুদ্ধ নামোদয় হইলে সেই কৃষ্ণনাম রূপ হইয়া দর্শন দেন, সে রূপটী স্তম্ভবর্ণ। ক্রমে গুণোদয় হইলে শ্রীগোপীবল্লভের অসাধারণ গুণ উদ্দীপিত হয়। সিদ্ধি হইলে লীলা দর্শন-ফলে ব্রজগোপীদিগের পরিচারিকা মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায় এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল দেবা-সুখ সন্তোগ করেন। নিকপটে সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীমাম পাইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই সকল বস্ত্র সিদ্ধি হয়, আর পরজন্মের অপেক্ষা থাকে না। চিন্ময় নামানন্দে চিত্তের বিচিত্র ভাব উদয় হয়। সে বিয়ল আনন্দের নিকট কৰ্ম্মযোগ-ধ্যান কিছুই

নয়। নাম অপেক্ষা আর কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নয়। সর্ব ত্বাপেক্ষা শ্রীহরিনাম সর্বশ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ভক্তের জীবন-স্বরূপ। শ্রীচরিতামৃত;—

কলিযুগে যুগধর্ম নামের প্রচার।

তীর্থ লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

গুণাবতারের নিগূঢ় ভাব অন্তর্কর্ষি: ভেদে দ্বিবিধ। অন্তরে ব্রজভাব, পারকীয় রস, নব নটবর, গোপবেশ, বনমালা গলদেশে, পীতাম্বর পরিধান, মূলীবাদন ইত্যাদি; বাহ্যে রাধা-ভাব-কান্তি, প্রেমভক্তি আনন্দন করত জীবগণকে শিক্ষা দেওয়া এবং জগদাচার্য্যরূপে শ্রীমায় প্রচার। সেই নাম হইতে অন্তর্ভাব প্রকাশ করিয়া মধুর নামে মধুর রস বিলাইয়াছেন। তাহা শুদ্ধ ভক্ত মহাজনগণ প্রেম-চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রজরস সমুদ্র-বিশেষ। তাহা একবিন্দু পাইলে জীব আপনাকে ভুলিয়া যান। তিনি সংসারে থাকিয়াও ব্রজমাধুর্য্য আনন্দন করত চিদেহদ্বারা সমস্ত সৃষ্টাঙ্কভব করিয়া ছদ্মাবতারের নিগূঢ় ভাব সমুদয় অবগত হন। শ্রীধামমাহাত্ম্যে :—

দাস্ত্র পরিপকে যবে জীবের হৃদয়ে।

শ্রীমধুর রস উদে নুর্ভিমান হয়ে ॥

সে-সময় ভজনীয় তব গৌরহরি।

রাধাক্ষররূপ হয়ে ব্রজে অবতরি ॥

নিত্যলীলা-রসে সেই ভক্তকে ডুবায়।

রাধাক্ষর-নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায় ॥

শ্রীমদ্রামপ্রভুর শিক্ষানুসারে যাহারা নামাশ্রয় করেন তাঁহারা অচিরে দেখিতে পান যে, কৃষ্ণনামই চরমে প্রেমরূপে প্রকাশিত হন। অন্তপ্রকার রসাপেক্ষা পারকীয় মধুর রস সর্বশ্রেষ্ঠ। এই রসে অধিক মাধুর্য্য থাকায় মধুর-রস নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ-দর্শন নহে। আমি বিগ্রহ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিয়া সুখী হইলে পরম মঙ্গল হয়। ভগবান্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

তৃতীয় জন্ম

অনেকের নিকট ‘তৃতীয় জন্ম’ নৃতন^১ কথা হইলেও শাস্ত্রে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভার্গবীর মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীতিগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন—“মাতুরগ্রেহদিজ্ঞানং দ্বিতীয়ং মোক্ষিবন্ধনং। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং বিজ্ঞপ্ত শ্রুতিচোদনাং॥” উপনীত বিজ্ঞ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদশ্রবণ (মধ্বজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। প্রথমে মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি লাভপূর্বক যথাবিধি সাবিত্র্য সংস্কার হইলে, আসার্য্য পিতা ও গায়ত্রী মাতা হইতে জাত হওয়ায় দ্বিতীয় জন্ম। আর বিজ্ঞ দীক্ষিত অবস্থায় ভগবৎদেবায় অধিকার পাইলে, গুরু পিতা ও ময়দীক্ষা মাতা হইতে তৃতীয় জন্ম। এইরূপে অধিরোহ-মার্গে প্রথমে শরীর জন্ম, দ্বিতীয় মানস ও তৃতীয় আত্মাভাসিক জন্ম—এই ত্রিবিধ জন্ম পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ত্রিবিধ জন্মকে যথাক্রমে শৌক্ৰ, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম বলিয়াছেন—“কিং জন্মতিপ্রিতি-বেহ শৌক্ৰনাবিত্র্যযাজ্ঞিকৈঃ।”

“ধিগ্ জন্মনজিবৃদ্ধ যন্তুধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞত্বাম্” (ভাঃ ১০।৩১)—শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন,—“ত্রিবৃৎ শৌক্ৰং নাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। গুরুদয়ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যাংমুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া।” বিশুদ্ধ মাতাপিতাজাত বলিতে “ব্রাহ্মণাদ্ভ্রাক্ষণ্যং জাতঃ” ইহাই বুঝায়। ব্রাহ্মণ হইতে যিনি স্বীয় বংশপ্রণালী অবিচ্ছেদে দশসংস্কারকৃত পিতৃপুরুষগণের নির্দেশ করিতে পারেন, আর বংশে কুত্ৰাপি অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই বা প্রত্যেক গর্ভাধানকালে তদুপযোগী সংস্কার অব্যাহত হইয়া আসিতেছে, ইহাও নির্দেশ করিতে পারেন, তিনিই শৌক্ৰ ব্রাহ্মণ। “অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত” এই শ্রুতিবচন বা “গর্ভাষ্টমেহস্বেনে কুবীত ব্রাহ্মণস্তোপনয়নম্” এই স্মৃতিবচন-নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ শৌক্ৰ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেবল যাহারা কয়েকপুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সম্ভানবর্গকে লক্ষ্য করে না, অথবা যাহাদের কুলে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা যাহাদের বংশে একটী মাত্র গর্ভাধান বা অন্য সংস্কার অসিদ্ধ বা অসম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করে না। “কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ” অর্থে যাহারা অন্তর্বর্ণোদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও বেদাভ্যাস শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বৃত্ত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

যেমন ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্য ব্রাহ্মণগণ, মুদগল রাজ হইতে মোদগল্য ব্রাহ্মণগণ, উরুশী-গর্তজাত মিত্র-তনয় মহর্ষি বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এক্রপ অসংখ্য বংশ বিদ্যমান—তাঁহারা বিদ্বৎ শৌক্য ব্রাহ্মণ না হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের মূল ভিত্তি বৃহৎ ব্রাহ্মণতা যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচিত সন্মান অব্যাহত থাকিবে। যদি কোন শৌক্যব্রাহ্মণ বা বৃহৎ-ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণোপেত না হন, তবে তাঁহারা উভয়েই সমভাবে পতিত। মহাভারত বনপর্ক ২১৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে “ব্রাহ্মণঃ পতনমীয়েষু বর্তমানো বিকর্যহু। দান্তিকো দ্রুহতঃ প্রোজ্জঃ শূদ্রো সদৃশো ভবেৎ॥” এ সকল শাস্ত্র-নির্দেশানুসারে কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বৎ শৌক্য ব্রাহ্মণ কাহারো ও কাহারো নহে, ইহার নির্ণয় নাই। সূতরাং অধিরোগবাদ-বিচারে যথার্থ দ্বিজ ও ত্রিজের পরিচয় একান্ত দুর্লভ। কিন্তু যাহারা বেদান্ত আগমশ্রবণ করিয়া অবরোহ বা অবতার মার্গে গুরুপরম্পরাগত প্রণালীতে ক্রমোক্ষর-সেবা জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা আগমোক্ত উপায়ে সংস্কারস্ফোরক যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন। কলিকালে তত্ত্বিন্ন শুদ্ধত্বের আর কোন উপায় নাই।

“শুভ্রাঃ শূদ্রল্লা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসমুত্বাঃ।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতব্যাধীনা॥”

সূতরাং সকল ব্রাহ্মণেরই এখন সাত্বত আগম, তত্ত্ব বা পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে; যেহেতু শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ করিতেছেন যে কলিজাত ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ—শৌক্য-পারম্পর্যের বিদ্বৎতা বঞ্চিত হয় না, অতএব তাঁহার অশুদ্ধ অবস্থায় শ্রৌতবিধি অনুসারে সাবিত্র্য সংস্কার হইতেই পারে না, তিনি দ্বিজই হইতে পারেন না, ত্রিজ ত’ দ্বয়ের কথা। বেদান্ত সাত্বত আগম-মুদ্রায় অশুদ্ধ অবস্থাতেই দীক্ষাধারা শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, অল্প উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা হইতেই পারে না। যিনি যে কুলেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, তথা-কথিত ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন বা অবরকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে শুদ্ধ হইতে হইলে কনিতে প্রথমে বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি-অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বের অধিকার সংগ্রহপূর্বক সাবিত্র্য সংস্কারের চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন, “যথা কাক্ষনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।” নরমাত্রেয়ই যথার্থ বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিমতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে দ্বিজত্ব সাধিত হয় ও তখনই তদুচিত উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য নিত্যাদি নিত্যশুদ্ধ

পরমহংসগণ বর্ণাশ্রমাতীতত্ব—তঁাহাদিগকে আর নূতন করিয়া গুহ্য হইতে হয় না ; সুতরাং তঁাহারা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তাই বলিয়া তঁাহাদের ত্রিজন্মের অভাব নাই। তঁাহারা ব্রাহ্মণের গুরু—ব্রাহ্মণ তঁাহাদিগের দান। তঁাহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণাবর—এরূপ বলিলে বৈষ্ণবাচার্য্য বিপ্রবরকে শূদ্রবুদ্ধিকারীরা ত্রায় অনন্ত নিরয়বাসই প্রাপ্যফল হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্বে হংস বলিয়া একবর্ণ ছিল, পরে গুণবৃত্তিবিচারে চতুর্বর্ণবিধান চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে,—প্রথমে চতুর্বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য চাতুর্বর্ণ্য ও চতুর্বর্ণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। স্বধীগণ একথা ভাল করিয়া বিচার করিবেন। ঐভাবে চাতুর্বর্ণ্য-প্রবর্তনের পর বিস্তৃতভাবে পিতা হইতে পুত্র বর্ণ সঞ্চারিত হইবারও প্রণালী স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই নাম শৌকবর্ণ। কিন্তু শৌক প্রণালীই বর্ণনির্ণয়ের একমাত্র পন্থা নহে—ইহা শাস্ত্রাধীতী প্রত্যেকেই জানেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে একাশী জন ব্রাহ্মণ, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং নয়জন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, গুংসমদের শৌনহাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব ও শূদ্রপুত্র ছিল, ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র জয়াক্ষি, কবি, পুংরাক্ষী ব্রাহ্মণ হন, অজমীররাজের বংশে ত্রায়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাত হন, আরও ৫৩শত উদাহরণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীমাহাজ-আচার্য্যপ্রভুর গুরু শঠকোপ দাস শূদ্রকুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীল রমিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীল রঘুনন্দন-বংশে, শ্রীহরিহোড়বংশ প্রভৃতিতে আজও বিজয়সংস্কার অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই দীক্ষাবিধান-মিচ্ছ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অভিজ্ঞ ব্যক্তি চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বিত হইবার কোন কারণ নাই।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

“আমি অধিক বুঝি, আর অশু গুরু আনিয়া আমায় কি উপদেশ দিবেন”—এইরূপ অহঙ্কারকারিজনদের অপরাধ-বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং শত শত ব্যসন আনিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়।

—জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ

নিঃস্বর্ত্তে নিগুণ-দানস্থলেই মঠ- মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ
কংসটীলা, মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ৫।২।৬২

স্নেহাঙ্গদেবু—

***! আমরা দান বলিতে নিঃস্বর্ত্তে দান করাকেই বুঝি। তাহাই সাত্ত্বিকদান। সাত্ত্বিকদান না হইলে ভগবৎসেবায় লাগে না। ভগবদ্ভক্তের হাতে ঐ প্রকার দান বিত্ত্বদ্ধমত্রে অর্থাৎ নিগুণরূপে পরিণত হয়। তাহা আমতল্যায় সম্ভবপর হওয়া কঠিন।

ভুবনবাবু তাঁহার নামে কিভাবে মঠ করিবেন, বুঝিলাম না। ‘ভুবন’ বলিলে পৃথিবী বা মাটি বুঝায়। শ্রীবেদান্ত নীতিতির মঠ প্রাকৃত জগৎ, পৃথিবী বা মাটিয়া দেশের বাহিরে থাকে। সুতরাং ‘ভুবন’ নামে কোন মঠ হইতে পারে না; তবে তাঁহার নামে একটি প্রস্তর ফলক সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

তাঁহার জমির মূল্য ৫/৭ হাজার টাকা, কিন্তু আমাদের ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া মঠ-মন্দিরাদি করিতে হইবে। সুতরাং প্রাকৃত প্রস্তাবে উহা দান নহে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

সম্বন্ধ-তত্ত্ব

অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানান্ধন-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরহিষে নমঃ ॥

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে!

গোপেশ! গোপিকাকান্ত! বাধাকান্ত! নমোহস্ততে ॥

জয়তাং সুরভৌ পদোর্মম মন্দ-মতের্গতি ।

মৎসর্কস্ব-পদাভ্যোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

“সকল বেদের হয় ভগবান্ দে সম্বন্ধ ।” সমস্ত জগতের সৃষ্টির মূল যিনি, যাহাতে সমস্ত জগতের স্থিতি ও প্রলয়, যাহাতেই সমস্ত জগতের অবস্থান, তিনিই সকল শাস্ত্রের মূল বিষয় । যাহাকে সম্বন্ধ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি, তিনিই ‘ভগবান্’, তিনিই ‘সম্বন্ধ তত্ত্ব’ । কে ভগবান্ ? “কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ।” “কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ম্ ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বলা হইয়াছে,—

“জন্মান্তশ্চ যতোহবয়াদিতরতংচার্বেষভিষ্কঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা ন আদিকবয়ে মুহুন্তি যৎ সুরবঃ ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা

ধাম্না যেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥”

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অবয়ব-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম ‘স্বতত্ত্ব’ অর্থাৎ ‘স্বরূপ-তত্ত্ব’ বলিয়া স্থির হন ; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতত্ত্ব রাজা ; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্ধামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ; যাহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহূর্ত্ত মোহ জন্মিয়া থাকে ; যাহাতে তেজোবারি, মৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথগ্‌রূপ সত্তা ; যাহাতে ত্রিম প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদ্রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও দায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি—সত্যরূপে বর্তমান ; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্যকুহকশূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি ।”

“কৃষ্ণ কে ?” চতুঃশ্লোকী ভাগবতে বলিয়াছেন,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তং যৎ সদস্যং পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোহত মোহস্যাহম্ ॥

পরম নিত্য আমি এক অদ্বয় তত্ত্ব । প্রথমে আমিই ছিলাম । সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ—আমি মাত্র ছিলাম । আর কিছুই ছিল না । অসৎ অর্থাৎ আগমপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অদ্বয় সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া, যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে, তাহা আমি । অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্যের যেমন কিরণ, সর্বভূত আমার সেইরূপ শক্তি-পরিণাম । আমি পরিণত হই না । কিন্তু আমার অক্ষয় শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণ প্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগতকে প্রসব করে । সৃষ্টি হওয়াতে

আমার অদ্বৈতত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ পরিচয়। আবার প্রলয়ে আমি অবশিষ্ট একই থাকি। কেবলান্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈতবাদ, দ্বৈতান্বৈতবাদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ এবং স্তূত্বান্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদ মাত্র। সমস্তবাদের বাদস্ত্র দূর হইলে যে পরমসত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্যশক্তি পরিণামরূপ নিত্য ভেদাভেদ জ্ঞান। ইহাই সর্ববেদবাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।”

আবার বলিয়াছেন,—

“জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমমিতম্।

নরহস্তং তদদক্ষং গৃহাণ গদিতং ময়া ॥”

অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান্ কহিলেন,—“আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরমগুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটা ভেদযুক্ত—জ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্রহ্ম ও তদদক্ষ। তাহা জীব-বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না। আমার অনুরোধে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি-সম্বন্ধ, জীব আমার ব্রহ্ম, প্রধান আমার জ্ঞানাত্মী। এই চারিটা তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য ব্রহ্মগত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম।”

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাহির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥”

কৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়বিগ্রহ। তিনিই আদিপুরুষ ও সর্বকারণের কারণ।

বেদে বহুবার “অসমোঁক্” কথাটির প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, তাঁহার উঁক্ ত’ দূরের কথা, তাঁহার সমানও কেহই নাই।

“পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥”

স্বয়ং ব্রহ্মাও কৃষ্ণের বৈভব-বর্ণনে অসমর্থ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

“জ্ঞানন্ত এব জ্ঞানন্ত কিং বহুজ্ঞা ন মে প্রভো।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥

অর্থাৎ যাহারা বলেন,—‘আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি,’ তাঁহারা জানুক, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর ॥”

মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম, বৈকুণ্ঠধাম বা পরব্যোম এবং গোলোকধাম—
এই তিনধামের স্বরূপ অধীশ্বর কৃষ্ণ । তিনিই সর্ব অবতারের অবতারী ।

“ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই ত্রিষ্টাতি-ঈশ্বর ।

তিনি আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥”

কৃষ্ণই সকল প্রকার সৃষ্টির আদি কারণ ।—

“এক কৃষ্ণ-দেহ হইতে সবার প্রকাশে ।

ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥”

“কৃষ্ণাবতारे ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্ত গোবৎস ও গোপসকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু সমস্তই প্রকট করিয়াছিলেন ।”

“চিন্ময় জগৎ—একটি পদ্মরূপ ; সেই পদ্মের উচ্চ (মধ্য) ভাগ ‘কর্ণিকার’-
রূপী কৃষ্ণলোকের চতুর্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোমে বিরাজমান ॥”

“তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥

অন্তঃপুর—গোসোক-শ্রীবৃন্দাবন ।

যাহাঁ নিত্যস্থিতি মাথাপিতা-বন্ধুগণ ।

মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য কৃপাদি-ভাণ্ডার ।

যোগমায়া দাদী যাহাঁ রাসাদি লীলাসার ॥”

গোলোক শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর । এই ধামে তিনি যোগমায়ায় দ্বারা দেখ্ছায় আবরিত হইয়া সর্বজ্ঞতা সবেও অজ্ঞসীলা আশ্বাদন করিতে মাধুর্য্যের ভাণ্ডার উন্মোচিত করিয়া রাখিয়াছেন । পিতামাতা, সখা, গোপীগণসহ নিরন্তর নিত্যসীলা করিমা চলিয়াছেন । তাঁহার ভগবৎ ঐশ্বর্য্য রূপের এখানে প্রকাশ নাই । এই ধামে তাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে । ব্রহ্মা যখন সখা, গো ও বৎসসকল হরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অজ্ঞ শিশুর স্থায় ক্রন্দন করিয়াছেন । যোগমায়া আবরণ উন্মোচিত করিলে তাঁহার সর্বজ্ঞতার প্রকাশ পাইল এবং ব্রহ্মা হরণ করিয়াছেন জানিয়া তখন আবার সকলকিছু প্রকটিত করিলেন । যশোদার নিকটে শিশু ; সখাদের স্বদে উঠান, উঠেন ; গোপীদের মান-অভিমানের দাসত্ব স্বীকার ; সকলই তাঁহার মাধুর্য্যালীলার প্রকাশ । এই গোলোকধামই তাঁহার অন্তঃপুর ।

এই গোলোকধামের নিম্নে অনন্ত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম । ইহা তাঁহার মধ্যাবাস । ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি, গৃহলক্ষ্মীগণের দ্বারা সেবিত হইয়া ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ করিয়া এখানে তিনি লীলা করিতেছেন ।

“তার তলে পরব্যোমে ‘বিষ্ণুলোক’-নাম ।
 নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥
 মধ্যম-আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য-ভাণ্ডার ।
 অনন্ত-স্বরূপে ঘাই করেন বিহার ॥
 অনন্ত বৈকুণ্ঠ ঘাই—ভাণ্ডার-কোঠরি ।
 পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্যে আছে ভরি ॥”

“তার তলে বাহ্যবাস বিরজার পার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘাই কোঠরি অপার ॥
 ‘দেবীধাম’-নাম তার, জীব যার বানী ।
 জগন্নাথী রাখে, ঘাই রহে মায়া-দাসী ॥
 এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর ।
 গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥”

সমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্যষ্টিজীবের অন্তরে তিনি স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন । দেবীধামকে কৃষ্ণের একপাদ বিভূতি আখ্যা দেওয়া হয় । চতুর্মুখ ব্রহ্মার সম্মুখে কৃষ্ণের আচ্ছাদ্য দ্বারকাতে যখন দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটি, অর্কবৃন্দ মুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ আসিয়া হাজির হইলেন, তখন চতুর্মুখ ব্রহ্মা কৃষ্ণের বিভূতি দর্শনে অবাক হইয়া গেলেন । কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার অল্পমারে ব্রহ্মা ও রুদ্রগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।

“পূর্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিকপাল ।
 অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥
 তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
 দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥
 মণি পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্ঝনি ।
 পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥”

আর এই সমুদয় রাজ্যের রাজ্যলক্ষ্মীগণ সকলেই কৃষ্ণসেবিকা ।

“সেই স্বরাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণধাম ।
 অতএব বেদে কহে—স্বয়ং ভগবান্ ॥”

সুতরাং কৃষ্ণের সঙ্গেই সকল সৃষ্টির সকল ধামের নিত্য সঘন বর্তমান । কারণ সকল কিছুই কৃষ্ণ হইতেই উৎপত্তি । আবার ‘কৃষ্ণ’ অর্থাৎ তিনি সকল কিছুর মধ্যে নিজে অবস্থান করিয়া নিজের প্রতি আকর্ষণ করেন । তাঁহার

বিভূতি, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সর্বোপরি তাঁহার মাধুর্য্যময় রূপ, ওৎ, লীলার দ্বারা সকলকে তিনি হরণ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া কৃষ্ণক্ষুতি হইল।—

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণক্ষুতি হৈল।

মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥

“যন্নর্ত্তালীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহিতম্।

বিস্মাপনং স্বশ্চ চ সৌভাগ্যে: পরং পদং ভূষণভূষণঙ্গম্ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণমুক্তি স্বীয় চিহ্নভিত্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে নর্ত্তালীলার উপযোগী আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-স্বাক্ষির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ।

“কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা,

নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকের, নবকিশোর, নটবর,

নরলীলার হয় অহরূপ ॥”

অনন্ত লীলাময় কৃষ্ণ অনন্তভাবে লীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বিভিন্ন পুরুষাবতার-লীলা, নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, গুণাবতার-লীলা, আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্বিশেষ ব্রহ্মাদি-লীলা ইত্যাদি অসংখ্য সকল লীলার মধ্যে তাঁহার নরলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপ অতীব মধুর। যাহার এক কণামাত্র সমগ্র জিভুবনকে মোহিত করিতে ও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর তাঁহার মাধুর্য্যের বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়া কেবল ‘মধুর’ ‘মধুর’-শব্দে ভূষিত করিয়াছেন। এহেন কৃষ্ণের রূপের বর্ণনার ভাষা কিছুই নাই। তিনি তাঁহার নিজরূপে নিজেই চমৎকৃত।

“রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,

আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ॥”

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র ষশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য্য শ্রীভগবানে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে সমগ্র শ্রীর নাম মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যই হৈল ভগবন্তার সার নির্যাস। শ্রীকৃষ্ণ—মাধুর্য্যময়, নারায়ণ—ঐশ্বর্য্যময়। শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ‘নিখৎসর’ কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ ‘পরশ্রীকাতরতাহীন’। ‘পর’ অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ,

তাহার 'শ্রী' বা মাধুর্য্য অর্থৎ ব্রজেশ্বরী ও ব্রজগোপীকৃষ্ণ কৃষ্ণের যে মাধুর্য্যময় বিগ্রহ, সেই রূপে যে ভক্তগণ আকৃষ্ট হন, তাহারাই 'নির্য্যংসর' আখ্যায় ভূষিত । এইরূপ ভক্তগণের সেবায় শ্রীভগবান্ পরম সন্তুষ্ট ।

সেই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগঙ্গ এমনই অপরূপ, তাহা যেমন অলঙ্কারের ও অলঙ্কার । এইরূপ অপরূপ শ্রীঅঙ্গে মিলিয়াছে ললিত ত্রিভঙ্গ্যচাম, আর নেত্রের অধঃ অপাঙ্গদৃষ্টবাণদ্বারা শ্রীরাধাদেহ ব্রজগোপীগণকে বিদ্ধ করিতেছেন । এহেন মনোহররূপ প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সকল জগৎকে মোহিত করিয়া তাহাদের সকল কিছু হরণ করিয়া ফিরিতেছে । 'পতিব্রতা শিরোমণি' লক্ষ্মীগণ ও কৃষ্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পাদপদ্ম আকাজক্ষা করেন ।

তিনি বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীনমদন । রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চশরে ত্রিভুবনকে বিদ্ধ করিয়া জর্জরিত করিতেছেন । কৃষ্ণরূপে আকৃষ্ট গোপীগণ কাম-জর্জরিত হইয়া, মাত্র দুইটী আঁখি-প্রদাতা ও নিমেষ সৃষ্টিকারী বিধির নিন্দা করিয়াছেন । তাহাদের ক্ষোভ লক্ষ্যকোটি আঁখি কেন বিধি দিলেন না ?

এহেন রূপের সহিত আবার শ্রীকৃষ্ণের বেণু মাধুর্য্য যে কর্ণে প্রবেশ করে, সে কর্ণে অল্প কোন শব্দকেই প্রবেশ করিতে দেয় না ।

ঐরূপ ঐ বেণুধ্বনি সর্বোপরি তাহার গুণাবলী ঘাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মধ্যে সকলকিছু পরিত্যাগ করিয়া ঐ চরণে দাসী হইবার অভিলাষই প্রবল হইতে প্রবলতর ও প্রবলতম পর্যায়ে উঠিবে ।

সুতরাং সর্ব অখিল চিত্তধারণী মাধুর্য্যময়বিগ্রহ কন্দর্পকাস্তি শ্রীকৃষ্ণই সকল সঙ্কল্পের মূল, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সন্যস্ত-তত্ত্ব । লীলাবিস্তারে চিদচিৎ উভয় সৃষ্টির সহিত তাহার নিত্য সন্যস্ত বর্তমান । একারণেই তিনিই একমাত্র সন্যস্ত-তত্ত্ব ।

—শ্রীগৌড়ী মায়া সরকার

কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন

আদিবৃক্ষ-স্বরূপ এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহাত্মক প্রপঞ্চে প্রকৃতি-কবলিত জীবগণ লাভ-লোকসামনের খতিয়ান-সমুদায়ে নিজেদের জীবনযাত্রা মির্জাহ করিয়া থাকেন। সকলে বেণের জায় লাভের ঝুড়িটাকে পরিপূর্ণরূপে ভরাইয়া রাখিবার জন্ত সর্বদাষ্ট সচেষ্ট; জাগতিক লোকসামনের শব্দের চিন্তা মনে উদয় হইলেই তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হন। লাভ-লোকসামনের তুল্যদণ্ডে লাভের পাল্লা ভারী হইলেই তাঁহাদের খুশীর জোয়ারে ভাসিতে দেখা যায়, লোকসামনের পাল্লা ভারীতে মন বিষাদগ্রস্ত হইয়া যায়।

জড়নাভাকাজ্ঞী অর্থাৎ স্বার্থনিন্দ্রি-পরায়ণ ব্যক্তির। “যেখানে ধন, সেখানে মন” নীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্ত অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য করিতেও তাঁহারা পিছপা হন না। “দুঠের হাজারো ছল।” দুই ব্যক্তির। “হুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোণোর” জন্ত ছলপূর্বক লোকের নিকট উপস্থিত হন। মুখে রুত্রিম কৃতজ্ঞতা ও সরলতার ভাব প্রকাশ করিয়া “পিছন দিখে ছুরি মেয়ে” লোকের সমস্তকিছু আত্মনাৎ করিবার চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। “হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিয়ে ডুগুড়ুগি বাজাব”-নীতি হইতে স্বার্থান্বেষী কিছুতেই সরিয়া আসিতে চাহেন না। অন্যকে ঠকাইয়া “আপন কোলে ঝোল না টানিলে” তাঁহাদের সুখমিত্রা কিরূপে হইবে?

কাহারও নিকট জড়ভোগের পরিপূরক কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করিলেই কেহ কেহ “কৃতজ্ঞতার নামাবলী” গায়ে চাপাইয়া কৃতজ্ঞতায় গদগদভাব প্রকাশ করেন। অনেক সময় তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেও অনেক কষ্ট করিতে হয়। তাঁহাদের এই কৃতজ্ঞতার কণ্টকের অর্থাৎ কৃতজ্ঞতার পূর্ণপ্রকাশ বিত্তমান। স্বার্থে আঘাত লাগিলেই কৃতজ্ঞতার মুখোশ খুলিয়া গিয়া কৃতজ্ঞতার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আব্রহ্ম অর্থাৎ জড়ভোগের পথে বাধা পড়িলেই পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই পর অর্থাৎ ঘোরতর শত্রু হইয়া যান। সবকিছু তাঁহার নিকট বিধতুল্য মনে হয়।

কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই প্রকৃত লাভের তথ্য বিশেষভাবে অবগত আছেন। “কৃষ্ণভক্তনই অর্থাৎ পরমার্থ-ধন সঞ্চয়ই যে জীবের পক্ষে প্রকৃত লাভ” এই প্রকৃত সত্য তাঁহারা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজেদের মহাত্ম্যভবতার পরিচয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির। ‘আকাশে মৃগাঘাতের’

জ্ঞায় ভক্তের বাক্যকে অবমাননা করিতে গিয়া নিজেদের হাত্মাপদ করিয়া তুলেন।

শ্রীভগবান্ জীবের হৃৎথে কাতর হইয়া সেই হৃৎথের বিমোচন-কল্পে কতই না দয়া করিয়া থাকেন। জীবনধারণের সমস্ত কিছু উপাদান তিনি সকলের জন্ত পৃথিবীতে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অফুরন্ত দান গ্রহণ করিয়াই জীবগণ অতিযত্নে লালিত-পালিত হইতেছে। তথাপি জীব অকৃতজ্ঞতাবশে তাঁহার ভজন করে না। প্রতাপকার বুদ্ধিতেও যদি হৃৎথীজনগণ তাঁহাকে তাঁহাদের হৃৎথের আসানকারী জানিয়া ভজন করেন, তাহা হইলেও ভগবদ্-বৈমুখ্য হইতে পরিত্রাণ পায়। ভগবানের সেবা করাই ভগবদ্-দাসের একান্ত কর্তব্য। এই পৃথিবীর ক্রীতদাস-প্রথার জ্ঞায় চেতনময় জগতের অন্তঃক-দাসত্বও (অন্তঃক দাসত্ব অর্থে কোনরূপ বেতন বা পারিতোষিক গ্রহণ না করিয়া যে সেবা) কিছু স্বার্থপরতা, ক্রেশ ও অভাব-অভিযোগময় ব্যাপার নহে। জড় জগতের অভাব ও অসম্পূর্ণতা চেতন-জগতে নাই।

তামসিক গুণসম্পন্ন তথা মাৎসর্য্যপরায়ণ কামুক ও নির্বিশেষবাদিগণ ইন্দ্రిয়জ্ঞ জ্ঞান, কুদ্বৃক্তি, কুতর্ক, প্রভৃতি দ্বারা ভক্তের ও ভগবানের চরিত্র সমালোচনা করেন এবং প্রকৃত সাধুকে ‘লোভী’ বলিয়া নিজেদের অদম্ভ চরিত্রকে গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা দৌরাভ্যা, দুর্ব্বলতা বা পৈশুণ্য আচরণ করিয়া লোকের মঙ্গল ত’ দূরের কথা, মঙ্গলময় বস্তুকে ধ্বংস করিয়া তজ্জন্ত পারিতোষিক দাবী করেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

সাধুগণই সমাজের রক্ষক ও সমাজের প্রকৃত নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। অথচ সেই সাধু মহাত্মাগণকেই চোপের জ্ঞায় “ঐ চোর” বলিয়া লোকচক্ষে হেয় ও ঘণ্যরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্ত হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টার বিরাম নাই। বেদ, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, এই বিশ্ব ভগবানের সম্পত্তি অর্থাৎ ভগবানই সমস্ত বস্তুর মালিক। তাঁহার বস্তু বা দ্রব্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত না করিয়া ঐহারা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাি প্রকৃতপক্ষে “চোর” ও “অকৃতজ্ঞ”। ঐহারা ভগবানের কথা প্রচার করেন, জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করেন, তাহাদিগকেই অকর্ষ্য্য, অলস ও সমাজের বিস্তাপহারক বলিয়া দেখাইয়া দিয়া কৃতঘ্নেরা নিজেদের অদম্ভপ্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কর্মী—কৃতজ্ঞতার মুখোশে অকৃতজ্ঞ

ফলভোগীকাজী কর্মকাণ্ডীর দল “শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা”র জায়গা হা কিছু করেন, তাহারই বিনিময়ে কিছু চান। ইহারা কখনই ভগবানের সেবা বা জগতের প্রকৃত উপকার করেন না। বহিদৃষ্টিতে ইহাদিগকে ধর্ম্মে কর্ম্মে বা ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত দেখিয়া মূর্খ ও বোকা লোকেরা ইহাদিগকে পরম ভক্ত বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহারা “ফেল কড়ি, মাখ তেল”-নীতির উপাসক। “প্রভু আমাকে স্বখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবেন”—এ জ্ঞাত প্রভুর তোষামোদ কখনও ‘প্রভুভক্তি’ নহে, ইহা প্রভুর প্রতি বিরোধ ও প্রভুকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা।

কর্মী স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বপ্ন অর্থাৎ প্রভুর প্রীতিটুকুই পান নাই; কারণ তিনি “আমার দাঁড়ে ছোলা”-নীতির পক্ষপাতী। প্রকৃতিকৃত কার্য্য স্বকৃত মনে করিয়া অহঙ্কারবশতঃ কর্ম্মিগণ ‘আমি কর্তা’—এইরূপ অভিমান করেন। এইরূপ অহঙ্কারী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনাদের জগতের ভোগের মালিক বলিয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃতিদেবীই স্বয়ং ইহাদের অহঙ্কারের বিপুল সৌধ ভূমিসাৎ করিয়া ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতার চরম সাজা দিয়া থাকেন।

ঐক্যকজ্ঞানী—কৃতঘ্নতার চরম শিখরে আরোহ

জড়স্বভাগ ত্যাগ করিয়া নিজে ‘প্রভু’ হইবার যে প্রচেষ্টা, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ও জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক। মায়াবাদিগণ অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদীরা যদিও বাহিরের দিকে বিলাসী বা ভোগী নহেন, তথাপি তাঁহারা এমনি নিমক্-হারাম বা কৃতঘ্ন যে মণিবের আদন দখল করিতে চান। বস্তুতঃ ইহারা “যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া”-নীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। ইহারা বাহিরে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখায় বটে, কিন্তু অন্তরে “মণিব হইব” এই কালকূটবুদ্ধি পোষণ করেন। এই কালকূট আকর্ষণ পান করিয়া তাহারা প্রথমে স্মৃতি-বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বশেষে আত্মবিনাশ লাভ করেন। জীবের ‘ঈশ্বর’-অভিমান অত্যন্ত ঘৃণার ও আঘাতক। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় ‘সম’।

সেই ত’ ‘পাষণ্ডী’ হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১১৫)

জীব কখনই পরমব্রহ্ম হইতে পারেন না, রাবণ কখনও ভগবান্ রামচন্দ্র হইতে পারেন না।

ভক্ত—কৃতজ্ঞতার মূর্ত্ত-বিগ্রহ

নিত্যপ্রভু নিত্য-ভূত্যের সেবাগ্রহণ করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করেন, তাহাতেই ভূত্যের স্বর্থ—ইহাই সেবানন্দ। ভগবদভক্তই নিজের যথাসর্ব্বশ্ব মিশেবে নিত্যারাধ্য-প্রভু ভগবান্ শ্রীহরির ও তাঁহার নিজ-জন্মগণের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া নিঃস্বস্তর অবস্থায় সেবানন্দ স্বর্থের শ্রোতে ভাসিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্ত পরিচয় প্রদান করেন,—আমি নিত্যকালই ভগবানের চাকর ও ইহাই আমার স্বরূপের পরিচয়। সুতরাং প্রভু ও তাঁহার নিজজন্মের সেবা করিয়া যেন কালতিপাত করিতে পারি, তাহার বিনিময়ে যেন আমি কোন কাণাকড়ি চাহি না। আমার মণিব ও তাঁহার প্রিয়জনেরা বড়ই উদার ও দয়ালু। তাঁহারা যেন এই দীনের সামান্য অযোগ্য সেবাটুকু প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন এবং কখনও যেন আমাকে সেবা হইতে বঞ্চিত না করেন। তাঁহারা সেবা গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব—আমার জীবন সার্থক হইবে। যে-কোনস্থানে বা যে-কোন জন্ম লাভ হউক না কেন, আমি যেন কোন জন্মে তাঁহাদের সেবাস্বর্থ হতে বঞ্চিত না হই।

পশু-পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে যা নিরয়ে।

তব ভক্তি র'ছ ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥ (শ্রী গঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

সেই মহান্ প্রভুই আমার রক্ষক, মারিলেও তিনি মারিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। “মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুঁয়া অধিকারী ॥” আমি যেন মণিবের আসন দখল করিতে গিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় না দিই।”

যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত হরিতক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি কখনও আপনাকে এই প্রকৃতির বা বিশ্বের ভোক্তা, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি কল্পনা করেন না, তিনি আপনাকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিত্য-পদধূলিক্রমেই উপলব্ধি করেন; তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই অকপট দৈন্ত্য বিরাজিত থাকে। ভগবান্ই ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভগবান্কে ভজ্ঞন করেন না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ঈশ্বর সে জানে—ভক্ত-মহিমা বাড়তে।

হেন প্রভু না ভঞ্জে কৃতজ্ঞ কোনমতে ॥ (১৫: ভা: অ: ৩২৫৯)

ভগবান্ ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, স্নেহ ও কৃতজ্ঞ। কোনকালে কোন ভক্ত তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ভজ্ঞন করিলেও তিনি তবিনিময়ে তত্কে যাবতীয় বিষয় প্রদান করেন; কেবল তাহাতেই তিনি নিবৃত্ত হন না, অপচয় ও উপচয়বিহীন নিজেকে পর্য্যাপ্ত দান করিয়া থাকেন। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ হেন দয়ালু ভগবানের ভজ্ঞন হইতে বিরত থাকিতে পারেন?

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের
২৩শ তম বিরহ-মহোৎসবে

মিবেদন-কুসুমাজলি

কোথা আছ প্রভুবর !

আর কি মোদেরে দেখা নাহি দিয়া কঁদাবে জীবন'ভর !

একদা শ্যামের শারদীয় রাসে

মোদের ত্যজিয়া গেছ দূরদেশে.

কানুর বেণুর ধ্বনি শুনি' আর রহিলে না ধরা'পর ।

ব্রজে রসরাজ সাথে রাসমঞ্চেতে খেলিছ নিরন্তর ॥

মনে কি পড়ে না আমাদের কথা ? আমরা যে তব দাস ।

তোমা'রে হারায়ে মোদের হৃদয়ে জাগে শুধু হাহতাশ !

শত জনমের স্মৃতি'র ধন,

তব পদে মোরা ঈপেছি জীবন,

তব নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরি যতদিন র'বে শ্বাস !

কবে হে দয়াল তব কৃপা-বলে টুটিবে এ মায়া-পাশ ॥

এসেছিলে তুমি এ মর-জগতে জীবের উদ্ধার তরে ।

শত শত লোক তব শ্রীচরণে লুটা'লো ভকতি ভরে !

পাতকীর চিত্ত করিয়া শোধন

নাধুসঙ্গে রাখি' শিখালে ভজন,

ভগবজ্জ্ঞানের প্রদীপ জালিলে ভকতের অন্তরে ।

দেশে দেশে ভ্রমি' শুদ্ধ হরিকথা বিলাইলে অকাতরে ॥

শঙ্কর-মায়াবাদ খণ্ডি' গা'হিলে বৈষ্ণবের জয়গান ।

বেদান্ত শাস্ত্রের নাম পর ভাষ্য তব নব অবদান ॥

সিদ্ধান্তার্থব করিয়া মন্তন

আনিলে জগতে ভকতি-প্লাবন,

তোমার মহিমা বুঝিতে আমরা শকতি কর গো দান ।

তোমার বিরহে কেঁদে কেঁদে আজ আকুলিত মোর প্রাণ ॥

তব প্রেষ্ঠজন 'শ্রীভক্তি বামন' প্রস্তুটিত শ্রেয়োবনে ।
 তাঁহার সৌরভে তব সুবিচার পরকাশে ক্ষণে ক্ষণে ।
 আচার্য্য-আসনে নেহারি' তাঁহারে,
 তোমার করুণা পেতেছি অন্তরে ;
 'অমুগতিরেব সিদ্ধিঃ'—বাণী স্মরি' নমি তাঁরে সযতনে ।
 মোর অশ্রু-পুষ্প অঞ্জলি প্রদানি' নমি তব শ্রীচরণে ॥

তাং ২২শে পদ্যমাত, ৫০৪ শ্রীগৌরানন্দ
 শ্রীগুরু-বিরহ বাসর

ভবদীয় শ্রীপাদদত্ত কৃপারেণু প্রার্থী
 —শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
 বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের আদলে

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা
 আশ্বাদন করেন—তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে
 শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে নোভ জন্মিলে
 শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করেন। কথাটি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর
 নাথে গীতগোবিন্দের আলোচনার সুযোগ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণদামোদর তাঁর কড়চায়
 লিখেছিলেন স্নোকাকারে। রায় রামানন্দ, শিখি মাহেতি ও তাঁর ভগ্নী
 মাধবী দেবী প্রভৃতি ভক্তজনের সাথে গীতগোবিন্দের আলোচনার স্থান ছিল
 শ্রীক্ষেত্র পুরী। আজ থেকে পঁচশ বছর পূর্বে। গীতগোবিন্দের অনেক
 স্নোকের মর্মার্থ বুঝতে সাহায্য করেছিল 'ব্রহ্মদংশিতা' ও বিষ্ণুমঙ্গলের
 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-নামক গ্রন্থদ্বয়।

পুরীতে গীতগোবিন্দ-গবেষণার গোড়াপত্তন অত সহজেই অবশ্য হয়নি।
 দূরে ও নিকটেই ছিল দুটি বিরাট অন্তরায়। একটি—কাশীবাসী প্রকাশানন্দ
 সরস্বতীর ষাট হাজার শিষ্যের অধৈতবাদের সংগঠন, দ্বিতীয়টি—পুরীর প্রধান
 পাণ্ডা নার্কভোম ভট্টাচার্য্যের আত্মগত্যে শঙ্করপন্থীর আলোচনা-চক্র। প্রথমেই
 এ দুটিকে বহু ধৈর্য্য ও ক্রেশ স্বীকার করে অধৈতবাদের কবল হতে উদ্ধার

করতে হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবকে। ‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো’ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়ের বেদান্তের নিপুণ ব্যাখ্যাকারী অভিমানের পরাজয়ে নিজেকে বিশ্বমঙ্গলের উক্তি দিয়ে তুলনা করে মহাপ্রভুর রূপার জন্ত স্তব করেছেন।—

‘অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাশ্রাঃ, স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ ।

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥’

যার অর্থ,—অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাশ্র, আত্মানন্দ সিংহাসন হতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শট-কড়ক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হয়েছি।

মাননীয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ইচ্ছিতেই রাজা প্রতাপরুদ্রের আদরের মন্ত্রী মহাশয় রায় রামানন্দের সাথে মিলিত হবার জন্ত মহাপ্রভু আকুল হয়ে ছুটে যান দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী-তটে। তথায় সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের প্রমোদে গীতগোবিন্দ আলোচনার যোগ্যপাত্র নির্বাচিত হন—রামানন্দ রায়। মহাপ্রভুর দর্শন ও কথোপকথনে দক্ষিণ ভারতের অনেক শৈব-শাক্ত ‘বৈষ্ণব’ হয়েছেন। এমনকি, বেঙ্গল ভট্টাচার্যের মত শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণেরও সেবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের যুগলভজনের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই হতে পুরী ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে গীতগোবিন্দ সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে দৈমন্দিরের স্তবস্তুতিতে ‘দশাবতারস্তোত্রম্’ প্রার্থনাটি। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে দ্বৈতবাদের চরম শত্রুভাবাপন্ন অদ্বৈতবাদী ধুরন্ধর পণ্ডিতগণই হয়েছিলেন দ্বৈতবাদের প্রচারে প্রভুর পরম বাঁকব। পূর্বভারত, উত্তরভারত, দক্ষিণভারতের মাঝামাঝি পুরীতেই স্থায়িত্ব লাভ করে গীতগোবিন্দের রসাস্বাদন-কেন্দ্র। এ ছাড়া এখানে গীতগোবিন্দ আলোচনার মহাপ্রভুর ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্নিহিত আর একটি কারণ আছে। সেটা তাঁর হরি-স্বরণ। জগন্নাথস্বত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই স্বাপনে ছিলেন মন্দমন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

মথুরা হতে কংস অক্রুরকে পাঠিয়ে মেঘাস্পদ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে বলরামসহ রক্তমঞ্চ দেখাবার ছলে এনে নিজের মৃত্যুকে নিজেই বরণ করেছেন। বলী উগ্রসেনকে মথুরায় রাজসিংহাসনে বসিয়ে কৃষ্ণ পিতামাতা বহুদেব-দেবকীকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন। গুরু সান্দীপনির নিকট গুরুসেবার আদর্শে কৃষ্ণ পেয়েছেন প্রাণভরা রূপাশীর্ষাদ। গুরুদেবের মৃত পুত্রকে যমালয় হতে এনে দিয়েছিলেন অভিলষিত গুরু-দক্ষিণা। তারপর ফিরে এসেছেন মথুরায়। কংস হত হলে তাঁর দুই স্ত্রী পিতা জরাসন্ধের নিকট

কৈদে কৈদে জানিয়েছেন তাদের অকাল বৈধব্যের কথা। জরাসন্ধ জামাতা কংস হত্যার একমাত্র কারণ জেনে ক্রুদ্ধকে ভেবেছেন চরম শত্রু। সেজন্য জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা আক্রান্ত হয়েছে অনেকবার। ক্রুদ্ধপ্রীতির যোগসূত্রে পাছে ব্রজবাসিগণ জরাসন্ধের শত্রুতার দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েন, সেজন্য ব্রজবাসীর প্রতি ক্রুদ্ধের আন্তরিক আকুলতা-ব্যাকুলতাতেও তিনি ছিলেন বাহতঃ ব্রজবিমুখ। ব্রজবাসিগণ বুঝেন ক্রুদ্ধের মর্মবেদনা। ব্রজবাসীর প্রতি জরাসন্ধের ভাবী কোপদৃষ্টি ও মথুরার পুরবাসিগণকে জরাসন্ধের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য ক্রুদ্ধ স্থানান্তরিত হন দ্বারকায়।

অপাঞ্চে কন্যাদান ও তার ভাবী নির্যাতনের কথা শ্রবণ করেই সুদর্শিনী কৃষ্ণগী নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শরণ। শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন কৃষ্ণগীকে। সনাতন ধর্মশাস্ত্রে গৃহবধু ভোগের সামগ্রীই নন, পরন্তু গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপিণী। ধর-বাড়ীগুলিই ‘গৃহ’ নয়, ‘গৃহিণী’ই গৃহ-পদব্যাচ্য। শাস্ত্রে গৃহের দু’টি পরিচয় দিয়েছেন। একটি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি হরিবিমুখ ‘গৃহাঙ্কুশ’ যা আত্মকল্যাণকামীর পরিত্যাগ-যোগ্য। অপরটি দশম স্কন্ধের ৮-৮১ অধ্যায়ে সুদামা সখার হরিভজনপরায়ণ ‘গৃহস্থশ্রম’ যা আত্মকল্যাণকামীর সাদরে গ্রহীতব্য। গৃহকর্তা স্বয়ং ধর্মজীবনযাপন করলে ‘গৃহস্থশ্রমী’ তিনি। গৃহস্থশ্রমী পতিকে সমর্থ্যচরণে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহায়ত্বীতি প্রদর্শনকারিণীই ‘সমর্থশ্রী’ আখ্যায় যোগ্য। সমর্থশ্রীকে অবলম্বন করে পুরুষ গৃহেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ধর্গ পুরুষার্থ লাভ করতে পারেন। এমনকি, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিকণা পরমসুখ পঞ্চম পুরুষার্থও লাভ করতে পারেন গৃহিণীকে আশ্রয় করেই। সেই গৃহিণী ভোগ্যপণ্য বা লাঞ্ছিতা হলে পুরুষ সুখ-সম্পদ লাভ করতে পারেন না।

অন্যত্র ‘অর্থই অনর্থের মূল’ তা বুঝাতে স্রমস্বত্ব মণির রহস্ত উদ্ঘাটনে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহিত হয়েছেন জাম্ববতী ও সত্যভামার সাথে। নরকাসুর-কর্তৃক লাঞ্ছিতা রাজকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতা হলে তাঁদের অস্বীকার করে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে হতে হয়েছে গার্হস্থ্য-লীলা-পরায়ণ। কিন্তু বহু পত্নীদ্বারা পরিসেবিত হয়েও ব্রজবাসী পিতামাতা, গো, গোবর্দ্ধন, সখা-সখীগণের প্রতি আকুল-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ। পুরী দ্বারকা-স্বরূপ। এখানকার সনুজ, শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথের স্নেহবিগ্রহ সেই ব্রজবিহারীর বিরহকাতরতারই উদ্দীপনা জাগায়।

মথুরা হতে ক্রুদ্ধ উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠিয়েছিলেন বিরহকাতর

ব্রজবাসীদের সান্নিধ্য দিতে। ব্রজলীলা ও স্বজনবর্গের বিস্ময়জনক উদ্ভবের নিকট ব্রজের গোপগোপীগণ কৃষ্ণকে অলুযোগ করেছেন—“বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজের ব্রজজন, মাতা-পিতা-বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা।” উক্ত কৃষ্ণপ্রেরিত জেনে ব্রজবাসী গোপগোপীগণের যে ভাবের উদয় হয়েছিল, সেই ভাবে বিভাবিত হতেন নীলাচলে মহাপ্রভু। তখন স্বরূপের গান, রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও গীতগোবিন্দের কথোপকথনে সুখী হতেন তিনি।

অত্যাধি ধারা সমাজে রাধার চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাঁদের রাধা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রী নন। পরন্তু একই রাধাকে যে যেমন সে ঠিক তেমন ভাবেই দেখেছেন ও তদনুসারে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে নুক্তি-সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে ভাবিক দিক্ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তা অন্তর্ভুক্ত নাই। কোন বর্ণনায় গীতগোবিন্দের পৌরাণিক উপাদানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিলাসকলার বাহ্যিক দিক্ এত বেশী বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে রাধা, লক্ষ্মী, সীতা, নাবিত্রীর চেয়েও সমাজে অধিক আদরণীয়া না হয়ে সাধারণের নিকট কলঙ্কিনী রাধায় পরিণত হয়েছে। এঁদের রাধা অপরের, অর্থাৎ কবি জয়দেবের। অপরের রাধাকে সুযোগ বুঝে লোকে ভাল-মন্দ বলেন। কিন্তু জয়দেবের রাধা তাঁর নিজস্ব। যেখানে মমত্ববোধ, সেখানে প্রাণের টান, যথার্থ আবেগের সঞ্চার। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ মহাকবি জয়দেবের অলুপ্তরূপে, ‘গহণকুসুম কুঞ্জমাকৈ’ লিখে ক্ষান্ত হয়ে তিনি সমাজকে বুঝাতে চেয়েছেন, ভক্ত জয়দেবের মত রাধা নিজস্ব, আদরণীয়া ও পূজনীয়া বুদ্ধি না হলে কোন ব্যক্তি প্রাকৃত বিজ্ঞা-বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে যথার্থ-রূপে জানতে পারে না। যে-বিষয়ে ধার যথার্থ জ্ঞান নেই, সমাজে সে-বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যায় তাঁকে আত্মবঞ্চিত ও জগৎবঞ্চনারূপ দোষে ছুষ্ট হতে হয়।

কবি জয়দেব তাঁর রাধাকে তিনি কোথায় পেয়েছেন, আজকের দিনের রাধা সম্বন্ধে বিতর্কিত সমাজে গীতগোবিন্দে জয়দেবেরই পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ব্যাখ্যার দিকে অলুপ্তবুদ্ধি দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

জয়দেবের রাধা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী নন, ইনি পরকীয়া নাগিকা। এখানেই সমাজের ভুল বুঝাবুঝির সূত্রপাত। সমাজে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ ও তাঁর পরকীয়া সম্বন্ধে সামঞ্জস্য বোধ না হলে তাঁকে কলঙ্কিনী ভাবা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ রাধা কৃষ্ণপেক্ষাও দুর্জেষা।

বৃষভাসু-রাজনন্দিনী রাধা বিবাহের যোগ্য হয়েছেন। মহারাজা বৃষভাসু কস্তার জন্ত উপযুক্ত বরাদ্বেষণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন। বহু অচুসক্কানের পর অবশেষে ‘মাল্যক’ নামক গোপরাজের কনিষ্ঠ পুত্র আয়ানের সাথে রাধার বিবাহ স্থির হয়। মাল্যকের পত্নীও নাম জটীলা; মদন, তুর্ষদ, দম ও আয়ান—চারজন রূপবান্ পুত্র এবং যশোদা, কুটীলা ও প্রভাকরী—অসামান্য রূপসী তিন কন্যা। তন্মধ্যে কন্যা যশোদার সাথে গোপরাজ নন্দের গুপ্ত পরিণয় হয়।

এদিকে আয়ানের সাথে রাধার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় শ্রীরাধা বিশেষ-ভাবে চিন্তিত হয়ে তার পূর্ব অভিষাপ ‘প্রাকৃত মাস্তুষের পাণিগ্রহণ’ বিষয় স্মরণ করে নিত্যপতি প্রিয়তম অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাজ্জল্য সখীগণ-পরিবৃত হয়ে কাভ্যায়নী ব্রতের ছলে কালিন্দীতীরে আগমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় তৎপর হন। বহুকাল অতীত হলে শ্রীকৃষ্ণ একদিন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্তিতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আশ্বাস প্রদান কর্ত্ত বললেন,—‘হে প্রিয়ে! তুমি এ কঠোর তপস্তা হতে বিদূষিত হও, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।’ শ্রীরাধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদমর্পণপূর্বক হাতজোড় করে বললেন,—‘হে ভগবন্! তুমি সকলের ভয়ছেত্বা, আমি তোমার দাসী, আমাকে ভয় হতে পরিত্রাণ কর। পিতা আমাকে আয়ানের নিকট প্রদান করতে মনস্থ করেছেন। হে মধুসূদন! আমি ভগবৎপরায়ণা, তোমা ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র মানব আমাকে কি-প্রকারে গ্রহণ করতে পারে? তুমি আমায় অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ না করলে আমার প্রাণধারণ ব্যথা।’ (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না,—এরূপ মনে করা অসুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ক্রব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই স্বত্ব করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং ২৪/৮/১৯৮১

[দ্বিতীয় অধিবেশন]

সর্বাগ্রে অশ্বদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। পরিশেষে প্রধান-অতিথি মহোদয়, ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববর্গ, স্মৃধী সঙ্কনমণ্ডলী ও মাতৃমণ্ডলী-চরণে অসংখ্য প্রণতি। আজ আমরা যে ধর্মসভায় সমবেত হয়েছি, এটা দ্বিতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয় আজ ‘অবতারবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব’। কার্যাত্মকভাবে যেহেতু ‘অবতারবাদ’ নিয়ে প্রথমে লেখা আছে, সেইজন্য ‘অবতারবাদ’ নিয়েই আমার আলোচনা শুরু করব। আমার পূর্ববর্তী বক্তৃমহোদয়গণ তাঁদের সাধারূপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাতে আপনারা বহু বিষয় অবগত হয়েছেন।

বর্তমানে অবতারতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয় অবতার কি বা কাকে অবতার বলা যায়? অবতার কার হয় ইত্যাদি বিষয়। আমরা ভাগবতে এই তত্ত্বদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা শ্লোক দেখতে পাই,—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমধ্বয়ং।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

ভগবানের—তত্ত্ববস্তুর তিনটে Aspect—ধারণা। প্রথম হল ব্রহ্ম, দ্বিতীয় হল পরমাত্মা এবং তৃতীয় হল ভগবান্। কাকে ব্রহ্ম বলছেন?—তত্ত্ববস্তুর আভা, প্রভাকেই বলছেন ব্রহ্ম। তত্ত্ববস্তুর অংশকে বলছেন পরমাত্মা, আর স্বয়ংরূপ তত্ত্ববস্তুকে বলা হল ভগবান্। ভগবান্ যাকে বলছেন, তিনি হলেন Superlative degree। এই তিনটি জিনিসকে শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—প্রথমে ব্রহ্মতত্ত্বকে Positive degree ধরা যায়, পরমাত্মতত্ত্ব Comparative degree এবং ভগবন্তত্ত্ব Superlative degree। সেই তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়েছে। ভগবান্ শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাস্ত্র বলছেন,— ঐশ্বর্য্যাস্ত সমগ্রাস্ত বীৰ্য্যাস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞানবৈরাগ্যমোক্ষৈশ্চৈব যথাং ভগ ইতীক্ষ্মনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র শক্তিসামর্থ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য ইত্যাদির পূর্ণমূর্ত্তি যিনি, তিনি হলেন ভগবান্। সেই ভগবন্তর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন, তাঁর সমান কেউ হতে পারেন না, তাঁর অধিকও কেউ নহেন। তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। মৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তু নন। সুতরাং যখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করতে যাই, যখনই আমরা অবতারবাদ নিয়ে আলোচনা করতে যাই তখনই দেখি, তার ভিতরে প্রাকৃত কোন চিন্তা নাই। দার্শনিক বিচারে আমরা দেখতে পাই,— যখনই ভগবানকে সাধারণ মনুষ্যদৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা হয়, তখনই ভুল হয়ে গেল। ঠিক এই উল্টো ভাবটা আবার আসে, যখন আমরা মানুষকেই ভগবান্ বলতে চাই। কিন্তু দুটো Theoryই ভুল—দার্শনিক বিচারে বলছেন। একটাকে বলা হয়েছে Anthropomorphism—অপ্রাকৃত প্রাকৃতবুদ্ধি, আর একটাকে বলা হয়েছে Apotheosis—জড়বস্তুতে দেবত্বারোপ। চেতনকে যখন জড় বলতে যাই, তখন একরকম ভুল হয়, আবার যখন জড়কে চেতন বলতে যাই, তখন অগ্ন প্রকার ভুল হয়। সুতরাং ভগবন্তর শাস্ত্রে যেভাবে নির্দেশ করেছেন, বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেটা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। শাস্ত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে বলেছেন অক্ষয় অব্যয়রূপ। ভগবান্ যেমন অক্ষয় অব্যয়রূপ সনাতন তত্ত্ব, ধর্ম ও তৎসূত্র সনাতন, শাস্ত্র ও তৎসূত্র সনাতন। সুতরাং সনাতন শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা পাই—যেটা পূর্বে ছিল, বর্তমানেও সেই অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতেও সেই অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ যার বিকৃতি নাই, যার কোন পরিবর্তন—Alteration, পরিবর্দ্ধন—Addition নাই, তাকে বলে সনাতন। শাস্ত্র সনাতন। সেই সনাতন শাস্ত্রের মর্ম আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে।

শাস্ত্রের ভিতরে কিছু Insertion প্রবেশ করেছে বা তার ভিতরে কিছু Concoction, Fabrication আছে—এটা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে আর আমাদের নিজেকেই অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে পারছি না। শাস্ত্র মানে Axiomatic Truth, Fundamental Truth, তাকেই বলা হয়েছে শাস্ত্র। শাস্ত্র মানে সংবিধান। ভারতবর্ষে, ভারতরাষ্ট্রে বাস করছি আমরা, ভারতীয় সংবিধান আমাদের মেনে নিতে হয়। কেন?—যদি আমি ভারতীয় সংবিধান না মানি, তাহলে আমার নিজেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। যে-সব আইন-কানুনগুলো আছে সে-সব আইন-কানুনগুলোর কোন সুযোগ-সুবিধা—Facility পাই না আমি।

সুতরাং আমারই সুবিধার্থে, আমারই কল্যাণার্থে ভারতবাসী আমাকে ভারতীয় সংবিধান মেনে নিতে হয়। তদ্রূপ শাস্ত্র হল Spiritual Constitution—পারমার্থিক সংবিধান। একেও ঐভাবে মানবার জ্ঞান আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। সে সংবিধানে কোন Addition, Alteration চলে না, হয় না। এখানকার সংবিধানে Addition, Alteration চলে, চলছে, কিন্তু Spiritual Constitution-এ ওটা চলে না, চলবে না। হাজার হাজার বৎসর ধরে যে শাস্ত্রগ্রন্থ চলে আসছে, যার টীকা-ভাষ্য—Commentary ইত্যাদি প্রমাণ করছে মূলবস্তুকে, তার ভিতরে Insertion আমরা স্বীকার করি না। মৌলিক যে-সব গ্রন্থগুলি আছে—যাকে শাস্ত্র বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

ঋগ্‌যজু সামাথর্ক্যাক ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।

মুরারামাশ্রমৈকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

এর ভিতরে কোন Concoction, Fabrication ইত্যাদি হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে বহু ব্যাপার এর মধ্যে হয়েছে, সেটা স্বীকার করতে হবে, কিন্তু ঋষীসমাজ—যারা সাধন-ভজনবলে বলীয়ান, তাঁরা অপ্ৰয়োজনীয় প্রকৃষ্ট অংশ বাদ দিয়ে সার সঙ্কলন করতে অনারসে পারেন। সার সঙ্কলন করাটাই হয়েছে মুক্‌শল আমাদের পক্ষে। শাস্ত্র বলছেন,—Time is short art is long. ‘অনন্তপারমখিলশব্দশাস্ত্রম্ স্বল্পং তথায়ূর্বহবশ্চ বিদ্যা, সারং ততো গ্রাহম্।’—একথা যদি সত্যই প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের সার সঙ্কলন অবশ্যই করতে হবে। সার সঙ্কলন ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নাই। তাই বলছেন,—‘সারং ততো গ্রাহম্ অপাস্ত্র কল্পঃ’—অসারকে পরিত্যাগ করে সার সঙ্কলন করা শিখতে হবে আমাদের। ঠিক সেইভাবেই আমাদের সবকিছু আলোচনা প্রয়োজন। ‘হংদৈর্যথা ক্ষীরমিবাদুমধ্যাৎ’। কিভাবে সার সঙ্কলন করব? কার অধিকার সেটা?—রাজহংসকে ছুঁতে জলে মিশিয়ে দিলে সে যেমন ছুঁটাকে গ্রহণ করে, জলটা পড়ে থাকে, তদ্রূপ সার সঙ্কলন। শাস্ত্র আমাদের জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছেন তত্ত্ববস্ত সত্ত্বকে। বেদান্ত-দর্শন তাই বলছেন,—যদি ভগবত্ত্ব জ্ঞানতে হয়, যদি অবতারবাদ জ্ঞানতে হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণত্ব জ্ঞানতে হয়, যদি মায়াত্ব জ্ঞানতে হয়, যদি জগত্ত্ব জ্ঞানতে হয়, তাহলে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য বেদান্ত-দর্শনের ১ম পাদ, তৃতীয় সূত্রে বলছেন,—‘শাস্ত্রযোনিত্বাৎ’—শাস্ত্রই আমাদের উপযুক্ত মাধ্যম সেই পরাৎপরত্ব ভগবানের সম্বন্ধে কিছু Concrete idea নেওয়ার জ্ঞান। তা না

হলে আমাদের কিছুই থাকছে না। Footings কিছুই থাকে না আমাদের যদি শাস্ত্রকে অস্বীকার করে দিলাম আমরা। সেইজন্য তত্ত্ববস্তুর অভিজ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ত্রই হল আদি প্রমাণ। কেন?—শাস্ত্রকে বলছেন অপৌরুষেয়। বেদকে বলছেন অপৌরুষেয়—ভগবানের নিঃশেষিত বাণী। সাফাং ভগবানের বাণী—তাকে বলে শাস্ত্র। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র সেইরূপ। সেখানে কোন সন্দেহের সম্ভাবনা নাই, তর্কের কোন স্থান নাই। Undisputed সেটা। সে-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করার অধিকার দেওয়া হয় নাই। তार्কিকগণ ত' ইহজগতের সর্কজ্ঞ রয়েছেন। তারা সব জিনিসের উপর সন্দেহ পোষণ করতে পারেন—ধর্ম সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহ—বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা ধর্ম সম্বন্ধে কি Idea নেব? ধর্ম কাকে বলা হয়েছে?

ঋষিগণ যে ধর্মের কথা বললেন, সেটা সনাতন ধর্ম এবং সে সনাতন ধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে পাশাপাশি অসনাতন ধর্ম—অমিত্য ধর্ম ঘেঁটা, সেটা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাই ঋষিগণকে বলতে হয়েছে—চতুষ্প্রাণী শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝাতে হয়েছে যে, যখনই আমরা তত্ত্বদর্শন নিয়ে আলোচনা করব, তখনই Positive ও Negative দুটো নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণৈষ্যায়ন বেদবাস শ্রীমদ্ভাগবতে বললেন,—অদ্বয়-ব্যতিরেকভাবে আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। তা না হলে শাস্ত্র আলোচনা সর্বাদ্বন্দ্বের হবে না। সেখানে Comparative studyর অভাব থেকে যাবে। তাই বলছেন,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্ত্বজিজ্ঞাস্তুনাঙ্গুনঃ।

অদ্বয়ব্যতিরেকভায়াং যং স্ত্রাং সর্কজ্ঞ সর্কদা ॥

অদ্বয়-ব্যতিরেকভাবে শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। Merits-demerits—ভালমন্দ দুটো নিয়েই আলোচনার প্রয়োজন আছে। সেই পরাংপর তত্ত্ব যে ভগবান্—যার থেকে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, নিখিল বিশ্ব Generated হয়েছে, অনন্ত শক্তিমান্ সেই ভগবান্। তার থেকে এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি, তাঁর থেকেই সংরক্ষণ ও তাঁর থেকেই লয়। সবকিছুর মূলধার তিনি। যদি ভগবানকে আমরা বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা বলে মেনে নেই, তাহলেও আবাব দেখা যায় স্রষ্টা আর একজন আছেন। যার নাম লোকপিতামহ ব্রহ্মা। আবাব একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যিনি প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নাম শিবঠাকুর। আবাব একজনকে পাওয়া যাচ্ছে যিনি বিষ্ণু, জগৎপালন করছেন। কি বিচার আছে এর মধ্যে? মুখ্য মালিকানা ভগবানের, যাকে

ভগবান্ শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তিনি হলেন মূল মালিক। তাঁরই অনন্ত কর্মচারী। সেই কর্মচারী দিয়ে তিনি সবকিছু করাচ্ছেন। সুতরাং গোণসৃষ্টির মালিক হলেন ব্রহ্মা, গোণ প্রলয়ের মালিক হলেন শিব। এইরকম অনন্তকোটি Officer নিয়ে তিনি তাঁর অনন্ত সংসার, অনন্ত বিশ্ব পরিচালনা করেছেন। সেই কথাই বেদে, বেদান্তে, উপনিষদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

সেই যে ভগবান্, তিনি নিখিল শক্তির মূলাধার। যখন তাঁকে বলি আমরা শক্তিহীন, যখন তাঁকে বলি আমরা নিঃশক্তিক, নিরাকার, নির্বিশেষ, নিগুণ, তখন সবটাই ভুল হয়। সেখানে One sided view—একদেশিক বিচার করা হয়। শাস্ত্র বলছেন,—Positiveকে আগে মেনে নাও, তারপরে Negativity। তত্ত্বদর্শনটাও তাই। ভগবানের শক্তি আছে, তিনি শক্তিমান্, তারপরে তর্কের খাতিরে, যুক্তির ক্ষেত্রে বলা হল—তিনি নিঃশক্তিক। ঠিক সেইভাবেই শাস্ত্রের সব জিনিসটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নিরাকার-সাকার দুটি শব্দ আছে শাস্ত্রে। নিরাকারের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—তাঁর কোন প্রাকৃত আকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট। তাঁর যে শক্তি অপ্রাকৃত শক্তি, তাঁর যে গুণ অপ্রাকৃত গুণ, সেইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেখানে নিরাকার, নিগুণ, নিঃশক্তিক, নির্বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার অর্থ এইভাবে করেছেন। সুতরাং আমাদের ভুল বুঝবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্বে বলেছি যে, সেই ভগবান্ Non-entity মন, তিনি লাংথোর মিস্ক্রিয় পুরুষ মন। প্রকৃতিবাদী বলছেন,—প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গীতায় ঐ যুক্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন। গীতার শ্লোকের মধ্যে রয়েছে,— মধ্যাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করছেন—একথা ঠিক, কিন্তু কার দ্বারা, কার সহায়তায়? ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন,—Under the guidance—তাঁর সহায়তায় প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করছেন। তা না হলে সম্ভব নয়। সুতরাং শক্তিমান্ তাকে বাদ দিয়ে শক্তির কোন পরিচয় নাই। শক্তি যখনই বলি তখনই শক্তি একটা Attribute, কোন বস্তুর বা কোন ব্যক্তির শক্তি। শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শক্তিমানেরই শক্তি। সেই তত্ত্বই দর্শনশাস্ত্রে পরিষ্কার বুঝিয়েছেন। শক্তিকে Abastract Noun—গুণবাচক বিশেষ্য বলা হচ্ছে। প্রকৃতির একাকী নিজের কোন কিছু করবার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা নাই, সেইকথা গীতায় পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন।

মম যোনির্মহদ্বন্দ্ব তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্বযোনির্ কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবতি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

সুতরাং প্রকৃতিবাদী নিরস্ত হউন । প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করছে না পুরুষের সাহায্য ব্যতীত । পুরুষের সাহায্য নিয়ে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করতে পারে, তা না হলে প্রকৃতি সাক্রিয়া নয় । সেইকথাই বেদ, বেদান্তে, উপনিষদে প্রচারিত ও প্রমাণিত ।

অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করবার কথা আছে আজ । অবতার কাকে বলব ? মানুষকে কি অবতার বলা চলবে ? মানুষ কি ভগবান্ ? মিথিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ভগবান্ ; তার উদাহরণ রয়েছে আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে, Christianityতে রয়েছে, মুসলিম ধর্ম্মেতেও সে-সব ব্যাখ্যা করা হয়েছে । আমাদের সনাতন শাস্ত্রে যে সৃষ্টি রহস্যের কথা বলা হচ্ছে তা ভাগবতের ভিতরে বেশ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, তার প্রকরণটা ব্যাখ্যা করেছেন । তারপরে কিভাবে আশে সেই সৃষ্টি ।

সৃষ্টা পুরাণি বিবিধাশ্চজয়াশ্চজা

বৃক্ষাঃ সরীষপ-পশুনাং থগ-বন্যশুকান্ ।

তৈষ্টৈস্তরতুষ্টৈহৃদয়ঃ পুরুষাং বিধায়

ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদয়াপ দেবঃ ॥

সৃষ্টি রহস্যের কথা বলছেন । ভগবান্ প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন, তারপর স্থল, তারপর তিনি জলজ প্রাণী — Aquatic animal সৃষ্টি করলেন । তারপরে তিনি বৃক্ষ, তৃণ, গুল্মসভা সৃষ্টি করেছেন । তারপর পাখী, পশু সৃষ্টি করেছেন, Reptiles — সরীষপ সৃষ্টি করেছেন । এতসব সৃষ্টি করবার পরও সেই প্রেমময় ভগবান্ সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই, স্থখী হতে পারেন নাই । তারপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন । তখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন । কেন ?—আগে যাদের সৃষ্টি করেছি, এদের সাথে আমার মনের—ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর নয় । কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি, তার সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান তাঁর সম্ভব । মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বৈরাগ্য, বিচক্ষণতা প্রভৃতি সবকিছু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । সেইজগৎ এই মানুষই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি — Best creation, শাস্ত্রে বলছেন । (ব্রহ্মসংঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথিতে

উদ্যোগত

পরম করুণ, গুরুদেব হন,
জীব উদ্ধার হেতু মর্ত্যে বিজয় ।
গৌরহরি-জন, পতিততারণ,
যাঁহার আশ্রয়ে মায়া দূর হয় ॥
গুণামুত্রাংগ, করিলে কীর্তন,
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ভক্তির উদয় ।
(ষাঁর) গায়ত্রীর ধ্যান, হৃদয়ে জপন,
সর্ববিঘ্ন হরি' চিদানন্দ হয় ॥
নিত্য ভাব মন ! হেন মহাজন,
সেবানন্দ-ভাবের হইবে উদয় ।
স্বরূপ-দর্শন, বিবর্ত-বিভ্রম,
অজ্ঞান-ভিমির সব যায় ক্ষয় ॥
বেদান্ত-স্বরূপ, হৃদয়ে তখন,
অন্বর জ্ঞান-তত্ত্ব অবস্থান হয় ।
শ্রীতবাগী জন, অনর্থ বর্জন,
ত্যজিতে পারেন যাঁহার আশ্রয় ॥
পরমার্থ-ধন, নিষ্ঠা-রুচি হন,
আসক্তি-ভাবাদি প্রেমভক্তি পায় ।
অধিকারীজন, সেবাকুঞ্জে মন,
সতত নিযুক্ত থাকয়ে নিশ্চয় ॥
নাম-মন্ত্রদান, তারিলা ভুবন,
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন পায় ।
আদেশ পালন, করেন যে-জন,
সর্বতত্ত্ববিৎ সিদ্ধান্তেতে রয় ॥

“এ-সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ ।

তুমি ঘাতে বিষ্ণু লাগি’ করিলা রন্ধন ॥

বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু ছুষ্ট নয় ।

সে হাঁড়ী-পরশে আর-স্থান শুদ্ধ হয় ॥

এতেক আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে ।

সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ৭।১৭৭-১৭৯)

মহাপ্রভুর শিশুকালের এবম্বিধ লীলা ও আরও বহু লীলা-কাহিনী আছে, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি শিশুকালেও নাস্তিক বা ভগবদ্ বিদ্বেষী ছিলেন না এবং নিজে লীলা-ছলে আচরণদ্বারা জগদ্বাসীকে বৈষ্ণব-ধর্মের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন ।

(৬) লেখক ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“চৈতন্য মৃগী” রোগী ছিলেন । ...কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন । কখনো জী বিষ্ণুপ্রিয়া, মা শচীদেবীকে মারধোর করতে যান (চৈঃ ভাঃ ২।২।৮৭) ।”

লেখক ৭৫ পৃষ্ঠায়ও লিখিয়াছেন,—“চৈতন্যচরিত পাঠক যাত্রেই জানেন, শিশুকাল থেকেই চৈতন্য কি রকম এক অস্বস্থ প্রকৃতির ছিলেন । হঠাৎ হঠাৎ মূর্ছা যেতেন ।”

লেখক ৫৩ পৃষ্ঠায় চৈতন্যভাগবতের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা হইল ;—

“ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে মূর্ছা পায় ।

লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥” (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৮৭)

উহার পরবর্তী শ্লোকে অবশ্যই দৃষ্ট হয়,—

“এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ ।

শচী না বুঝে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ ॥” (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৮৮)

এস্থলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আপনাকে পাবিত্র-সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হুকুম করত লীলাবিরোধী পাষণ্ডগণের শিক্ষার নিমিত্ত দুষ্টনাশিনী মূর্তিতে লীলা-ভিনয় করিয়াছেন । মূঢ় লোকগুলি প্রভুর ঐ কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টাকে বাসুরোগ-বিকার জ্ঞান করিয়াছেন । ভক্ত শ্রীবাসঠাকুর কিন্তু মহাপ্রভুর ঐ প্রেমবিকার দর্শনে উহাকে মহাভাব জ্ঞান করিয়াছেন ।

“অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে’ ।

মহাভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে ?” (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১১০)

লেখক পুনঃ ১৫১ পৃষ্ঠায় নিজেই লিখিয়াছেন,—“অতঃপর চিন্তাস্বিতা শচীদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীবাস বললেন,—

“চিন্তের যতেক হুখে করহ থগুন ॥

‘বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি’ বলিল তোমায়ে ।

ইহা কভু অশ্রু জন বুঝিবারে নায়ে ॥”

শ্রীবানপাণ্ডিতের আত্মদান বাণী শুনে মা শচীদেবীর হৃচ্চিন্তা কিছুটা প্রশমিত হলো সত্যি কিন্তু শ্রীধাসের ঐ ‘বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি’ কথাটা তাঁর মাতৃ-হৃদয়কে দ্বিগুণ উদ্বেলিত করে তুললো । ভয় হলো, অপত্য স্নেহের অন্তর্দ্বন্দ্বে উৎপীড়িত শচীদেবীর মনে, সম্ভানপালিনী, চিরকলাগময়ী মাতৃহৃদয় জুড়ে তখন একমাত্র চিন্তা, ভক্তিবাদের তুম্ব জোয়ারে বিশ্বরূপ ভেসে গেছে । সেই সংসার-বিমুখী সর্বনাশা জোয়ার এগেছে বিশ্বস্তরের মনেও ।” লেখকের ভাষাতেই শচীদেবী যখন বিশ্বস্তরের বায়ুরোগ নহে,—কৃষ্ণভক্তি—ইহা বুঝিয়াছেন, তখন লেখক কি তাহা বুঝেন নাই ?

চৈতন্তভাগবতে বর্ণিত আছে, বায়ুরোগজ্বলে প্রভুর অন্তর্দর্শন প্রেমবিকার প্রকাশ হইত ।—

“একদিন বায়ু-দেহমান্য করি’ ছল ।

প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ১২।৬৭)

কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় সকলের তদীয় ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি হইত না ।

“আপনা’ প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে ।

তথাপি না বুঝে কেহ তা’ন মায়া-বলে ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ১২।৭৮)

সুতরাং প্রেমবিকার প্রকাশ করিতে প্রভুর ভাবোন্মাদ মৃগীরোগ নহে ও হইতে পারে না । অতএব যাহারা শ্রীমন্নহাপ্রভুকে মৃগীরোগগ্রস্ত মনে করেন, তাহারা বা তিনি নিশ্চয়ই কোনরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়াছেন, মনে হয় ।

শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভু নিজ জননীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু মারিতে ধাবিত হন নাই । তাহার প্রমাণ,—

“ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন ।

জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ৮।১৪৩)

লেখক তাহার পুস্তকে ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“তবে শেষ দিকে চৈতন্ত ওড়িশায় কাশী মিশ্রের বাড়ীতে (গম্ভীরার) দেওয়ালে যেভাবে মুখ ঝুতেন ও তাঁর কপালে ঠোট কেটে যেভাবে রক্ত বেরোতো—এসব লক্ষণ দেখে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে চৈতন্ত মৃগী অর্থাৎ এপিলেপসি (Epilepsy) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ।

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিল।
 গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাগিল।
 মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
 ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার।
 সর্বস্বাত্মি করে ভাবে মুখ সজ্জ্বর্ণ।
 গো গো শব্দ করে স্বরূপ গুনিল তখন।”

[চৈতন্যচরিতামৃত / অন্ত্যালীলা / উপবিংশ পরিচ্ছেদ]

আশ্চর্য্য এই যে, লেখক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পয়ারটি পাঠ করিয়াও তাহাতে মহাপ্রভুর মৃগী রোগের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন! উক্ত পয়ায়ে বর্ণিত মহাপ্রভুর মুখ সজ্জ্বর্ণরূপ দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণ) কি মৃগীরোগ হইতে পারে? বিপ্রলভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা এইরূপ;—

“উদ্‌ঘূর্ণা, বিবশ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম।
 বিরহে কৃষ্ণকুন্তি, আপনাকে ‘কৃষ্ণ’-জ্ঞান।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩৬১)

উক্ত শ্লোকে মহাপ্রভুর ‘অপ্রাকৃত-কৃষ্ণ-সেবাময়ী পরম চমৎকারিণী সর্বোত্তমাবস্থা দৃষ্ট হয়। শ্রীল রঘুনাথদাস তাঁহার রচিত ‘গৌরাঙ্গ-স্তব কল্পবৃক্ষ’-গ্রন্থে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে প্রলাপোন্মাদময় দশা বর্ণনা করিয়াছেন,—

“স্বকীয়স্ত প্রাণার্জুদ সদৃশ-গোষ্ঠস্ত বিরহাৎ
 প্রলাপাচ্ছন্মাদাৎ সতত মতি কুর্ক্শন্ বিকলধীঃ।
 দধদ্ভিতৌ শব্দধ্বনবিধুর্ধ্বৈব কধিরং
 ক্ষাতোথং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি।”

উক্ত শ্লোকের ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ ঐমং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“নিজের অনংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজের বিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্বদা সেট চেষ্টা অধিক বুদ্ধি পাওয়ায় বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র অহুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে স্বপ্নপূর্বক ক্ষতোথ কধির ধারণ করিতেম। এবস্থিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।”

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার রচিত “শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্”-গ্রন্থে ১৩৪ শ্লোকে মহাভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সদৃশে বলিয়াছেন,—

“ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্ছতি
 ক্ষণং লুপ্ততি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি।

ক্ষণঃ স্থিতি নৃক্ষতি ক্ষণমুদার হা হা কৃতিং

মহাপ্রণয়মীধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ ॥”

“শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃত-রসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও বোদন করিতেছেন, কখনও মুচ্ছিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে নৃষ্টিত হইতেছেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেছেন, আবার কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও বা ‘হা’ ‘হা’ এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেছেন, (ঈদৃশ নানাভাবে) প্রপঞ্চে বিহার করিতেছেন।”

লেখক অজ্ঞতাবশতঃ মহাপ্রভুর মহাভাবোন্মাদ-দশাকে বুদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া মৃগীরোগ বা বায়ুরোগ বলিয়া তাঁহার পুস্তকে বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, —ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে লেখক তাঁহার ভুল বুদ্ধিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

মর্ম্মভেদী কান্না

“নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটীচন্দ্রানমসিষে।

প্রেমানন্দাক্ষিচন্দ্রায় চাক্ষুচন্দ্রাংস্তহাসিনে ॥”

“বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্ত বালালীলাং মনোহরাম্।

লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥”

পাগল ছেলে! সকাল থেকেই কেঁদে চলেছে, মা আর সামলাতে পারছেন না। কি করে পারবেন? কিসের জন্ত ছেলেটি যে কাঁদছে তাইত’ তিনি জানেন না, কোন কিছুরইত’ অভাব রাখেননি তাঁরা। তবে?

পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ছুটে এসেছেন। সকলের প্রিয় ঐ ছোট ছেলেটাকে দেখলেই যে চুপন করতে ইচ্ছে করে! ও ত’ সকলের আদর মোহাং মাখানো স্নেহ-চুষনের অধিকারী। আজ তাকে আশ্বাস করল কে?

“সর্ব্ব অঙ্গ-স্থিতিস্থাপ, স্ববর্ণ-প্রতিমা-ভান,

সর্ব্বঅঙ্গ—স্থলক্ষণময়।

বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি’ পাইল বহু প্রীতি,

বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১৬)

কান্নার মধ্যে কতখানি কারুণ্য! কতখানি আর্তি! প্রতিটি মুহূর্ত্তে ঐ মর্ম্মভেদী কান্না যেন প্রতিবেশীদের অবিচলিতভাবে কৌতূহল-পরবশ করে

তুলছে। জন্মেকা প্রতিবেশীনির হঠাৎ ‘হরি’ ‘হরি’ ধ্বনি উচ্চারণ করা যাত্রাই আশ্চর্য্যভাবে সকলের অবাকের পরিমাণকে উচ্চ শীর্ষে পৌঁছে দিয়ে পাগল ছেলের মধ্যভেদী কপট কান্না এক মুহূর্ত্তেই বন্ধ হয়ে যায়। সকলেই স্তম্ভিত!

তবে কি হরিনাম-কৌর্ভমই শিশুকান্না বন্ধ করবার একমাত্র ঔষধ? হ্যাঁ, ঠিক তাই, যখনই কাঁদতো ছেলেটি, সবাই মিলে হরিনাম গ্রহণ করতেন, তাতেই কান্না বন্ধ হতো।

নদীয়ার সেই পাগল ছেলে শ্রীজগন্নাথস্বত বিশ্বস্তরের কথাই বলছি। ছোটবেলায় সবাই বলতো পাগল বিশ্বস্তর। কিন্তু সত্যিকারের পাগল নয়, কপট পাগলামি। সে পাগলামির কথা শুনে আমরা সবাই হাসব হয়ত’। কেননা, মাহুদ অপরের রূপে পাগল হয়, কিন্তু বিশ্বস্তর নিজের রূপে নিজেই পাগল হয়েছিলেন। নিজের অঙ্গ-সৌরভ আত্মাণ ও নিজের রূপ-সৌন্দর্য্যকে আত্মদান করবার লোভে চতুর শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবহ্যাতিশুবলিত বিশ্বস্তররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সেই রাধায়িত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণায়িত রাধা শ্রীগৌরাদ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছিলেন। দে কী কান্না! কতখানি মধ্যভেদী! শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিরহী উন্মাদ শ্রীগৌরাদেবের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল অষ্টদৈবিক বিকার—অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্ছা, ঘ্রোষ, স্তম্ভ, পুলক ও হৃদয়। কি হৃদয় আকুল করা বেদনা! ভাষায় বর্ণনা করা আমার মত নরাধমের ক্ষমতা না থাকলেও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ তাঁদের অহৈতুক ভক্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় দিয়ে একটুখানি উপলব্ধি করতে পারেন নিশ্চয়ই। “হৃদয়, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।

নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘন ঘন ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০)

সমস্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অন্তরালে রেখে কপট চাতুর্য্যের আশ্রয় নিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। দেখিয়েছিলেন—কতখানি ভগবানের জন্য কাঁদতে পারলে ভক্তিদেবী তাঁর মায়াবরণ খুলে দেন। মা যখন শিশুকে মারে, আর শিশু নিজেকে অসহায় একা মনে করে—যেভাবে যতখানি কাকণ্য-আকৃতি নিয়ে কাঁদে, ঠিক তেমনি করে ভগবানের জন্য ভগবদ্বিশ্বাস নিয়ে কাঁদতে হবে। মধ্যভেদী কান্না! হৃদয়-বিদারী ভক্তি-স্ব’চের মত। ঠিক ভালবাসার জন্য কাঁদা, এমন ভালবাসা যে একমুহূর্ত্ত তাঁকে ছাড়া থাকাই যায় না। তাইত’ ভক্ত কেঁদে বলে,—

এ সখি! হামারি ছুথের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর,

মাহ ভাদর,

শুন মন্দির মোর ॥

কী করুণাতি ! ভক্তমনে এক অসাধারণ উদ্ভাদনার সঞ্চার করে । এক বিশেষ মুহূর্ত্ত ও পরিবেশে এক বিশেষ ভক্তের চিত্তচাক্ষুর্ষ্য, হৃদে ও হৃদে, ভাবে ও ভাবনায় এমনভাবে উদ্ভাটিত যে একটা প্রাণ-নিঙড়ানো, বুক-নিঙড়ানো যন্ত্রণা, গুমরে গুমরে উঠে দেহের সমস্ত অস্থি-সন্ধিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে । আত্ম-স্বীকৃতির জন্ত মিলনের মন্দির মুহূর্ত্ত থেকে বিরহের এই মদনার্ত্ত প্রহরের প্রয়োজন বেনী যেন অনেকগুণে ।

রাধায়িত কৃষ্ণ যেন কৃষ্ণকেই পাওয়ার জন্ত এপার থেকে ওপারে ছুটে চলেছেন । ভক্তের গলা জড়িয়ে সে কী আকুল মর্ম্মভেদী কান্না !

“সই, কত না রাখিয়া হিয়া ।

আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায়, আমার আঙিনা দিয়া ॥”

শেষে সব কান্না থেমে যায় । হতাশ হয়ে পড়েন শ্রীগৌরাদ, কৃষ্ণ-বিরহের প্রগাঢ় বেদনা এক তীব্র নৈরাশ্য সৃষ্টি করে । বলে ওঠেন—

“হৃথের লাগিয়া, এষর বাঁধিলু,

অনলে পুড়িয়া গেল ।

অমিরা-সাগরে, দিনান করিতে,

সকলি গরল ভেল ॥”

সেই যে মর্ম্মভেদী কান্না—ছোটবেলায় সমস্ত পাড়াপ্রতিবেশীকে আকুল করে তুলত—বেদনায় ভুগতে থাকতেন শচীমাতা সেই কান্নায় । শ্রীকৃষ্ণ বিরহের সেই যন্ত্রণায় সারাটা জীবন ছটফট করতে করতে একদিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অন্তর্ধান করেন । ভক্তবৃন্দ কেঁদে বলে ওঠেন,—

“পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব ।

গৌরাদ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥”

শ্রীগৌরাদ-মহাপ্রভুর কাছে একান্ত প্রার্থনা, ভগবানের জন্ত যেন সেই মর্ম্মভেদী কান্না কঁদতে পারি । জড় সংসারের কুটিল মায়াজালে বন্ধ না হয়ে যেন ভগবানের ভালবাসার জালে বদ্ধ হতে পারি । যেন বলতে পারি,—

“আমি—কৃষ্ণপদদাম্পী ; তিঁহো—রসসুখরাশি,

আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ।

কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ-মন,

তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধ্বত শিফাষ্টক ৮)

—শ্রীমতী কুছ বেরা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূচ ।

অন্য ধর্ম হতুকাপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ { ১৪ নারায়ণ, বাসুদেব, ৫০৪ শ্রীগোরাঙ্গ
২২ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩২৭, ইং ১৬।১২।২০ } ১০ম সংখ্যা

সালুবাং

শ্রীচতুর্ন্থ-ব্রহ্মকৃত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্ততিঃ

শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাখ-সংবাদে
ব্রহ্মস্তুতো নবমেহধ্যানে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১৩-১৪ । বক্তৈশ্চতুর্ভিঃস্বহমেব দেবঃ
শ্রীপঞ্চবক্তৃঃ কিল পঞ্চবক্তৈঃ
সহস্রশীর্ষাস্ত সহস্রবক্তৈ-
যন্তোতি সেবাং কুরুতে চ তস্ম ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণুশ্চ বৈকুণ্ঠনিবাসকৃচ্ছ
ক্ষীরোদবাসী হরিরেব সাক্ষাৎ ।

নারায়ণো ধর্মসুতস্তথাপি

গোলোকনাথং ভজতে ভবন্তুম্ ॥ ১৪ ॥

আমি চারি মুখে, দেব পঞ্চানন পঞ্চবদনে, সহস্রবদন অনন্ত সহস্রমুখে ঋঁহার
স্তব করিয়া সেবা করেন ; বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী সাক্ষাৎ হরি এবং
ধর্মসুত নারায়ণ সেই গোলোকপতি আপনার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৪ ॥

১৫। অহোতিধন্যো মহিমা মুরারে-

জ্ঞানন্তি ভূমৌ মুনয়ো ন মানবাঃ ।

সুরাসুরা বা মনবোহবুধাঃ পুনঃ

অপ্নেহপি পশ্যন্তি ন তৎপদদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অহো মুরারির মহিমা ধন্য ; ভূতলে সে মহিমা মূনিগণই জানেন, মানবে
নহে। অজ্ঞ মনুষ্যগণ, সুর, অসুর,—ইহারা অপ্নেও তদীয় পাদপদ্ম দর্শনে
অদম্য ॥ ১৫ ॥

১৬। বরং হরিং গুণাকরং স্মৃজিতং পরাংপরম্ ।

রমেশ্বরং গুণেশ্বরং ব্রজেশ্বরং নমাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥

গুণাকর, স্মৃজিত, পরাংপর, রমেশ, গুণেশ, ব্রজেশ্বর, পরমাত্মা শ্রীহরিকে
নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

১৭। তাড়ুল-সুন্দরমুখং মধুরং ক্রবন্তং

বিন্ধ্যধরং শ্রিতযুতং সিতকুন্দ-দন্তম্ ।

লীলালকারাবৃত-কপোল-মনোহরাভং

বন্দে চলৎ-কনককুণ্ডল-মণ্ডলাহম্ ॥ ১৭ ॥

তাড়ুলরাগে সুন্দরবদন, মধুরভাবী, বিন্ধ্যধর ঈষৎ হাস্যযুক্ত কুন্দকুসুমবৎ
সুন্দরদন্ত, লীলালকারাবৃত-কপোল, মনোহর কান্তি, দোঁহুলামান কুণ্ডলে মণ্ডিত
শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৭ ॥

১৮। সুন্দরন্ত তব রূপমেব হি

মন্মথস্তা মনসো হরং পরম্ ।

আবিরস্ত মম নেত্রয়োঃ সমা

শ্চামলং মকর-কুণ্ডলাবৃতম্ ॥ ১৮ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার পরম সুন্দররূপ মন্মথেরও রূপ হরণ করে ; আমার
নেত্রে সর্বদা মকর-কুণ্ডলাবৃত শ্চাম-কলেবর কৃষ্ণ আবিস্তৃত হউন ॥ ১৮ ॥

১৯। বৈকুণ্ঠ-লীলা-প্রবরং মনোহরং

নমস্তুতং দেবগণৈঃ পরং বরম্।

গোপাল-লীলাভিযুতং ভজ্যাম্যহং।

গোলোকনাথং শিরসা নমাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

দেবগণ সর্বোত্তম বৈকুণ্ঠ-লীলাপ্রবর মনোহর রূপের নমস্কার করেন।
আমি গোপাল-লীলাযুক্ত গোলোকনাথকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া ভজনা
করি ॥ ১৯ ॥

২০। যুক্তং বসন্ত-কলকণ্ঠ-বিহঙ্গমৈশ্চ

সৌগন্ধিকং স্বরূপপল্লব-শাখিসঙ্গম্।

বৃন্দাবনং সুধিত-ধীর-সমীরলীলং

গচ্ছন্ হরির্জয়তি পাতে সদৈব ভক্তান্ ॥ ২০ ॥

বসন্তকালের কোকিলাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গযুক্ত, সুগন্ধময়, তরুণ-পল্লবযুক্ত
বৃন্দাবন, সুধোপম ধীরসমীর সম্পর্কিত বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া কৃষ্ণ জয়যুক্ত
হউন এবং সর্বদা ভক্তগণকে রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

২১। হরতি কমলমানং লোলমুক্তাভিমানং

বরনিরসিক-দানং কামদেবস্ত বাণম্।

শ্রবণ-বিদিতযানং নেত্রযুগ্ম-প্রয়াণং

তজয়তু-সমক্ষং দানদক্ষং কটাক্ষম্ ॥ ২১ ॥

তোমার কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত নেত্রদ্বয় কমলের মান হরণ করে, দোলায়মান
মুক্তার অভিমান দূর করে; তোমার রসিকতা ধরণীর যাবতীয় রসিকের
পর্য্যাপ্ত করে; আর তোমার কটাক্ষ কাম-বাণকে তিরস্কৃত করে। আমি
সেই সকল ভজনা করিব ॥ ২১ ॥

২২। শরচ্ছন্দ্রাকারং নখমণিসমূহং সুখকরং

স্বরক্তং হৃৎপূর্ণং প্রকটিততমঃ-খণ্ডনকরম্।

ভঞ্জেহং ব্রহ্মাণ্ডে সকলনর-পাপাভিদলনং

হরৈর্বিশোধেদৈবৈদ্যিভি ভারতখণ্ডে স্তম্ভমলম্ ॥ ২২ ॥

খাঁহার নখমণিদমূহ শরচ্ছন্দ্রাকার সুখকর স্বরক্ত হৃদয়গ্রাহী, গাঢ়াক্ষকার-
হারী, জগতের সর্ববিধ পাপহারী, ভারতখণ্ডে ও স্বর্গে দেবতাগণ বিষ্ণু
ঐহিরকপের স্তব করেন, আমি তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ২২ ॥

২৩। মহাপদ্মে কিংবা পরিধিরিখ চাভাতি সততং

কদাদিত্যক্ষুর্জ্জ্বল-চরণ ইথাং ধ্বনিধরম্ ।

বথাস্ত্যস্তং চক্রং শতকিরণযুক্তং তু হরিণা

ক্ষুরচ্ছীমঞ্জীরং হরিচরণপদে ঔষিগতম্ ॥ ২৩ ॥

তোমার পাদপদ্মের সর্বদা শঙ্কায়মান কিরণযুক্ত হরি-চক্রাকার নূপুর হইতে যে পরিধির গায় ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা কি শতকিরণযুক্ত স্বর্ষ্য-রথ-চক্রের পরিধি? অথবা তোমার পাদপদ্মের পরিধি? ২৩ ॥

২৪। কট্যাং পীতাম্বরং দিব্যং ক্ষুদ্রবটিকরাস্বিতম্ ।

ভজাম্যহং চিত্তহরং কৃষ্ণাক্লিষ্ট-কর্মণঃ ॥ ২৪ ॥

খাঁহার কটিতে ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত দিব্য পীতাম্বর, আমি অক্লিষ্টকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর রূপের ভজনা করি ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের সোপান

অনেকে মনে করেন যে ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম । সেই বিশ্বাস হইতে মূললোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবত্বের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণত্বের নিন্দা করেন । কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণত্বের পক্ষপাতী হইয়া বৈষ্ণবত্বের নিন্দা করেন । শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা তাহা করেন না । তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণের ফল । শ্রীমদ্রূপপ্রভু বলিয়াছেন,—

“সহজ নির্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় ।

কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্যস্থান হয় ॥

মাৎসর্য্য চণ্ডালে কেন ইহা বসাইলে ।

পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥”

জীবের নির্মল হৃদয়ের নাম ব্রাহ্মণত্ব । কৃষ্ণভক্তি নির্মল হৃদয়েই বসতি করেন ।

মাৎসর্য্য প্রেমের বিরুদ্ধ এবং মাৎসর্য্যপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহেন

সেই হৃদয়ে যদি মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থান-লাভ করে, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তি তিরোহিত হন। তখন আর সেই ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। পরস্পরে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য ও প্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই। যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই। মাৎসর্য্যশূন্য হৃদয় ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচয়। তাহা প্রেমের অবশ্য বসতি-ভূমি।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণত্বের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

“শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তির্ভাজিবম্।

জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥”

যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার এই একাদশটি লক্ষণ অবশ্য আছে। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুত-ভক্তি ও সত্য যে-ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। এই প্রকার ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্ত দেদীপ্যমান হইয়া সর্বদা বিবাজ করেন। তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হইল না, তাঁহার স্মরণ ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই।

গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণের পরিচয়, জাতির দ্বারা নহে,

নারদ বলিয়াছেন,—

যশ্চ যজ্ঞক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্তত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তে নৈব বিনির্দিশেৎ ॥

এই শ্লোকটির টীকায় শ্রীধরস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—“শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যশ্চেতি। যদযদি অন্তত্র বর্ণান্তরেহপি দৃশ্যেৎ তদ্বর্ণান্তরং তে নৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ ॥”

এই সমস্ত পারমার্থিক শাস্ত্রবচন এবং মন্ত্রাদি সংসারনির্কাহী স্মৃতিবচন অনুশীলন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার, অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না

বৃহদারণ্যকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন ;—

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বান্নলোকাং প্রৈতি স কৃপণঃ ।

অথ য এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বান্নলোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥

নিষেকাদি শাসানান্ত দশবিধ ব্যবহার ক্রিয়া । সেই সকল ক্রিয়াতে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্থতি-শাস্ত্রে লিখিয়াছেন । দীক্ষা, উপাসনা, সন্ন্যাস ও ভজনাঙ্গ ব্রতাদি সম্বন্ধে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা । পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না । তৎসম্বন্ধে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্স্বীত ব্রাহ্মণঃ ।

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন করিবেন ।

এই সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিতেছি যে, উন্নতিগর্ত, ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই । ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদ্ভিতপ্রাজ্ঞ হইলেই জীব কৃত-কৃত্য হইয়া ভক্তি লাভ করেন ।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে জাতি-ব্রাহ্মণ

হইবার আশঙ্ক্যক নাই

অনেকের মনে জড়ভরতাদির উদাহরণ দৃষ্টি করিয়া একটা সংশয় হয় । যে, নীচবর্ণের ভক্তি হইলেও পরাগতি লাভের জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মের প্রয়োজন হয় । এতৎসম্বন্ধে শ্রীভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তবাক্যই সর্বদা আলোচনীয় । তদ্যথা ;—

মাং হি পার্থ । ব্যাপাঞ্জিত্য যেহপি স্যুঃ পাপঘোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈজ্ঞান্তথা শূদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

কিং পুনঃস্বর্গাঃ পুণ্য ভক্ত্য রাজর্ষয়ন্তথা ।

অনিত্যমস্থখং লোকমিমাং প্রাপ্য ভজষ্যাম্ ॥

ব্রাহ্মণ-কত্রিয় জন্মে যদি তীব্র ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে যে জীব উদ্ধার হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ? কেননা স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ পাপঘোনিপ্রাপ্ত চণ্ডালাদি সকলেই আমার শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে ।

ভজন-প্রভাবে দুর্জাতিত্ব নষ্ট হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হইয়া

যে দুইটি বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহার অব্যবহিত পূর্বস্থিত দুইটি বচনের তাৎপর্য গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

অপি চেৎ স্তুত্বরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যাবসিতো হি সঃ।

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শতচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞানৌহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি।

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য এই, সাধারণতঃ জীবগণ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন হইয়া ভক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সাধুসদ-বলে ব্রাহ্মণত্ব-সম্পত্তির পূর্বেই অনন্তভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেও সাধু বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেননা, মংকুপায় অতি স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ধৰ্ম্মাত্মা অর্থাৎ ভক্ত্যাধিকার-যোগ্য ব্রাহ্মণত্ব ভক্তির আনুসঙ্গিক ফলক্রমেই লাভ করিবেন। হে কৌন্তেয়! তাঁহার পুনর্জন্মান্তি-রূপ পতন কখনই হইবে না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। এই জন্মেই আমি তাঁহাকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিমুক্ত পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব দিয়া প্রেম প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ

হে পাঠকবর্গ! ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের ভেদ করিবেন না। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী। এতদ্বিবক্ষ্যম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শুদ্ধ-ভক্ত্যাধিকারী ব্রাহ্মণদিগকে এতদূর সম্মান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসকলের একান্ত রূপা লাভ করিলে আমরা শুদ্ধ হইতে পারি। ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না। অন্তএব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের ধ্যেয় স্বভাব-সিদ্ধ ভ্রাতৃত্ব, তাঁহাই জগতে প্রোদীপ্ত হউক। স্বার্থপরতা ও মূর্থতা প্রবেশ করত ঘেন তাঁহাদের মধ্যে বৈর-ভাব উৎপন্ন না করে। শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু ব্রাহ্মণ-সম্মান জগতে বিস্তৃত করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ-চরণামৃত পানদ্বারা স্বীয় জর-লীলার অন্ত্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে রূপা করুন।

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ধান ও শ্যামা

ধান ও শ্যামা এই দুই প্রকার গাছের অনেকটা সৌন্দর্য দেখা যায়, কিন্তু ধানগাছ হইতে ফলকালে ধান পাওয়া যায় এবং শ্যামাগাছ হইতে ফলকালে শ্যামাগাছের বীজ পাওয়া যায়। ধান চাইতে চাউল উৎপন্ন হয়। চাউল বিকুনৈবেত্তে লাগে। নৈবেত্ত-প্রসাদ বৈষ্ণবের শরীরকে পুষ্ট করিয়া হরিভক্তনের উপযোগী করায়। শ্যামাধান ধানগাছের সহিত একত্র উৎপত্তি লাভ করিলেও ধানগাছের উপকারের জন্য সেইগুলিকে প্রথমমুখে অপসারিত করিতে হয়। শ্যামাগাছের উচ্ছেদ সাধন না করিলে ধানক্ষেত্রের সমৃদ্ধি হয় না। যদি ধানক্ষেত্রে শ্যামা প্রবল হইয়া যায় এবং উপযুক্ত সময়ে মিড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধানরোপণকারীর অভীষ্টসিদ্ধি-লাভে বাধা পড়ে। শ্যামাগাছ বড় হইয়া ধানগাছের ক্ষতি করে, আবার শ্যামার বীজ প্রপঙ্ক হইয়া ভবিষ্যতে ধানক্ষেত্রের ভূমিকে পুনরায় বিপদসঙ্কুল করে। শ্যামার প্রপঙ্ক বীজ ভূমিতে পড়িয়া থাকায় পরবর্ষে ধানের আবাদকালে শ্যামার অনেকগুলি গাছ হয়। যে কৃষক ধানলাভের আশা করেন, তিনি ধানরোপণ করিবার অব্যবহিত পরেই শ্যামাগুলিকে উৎপাটিত করিবেন, না করিলে শ্যামার বীজ ভূমিতে পড়িয়া শ্যামাগাছের উৎপত্তি করাইবে। কৃষকের পরিশ্রম ও খরচ বাড়িয়া যাইবে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কার্যায়ত্ত, ও কার্যে প্রবৃত্তির পূর্বে সাবধান হওয়াই আবশ্যক। যিনি সতর্কতায় অমনোযোগ করেন, তাহার অভীষ্টসিদ্ধির বড়ই ব্যাধাৎ হয়। শ্যামাধানের বীজ ভগবন্মৈবেত্তে লাগে না এবং তাদৃশ দ্রব্য বৈষ্ণবগণের ভক্তনের অহুকুল নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের জন্য যাবতীয় সৃষ্টি। স্তবরাং ধানের উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক ও শ্যামাগাছের উৎসাদন সর্বতোভাবে ভক্তনের অহুকুল।

শ্রীগৌরসুন্দর ভোগাসক্ত জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে হরিকীৰ্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের চরম কল্যাণ লাভের জন্য হরিভক্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নির্মল সেবার স্বরূপ আবৃত্ত করিবার জন্য বিমুখ জীবের বিমোহিনী শক্তি অবিজ্ঞা শ্রীগৌরসুন্দর হইতে প্রকট লাভ করিয়া বদ্ধজীবকে গৌরসেবার নামে শ্রীগৌরদিকে পার্থিব ভোগের বস্ত্র মনে করাইয়া সেবার পরিবর্তে শ্রীগৌরদেবের উপর প্রভুত্ব করে। কৃষক যেরূপ অনভিজ্ঞ হইলে শ্যামাধানকে ধানগাছ মনে করে, কৃষক

যে রূপ ক্ষীণদৃষ্টি হইলে শ্রামার পরিবর্তে ধান গাছের উৎপাদন করে, সেইরূপ জীব অবিজ্ঞাগ্রস্ত হইলে বিবর্ত বা ভ্রমে পতিত হন। তিনি তখন সত্যবস্তুর বুদ্ধিতে না পারিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন। সত্যবস্তুর অন্ত্য বলিয়া ভ্রম হইলে অভ্যন্তরীণ ঘটে না, কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। যাহারা অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হইয়া কার্য্যানুপূর্ণ, তাহাদিগের আত্মগতাই একমাত্র সিদ্ধির কারণ। অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা আমাদের কোন সুবিধা করিতে দেয় না। অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতারবাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহবাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কষ্টকাৰ্ণী পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহ-প্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহ-বাদের ক্রটিক্রমে প্রথম-মুখেই শ্রীগুরুদেব আস্ত। ‘আমাকেই গুরুদেবকে ভূরস্ত করিতে হইবে’—এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিঘ্ন সঙ্কেতে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতারবাদ প্রবল।

নিরন্তরকূহক সত্যবস্তুর পরমেশ্বরের সেবার শ্রীবৈষ্ণব গুরু অধিষ্ঠিত। অধিরোহ-বাদের কূহক বা মায়ী সেখানে ঘাইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবের গুরুগিরি করিবার প্রার্থী অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া আপনাকে অবতারবাদী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া যে জ্ঞানরহিত উক্তি করেন, এবং যে শিষ্য জ্ঞান-পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অচ্যুত গোত্র হইতে চ্যুত হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে হরিবিমুখ হইয়া যান—বংশধরসম্প্রদায়গত শ্রামাধিপতির বীজধারা সংরক্ষণ করেন মাত্র। শ্রামাধিপতির উত্তরোত্তর উন্নতিক্রমে ধাত্তক্ষেত্র আর ধান উৎপন্ন করিতে পারে না। ভক্তির পথ কলিহত বুদ্ধিতে অধিরোহবাদের অধীন হইয়া পড়ে, তাদৃশ ভক্তিকে ‘মিছাভক্তি’ শব্দে মহাজনগণ বলিয়া থাকেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত ‘স্বাভাবিক ভগবদাশ্রয়’, গীতা ‘সকামোপাসনা’, বেদান্ত ‘কর্ম্মবাদ’ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করেন।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিজ্ঞানিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্তন যোগ্য। অধিরোহবাদ সর্বদা পরিবর্তনময়। অধিরোহপ্রণায় যিনি গুরু হন তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্যবস্তুর বিকৃত করেন, কেননা পরিবর্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য,

শিষ্টাণ্ড অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্যসত্য ঐক্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিজ্ঞা-মুক্ত নিরন্তরুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্রভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীবাসকে দিয়াছেন, শ্রীবাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিতেছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅষ্টমতপ্রমুখ ঈশ্বরবস্তুতে প্রদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন—সুদূর গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্যসত্যের সর্বদা অবস্থিত, তাহার মধ্যে কোন বিবর্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতারবাদী বৈষ্ণবগণ নিত্যসত্যের আশ্রিত। অধিরোহবাদী প্রাকৃত বীরগণ নিজ নিজ পূর্বগুরুদিগের উপর আশ্রিপতা বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য গ্রহণে পরাভূত।

বর্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞার ছলনায় বাহারা অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া হরিকীর্তনের নামে জড়ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা ‘বৈষ্ণব’ শব্দবাচ্য নহে—প্রকৃতপ্রস্তাবে কপটী বা মিছাতত্ত্ব। তাঁহারা যাহা কিছু প্রচার করেন, তাহা ‘ভক্তি’ শব্দবাচ্য নহে বা ভক্তিপ্রচার নহে। অনভিক্ত সমাজকে ভ্রমণথে লইয়া যাইতে সকল অবৈষ্ণবেরই অধিকার আছে। সুদূর বিষ্ণুভক্ত তাদৃশ দৌরাভ্যার প্রশংস দেন না। তাঁহারা পূর্ব মহাজনের সকল কথাই নিজের আচরণ বলিয়া জানেন। যেখানে পূর্ব মহাজনের আচরণ উল্লিখিত হইয়া ভোগপিপাসা প্রবল হইয়াছে, তথায় হরিবিমুখতামাত্র অবস্থান করে। শ্রীমাধ্বাসকে যদি আমরা ধানগাছ মনে করি এবং ধানগাছকে যদি আমরা শ্রীমাধ্বাস মনে করি, তাহা হইলে আমাদের হরিসেবার পরিবর্তে হরিদ্বারা অবিজ্ঞার সেবা করাইয়া লওয়া হয়।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয় তাহা কলিজমোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইজিরতৃপ্তির আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা শুদ্ধভক্তির অহুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয়কথা বা গ্রাম্যকথা নামে দৃঢ়রূপে জানিব। শাস্ত্র-গুরু ও বাঁকাই আমাদের অবলম্বন হউক। আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর কন্মীর নিকট মাধুকরী করিব না।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

আশ্রমীয় অনুশাসন মানিয়া লওয়াই শিষ্টাচার

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ ব:

ইং ১/৬/১৯৬৩

স্নেহাস্পদে—

* * * মহারাজ ! * * * * মহারাজ “নয়মাতৃক” গ্রন্থানুসারে সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহস্বাস্থ্যের নাম ব্যবহার করায় একপ্রকার অপরাধী। তাঁহার পুস্তকে ঐরূপ নাম ব্যবহার করায় আমরা ইত্যন্ত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি।

দুই নোঁকার পা দেওয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। সুতরাং এইদক বিষয় আমার ব্যক্তিগতভাবে মীমাংসা হইয়া গেলে পরে পত্রের উত্তর দিব। তাহা ছাড়া বইখানা পড়িবার সময় এখনও পাই নাই। শীঘ্রই তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

নিতামঙ্গলাকাজক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের আদলে

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৬ পৃষ্ঠার পর]

অশ্রমুখী শ্রীরাধার একরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ স্নেহে স্বয়ী পীতাম্বরের অঞ্চলদ্বারা তাঁর চোখের জল মুছায়ে স্বমধুর বাক্যে বললেন,—‘হে স্নমুখি! তুমি কেন এত ভীতা হয়েছ? তুমি ধীর জন্ত ভয় করছ, দে আশ্বাস আমারই অংশ, ক্ষুদ্র মাছুষ নয়।’ রাধা তথাপি তাতে অদম্যত হলে ভগবান্ তাঁকে পুনরায় বললেন,—‘হে রাধে! এ বিষয়ে আমি এক উপায় বলছি, তা শুন। মামা আশ্বানের বিবাহোৎসব দর্শনের জন্ত আমি মায়ের সাথে গমন করে বিবাহের সময় মামা আশ্বানের কোলে বসব। একরূপে বিবাহ

অস্থূর্ণানে আমি থেকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হব। লোকে জানবে—রাধার সাথে আগমনের বিবাহ হল; কিন্তু তোমার আমার পরম গোপনীয় তবু কেহই জানতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন,—হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে, তোমাবু প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়ে আরও এক বর প্রদান করছি। আজ হতে আমার তত্ত্ববৃন্দ তোমার ‘রাধা’ নাম পূর্বে সংযুক্ত করে আমার ‘কৃষ্ণ’ নাম স্মরণ করবেন। যে-সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অগ্রে ‘রাধা’ শব্দ প্রয়োগ পরে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ উচ্চারণ করবেন, তাঁরা নিশ্চিত আমার পরম-ধামে গমনে সমর্থ হবেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে ও সাংকালে ‘রাধা-কৃষ্ণ’ যুগলনাম জপ করেন, তাঁর নিখিল পাপরাশি বিনাশ হয়। কেহ মোহগ্রস্ত হয়ে বা ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা পরিহাসচ্ছলে আমার নাম অগ্রে উচ্চারণের পর, তোমার নাম স্মরণ করলে তাকে মহাপাতকগ্রস্ত হতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ হতে বর লাভ করে রাধা আনন্দচিত্তে পিতৃগৃহে সমাগতা হলেন। বৃষভাসুররাজাও অমাত্য-পুরবাসী-রাজসুত্রবর্গ, পুরোহিতগণকে স্বভবনে এনে রাধার বিবাহোৎসব সম্পাদন করলেন। বৃষভাসুর-রাজা আয়ানকে কন্যা সম্প্রদানকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীরাধিকার মনোভিলষিত প্রার্থনা পূরণার্থ আয়ানকে পশ্চাতে রেখে স্বীয় দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে কন্যারত্নের পাণিগ্রহণপূর্বক ‘বাচং’ এই প্রতিগ্রহসূচক বাক্য বগেন। বৃষভাসুররাজা কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ কতকগুলি রত্ন শ্রীকৃষ্ণহস্তে প্রদান করিলে তিনি তাও ‘স্বস্তি’ বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু এতাদৃশ বৃন্তান্ত রাজা বৃষভাসুর কিঞ্চিৎ মাত্রও উপলব্ধি করতে পারলেন না। বাহ্যতঃ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আগমনের সাথে রাধার বিবাহ হল বলে মনে হলেও আসলে রাধা কৃষ্ণকেই বিবাহ করেছেন। ইতঃপূর্বে শিবাদি দেবতার উপহিতিতে ও প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরহিত্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। রাধা চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ‘বৃষভাসুর-রাজা পরমাসুন্দরী এক কন্যা লাভ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কন্যাটি জন্মান্ধ।’ লোকমুখে একথা শুনে মা-মশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে রাধাকে দেখতে যান। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কোল হতে নেমে শয্যায় শায়িতা রাধাকে ধরেন। শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শচুতবে রাধা তাঁর শুভাগমন বুঝতে পেরে চোখ খুলে নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন। রাধা কৃষ্ণময়ী। বৃঃ গৌতমীয়ে—‘দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্বোধিনী পরা।’ ব্রহ্মা-শিবাদিরঙ

বন্দিতা পরদেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী কৃষ্ণময়ী রাধা, যিনি সর্বচিন্তাকৰ্ষী শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করবার সামর্থ্য রাখেন। স্বকৃপাশিষ্টে—‘রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা’ অর্থাৎ ‘রাধাকে নিয়েই মাধব দেবতা, মাধবেরই রাধা’ এ হেন নিত্য-সদ্বন্ধযুক্ত রাধা আগ্রানের সাথে বিবাহ সম্বন্ধে কেন কলঙ্কিনী হয়েছেন, তারই অনুদধান করতে হবে।

আগ্নান পূর্বজন্মে ছিলেন এক তপস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন,—নারায়ণ যে চরাচর জগৎ পালন করেন, তা তাঁর শক্তি ঐ লক্ষ্মীর দৌলতেই। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের জন্ত কি না করেন, তাহা বুঝতে সেই লক্ষ্মীকে একবার আমার ঘরে বিজয়া রূপে ঘরণী করে বরণ করতে হবে। এই নকল করে কঠোর তপস্শ্রায় ত্রতী হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর তপস্শ্রায় ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতারও ভীতির নকার হয়েছিল। নারায়ণ তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে বর দিতে চাইলে, তপস্বী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীকে গৃহিণীরূপে প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু তাঁকে অল্প বর প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ লক্ষ্মী ছাড়া অল্প কোন বরই নিতে চাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণু বললেন,—‘হে ব্রাহ্মণ! লক্ষ্মীকে তুমি এ জন্মে গৃহিণীরূপে পাবে না। এর পরে তুমি গোপবংশে আগ্নানরূপে জন্মগ্রহণ করবে। লক্ষ্মী বুধভাঙ্গ-রাজ্যের কন্যারূপে জগতে প্রকটিতা হবেন। তখন তুমি তাঁকে গৃহিণীরূপে পাবে।’ লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে লক্ষ্মীছাড়া করে লক্ষ্মীবান্ হবার ব্যতিক্রম প্রার্থনার জন্ত ব্রাহ্মণ আগ্নানরূপে মাল্যকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাধারানীর বিবাহকালে শ্রীভগবদ্দিক্‌শ্য তিনি নপুংসকত্বে পরিণত হন। আগ্রানের পূর্বজন্মে তপস্বী ব্রাহ্মণরূপে বর প্রার্থনা ও রাধার আবেদনকে সামঞ্জস্য করে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ বিবাহে লক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিব্রতা ধর্মকে রক্ষা করেছেন।

বিবাহযোগ্যা বুধভাঙ্গ-রাজনন্দিনী বুদ্ধিমতী শ্রীরাধা কালিন্দীতীরে কান্তায়নী-ব্রতের ছলে শ্রীকৃষ্ণের নাথে যে পরামর্শ করেছেন তা পিতা নন্দ, মাতা যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-স্নেহপরায়ণ অভিভাবকদের জানাবার জন্তে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যা অষ্টমথীকে সহচরী করেছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাবার এই মথুরাই প্রধান নায়িকা। পক্ষান্তরে ভাগবতের বঙ্গহরণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার ব্রজকুমারীদের প্রার্থনা তাঁদের পিতামাতা হিতৈষী গুরুজনদের কাণে তোলার জন্ত ঐ কুমারীদেরই পত্নীবাসী গোপবালকদের শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুত সখারূপে নাথে করে কালিন্দীতীরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐহা নিতান্ত বালক-বালিকার স্ব-সংসার-খেলার কালে প্রেম-ভালবাসার

কথোপকথন বাণ-চপলতা বলেই গুরুজনদের নিকট ধর্মব্যয়ের মধ্যে গণ্য হয়নি। শ্রীকৃষ্ণে অমৃতকৃত্রাজের পিতামাতা গুরুজনদের নিকট রাধাকৃষ্ণের কিছুই গোপন নেই। তাঁদের সরল স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তায় সখীদের মাধ্যমে মা-যশোদা ও যশোদা-কর্তৃক নন্দমহারাজ সবই জানেন। নন্দ-যশোদার দৃষ্টিতে পতিব্রতা সতীসাক্ষী লক্ষ্মীধরুপিণী শ্রীমতী রাধা ভক্তবৎসল নারায়ণের বাৎসল্যের রক্ষার ভ্রাত্তে তাঁরই আদেশে সাধারণ লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে আয়ানের বিবাহিতা নামে আয়ান-ঘরণী বলে কলঙ্কিনী হয়েছেন। কিন্তু রাধা নন্দ-যশোদারই স্নেহের কাজালিনী, তাদেরই গৃহবধু।

আয়ান তাঁর পূর্বজন্মের তপস্তার দৌলতে নিশ্চিতরূপে জানেন গৃহলক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা সতী-সাক্ষী-পতিব্রতা-শিরোমণি। জটীলা-কুটিলার মত খাণ্ডড়ী-নন্দদের ঘরে রাধাকে গৃহবধুরূপে বরণ করে, আয়ান যে কি ভুল করেছেন, তা মর্মে মর্মে তাঁর অনুভব হয়েছে। জগৎপতি, প্রজাপতি, সভাপতি, গৃহপতি প্রভৃতি পতি-পদবাচ্যের শকার্থ—স্বনিয়ন্ত্রণকারী, রক্ষক, পালক, পোষক। সে দিক দিয়ে জটীলা, কুটীলা ও তদনুগামীরা অপবাদ থেকে রাধাকে উদ্ধার করার বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধীন আয়ান। তাই জটীলা প্রভৃতির অপবাদের প্রসঙ্গকে তিনি এড়াতে পারেন না। অবশেষে জটীলা-কুটীলা ও আয়ান উভয়পক্ষই একদা উহা প্রমাণের জন্ত চেষ্টিত হলেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের মিলন-স্থলীতে উপস্থিত হবার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ হৈমবতী কালিকার রূপ ধারণ করেন এবং রাধা তাঁর আরাধনায় তন্ময়া হন। জটীলা, কুটীলা ও আয়ান রাধার এ রূপ দেখে মা-বোনের সাথে আয়ান কাতায়নীকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করলেন। তাঁরা রাধিকাকে পরমা তপস্বী জেনে নিজদিগকে ধন্যবোধে বার্ষভানবীকে স্নেহালিঙ্গন ও আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রীল ব্যানদেবের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠানের পর, পরবর্ত্তী শ্রীমদভাগবত মহাপুরাণে রাধা গোপীগণের মধ্যে অবগুষ্ঠিতা নব গৃহবধু। তাই রাধা সর্বসাধারণের লোকচক্ষুর পর্দার অন্তরালে। কিন্তু সখীদের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাবার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অগ্ৰাচ্ছ গোপীগণের সজ্জন-পরিবার-পরিজন ও নন্দ-যশোদা প্রভৃতি গুরুজনদের নিবেদিত নেইই, পরন্তু তাঁরা পরামর্শ-প্রদানকারী ও ব্যবস্থাপক।—এখান হতেই মহাকবি জয়দেব তাঁর শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রথম স্তবকের সূচনা করেছেন।

কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে অধ্যায়গুলির নামকরণ করেছেন ‘দর্গ’ বলে। ‘দর্গ’ মানে—স্বাভাবিক সৃষ্টি। ‘নিদর্গ’ মানে স্বাভাবিকতার বিরূতরূপ। প্রথমদর্গের নামকরণ করেছেন, ‘সামোদদামোদর’ নামে। মা-ঘশোলা বাঁকে ভক্তিজোরে বেঁধেছেন, মাগের বাঁধনে থেকে যিনি পিতামাতা, গুরুজন, দখা-দখীগণকে আনন্দবিধান করেছেন ও তাঁদের দ্বারা আনন্দিত হচ্ছেন একরূপ ভাব।

প্রথম শ্লোকে ‘মেঘৈর্মেহং ধরম্’ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। গোড়ীয় বৈকবগণ সমাজকে আকাশের সাথে তুলনা করেছেন, যথা—“যতিধর্মে পরিধানে স্বরূপ বসন। যুক্ত কৈল ‘মেঘাবৃত গোড়ীয়-গগন’।” ‘মেঘ’ জলের নৈমিত্তিক ধর্ম বা স্বভাবের নিদর্গ। জল একটি তরল পদার্থ বা বস্তু। পদার্থের স্বভাবকে ধর্ম বলে। তরলতা, বদ্ধাবস্থায় সমোচ্চলীলতা, নিয়গামিতা, পাত্রানুসারে আকার ধারণের সামর্থ্য ও যে কোন রংকে আত্মসাৎ করার বৃত্তি জলের ধর্ম। সেই জল যদি তার স্বাভাবিক তাপমাত্রা হইতে অধিক উষ্ণ হয়, তবে উহা বাষ্পে পরিণত হয়। আবার অধিক শীতলতায় হয় বরফ। এ দুই জলের নৈমিত্তিক ধর্মের পরিচয়। প্রথম শ্লোকে পিতা নন্দমহারাজ ‘নক্তং’ অর্থাৎ পূর্বের শারদীয়া রাতের রাত্রে রাধার মান করে রাসস্থলী ত্যাগ ও কৃষ্ণেরও রাধাকে ত্যাগের কথা ‘পুনরাবৃত্তির ভাবনায়’ ভীত কৃষ্ণ। সমাজেও ‘আমান ধরণী রাধা’ প্রভৃতি মেঘের দাজ ও তর্জন-গর্জন। বসন্ত ঋতুতে তিনি একা রাত্রিতে যেতে ভীত, অতএব রাধাই তাকে গৃহে লয়ে যাক একরূপ আদেশ। রাধা-কৃষ্ণের নিত্যসংস্রবী তাকে যে নৈমিত্তিক কারণে সাথে নিতে ভয় করে নন্দমহারাজ সে কৃষ্ণের নামোচ্চারণও করতে চান না। তাই ‘ভীকরয়ং’ ও ‘তদিমম্’ শব্দদ্বয় প্রয়োগ। এক হাতে কখনও তালি বাজে না। তাই নন্দ মহারাজ রাধারাগীকেও এই ভয়ের কারণের মধ্যে গণ্য করেছেন, ‘স্বমেব’ শব্দদ্বারা। পিতা নন্দ মহারাজের উপদেশে রাধাই এর বিহিত ব্যবস্থা করতে পারেন এমন ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় শ্লোকে পদ্মাবতী-চরণচারণ কবি জয়দেব। অনামধন্ত মহাকবি জয়দেব তিনি তাঁর শ্রী পদ্মাবতীর নামে পরিচিত নন। পদ্মাবতী রাধারই অপর নাম। ‘পদ্মং বিজ্ঞতে করে যস্তাঃ সা পদ্মাবতী’—রাধা। পদ্মাবতী- (রাধা) চরণ পূজা করেন যিনি—সেই জয়দেব বলে তিনি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সরস্বতীপতি হরির চরিত্র কেহ বাগ্দেরী কৃপায় বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের চরিত্র রাধারাগীর রূপা ব্যতীত নয়। রাধার পাদপদ্মের রূপায় তিনি “গীতগোবিন্দ”-নামক প্রবন্ধগ্রন্থের বর্ণনা করতে পারবেন, একরূপ ভরসাশীল জয়দেব। এক্ষেত্রে তিনি রাধার নাম পদ্মাবতী বলেছেন কেন?—যেখানে তাঁর আরাধ্য ‘ব্যাসদেব’ আখ্যায় অভিহিত, সেখানে তিনি তাঁর শক্তিকে ‘রাধা’ আখ্যা দিতে পারেন না।

—শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গুরুদেব ! নমি তোমা,
 কোটী জনমের অপরাধ মোর
 কৃপা করি' কর ক্ষমা ।
 মায়াদেবী যবে গলে ফাঁস দিয়া
 ভবকূপে মোরে দিলেক ডারিয়া,
 সেদিন হইতে যাতনা পেতেছি
 পরিয়া পথিক-জামা ॥

চৌরাশী লক্ষ জনম ধরিয়া
 ভবের মাঝারে মরিছি ঘুরিয়া,
 কেমন করিয়া পরপারে যা'ব
 শেষ করি' উঠা-নামা ?
 লোভ ও লালসা, ভোগের পিপাসা
 হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে ঠাসা,
 পরাণ-পাখী যে উড়িয়া যাইবে
 আসিলে মরণ-মামা ॥

ঠগ আর যত প্রতারণগণে
 আদরে সেবিছু আত্মীয়তাজ্ঞানে,
 তব কৃপা বিনা কেমনে হইবে
 ভব-পথ চলা থামা ?
 কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ যে ভাবিয়া
 কতদিন তাহে রহিছু মজিয়া,
 কৃপা করি যবে ভাঙ্গাইলে ভুল
 শেষ হ'ল ভয়ে ঘামা ॥

করণা-সাগর তুমি ওহে গুরু !
 কৃষ্ণভক্তি বিনা চিত্ত মোর মরু,
 কৃপা কর যাতে কাম-তরঙ্গের
 উত্তেজনা হয় কমা ।

আজিকে তোমার আবির্ভাব-দিনে,
কিবা অর্ঘ্য দিবে এ অধম দীনে !
শ্রদ্ধাঞ্জলি তব পদে দিহু যাতে
ভক্তিধন হয় জমা ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাকাজী—
—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

অভিধেয় তত্ত্ব

শ্রীরাধিকামাধবয়োৰপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীঃরণারবিন্দম্ ॥
হরিঃ পুৰুষৈশ্বর্য্যচ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্কুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥
দীব্যাস্ বৃন্দারণ্য-কল্পজমাধঃ শ্রীমদ্বৃদ্ধাগার-সিংহাসনেশ্বো ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ শ্রয়ামি ॥
তপ্তকাক্ষন-গৌরাজি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি !
ধূষভাসুহৃতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥
বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্ত চ ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবতৈ নমো নমঃ ॥

“আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ”—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আরাধ্যতম বস্তু বা কৃষ্ণই যে ‘নমস্কৃত্ত্ব’—এই উপলক্ষি হইবার পরেই প্রশ্ন আসিয়া যায়,—কি উপায়ে সেই আরাধ্যতম বস্তুর সেবা লাভ ঘটিবে ?

শ্রীমদ্ব্যপ্রভু বলিয়াছেন,—‘ভীবেষ স্বরূপ হয় মিত্য কৃষ্ণদাস।’ দাসের বর্ধাই হইল সেবা। সেই সেবালাভ কি উপায়ে সংঘটিত হইবে ? অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, তাহাকে শাস্ত্রে “অভিধেয়” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের অভীষ্ট বস্তু এ জগতে বহু। অভীষ্টলাভের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে সুখলাভ, কিন্তু জীব-হৃদয়ে যে চিরন্তন সুখের বাসনা রহিয়াছে, এই জগতের কোন বস্তুর দ্বারাই সেই সুখের

বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটা কখনই সম্ভব নহে। সে সুখ হইল—সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ, নিত্যবস্তু পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সহিতই জীবের মিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান। তিনিই ‘সম্বন্ধ তত্ত্ব’। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান। অনাদি-বহিস্মূহ জীব সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত হইয়া আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞান ভুলিয়া মায়ার দাসত্ব করিয়া বর্তমানে জীব জন্ম মৃত্যুচক্রে আবর্তিত হইতেছে ও ত্রিতাপ-জ্বালার ভয়ে নর্বীৰ্য্য ভীত হইয়া আছে। ইহা হইতে মুক্তির একমাত্র পথ সম্বন্ধ-জ্ঞানে জাগ্রত হওয়া। সেই কৃষ্ণ-স্মৃতিকে জাগ্রত করাই জীবের মুখ্য কর্তব্য। এই জাগ্রত করিবার উপায়কেই “অভিধেয়” বলা হইয়াছে।

অভিধেয়ের জন্ত প্রয়োজন সাধনা। সাধনার পথ অনেক প্রকার আছে—কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন পথটি বিধেয় বা চরম মঙ্গল লাভের সহায়ক, তাহা জানিতে হইবে। কর্ম স্বর্গাদি সুখ দিতে পারে, কিন্তু সংসার-বন্ধন মুক্ত করিতে পারে না। একারণে কর্মের অভিধেয়ত্বই নাই।

যোগী পরমাত্মার সহিত ও জ্ঞানী ব্রহ্মের সহিত মিলন চাহেন। যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। আর ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাগ্যে কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে।

ধর্ম, অর্থ, কাম ভক্তের সেবায় লাগিবার জন্ত সময় প্রতীক্ষা করে, আর মুক্তি মুক্তাঞ্জলি হইয়া ভক্তের নিকটে দণ্ডায়মান থাকে। সুতরাং ভক্তির দ্বারা চারি পুরুষার্থ সহজেই আসিয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত তাহা চাহেন না। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই ভক্তের কাম্য। ভক্তি ভিন্ন কৃষ্ণপ্রেম লাভ কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে।

সুতরাং সর্বশাস্ত্রে ভক্তিই একমাত্র মূল “অভিধেয়” বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভক্তির দ্বারাই জীবের চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—“হে অর্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমার নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।”

ভগবান্ স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মহিমা হইল তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাসবিশেষ। স্বরূপশক্তির বিলাসেই ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—“সত্ত্বং বিপুলং বহুদেব শক্তিতং যদীদৃশতে তত্র পুমানপাবৃতঃ।” বিপুলসত্ত্বকে ‘বহুদেব’ বলে। বিপুলসত্ত্ব অপাবৃত পুরুষ

প্রকাশিত হন। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলে বিত্তকনস্ব বা শুদ্ধকনস্ব। ভগবান্ চিদ্বস্তু; চিদ্বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভব নহে। স্বরূপশক্তির ক্লাদিমী বৃত্তির সারাই হইল ভক্তি। এই ভক্তি যখন স্বরূপশক্তির রূপায় ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন সেই ভক্ত-হৃদয় শুদ্ধকনস্বে পরিণত হয় এবং সেই হৃদয়ে স্ববার্ট কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হয়।

সুতরাং ভক্তিট “অভিধেয়” তত্ত্ব। কিন্তু কি উপায়ে ভক্তিলাত সম্ভব? ভক্তি অর্জন জীবের স্ব-চেষ্টায় বা অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। এমনকি, স্বয়ং কৃষ্ণও জীবকে ভক্তি দান করিতে পারেন না। ভক্তি হইল স্বরূপশক্তির ক্লাদিমীবৃত্তির অংশ। তাহার মালিক কৃষ্ণ নহেন। স্বয়ং বাধায়াণীই তাহার অধিষ্ঠারী। “ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জন”—একমাত্র ভক্তের নিকটে ভক্তের রূপাতেই ভক্তিলাত সম্ভব।

“সতাং প্রসঙ্গান্নম বীৰ্যাসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

ভজ্ঞোষণাদাশ্বপৰ্ণবজ্রানি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরমুক্রমিস্ততি ॥

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে কৃষ্ণের অনর্থনাশিনী কথা শ্রবণ হয়। অনর্থনাশিনী হরিকথা শ্রবণ হইতে নিষ্ঠার উৎপত্তিক্রমে ভগবন্মাহাত্ম্যের পরিজ্ঞান হয়, আর কচির উৎপত্তিহেতু হরিকথায় হৃদয় ও কর্ণের রসায়ণ হয়। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সঙ্গের পূর্বে শ্রবণ ক্রিয়া। শ্রদ্ধা হইতে সঙ্গ। হৃৎকর্ণরসায়নী কথা প্রীতির সহিত আশ্বাদন করিতে করিতে আসক্তি, রতি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্রমপন্থায় উদ্ভিত হয়।” (ভক্তিসন্দর্ভ)

কিন্তু ভক্তিলাতের ফল কি?

“প্রোক্তেন ভক্তিয়োগেন উজ্জতো মাহসকুন্মুনোঃ।

কামা হৃদয়া নশন্তি সর্কে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥”

“হে উদ্ধব! আমার কথিত ভক্তিয়োগ অবলম্বনপূর্বক যে মুনি নিত্যকাল আমার ভজন করিতে থাকেন, আমি তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম বিনষ্ট হইয়া যায়।” (ভক্তিসন্দর্ভ)

একারণে সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন-ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব গীত হইয়াছে,—

“অতএব ‘ভক্তি’ কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।

‘অভিধেয়’ বলি’ তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥”

“তৈছে ভক্তি-কলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।

প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥”

চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণকারী মায়াবদ্ধ জীবের ভাগ্যে কখন এই ভক্তিলাত ঘটিবে?

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥”

ভক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন । শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমদ্রূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন,— “অন্যভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মান্তনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকন্তমা ॥”

এই শ্লোকেই ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থালক্ষণ বর্ণমান । উত্তমা ভক্তিই ‘গুহ্যভক্তি’ । ‘কর্ম্মবিদ্ধা’ ভক্তিতে ভক্তিকল উদ্দেশ্য থাকায়, এবং ‘জ্ঞানবিদ্ধা’ ভক্তিতে মুক্তিকল উদ্দেশ্য থাকায় ইহাদের গুহ্যভক্তি বলা যায় না । ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহাশূন্য যে ভক্তি, তাহাই উত্তমা বা গুহ্য ভক্তি । ইহার দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম-ফল লাভ করা যায় । এই গুহ্য ভক্তির দুই লক্ষণ,—

(১) আনুকূল্য-ভাবে সহিত কৃষ্ণানুশীলন—ভক্তির ‘স্বরূপ লক্ষণ’ ।

(২) অন্যভিলাষিতা-শূন্যতা অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন ইতর বিষয়ে অভিলাষ না করা এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনাবৃত্ত—এই দুইটি ভক্তির তটস্থা-লক্ষণ ।

এই গুহ্যভক্তির ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

(১) “ক্লেশহীনী—ক্লেশ তিনপ্রকার—পাপ, পাপবীজ, অবিজ্ঞা । পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক ক্রিয়াসকল পাপ, পাপ করিবার বাসনাসকল পাপবীজ, জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম—অবিজ্ঞা । গুহ্যভক্তির উদয়ে ‘আমি কৃষ্ণদাস’ এই বুদ্ধি সহজে উদ্ভিত হয়; অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিজ্ঞা থাকে না । ভক্তি-দেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবারাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিজ্ঞারূপ অন্ধকার, সূতরাং বিনষ্ট হয়; ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন । সূতরাং ক্লেশস্বরূপই ভক্তির একটি বিশেষ ধর্ম্ম ॥”

(২) ভক্তি গুহ্যতা—যিনি গুহ্য ভক্তিসাধ করিয়াছেন, তিনি চারিগুণে (দৈন্ত, দয়া, মাননশ্রুতা, অন্তঃ মান প্রদান) গুণী হইয়াছেন । বিষয়-সুখ, ব্রহ্ম-সুখ, সর্বপ্রকার সুখ প্রদানের ক্ষমতা ভক্তির থাকিলেও গুহ্যভক্তিকে চতুর্ভুজের ফল দান না করিয়া নিত্য পরমানন্দ কৃষ্ণপ্রেমই দান করেন ।

(৩) ভক্তি মোক্ষলঘুপ্রাপ্তিকারিণী—গুহ্যভক্তির হৃদয়ে ভগবৎসংস্পৃহা উদয় করাইয়া ভক্তিদেবী মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করান ।

(৪) ভক্তি সুহৃৎতা—বিশেষ অধিকারী না হইলে ভক্তিসাধ ভাগ্যে

ঘটে না। ভুক্তি-মুক্তির দ্বারাই অধিকাংশ জীব ভুলিয়া থাকে। ভক্তি স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা জীব লাভ করিতে পারে না। একমাত্র ভক্তের ও ভগবানের কৃপাতেই ভক্তিলাভ ভাগ্যে ঘটে। স্বীয় প্রচেষ্টায় অন্য কোনপ্রকার সাধনের দ্বারা শুদ্ধভক্তিলাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে না। একারণে ভক্তি স্বহর্জতা।

(৫) ভক্তি সাক্ষানন্দ বিশেষরূপা—“ভক্তি চিৎস্বথ, স্তব্ধএব আনন্দ-সমুদ্র। জড়জগতের বা তাঁহার বিপরীত চিন্তাময় জগতের যে ব্রহ্মানন্দ আছে তাহা পরাক্রম গুণীকৃত হইলেও ভক্তি-স্বথ-সমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না। জড়স্বথ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত স্বথ নিত্যস্ত শুদ্ধ—সেই দুইপ্রকার স্বথই চিৎস্বথ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পরে তুলনা নাই; এতদ্বিবন্ধন যাহারা ভক্তি-স্বথ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ একটি গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ব্রহ্মাদিস্বথ তাঁহাদের নিকট গোপ্পদ বলিয়া বোধ হয়, সে-স্বথ যে অসুভব করিতেছে, সে-ই জানে, অগ্নিরে বলিতে পারে না।”

(৬) ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—“যাহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নিকটে সমস্ত প্রিয়বর্ণ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না।”

ভক্তি এরূপ উপাদেয় হওয়া সত্ত্বেও সকল শাস্ত্রজ ব্যক্তি ভক্তিলাভে যত্নবান হন না। ইহার কারণ, মানব স্বীয় জড়ীয় বিচার-বুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। পূর্বস্মৃতি-বলে যে-সকল মৌভাগ্যবান ব্যক্তির বিন্দুমাত্র কৃষ্ণের উদয় হয়, তাঁহারা ইহা একমাত্র ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার শক্তিলাভ করেন। চিৎস্বথ বিষয়ে এই জড়ীয় যুক্তি-তর্কের অধিকার নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী মায়া সরকার

আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যাহাতে অন্তপ্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্বদা সতর্ক হই। কোমলশ্রদ্ধাগণের প্রতিপদেই বিপদ। তাঁহারা অন্তর্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

—জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর]

কিন্তু সেই মানুষের চেহারাটাকেই মানুষ বলা হয় নাই। 'সবার উপরে 'মানুষ' নত তাহার উপরে নাই'—কবির একথা বলার উদ্দেশ্য কি? লর্ড মেকলে যা বলেছেন,—'More than a man you can not be'—এ কথারই বা তাৎপর্য কি? এখন আমি বলতে চাই, মানুষ কাকে বলা হবে? মানুষের চেহারাটাকে নিজে যদি আমরা বসে থাকি, তাকে কি মানুষ বলে স্বীকার করা হয়েছে? Rationality ও Animality—দুটো জিনিস আছে। মানুষ যদি Rational being হয়, তবে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে Rational being। নীতি-আদর্শপরায়ণ মনুষ্যকেই ঠিক ঠিকভাবে মানুষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চেহারাটা মানুষের মত, কিন্তু কাজটা অমানুষের মত—পশুর মত, তাকে বলা হল Animal। Animality-সর্বস্ব যে মনুষ্য শরীরধারী ব্যক্তি, তাকে মানুষ বলে আখ্যা দেওয়া হয় নাই।

প্রশ্ন : একে কি মানুষ বলা হবে?—নীতি-আদর্শ-বিবর্জিত মানুষকে মানুষ বলা হবে না, সে মনুষ্যত্ব থেকে খারিজ। দ্বিতীয় প্রশ্ন : যদি কেউ নীতি-আদর্শ মানেন, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। অতএব প্রথম বাদ হচ্ছে—নিরীশ্বর নির্নৈতিকতা, শেষের দিকে বাদ গেল—নিরীশ্বর-নৈতিকতা। যিনি ঈশ্বরকে মানেন না, কিন্তু নীতি মানেন, তার নীতি কাকে আশ্রয় করে? নীতি ত' ভগবানকে আশ্রয় করে, ভগবানকে বাদ দিয়ে কোম নীতি-আদর্শের কথা স্বীকৃত হয় নাই। যখন আমরা নীতি-আদর্শের কথা বলব, তখন ভগবান্ তার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। নীতি—Principle বলে যে জিনিস শাস্ত্রে রয়েছে সেটাকে বলেছেন Axiomatic Truth। সেটা সবাইকে আমাদের সব সময়ের জন্ত মেনে নিতে হচ্ছে। সেটা যদি মনুষ্যত্বের প্রাণী পাতী-পশুর মধ্যেও দেখা যায়, তাকেও মেনে নিতে হচ্ছে। সেই নীতি-আদর্শ মানুষের মধ্যে যখন পূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে, তখন তার সেইভাবে পরিচিতি আসছে। শাস্ত্রে সেইজন্ত মানুষকে কতভাগে ভাগ করেছেন।—

প্রথম মানুষকে বললেন—নিরীশ্বর নির্নৈতিক, দ্বিতীয় মানুষকে বললেন—নিরীশ্বর নৈতিক। এই দুই শ্রেণীকে মনুষ্যত্ব থেকে বাদ দিলেন। তৃতীয়

Categoryতে এল সেশ্বর নৈতিক । তাকে বলা হল,—হ্যাঁ তুমি মানুষ, তোমাকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল, মনুষ্যের Categoryর মধ্যে তুমি পড়লে । Fourth Categoryতে এল সেই মনুষ্য যখন নীতি-আদর্শ-পরায়ণ, যখন তাঁর ধর্ম বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এসেছে, তখন তাঁর 'সাধনার ক্রম শুরু হয়েছে । তখন তাঁর দরকার হচ্ছে গুরু—Spiritual Preceptor । কেন ? —তিনি না হলে সাধন-পথে চালিত করতে পারবেন না কেউ । নানামতে বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক Diverted হবেন তিনি । তিনি সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেন না । 'মহাজনো যেন গত্যঃ সঃ পন্থাঃ' সেই পন্থা দেখাবেন সঙ্গুরু । এইজন্যই গুরুর প্রয়োজন হচ্ছে । গুরুর আশ্রয় নিয়ে শিষ্য বা ছাত্র যখন সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন তখন তার Fourth stage । আগেকার মানুষকে বলা হল—মুকুলিত চেতন । যখন সাধন-ভজ্ঞন শুরু করেছেন তিনি, Proper trackএ চলতে শুরু করেছেন, তখন তাকে বলা হল বিকচিত চেতন মনুষ্য । সাধন-ভজ্ঞন করতে করতে যখন ক্রমশঃ তাঁর বাস্তব অমুভূতি—Realisation আসছে, যখন তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তখন তাঁকে বলা হল পূর্ণ-বিকচিত-চেতন মনুষ্য, সিদ্ধ মনুষ্য । সুতরাং এইভাবে মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ অনুসারে—Gradual development অনুযায়ী শাস্ত্রে মানুষকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন । এটা আমাদের মনে নিতে হচ্ছে । কেবলমাত্র মনুষ্য-শরীরধারী ব্যক্তিকেই যদি মানুষ আখ্যা দিতেন, তাহলে ভুল করতেন আর্ধ্য-ঋষিগণ । কিন্তু তাঁরা তা করেন নাই । সেইজন্য বৈষ্ণব-কবি বলেছেন, —“মানুষ আকার হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম ।” তোমার কাজটা দেখছি উল্টো । চেহারাটা তোমার মানুষের মত বটে, কিন্তু Animality ভর্তি তোমার মধ্যে । তুমি তোমার বিরূপ আচরণ দিয়ে Animality প্রমাণ করছ, তুমি তোমাকে Rational being বলে প্রমাণ করতে পারলে না । ঋষিগণের বিচারের মধ্যে এসব কথাগুলো আছে ।

মানুষের যে চরম বিকাশ,—‘Manliness in next to godliness’ । মানুষ সাধনার দ্বারা—সাধনার ক্রমানুসারে শুদ্ধিতা বা দেবত্ব লাভ করতে পারে । ভগবান্ তাঁর সব Officer নিয়ে অমন্ত বিশ্বদংসার চালাচ্ছেন । কখনও কখনও Officer Groupএ জনসংখ্যা কমে গেলে এই মনুষ্য-সমাজ থেকে ‘চূনাও’ করে কিছু কিছু officerদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তাঁরা দেবত্ব লাভ করছেন । যেমন এই দুনিয়াতে আমরা অনেক Postএ Honourary Service আছে দেখতে পাচ্ছি, তেমন ভগবানের রাজ্যেও ঐ রকম আছে ।

বিশেষ শক্তিশালী মহামুকে দেবত্ব-পদ দিচ্ছেন ভগবান্। এর বহু প্রমাণ রয়েছে শাস্ত্রে।

তাহলে ব্রহ্মা কাকে বলি? শিবাদি দেবতা কাকে বলি?—বলছেন, যত officer আছেন, সব officer-এর মধ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এঁরা হুজুম—ব্রহ্মা এবং শিব। তাঁর ভিতরে আবার শিবের মহিমা অধিক। তাঁদের যে-সব দাঙ্গ-দায়িত্ব, যে-সব Duty, সেগুলি শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। শিবঠাকুরকে, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করা হল,—আপনারা এ সমস্ত কাজগুলো কোথা থেকে পেয়েছেন? আপনারা যে এই সকল Duty-গুলি করে যাচ্ছেন, এগুলো কে দিলেন আপনারদের? কীর আজ্ঞা পালন করছেন আপনারা? ‘সৃষ্টামি তন্নিযুক্তোহহম্ হরো হরতি তদ্বশঃ’। ব্রহ্মাজী বলছেন,—সেই ভগবৎ-কড়ক নিযুক্ত হয়েই আমি ব্রহ্মা জগতে গৌণ সৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছি। ‘হরো হরতি তদ্বশঃ’—শিবঠাকুরও এই গৌণ প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন। আবার কখনও শিবঠাকুর নিজেই বলছেন ঐ এওই কথা। যখন শিবানী প্রশ্ন করছেন, তুমি ও আমি কোথা থেকে এলাম? আমাদের Origin কে? তখন শিব-ঠাকুর বলছেন,—

“তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।

কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।”

সেই যে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সেই যে সর্বহেতুভূত বস্তু, তাঁর থেকে তুমি, আমি এসেছি। কথাটা চিন্তা করবেন। ব্রহ্মা বলছেন,—তাঁরই আজ্ঞায় আমি গৌণ সৃষ্টি করে থাকি।

অথাপি যৎপাদনথাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃত্যর্হণাত্তঃ।

সেশং পুণাত্যন্ততমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।

ব্রহ্মা অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। সেই অর্ঘ্য গঙ্গারূপে এ জগতে আসছে। শিবঠাকুর গঙ্গাদেবীকে জটায় ধারণ করেছেন। জগৎকে পবিত্র করছেন সেই গঙ্গাদেবী। ব্রহ্মা তাঁরই আজ্ঞাবাহী ভূত। “সেশং পুণাত্যন্ততমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।” সূত্রবাং সেই ভগবান্ ছাড়া Supreme Command, Supreme Lord, Almighty Lord আর কে আছেন? শ্রীভগবানের সর্বশক্তিমত্তা দেখাচ্ছেন; তিনি নিখিল দেব-দেবী সকলের উপরওয়াল, সেটাই প্রমাণ করছেন এখানে।

অবতারবাদ নিয়ে আজ আলোচনার কথা। শাস্ত্র অবতারবাদ নিয়ে বলছেন প্রথমেই,—

অবতারা হুংখোয়া হরে: সব্বনির্বেদ্বিজ্ঞা: ।

যথাহবিদাদিন: কুল্যা: নরস: স্ত্বা: সহস্রশ: ॥

অবতারের কথা বলছেন। কাকে বলে অবতার? কাকে বলে অবতারী? এখানে ব্যাখ্যা করছেন,—সব্বমিষি ভগবান্ শ্রীহরি, তাঁর থেকে বহুতর অবতার generated হচ্ছেন। কিরকম?—অক্ষয় সরোবর থেকে যেমন বহু নদ-নদী প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই অনন্ত শক্তিমান্ সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকেই অসংখ্য অবতার আসছেন বেরিয়ে। এখন বিচার হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ সর্বাবতারী, Main Fountain Source যে কৃষ্ণ, তাঁর থেকে নিঃসৃত এই যে অবতারগণ, এঁদের কার কতটুকু ক্ষমতা এবং কতটুকু রসগত বৈশিষ্ট্য আছে, তা নিয়েও শাস্ত্র বিচার করেছেন। আমরা যখন দার্শনিক বিচারে প্রবেশ করি, তখন দেখি—নারায়ণ বা বিষ্ণু স্বরূপে দুই এক। শ্রীরামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে যত সব অবতার এসেছেন, নারায়ণ-স্বরূপে সব এক। নারায়ণ কাকে বলা হবে?—যাঁর ভিতরে ৬০টি গুণের সমাবেশ বা ৬০টি গুণ-সমবিত্ত তত্বকে বলে নারায়ণ বা বিষ্ণু। এখান থেকে পূর্ণত্বের বিচার আরম্ভ হয়েছে। ৫৫টি গুণবিশিষ্ট তত্বকে বলা হয়েছে শিব বা ব্রহ্ম। ৫৫টি গুণ আংশিক-ভাবে, পূর্ণ নহে। কিন্তু পূর্ণ ৬০টি গুণের অধীশ্বর যিনি, তাঁকে বলা হল নারায়ণ বা বিষ্ণু। এই Categoryর মধ্যে আসছেন সমস্ত অবতার, যদিও ভক্ত ও ভগবানের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিত্যবর্তমান। নারায়ণ-স্বরূপে কোন পার্থক্য বিচার করা হয় নাই। সেখানে একই তত্ত্ব, কিন্তু কোথায় বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করছেন? যেমন ধরুন রামস্বরূপ, যিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, তাঁকেও পূর্ণব্রহ্ম বলা হচ্ছে। কিন্তু রসগত বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সেখানে রয়েছে, যেটা নারায়ণ-স্বরূপে নাই। নারায়ণ-স্বরূপে ৬০টি গুণ আছে, কিন্তু রামচন্দ্রের ভিতরে ২৫ গুণ ও রস বেশী আছে। শান্ত, দাস্ত এবং সখ্যের অর্ধেক। কৃষ্ণ-স্বরূপে পূর্ণ ৬০টি গুণ আছে। তাঁর চারটি গুণ অধিক আছে—লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্য। স্তবরাং ৬০টি গুণের পূর্ণতম যে Entity, তাঁকে বলা হল শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী। পূর্ণত্বের বিচারে কৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারকে ছোট-বড় করা হয় নাই। সেখানে এক বিচার। কেন?—অথও তত্ত্ব বলে। নারায়ণ তত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব অথও তত্ত্ব। ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর তত্ত্ব অথও। অথও কাকে বলা হবে?—গুরুতত্ত্বকেও বললেন অথও। প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে,—

ওঁ অথও মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুত্বকেও বললেন অথও তত্ত্ব। ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তি—তিনই অথও তত্ত্ব। একে খণ্ডিত করা হয় নাই, খণ্ডিত করা যায় না। পূর্ণতমতত্ত্ব সর্বাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর থেকে সমস্ত অবতার generated হয়েছেন। অসংখ্য নদ-নদী যেমন অক্ষয় হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসে, তদ্রূপ সেই সত্ত্বগুণনিধি যে ভগবান্ কৃষ্ণ, তাঁর থেকে অসংখ্য অবতার বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই কি সমগুণদম্পন?—বিষ্ণু বা নারায়ণ তত্ত্ব-হিসাবে সমান, কিন্তু যেখানে ‘শক্ত্যাবেশাবতার’ বলা হল, সেখানে বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব। সেখানে ভগবান্ ও জীবের পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। তত্ত্বদর্শন হল জীব এবং ভগবান্। সব জীব যদি শিব হয়ে যান, তাহলে Theory ভুল হয় না কি? জীব তাঁকেই বলা হবে, যার মধ্যে ৫০টা গুণ আংশিক মাত্রায় আছে। ৫৫টা গুণ যার মধ্যে আংশিক মাত্রায় আছে, তাঁকে বলে শিবতত্ত্ব বা ব্রহ্মা তত্ত্ব তাহলে জীব কি করে শিব হন, যুক্তি দিয়ে বিচার করা হউক। যে কথটা বাজারে চলছে—‘জীব শিব হন’, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে—বিচারক্ষেত্রে—দার্শনিক বিচারে আমরা ওটা পাই না। সব জীব শিব হতে পারেন না। শিবের যে শিবতত্ত্ব, তাঁর যে প্রাধান্ত সর্বজনস্বীকৃত সত্য, Axiomatic Truth। স্তূতরাং স্বতঃ সব জীব শিব হতে পারেন না, তখন জীব ভগবান্ কি করে হচ্ছেন বা হবেন? এটা কি সম্ভব? বহু ব্যক্তির ধারণা আজ,—জীব ভগবান্ হতে পারে। কিন্তু কোনক্ষেত্রে হতে পারেন না, আজ পর্যন্ত হতে পারেন নাই, এটা কখনও সম্ভব নয়—It is quite impossible। যদি ভগবানকে জীব বলি, তাহলে ভগবানকে কমা করা হয়। ভগবানকে যদি জীবদ্বারা স্থাপন করা হয়, তাহলে ভুল করা হল। সেই সাধারণ ভুলই সংশোধন করেছেন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গীতার মধ্যে।

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষ্যীং বহুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

হে অজ্ঞান! আমি মানুষের মত চেহারা নিয়ে এসেছি বলে যারা আমাকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করে, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষদুষ্ট যে মনুষ্য—অজ্ঞান যে মনুষ্য, যার পদে পদে ভুল-ভ্রান্তি হয়, সেই মনুষ্য আমাকে যদি মানুষ বলে অবজ্ঞা করে, তাহলে চরম ভুল করবে তারা। অজ্ঞান, তুমি আমাকে ঐরূপ প্রাকৃত মানুষ মনে করেনা, যদিও আমি নরাকার হয়েই এসেছি। নরাকার-পরব্রহ্মই আমার স্বরূপ বা Original (আদি) আকার। শ্রীভগবান্ সাবধান করে দিচ্ছেন অজ্ঞানকে দিয়ে।

অজ্ঞানকে সাবধান করার কি প্রয়োজন? অজ্ঞান ত' তবজ্ঞানী, তাঁর কোন মোহ হয় নাই, ছিলও না। মোহ হয়েছে আমাদের মত বোকা হতভাগা জীবের। সেই মোহ অপনোদনের জন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে লক্ষ্য করে সমগ্র জগৎদাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। অজ্ঞান বলতে হয় বলেছেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা স্বং প্রসাদান্নময়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতদন্দোঃ করিস্তে বচনং তব ॥

এটা বলেছেন অজ্ঞান আমাদের হয়ে আমাদের জন্ত, বাস্তবক্ষেত্রে অজ্ঞানের কোন মোহ ছিল না। তাঁর মোহ কাটাবার জন্ত কোন ব্যবস্থাও নিতে হয় নাই। ভগবান্ জগৎকে এইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সে শিক্ষাগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাই বললেন, ভগবানের সম্বন্ধে ভুল বিচার করলে হবে না।

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ততঃ ।

ত্যাঙ্ক্য দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি দোহজ্জুন ।

হে অজ্ঞান! আমার জন্ম-কৰ্ম্ম অলৌকিক, দিব্য, অপ্ৰাকৃত; সাধারণ মানুষের মত, কৰ্ম্মফলবাদী জীববিশেষের মত আমি আনি না। আমি এ জগতে আসি, যাই আমার নিজ ক্ষমতাবলে। আমার গমনাগমন সম্পূর্ণ আমার এজিয়ারভুক্ত, আমার নিজের ইচ্ছাধীন। আমার জন্ম-কৰ্ম্ম দিব্য, অপ্ৰাকৃত—এই তব যারা বুঝতে পেরেছেন, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি আমরা আমাদের এই Birth and Rebirth-এর Chain থেকে উদ্ধার লাভ করতে চাই, তাহলে এইরূপ বিচার অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এতে বিশ্বাসী হতে হবে। ভগবান্ অজ্ঞানকে বলছেন,—অজ্ঞান! তুমি আমার কাছে, আমার ধামে যাবে? তোমার ধাম কোথায়? ভগবাক্য—সেইটাই আমাদের সকলের প্রাচীন বাস্তবতা। সেইটাই আমাদের পূর্ব পৈত্রিক ভূমি। শাস্ত্র বলছেন,—“Back to God and back to Home—our eternal Home”. “Baikuntha is our heritage, earth's but a players stage”. স্মরণ্য ভগবাক্যই হল আমাদের নিজস্ব পৈত্রিক ভিটা, পৈত্রিক ভূমি। তাই আমি অনেক সময় বলি,—যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে এসেছেন Evaquees—শরণার্থী হয়ে, তাঁরাই শুধু Displaced person নন। এই অনন্ত বিধে মায়াদেবীর কারাগারে—দুর্গাদেবীর কারাগারে যারা এনে পড়েছি, সবই Fettered souls—বদ্ধ জীব। সবাই নিজেদের আদি আশ্রয় ভুলে এখানে এয়েছি। সেইজন্ত সনাতন শাস্ত্রের নির্দেশ—“Back to God

and back to Home—our eternal Home". তত্ত্বদর্শনটাই ত' বুঝতে হবে নিজেদের। আত্মতত্ত্ব কি? পরমাত্মা কি বা কে?—আত্মার আত্মা যিনি, তিনিই ত' পরমাত্মা। তিনি নিশ্চয় আমার কোন অন্তরঙ্গ জন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত' সম্পর্ক রাখতে পারি না। কে ভগবান? তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? এই সম্পর্কের বা সম্বন্ধের উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে। সেইজন্ত সঙ্গুরু প্রয়োজন। সেই সম্পর্ক উদ্বোধনের জন্ত ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কটা কি, সেটা যাচাই করে নিতে হবে। সেই কথা বলছেন শাস্ত্রে।

ভগবান্ থাকে বলছি, তিনি হলেন—সমস্ত অবতারের অবতারী। 'অবতার' একটা আলাদা Section, যেখানে পূর্ণদর্শনের বিচার করছেন। যখনই জীব-জগতের কথা আলোচনা হয়েছে, তখনই আংশিক বা খণ্ডিত বিচার। সেই জীব হ্র'রকম—বদ্ধ ও মুক্ত। ধারা সাধনের দ্বারা মুক্তিস্নাত করছেন, তাঁরা ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন। আর এক নিত্যমুক্ত জীব। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা-লাভ। এই নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত দুই জাতীয় রয়েছেন। কৃষ্ণ থাকে বলি, ভগবান্ থাকে বলি,—তিনি কে? তিনি আমাদের সবকিছু। কিরকম?—তাঁর সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক স্থাপন করা যায় যদি ইচ্ছা করি আমরা। আপনারা একটা শ্লোক প্রায়ই বলেন, বহু জায়গায় বলতে শুনি, গান্ধারী একটা শ্লোক উদ্ধারণ করেছেন,—

অমেব মাতা চ পিতা অমেব, অমেব বন্ধু চ নখা অমেব।

অমেব বিদ্যা দ্রবিশং অমেব, অমেব সর্বং মম দেবদেবঃ ॥

ভগবানের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন। সেটা এই শ্লোকের মধ্যে পরিস্ফুট। যেখানে বলছেন—"Father, Mother, Lover, Son, Lord, Preceptor, Husband।" কি—আরও কান! কৃষ্ণকে বলছেন,—হে ভগবান্! তুমিই আমার সব, 'অমেব সর্বং মম দেবদেবঃ'। তুমি আমার কি নয়। প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। (ক্রমশঃ)

ধর্ম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই যুগে আধুনিক শিক্ষা-ভিমানী মানুষ বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ জ্ঞানকে তাঁরা বিজ্ঞান আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অতুদঙ্গান, পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে বিজ্ঞানের অবদান বলি। ধর্মের ক্ষেত্রেও যে পারমার্থিক সত্য বা আধ্যাত্মিক সত্য আছে তা' বিজ্ঞান—মানব স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের উৎস এখানেই। পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞান শাখাকে বিজ্ঞান-সম্বিত বলা যাবে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-শব্দ অপাংক্তেয়। আজ ত' বাস্তববিজ্ঞান, অর্থনীতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান এবং গৃহ-বিজ্ঞান প্রভৃতি আছে—অথচ পারমার্থিক বিজ্ঞান বললে স্বীকৃতিতে কুণ্ঠা জাগবে কেন?

পৃথিবীর সব সত্যকে বিনা বাধ্যতায় বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে যে মন প্রস্তুত, সে মন আধ্যাত্মিক সত্যকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে চায় না। অথচ আমরা বিবেকানন্দ বলেছেন,—“Religion is Realisation—উপলব্ধিই ধর্ম।” সত্যজ্ঞাপী আধ্যাত্মবিদের উপলব্ধ সত্যকে অবৈজ্ঞানিক বলার স্পর্ধা আর যারই থাক, বিজ্ঞানীদের থাকা সমীচীন নয়। একথা সত্য—বিজ্ঞান বহির্জগতের অনেক তথ্য, অনেক তত্ত্ব, অনেক সংবাদ আমাদের দিয়েছে, অনেক রহস্যের উদ্বেগও সে করেছে। কিন্তু অন্তর জগতের কয়টা খবর তাঁরা দিতে পেরেছেন? একথা অনস্বীকার্য বিজ্ঞান মানুষের মৌল প্রয়োজন—খাতি, বস্ত্র ও আশ্রয়সহ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত রোগমুক্তি, আরাম, বিলাস, ব্যসন, শ্রমকুণ্ঠতা এনে দিয়েছে। বহু অভাবের অভাব ঘটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আরও অভাবের সিংহদুয়ার উন্মোচিত করে দিয়েছে। মানুষের অনন্ত নিপাদার নিবৃত্তি ঘটাতে বিজ্ঞান সমর্থ হয়েছে কি? কটির সমাধান হয়ত' কিছুটা হয়েছে, কিন্তু Psychological needs মিটেছে কি? ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও তার আছে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, আছে আত্মিক স্বাচ্ছন্দ্য। বিজ্ঞান সে-বিষয়ে অনগ্রসর, অগ্রসর সেখানে বেসান্ত ধর্মশাস্ত্র। তাই মানুষের মননের জন্ত, মনের স্বাস্থ্যের জন্ত ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজন, প্রয়োজন ধর্মবিজ্ঞানের—পারমার্থিক জগতের কুক্ষিকা যেখানে নিহিত। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু “মানুষকে উন্মোচনা

প্রবাহ" প্রবন্ধে মনের মননশীলতার শক্তির কথা বলেছেন। বাইরের উদ্ভেদক পদার্থের অল্পপস্থিতি নদেও ভেতরে উদ্ভেদনা আসতে পারে, স্নায়ুগুলি সক্রিয় হতে পারে। তা' যদি সম্ভব হয় এবং তা' বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে ঈশ্বরের অবস্থিতি মানুষের মনে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, আলোড়ন সৃষ্টি করলে তা' বিজ্ঞানসম্মত হবে না কেন?

বিজ্ঞানের সর্বসার্থসাধকতায় যারা বিশ্বাসী, তাঁরা কি বলতে পারবেন জীবনের সব সমস্তার সমাধান তাঁরা করে ফেলেছেন? প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কিছু গ্রহণ করেন না যখন বলেন, তখন তাঁরা বিজ্ঞানের গুটিকয় বস্তু বা সূত্রকে অল্পমানভিত্তিক জেনেও তা' গ্রহণ করেছেন কিসের ভিত্তিতে? ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস আছে, একথা ত' বহুজন কেন সর্বজনবিদিত, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের স্থান আছে, তা' কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন? বিজ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নিকট থার্মোডায়নামিকসের Closed systemএ black bodyতে, ideal gasএ, Avogadro's number-এ বিশ্বাস অপরিহার্য। বিশ্বাস ত' মানুষ তখনই করে, যখন নিজে তা' প্রমাণ করে গ্রহণ করতে পারে না। অস্ত্রের প্রমাণিত বা উদ্ভাবিত বা উপলব্ধ সত্যকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করার মধ্যে ত' বিশ্বাস মিহিত। নাস্তিকতায় বিশ্বাস সেও বিশ্বাস, মার্কসবাদে বিশ্বাস সেও বিশ্বাস। এতজুড়য়ের ক্ষেত্রে সমস্ত সত্যকে নিজ জীবনে কেউ প্রমাণ করে ত' বিশ্বাস করেনি। অথচ আজকের মানুষের তাতে আস্থা বা বিশ্বাসের কমতি ত' হয়নি। ধর্ম-বিশ্বাস শু ভেগনি আর্থা-খাষি প্রজ্ঞাবান্ দ্রষ্টার উপলব্ধ সত্য, সে গুলিই ত' আমাদের নিকট ধর্মবিশ্বাস বলে প্রতিভাত।

আমরা বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, শাস্ত বা সত্য বলে যা' আজকের মানুষ গ্রহণ করছেন, আগামীকাল তার পরিবর্তন হচ্ছে এবং তা' গৃহীতও হচ্ছে। কাজেই স্থির সত্য কি, সে বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। ধর্ম স্থির সত্যকেই নির্দেশ করেছে। ইতিহাস পারেনি, ভূগোল পারেনি, রাষ্ট্রনীতি পারেনি তার এককালের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সর্বকালের প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে। কালের বিবর্তনে নতুন চিন্তা-জীবনের মূল্যায়নে এককালের প্রতিষ্ঠিত সত্য তার আপাতঃ অনড় আসন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের সত্যও বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই অল্পসন্ধিঃ তার অল্পসন্ধান অব্যাহত রাখলে অনেক নতুন সূত্রের উদ্ভাবনদ্বারা নতুন কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। আর বিশ্বাস? বিশ্বাস মাত্রই ত' অন্ধ। কারণ

অন্তের প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নির্দিধায় মেনে নেওয়াতেই বিশ্বাসের প্রসঙ্গ। আমরা কেউই ত' চের্নোবিলের দুর্ঘটনার ব্যাপ্তি, বিস্মৃতি এবং ভয়াবহতা চোখে দেখিনি; চোখে দেখিনি নিজের দেশের ভূপালের গ্যান দুর্ঘটনার মর্যাদাস্তিক পরিণতি। অথচ খবরের কাগজ পড়ে অপরের দেখা এবং লেখা বিবৃতিকে ত' সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। মেনে নিচ্ছি নিকট অতীতের ঘটনা বলে। দূর অতীতের ঘটনাও ত' দূর অতীতের মানব-প্রজ্ঞারই প্রদত্ত প্রতিবেদন। তবে সেখানে অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠবে কেন? বিজ্ঞান যুক্তি-নির্ভর শাস্ত্র, কখনই তা একদেশদশী নয়। তাই নিজের ক্ষেত্রের সব কিছুই সত্য, আর অন্তের ক্ষেত্রের সব কিছুই অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার—এ অভিমত কি একদেশদশী নয়?

আমরা বেদনা বোধ করি যখন একজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকস্থানীয় ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জ্যোতিষবিজ্ঞানকেও অস্বীকার করবার স্পষ্ট প্রদর্শন করেন। আমাদের মনে হয়, গোলমাল ঘট নীচের থাকে। উচ্চকোটিতে গৌজামিল বা গোলমালের কোন সম্ভাবনা নেই। জ্যোতিষশাস্ত্রকে অবাস্তব কল্পকাহিনী বললে সম্ভান হয়ে থাকেই বক্ষ্যা বলার লামিল হয়ে যায়। গ্রহ-মক্ষত্রের অবস্থান, রাশিগুলির বিবর্তন ওতঃপ্রোতভাবে সম্বন্ধ। আর সমগ্র নিসর্গ জগতের সঙ্গে মানবদেহের যোগ নিবিড় ও অচ্ছেদ্য। তা' যদি না হত তবে পৃথিবী বা অমাবস্তায় শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হয় কেন? দু'একজনের ক্ষেত্রে হলে তা' শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা অণুটুতা বা ভাইরাস-কর্তৃক আক্রান্ত হবার কথা না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে অমাবস্তা-পূর্ণিমার প্রভাব পড়ছে কিভাবে? এর বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা কি? তাই যে বিজ্ঞা আমার অধিগত নয়, তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করা বাতুলতা নয় কি?

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের একটা স্থির ধর্মবিশ্বাস—বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাব পৃথিবীর পক্ষে শুভ এবং শনি পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং মশুভ। বৃহস্পতি যেমন ফসলের উন্নতি এবং ফসলের সুযোগ ঘটায়, তেমনি শনি শাস্ত্যাহানি, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের সহায়ক। অথচ যে বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কিছু মানতে রাজী নয়, সেই বিজ্ঞানও আজ দীর্ঘকালের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছে। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। কিন্তু পরীক্ষান্তে প্রমাণিত হল ত' সেই ধর্মবিশ্বাসই। তাই ধর্মবিশ্বাসকে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সম্প্রতি রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের ফেডারেশন

“এনিয়ন” এ ধর্মবিশ্বাসকে প্রমাণ করতে পেরেছে। “১৯৭৯-৮১ সালের মহাকাশযান ভয়েজার—১ ও ভয়েজার—২ বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় প্রাচীন বিশ্বাসের সত্যতা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। সে দেশের জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গে গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, বৃহস্পতি ও তার উপগ্রহরা সম্মিলিতভাবে এক জেনাবেটার বা শক্তি উৎপাদক হিসাবে কাজ করে এং সে গ্রহের বিদ্যুৎ চুম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পক্ষে মঙ্গলজনক। অতীতকালে বলয়সমূহ সমেত শনিগ্রহ প্রায় বিশাল এক প্রোটন-সিংক্রোটনের কাজ করে। নানা গ্যাসের প্রায় মহা জাগতিক গতিবেগের আয়ন ছিটকে পারিপার্শ্বিক মহাকাশে বণিত হতে থাকে। সে গ্রহের আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে ঐ সব আয়ন মহাকাশের দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে পৃথিবীদহ অত্যাশ্চর্য দূরের গ্রহতেও পৌঁছায়। এ আয়নের বড়-বাড়ন্ত পৃথিবীর বহু ক্ষতি করে।”

আগেই বলেছি; যত গোলমাল নীচের পর্যায়ে। তেমন গোলমাল ত’ সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব। ধর্মের উচ্চকোটির চিন্তার সঙ্গে ঝাড়-ঝুক, দোওয়া-তাবিজ, কবজ-মাদুলীর চিন্তা-ভাবনা যোগসূত্র রচনা করে ধর্মের পরিবাদ কীর্তন কি যুক্তিবিরুদ্ধ নয়? একথা সত্য, ধর্মজগতে Exploitation এর অহুপ্রবেশ তাকে কলুষিত করেছে। বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। কিন্তু কিছু দুঃস্বভাবীর অপকর্মের জন্য গোটা ধর্ম জগৎকে দায়ী করলে বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রাখা দায় হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের জগতের বিধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্মাণকারী কিছু বিজ্ঞানীর জন্য হুহু হুন্দর পরিচ্ছন্ন মানবকল্যাণমুখী বিজ্ঞানচিন্তার উপর কটাক্ষপাত করা যেমন যায় না, বিজ্ঞান জগৎকে যেমন নিন্দা করা যায় না, ঠিক তেমনি ধর্মজগতের মানির দু’একটি দিককে বড় করে দেখলে ধর্মজগৎকে খাটো করে দেখা হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘাতের কোন প্রায়ই নেই।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন,—Science without religion is lame and religion without Science is blind.” এখানে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে হাত ধরাধরি করে চলবার কথাই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নির্দেশ করেছেন। দু’টি বিষয় বিপরীত ধর্মী হলে তাদের সহাবস্থানের কথা একজন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী কি করে বললেন? একটীর মধ্যে প্রমাণিত সত্য, অল্পটীর মধ্যে অন্ধবিশ্বাস থাকলে এই সহাবস্থান কেমন করে সম্ভব? একটীর মধ্যে পরীক্ষিত তত্ত্ব, অল্পটীর মধ্যে কল্পকথার ফুলঝুরি থাকলে দুইয়ের মিল কি করে

সম্ভব? এই অনন্ত বিজ্ঞান প্রতিভার স্মৃতিদ্বিষ্ট নির্দেশ বিজ্ঞানের কল্যাণ-মুখীনতাকে বাস্তবায়িত করতে ধর্মের সর্বতোমুখী কল্যাণ প্রয়াসের সংযুক্তি ঘটতে হবে। ধর্মের মধ্যে অবাস্তব বস্তুর অল্পপ্রবেশ যুক্তি ও বিচারমনস্কতা দিয়ে চোলাই করে নিতে হবে। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়, পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক।

বিজ্ঞান-মনস্কতা আমাদের ততখানি গ্রহণ করতে হবে যতখানি নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের ধর্মীয় অহুশাসন অল্পমোদিত। দুঃশাসন বিবেচিত না হলে বলব—বিজ্ঞান মানব-জীবনে মূল্যবোধহীনতা এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান-মনস্কতা মানুষকে আত্ম-সচেতন করে তুলেছে, স্বাবলম্বী করেছে, শক্তিমান করেছে, আবার প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে বৃদ্ধাজুগ্ম প্রদর্শন করতেও প্ররোচিত করেছে। এখানেই প্রয়োজন ধর্মের। ধর্মের বাতাবরণে মূল্যবোধহীনতার স্থান নেই। (ফ্রেমশঃ)

—শ্রী অমূল্যকৃষ্ণ দাস

আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

গণসহ শ্রীরাধাবির্ভাব

গৌরীপিতা হিমাচলের 'কন্যা-সৌভাগ্য'।

দেখিয়া বিদ্যাপর্বত দুঃখিত হইল ॥

অনুরূপ কন্যা-সৌভাগ্য লাভের আশায়।

তপস্যা করিয়া বিদ্য ব্রহ্মার বর পায়।

চতুরানন তারে প্রসাদ করিয়া।

“তু’টী কন্যা লভ”—বর দিলেন হাসিয়া ॥

“আমার কটাক্ষে উত্তম ভর্তা লভিবে।

নিশ্চয়ই সে ধূজ্জট-বিজয়ী হইবে ॥

অশেষ কল্যাণগুণগণ-ভূষিত।

বিশ্বের বিস্ময়, আর প্রেমময় চিত ॥”

—শুনিয়া বিদ্যামৈল আনন্দিত হইল।

অশেষে বিশেষে ব্রহ্মার স্তুতি করিল ॥

এবে বুধভানুপুরে শ্রীরাধাবির্ভাব ।
 শ্রবণে মঙ্গল লভে শ্রীরাধাপ্রসাদ ॥
 গোকুলের মহিমা কে বর্ণিতে পারে ?
 মো-সম পাতকী তরে যে-নাম-শ্রবণে ॥
 বুধভানু, চন্দ্রভানু গোপদ্বয়ের গৃহে ।
 দৌহাকার গভ্রীগর্ভে হু'কথা প্রবেশে ॥
 বিধিনির্বন্ধে গর্ভ আকর্ষণ করি ।
 বিদ্যাজায়া-গর্ভে তাহা সংস্থাপন হরি ॥
 পৃথ্বী-সুতপা দৌহে তপশ্চর্যা করি' ।
 দ্বাপরে লভিল পুত্র কংসারি হরি ॥
 নিত্যপুত্র যশোদার যশোদানন্দন ।
 ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণহেতু দেবকীনন্দন ॥
 তেমতি বিদ্যাক্ষেপে অনুগ্রহ করি' ।
 তাঁহার কথা হইলেন সর্বলক্ষ্মীময়ী ॥
 কংসানুচরী দানবী পুতনা রাক্ষসী ।
 'শিশুঘাতিনী' জানি চিন্তিত গিরি ॥
 বিদ্যাক্ষলের পুরোহিত যজ্ঞ আরম্ভিল ।
 সঙ্কল্পা হইয়া বালগ্নী ভয়েতে ছুটিল ॥
 বিদর্ভদেশ-গামিনী নদীর স্রোতে ।
 নিপতিতা জ্যেষ্ঠ কন্যা ভীষ্মক লভে ॥
 ভীষ্মক-দুহিতা ব্রজে চন্দ্রভানু-কন্যা ।
 'চন্দ্রাবলী' নাম ধরে রূপে-গুণে ধন্যা ॥
 'পৌর্ণমাসীদেবী'—যিনি ব্রজে সুবন্দিতা ।
 পুতনা হইতে লভে ললিতাদি কন্যা ॥
 মনোজ্ঞা, পদ্মা, ভজ্জা, শৈব্যা ও শ্যামা ।
 এ সকলে রক্ষা করেন যতনে পূর্ণিমা ॥
 বিশাখা যমুনা-প্রবাহে ভাসিবার কালে ।
 জটিল তুলিয়া রাখে আপনার গৃহে ॥

বিদ্যোৎসব দ্বিতীয় কন্যা ত্রিজগতের সার ।
 'অপরূপ রূপমহিমা 'তার' (রাধা) নাম তাঁর ॥
 প্রসূতা হইলে কন্যা অপহরণ করি' ।
 পুতনা আনিল তাঁকে শ্রীগোকুল-পুরী ॥
 মহামতি বুঝভানু ছুখিত-অস্তুর ।
 দৃষ্টিহীনা কন্যার কৈছে হবে বর ॥
 কন্যা লভি' কীর্তিদা পরম হরিষে ।
 পালেন হৃদয়ে রাখি' অশেষ-বিশেষে ॥
 একদা যশোদা আইলা বুঝভানুপুরে ।
 বালক কানাইসহ রাধা দেখিবারে ॥
 দৈবে কানুর হস্ত কন্যার বদন-কমলে ।
 স্পর্শিতেই দৃষ্টি লভে কৃষ্ণ লক্ষিবারে ॥
 বুঝভানু-পুরে কন্যা দিনে দিনে বাড়ে ।
 ভানুকুল-চন্দ্ৰিমা গোকুলে প্রকাশে ॥
 এইরূপে শ্রীরাধার প্রিয়সখীগণ ।
 তাঁহার ইচ্ছায় ব্রজে আবিভূতা হন ॥
 যে 'রাধা' নাম-শ্রবণে, শ্রবণ-কীর্তনে ।
 গর্ভবাস, পাপ, রোগ—ভয় যায় দূরে ॥
 গণসহ সে রাধাগোবিন্দ-চরণ ।
 ভজ মন অনুক্ষণ লইয়া শরণ ॥
 "রেকো হি কোটিজন্মাষং কস্মিভোগে শুভাস্তভম্ ।
 আ-কারো গর্ভবাসক মৃত্যুং রোগমুৎসজ্জম্ ॥
 ধ-কারমায়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্ ।
 শ্রবণ-শ্রবণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্চতি ন সংশয়ঃ ॥"

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর]

(৭) লেখক তাঁহার পুস্তকের ২২।২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—“অতঃপর দেখা যাক, মাহুঘ চৈতন্যকে তাঁর চরিত্রকাররা কতোখানি অতিমাহুঘ বানিয়েছেন। চৈতন্যভাগবতে কমপক্ষে অন্ততঃ ১৩ জায়গায় চৈতন্যের নানারূপের অলৌকিকত্ব বর্ণনা রয়েছে। নানারূপ বলতে বর্তমান কালের সত্যাহ্বেষী গোয়েন্দাদের মতো কখনো সাধু, কখনো ফকির বা পাগল—টিক তা নয়। একেবারে আধিভৌতিক ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে, দুহাত ধারী মাহুঘ চৈতন্য ছ’হাত ধারী এক ভয়াবহ অতিমাহুঘে পরিণত হয়েছেন। কখনো বা ভয়ঙ্কর রূপধারী দৈত্যে। কখনো বা তীক্ষ্ণ দাঁতাল শূকর রূপে। আবার কখনো বা মা কালী বা জটাঙ্গুটধারী দিগম্বর শিব রূপে। সেইসব রোমহর্ষক স্থানগুলির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরলাম। যথা—(এক) মা শচীদেবীর কাছে চৈতন্যের কৃষ্ণরূপ প্রকটন [চৈতন্যভাগবত ২।৮।৬৩-৬৬]। (দুই) মুরারি গুপ্তের কাছে বরাহ রূপ প্রকটন (ঐ ২।৩।১৮-২৪)। (তিন) মাধায়েব কাছে চতুর্ভুজ-রূপ প্রকটন (ঐ ২।১০। ১২৩-১২৫)। (চার) চক্ষুশেখর আচার্যের ঘরে কল্লিনী-আত্মাশক্তি রূপ প্রকটন (ঐ ২।১২ অধ্যায়)। (পাঁচ) অষ্টমত ও নিত্যানন্দের কাছে বিখরূপ প্রকটন (ঐ ২।২৩।৪৭-৬০)। (ছয়) সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে ষড়্ভুজ রূপ প্রকটন (ঐ ৩।৩।১০১-২)। (সাত) শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে কৃষ্ণ বলরাম রূপ প্রকটন (ঐ ২।২।১২০-২৫)। (আট) শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে নৃসিংহরূপ প্রকটন (ঐ ২।২।২৫-৫২)। (নয়) অষ্টমতাচার্যের কাছে অপূর্ব কৃষ্ণ রূপ প্রকটন (ঐ ২।৫।৭৪-৮৫)। (দশ) শিবের গায়ের কাছে শিব-রূপ প্রকটন (ঐ ২।৮। ৯৫-১০১)। (এগারো) মুরারি গুপ্তের কাছে রাম-লক্ষণ-সীতা রূপ প্রকটন (ঐ ২।১০।৬-১০)। (বারো) নিত্যানন্দের কাছে ষড়্ভুজ রূপ প্রকটন (ঐ ২।৫।৮৮-৯০) এবং তৈরিক নামক বিপ্লবের কাছে কৃষ্ণ-রূপ প্রকটন (ঐ ১।৩।২৬৩-৭০) প্রভৃতি।

এ রকম প্রায় সকল চৈতন্য জীবনীকারদের গ্রন্থে মাহুঘ চৈতন্যকে অল্প বিস্তার অতি-ভৌতিক, আবার কোথাও বা অতি-শাস্তিক (almighty) পরিণত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই সর্ব ও সর্বজ্ঞ। তিনিই ‘যয়া-অয়া জগৎ সৃষ্টা জগৎ পাতাবি যো জগৎ।’ বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র পাঁচশো বছর আগে এক সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ সাংসারিক মাহুঘকে নিয়ে কেন এমন আধিদৈবিক গল্প করা হয়েছিল ভাবলে সততই বিস্ময় জাগে।”

লেখকের উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, লেখক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অলৌকিকত্বে সন্দেহ পোষণ করিয়া তাহা অতি-ভৌতিক ব্যাপার বলিয়াছেন। লেখক উক্ত গুণত্বের ৩০ পৃষ্ঠায় অতি-ভৌতিক শব্দের অর্থে অতীব কাল্পনিক বলিয়াছেন। লেখক ২৩১ পৃষ্ঠায় চৈতন্যভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন,—“সার্বভৌমের সমীপবর্তী ষড়ভুজ মূর্তিমানেরূপান্তরিত হলেন চৈতন্য।

অপূর্ব ষড়ভুজ মূর্তি কোটিসুখ্যময়।

দেখি মুছাঁ গেলা সার্বভৌম মহাশয় ॥”

এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর যে কোটি সুখ্যময় প্রথর ষড়ভুজ মূর্তি দেখিয়া পরমপণ্ডিত সার্বভৌম মুগ্ধিত হইলেন, সেই ষড়ভুজ মূর্তি সহজে লেখক তৎপরবর্তী ২৩২ পৃষ্ঠায় মতামত জানাইয়াছেন—“কোন প্রতীকী (Symbol) অর্থে এই ষড়ভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্তি ব্যবহারিত হয়েছে বলে মনে হয়।”

ইহাতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, কোটি সুখ্যময় প্রথর দীপ্তিযুক্ত কোন প্রতীকী ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব কি? আরও লেখক ‘মনে হয়’ শব্দ ব্যবহার করায় ‘প্রতীকী’ শব্দটি লেখকের মনগড়া মাত্র বুঝাইতেছে। লেখক প্রতীকী মনে করিলে তাহাই কি বিজ্ঞান সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইবেন? শ্রীমহাপ্রভু যে বিভিন্ন মূর্তিতে শুদ্ধভক্তদের দর্শন দিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণ তাহাতে মুগ্ধ, হতচকিত বা মুগ্ধিত হইয়াছেন, তাহা কি সর্বত্রই মিথ্যা হইতে পারে? লেখক চৈতন্যদেবকে সাধারণ মানুষ মনে করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা মানুষের দ্বারা সম্ভব নহে।

লেখক ২২।২৩ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেবের বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হওয়ার কাহিনী যাহা ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থ হইতে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্যদেবের ভগবত্বই প্রমাণিত হয়। অবতার-পুরুষ বা ভগবানের দৈহিক আকার ও চিহ্ন তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ তটস্থ-লক্ষণ যাহা অল্প জীবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে।

“অবতার নাহি কহে আমি অবতার।

মুনি সব জানি’ করে লক্ষণ বিচার ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৫৪)

‘স্বরূপ’-লক্ষণ, আর ‘তটস্থ-লক্ষণ’।

এই দুই লক্ষণে ‘বস্তু’ জানে মুনিগণ ॥

আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।

কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৫৬-৩৫৭)

“অবতার এমত কি আছে অদ্বুত ।

যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীহৃত ॥” (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।১৫৫)

সুতরাং ভগবানের আকৃতি—আকার, প্রকৃতি—স্বভাব, স্বরূপ—মূর্তি,—এই তিনটাই স্বরূপ বা মূখ্য লক্ষণ । আর কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই তটস্থ বা গোপ-লক্ষণ । কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার, আর তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্ণন-কার্য্য ।

“সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ ।

পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সংকীর্ণন ॥”

(চৈঃ ৫ঃ মধ্য ২০।৩৬৪)

‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ উল্লিখিত ৩২টি মহাপুরুষের লক্ষণও ভগবানের শ্রীঅঙ্গে পরিলক্ষিত হয় এবং এমতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গে এইসকল চিহ্ন বিद्यমান ছিল । লেখক তাঁহার পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—
“অন্যাবধি সর্ব ভারতীয় সম্যাসীদের মধ্যে বোধ করি চৈতন্যই ছিলেন সর্বাপেক্ষা রূপবান পুরুষ । চৈতন্য শুধুমাত্র গুণাবলীর জন্ত নয়, ঐশ্বরিকরূপের বিভূষণেও মানুষকে সম্বোধিত করেছিলেন ।”

লেখকের বক্তব্যগুলি পরস্পর আলোচনা করিলে দেখা যায়,—শ্রীচৈতন্যদেব ষড়্ভুজ মূর্তি ধারণ, বিশ্বরূপ দর্শন দান, বরাহ-মূর্তি ধারণ প্রভৃতি যে-সমস্ত লীলা করিয়াছেন ; তাহা লেখক কখনও বা অতি-ভৌতিক বা অতি-কাল্পনিক বলিয়া, কখনও প্রতীকী (Symbol) বলিয়া, আবার কখনও বা ঐশ্বরিক রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতে লেখক যে স্থির দিকান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে । ‘চৈতন্য ঐশ্বরিক রূপের বিভূষণেও মানুষকে সম্বোধিত করেছিলেন’—ইহা ত’ লেখকেরই উক্তি । চৈতন্য মানুষ হইলে তিনি কি ঐশ্বরিক রূপ দেখাইতে পারিতেন ? লেখকও ত’ একজন মানুষ, তিনি কি ঐশ্বরিকরূপ দেখাইতে পারেন ? লেখক তাঁহার পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্যদেবকে এক সাধারণ পরিবারের স্ত্রী সাধারণ সামসারিক মানুষ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং চৈতন্যদেবের বিশ্বরূপ-প্রকটন, নৃসিংহরূপ-প্রদর্শন প্রভৃতি ঐশ্বরিক রূপগুলিকে আধিদৈবিক গল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । লেখকের উক্ত মন্তব্যের সহিত ২৭৩ পৃষ্ঠার মন্তব্যের সামঞ্জস্য হইতেছে কি ? ঈশ্বর ব্যতীত ঐশ্বরিক রূপ কেহই দেখাইতে সমর্থ নহেন । লেখকের ২৩ পৃষ্ঠার বক্তব্য অনুযায়ী চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিক রূপগুলি যদি আধিদৈবিক গল্প মাত্র হয়, তাহা হইলে ২৭৩ পৃষ্ঠার লেখকেরই বক্তব্য

অত্ৰসারে প্রশ্ন জাগে,—চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিকরূপ দেখিয়া মানুষ সত্যই কেন স্তম্ভোহিত হইয়াছিলেন? লেখক নিবেদনে ‘ধর্মসংস্থাপনার্থ’ শব্দটি যখন গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন গীতা নিশ্চয়ই লেখক পাঠ করিয়া থাকিবেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—“... পশু মে যোগমৈশ্বরম্” অর্থাৎ “তুমি আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর।” তৎপরেই অর্জুনকে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনোহন্তিলাষ পূরণার্থ বিশ্বরূপ দেখাইলেন এবং শ্রীমদ্বিত্যানন্দ-প্রভু অন্তর্ধামিক্রমে ইহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন,—তাহা যে ঐশ্বরিকরূপ গীতার বাণীতেই প্রমাণিত হয়।

“বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত-মিত্যানন্দ।

কাহারো নাহিক বাহু --পরম আনন্দ ॥” (চৈ: ভা: মধ্য ২৪।৭৬)

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর বলিয়াই ত’ ঐশ্বরিক রূপ দেখাইয়াছেন। ঈশ্বর চৈতন্য, ঈশ্বরই আছেন। চৈতন্য মানুষ নহেন এবং তাঁহাকে কেহই অতি-মানুষ বানায় নাই। এমতাবস্থায় লেখকের চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিতে আপত্তি থাকা উচিত কি?

ভগবান্ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার আবির্ভাবের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিবেই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব সর্বাবতারিত্ব-সমীক্ষায় মাত্র কয়েকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি;—

“সপ্তমে গৌরবর্ণো বিষ্ণুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্যা প্রাপ্তে
প্রাতরবতীর্থ্য সহ বৈ: স্বমহুঃ শিক্ষয়তি ॥”

(অথর্ষবেদ-পুরুষ বোধিনী শ্রুতে)

অর্থাৎ—“সপ্তম বৈবস্বত যযন্তরে কলিযুগের প্রথম সম্ভ্রায় রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তম্ভ গৌরবর্ণ শ্রীভগবান্ সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ক্লাদিনী-শক্তিঘারা জনগণকে ‘হরেকৃষ্ণ’ মন্ত্রাদি উপদেশ দান করিতেছেন।”

“তথাহং কৃতসম্যাসো ভূগীর্বাণোহবতরিষ্যে তীরেহলক-

নন্দায়া: পুন: পুনরীশ্বর প্রার্থিত: সপরিবারো

নিরালম্বো নির্মূর্ত-কলি-কল্মষ-কবলিত-জনাবলখনায় ॥”

(সামবেদান্তর্গত-ব্রহ্মভাগে)

অর্থাৎ—“শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-কর্তৃক পুন: পুন: প্রার্থিত হওয়ায় কলিপাপহত জনগণের একমাত্র অবলম্বন-থিতু নিরালম্বভাবে সপরিবার ব্রাহ্মণকূলে (আমি) অবতীর্ণ হইয়া সম্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিব।” (ক্রমশ:)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দ্বাসাধিকারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

তেজরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

ফোন—২৪৭

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ ; ইং ১৬।১২।২০

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুনীরয়েৎ ॥

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্জারাদ্য বেদান্তবিজ্ঞাপিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৪ শ্রীগৌরান্দ ; ১২শে মাঘ, ১৩৯৭ (ইং ২৪।২।২১) শনিবার শ্রী সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্বদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাধী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাধী-কৃষ্ণা পঞ্চমী এই গোবিন্দ, ২১শে মাঘ (ইং ২৪।২।২১) সোমবার পর্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সমকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তদ্বপঞ্চকের পূজা, গৌর প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, শুভ-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুভতত্ত্বাহুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদহুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যব্যারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্বকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়ানক্যাচুগত্যাভিনাবী—

সত্যাবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—১২শে মাঘ, শনিবার ব্রহ্মসংহর্ষে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাশ্লোক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি কীর্তন, পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাধি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা কীর্তন এবং শ্রীচক্রমহিমাশ্লোক ভজ্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২০শে মাঘ, রবিবার পূর্বাহ্নে শ্রীগুরুতদ্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সংক্ষেপ আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

২১শে মাঘ, সোমবার পূর্বাহ্নে শ্রী প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সংক্ষেপ আলোচনা।

। শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ মাতে আর-পরনর ।
অধোজ্ঞে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধল ।

অল্য ধর্ম হুতুলাপে পালে বেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ {	১৪ মাঘ, মঙ্গল, ৫০৪ শ্রীগৌরাক	{ ১১শ সংখ্যা
	২২ পৌষ, সোমবার, ১৩৯৭, ইং ১৪।১।২১	

সামুবাদং

শ্রীচতুর্ন্থ-ব্রহ্মকৃত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বজ্রলাগ্ন-সংবাদে
ব্রহ্মস্তুতৌ নবমেহধ্যায়ঃ]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

২৫-২৭। ভজে কৃষ্ণকোড়ে ভৃগুমুনি-পদং শ্রীগৃহমলং
তথা শ্রীবৎসাস্থং নিকষরুচিযুক্তং ছাতিপরম্ ।
গলে হীরা-হারান্ কণকমণিযুক্তাবলিধরান্
ফুরভারাকারান্ ভ্রমরবলিভারান্ ধ্বনিকরান্ ॥ ২৫ ॥
বংশী-বিভূষিতমলং দ্বিজ-দানশীলং
সিন্দূরবর্ণমতিকীচ-করাবলীলম্ ।

হেমাদুলীয়-নিকরং নখচন্দ্রযুক্তং

হস্তদ্বয়ং স্মর-কদম্ব-সুগন্ধপূক্তম্ ॥ ২৬ ॥

শনৈশ্চলন্মানস-রাজহংস-

গ্রীবাকুতো কন্ধর উচ্চদেশে ।

কাদম্বিনী-মানহরৌ বরৌ চ

ভজামি নিতং হরি-কাকপক্ষৌ ॥ ২৭ ॥

যাঁহার বক্ষ শ্রীবৎস-ভূষিত, যাঁহার নিকষ-পাষণ-কাস্তি অত্যুজ্জল ভৃগুপদ
লাঙ্ঘিত বক্ষে লক্ষ্মী বিলাস করেন, যাঁহার গলে স্বর্ণরত্ন ও মুক্তাবলী রাজিত
এবং তারকাকারে প্রস্ফুরিত মধুকরসমূহের গ্রায় ধ্বনিকারী হীরাহার বিদ্যমান ;
যিনি বংশী-বিভূষিত, দ্বিজগণে অত্যন্ত দামণীল, সিন্দূরবর্ণ স্নন্দর অঙ্গুলীধারা
বংশীবাদনে তৎপর ; যাঁহার অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়, হস্তদ্বয় চন্দ্রতুল্য নখযুক্ত ;
যিনি কদম্ব-কুঙ্কমের সুগন্ধপূক্ত ও কামদেব-সদৃশ ; সুগতিসম্পন্ন মামস-রাজ-
হংসের গ্রায় যাঁহার উচ্চ কন্ধর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত উন্নত, যাঁহার মনোজ্ঞ কাকপক্ষ
মেঘের মানহরণ করিয়াছে, সেই শ্রীহরিকে নিত্য ভজনা করি ॥ ২৬-২৭ ॥

২৮-২৯ । কল-দর্পণবদ্বিশদং সুখদং

নব-যৌবন-রূপধরং নুপতিম্ ।

মণি-কুণ্ডল-কুন্তলশালি-রতিং

ভজ গণ্ডযুগং রবি-চন্দ্ররুচিঃ ॥ ২৮ ॥

খচিত-কনক-মুক্তা রক্তবৈদূর্য্য-বাসং

মদন-বদন-লীলা-সর্বসৌন্দর্য্যাসম্ ।

অরুণ-বিধু-সকাশং কোটি-সুরপ্রকাশং

ঘটিত-শিখি-সুবীটং নৌমি বিষ্ণোঃ কিরীটম্ ॥ ২৯ ॥

স্বচ্ছ-দর্পণবৎ নির্মল, সুখদ, নবযৌবন-কাস্তিযুক্ত নরগণের বক্ষক, মণি-
কুণ্ডল ও কুন্তলশালী, যাঁহার গণ্ডযুগল মার্জিত ও চন্দ্রের গ্রায় দ্ব্যতিযুক্ত, যিনি
স্বর্ণমুক্তা ও রক্ত বৈদূর্য্যখচিত বদন পরিধান করিয়াছেন, যিনি মদনের গ্রায়
বদনশালী, সর্বসৌন্দর্য্যের সারভূত রান-লীলাকারী, অরুণ-চন্দ্রকাস্তি ও
কোটিসুন্দর্য্যতুল্য-প্রভ এবং যাঁহার চুড়ায় ময়ূরপুচ্ছ বিদ্যমান, সেই বিষ্ণু-
কিরীটকে নমস্কার করি ॥ ২৮-২৯ ॥

৩০ । যদ্বারিদেশেন গতিশূন্যহে-

গণেশ-তারেশ-দিবাকরাণাম্ ।

আজ্ঞাং বিনা যাস্তি ন কুঞ্জমণ্ডলং

তং কৃষ্ণচন্দ্রং জগদীশ্বরং ভজে ॥ ৩০ ॥

যাঁহার দ্বারদেশে কান্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, চন্দ্র ও দিবাকরের গতি নাই, আদেশ ব্যতীত যাঁহার মিকুঞ্জমধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ৩০ ॥

৩১। ইতি কৃষ্ণা স্তুতিং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ।

পুনঃ কৃতাজলিভূত্বা স্ববিজ্ঞপ্তিং চকার হ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পুনরায় করজোড়ে স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৩১ ॥

৩২। অপরাধন্ত পুত্রস্য মাতৃবৎসং ক্ষমস্ব চ ।

অহং তন্নাভিকমলাৎ সম্ভবোহহং জগৎপতে ॥ ৩২ ॥

হে জগৎপতে! আমি আপনার নাভিকমলজাত; অতএব মাতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৩২ ॥

৩৩। কাহং লোকপতিঃ ক তং কোটিব্রহ্মাণ্ড-নায়েকঃ ।

তন্মাং ব্রজপতে দেব রক্ষ মাং মধুসূদন ॥ ৩৩ ॥

হে ব্রজপতে! কোথায় আমি একটি লোকের অধিপতি; আর আপনি কোণী কোণী ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, অতএব হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৩ ॥

৩৪। মায়য়া যস্য মুহুন্তি দেব-দৈত্য-নরাদয়ঃ ।

স্ব-মায়য়া তন্মোহায় মুখোহহং হ্যাত্ততোহভবম্ ॥ ৩৪ ॥

যাঁহার মায়ায় স্বর, অস্বর ও নরাদি মোহিত হয়, আমি মুখের মত তাঁহাকে আমার মায়ায় মোহিত করিতে উত্তত হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥

৩৫-৩৭। নারায়ণস্তং গোবিন্দ নাহং নারায়ণো হরে ।

ব্রহ্মাণ্ডং ত্বং বিনির্মায় শেষে নারায়ণঃ পুরা ॥ ৩৫ ॥

যস্য শ্রীব্রহ্মণি ধারি প্রাণং ত্যক্তা তু যোগিনঃ ।

যথা যাস্তস্তি তস্মিংস্ত সকুলা পুতনা গতা ॥ ৩৬ ॥

বৎসানাং বৎসপানাঞ্চ কৃতা রূপাণি মাধব ।

বিচচার বনে বৃন্ত হপরাধান্ মম প্রভো ॥ ৩৭ ॥

হে গোবিন্দ ! আপনি নারায়ণ, আমি নারায়ণ নহি । হে হরে ! আপনি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়া শেষ-শয্যায় জলশায়ী হন । যোগিগণ প্রাণত্যাগ করিয়া পুতনার গায় আপনার ব্রহ্মতেজে মিলিত হন । হে মাধব ! আমারই অপরাধে আপনি বৎস ও বৎসপালগণের রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন । (অতএব প্রভো ! আমাকে ক্ষমা করুন ।) ॥ ৩৫-৩৭ ॥

সাধু-সঙ্গের প্রণালী-বিচার

সঙ্গই স্বভাবের মূল

সঙ্গ হইতে স্বভাব । যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে । পূর্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্তিত হইয়া থাকে । সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল । অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

“যন্ত যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্রাৎ সঃ তৎগুণঃ ।”

স্ফটিক মনি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগুণ প্রতিভাত হয় ।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গত্ব

ভাগবতে বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতোহৈতুরসংস্ক বিহিতোহধিয়া ।

স এষ সাধুবু কৃত্তো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ (ভাঃ ৩২৩।৫৫)

অসৎ জন্মের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয় । কে অসৎ, কেবা সৎ—এ-বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয় । সাধু-লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্ব-রূপ ফলোদয় হয় ।

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ কর্তব্য

অসৎসঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হীঃ শ্রীর্ষশঃ ক্ষমা ।

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ভাতি সংক্ষয়ম্ ॥

ভেষ্যশান্তেযু মুচ্যেযু খণ্ডিতান্নসাদুযু ।

সঙ্গং ন কুৰ্য্যাচ্ছোচোযু যোষিৎক্ৰীড়ামুগেযু চ ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

নভ্য, শোচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ অর্থাৎ
ত্রৈলোক্য—এ-সমস্তই যে অসংসদে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই অসাদু, অশান্ত, মুঢ় ও
যোষিৎক্ৰীড়ামুগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জ্ঞানিয়া একেবারেই
পরিত্যাগ করিবে ।

সাধুর লক্ষণ ; সাধু-সঙ্গই কর্তব্য

কেবল অসংসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না । যতপূর্বক সংসঙ্গ করাই
আমাদের কর্তব্য । যে-সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের
লক্ষণ বলিতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কাকৃণিকাঃ স্তম্ভদঃ সর্বদেহিনাম্ ।

অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃংখলি কথয়ন্তি চ ।

তপন্তি বিবিধান্তাপা নৈতান্ মদগ হচেতসঃ ॥

ত এতে সাধবঃ সাধিব সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥

(ভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

কপিসদেব কহিলেন, হে মাতঃ ! তিতিক্ষাযুক্ত, কাকৃণিক, সর্বদেহীর
স্তম্ভ, অজাত-শত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু ভূষণ । শুদ্ধ ভক্তদিগেরই এইপ্রকার
স্বভাব । ভক্তগণ মদগতচিত্ত, স্তবরাং কৰ্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগগত বহুবিধ
কষ্টাভ্যাস করেন না । সহজে মদাশ্রয়া-কথা দ্বারা মাজ্জিত অন্তঃকরণে পরস্পর
হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন । হে সাধিব ! সর্বসঙ্গবিবর্জিত সেই
সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন । তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর ।

বেশের দ্বারা সাধু নির্ণীত হয় না—সাধু অতি দুর্লভ

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব
না : পরচর্চা, পরনিন্দা—এ-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্বোক্ত
লক্ষণ না দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করিব না । কলিকালে
সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া ঝাইতেছে । হৃৎথের বিষয় এই যে, যাহাকে
তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই

কপট হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধু-সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও বহুদিন অল্পসংস্কার করিয়া একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

মাধুর্য্য-রসাত্মি ও কৃষ্ণভক্তি অর্জিব দুর্লভ

মহাদেব দেবীকে কহিলেন, হে ভগবতি ! সহস্র সহস্র মুন্যুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্ত-লক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্ত-জনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সংসদ-স্বকৃতিবলে নারায়ণ-পরায়ণ হন। দেখ, নারায়ণ-ভক্ত প্রশান্তাত্মা, অতএব সুদুর্লভ। এখন দেখুন, দাস্ত-রসাত্মিত শুদ্ধ নারায়ণ-ভক্ত যখন এত দুর্লভ, তখন মাধুর্য্য-রসাত্মিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ, তাহা কি বলিব।

কৃষ্ণভক্তই পরম সাধু এবং তাঁহার সঙ্গের পরম ফল

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই আমাদের মিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

তাবজ্ঞাপাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কাংসগৃহং গৃহম্ ।

তাবমোহোহজিঘ্র-নিগড়ে বাবৎ কৃষ্ণ ম তে জনাঃ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিশিষ্ট বাগ-বৈব আমাদের সমস্ত মন অপহরণ করিতেছে। আমাদের গৃহ, কাংসগৃহ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অজিঘ্র-নিগড়ে সর্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দশা ! হে কৃষ্ণ ! যেদিন তোমার শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জন-মধ্যে বসিতে পারি। সেইদিন হইতে আমাদের বাগাদি প্রবৃত্তি আর চৌরের জায় আচরণ করে না ; পরম বন্ধুত্ব আচরণ করিয়া তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্ৰাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তি-সেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

তদন্ত য়ে নাথ ম ভূরিভাপো, ভবেহত্র বাগ্নত্ব তু বা তিবশ্চাম্ ।

যেনাহমেকোহপি ভবজ্ঞনানাং, ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥

(ভাঃ ১৪।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশু-পক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে—‘আমার সেই ভাগ্যলাভ হউক যদ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করি। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের আবৃত্ত অদম্য অবস্থা লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধে জ্ঞান ধারণা

সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায় তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রণাদ দেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না কোনপ্রকার লাভ আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়।

সাধুসঙ্গ-জাতের ক্রমোপায়

সাধুসঙ্গ যেক্রমে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

তে বৈ বিদিত্যতিতরঙ্গি চ দেবমায়াং

দ্বী-শূদ্র-হুণ-শবরা অপি পাপজীব্যঃ।

যজুর্ভুক্তকাম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-

স্তির্ধাগ্জনা অপি কিম্ অতথায়ণা যে ॥ (ভাঃ ২।৭।৪৬)

‘অভূতক্রম’ শব্দে ‘শ্রীকৃষ্ণ’। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অভূত-ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের ‘শীল’ অর্থাৎ ‘স্বভাব’ ও ‘সচ্চরিত্র’ যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনিই নিশ্চয় ভগবানের মায়া-শক্তিকে জানিতে পারেন, আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়া-মাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন দ্বী, শূদ্র, হুণ, শবর, অন্য পাপ-জীব ও পশু-পক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অন্যায়সে ভব-মাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুসরণ করিয়া যে অন্যায়সে সংসার-মাগর পার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিলেও আরাধ্য অতিক্রম করিতে পারে না। উজ্জম জ্ঞানীভাৱ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না। শাস্ত্র-বিচারদ্বারা শুদ্ধ গৈরাগ্য অবগম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

বিষয়ীর দৈন্ত্য ও কৃপা-প্রার্থনা—কপটতা মাত্র

বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্বক বলিয়া থাকেন যে,—“হে দয়াময় ! আমাকে কৃপা করুন—আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুজি কিরূপে দূর হইবে ?” বিষয়ীর এই বাকাগুলি কপট বাক্য মাত্র । তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য । তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে । কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্ত্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় । যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন যে,—“ওহে তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন্ম তোমার ক্ষয় হউক ।” তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—“হে সাধু মহারাজ ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্বাদ করিবেন না । এরূপ আশীর্বাদ কেবল শাপমাত্র সর্বদা অহিতজনক বাক্য ।” এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার মিতান্ত্র কপট ।

কপটতাহেতু সাধুসঙ্গের ফল-লাভে বঞ্চিত

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না । অতএব সরল প্রকৃতির সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সন্নিবিষ্ট নিরন্তর যত্নপূর্বক অচ্যুতসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি । এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অধ্যয়ন করিব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তজ্জপ গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব । ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা ।

—জগদ্বক্তৃক শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

“যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সহপদে দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না ।”

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ব্যবহার

ব্যবহার হইতে পরমার্থ পৃথক্। বহুজীবের মত প্রয়োজনকে ব্যবহার বলে। তাহার অপর নাম অনর্থ। অনর্থের ব্যতিরেক তাবই পরমার্থ। পরমার্থ নিত্য, ব্যবহার তাৎকালিক মাত্র। ব্যবহার ভোগময় ও ত্যাগপর। পরমার্থ ভগবৎসেবোন্মুখ ও বদ্ধাভুতির ভোগ্য নহে।

লোকে অনেক সময়ে ব্যবহারকেই পরমার্থ মনে করে এবং পরমার্থকে ব্যবহারের অন্তর্গত করিতে প্রয়াস করে। অনেকে ধর্ম বা অশৌচিক ধারণাকে লৌকিক ভোগের অন্তর্ভুক্ত করে, তাহার ফলে তাহারা পরমার্থ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়। যাহাদের নিত্যানিত্য বিবেক নাই, চিদচিদ-বৈশিষ্ট্যের ধারণা করিতে যাহারা অসমর্থ, ব্রহ্ম ও মায়াবদ্ধ জীবকে যাহারা এক মনে করে, তাহারা যে ব্যবহারকেই পরমার্থ বলিয়া ভ্রম করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

কন্দাকাণ্ডের বিচারসমূহ অনেক সময় ব্যবহারনিপুণ সমাজের নিয়ন্তা হয়। কঙ্গিগণের চেষ্টা মতর ভোগপর হওয়ায় বৈরাগ্যের শুদ্ধ আদর্শকে তাহারা সর্বদা কলঙ্কিত করে এবং পরমার্থকে ব্যবহার জীবনের অল্পতম কৃত্য বলিয়া মনে করে। সেইরূপ অবिवেচনার ফলে তাহারা পারমার্থিকের অপ্রাকৃত চরণে অবলীলাক্রমে অপরোধ করিয়া বসে।

সম্প্রতি পরমার্থের আলোচনা করিতে গিয়া অনর্থের প্রবল অত্যাচারে আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের হাবভাব দেখিয়া বিস্মৃত হই। ব্যবহারিক সহজিয়াগণ আপনাদিগকে বুদ্ধদায় মনে করিয়া জড়ের ভোগবাসনাকে পরমার্থ বলিয়া ভ্রান্তিময়ী ধারণা পোষণ করে, তাহাতে তাহাদের মদল হয় না। শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

অর্চ্যে বিধৌ শিলাধীশু'কৃষু নরমতির্বিষ্মবে জাতিবুদ্ধি-

বিষ্ণোর্ক্য বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহুষ্ণুষ্কিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নান্নি মস্ত্রে সকলকলুবে শব্দনামান্যবুদ্ধি-

বিষ্ণৌ সর্কেষথেষে তদিতরসমধীর্গম বা নারকী সঃ ॥

অনেকে প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রতারণিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে মন্ত্রস্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে নীচের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করেন এবং শিশু স্বয়ং উচ্চবংশজাত

মনে করেন। ব্রহ্মজ্ঞের গুরু পরমাত্ম যোগনিরত শুদ্ধজীবাত্মা এবং যোগেশ্বরের গুরু হরিসেবাপর বৈষ্ণব; একথা ভুলিয়া প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও বৈষ্ণবকে নীচের সন্তান বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ বিশ্বাস করেন না। তিনি দেশবিদেশে নিজ নিজ ব্যবহারিক সমাজের স্মার্ত্তকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিতে গিয়া নিত্যকাল পরমার্থ হারাইয়া ফেলেন। পারমার্থিকগণকে নিজের বর্ণ জ্ঞান করিয়া প্রাকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। সময়ে সময়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিয়া বসেন। ফলে হয় এই যে পরমার্থচ্যুত হইয়া নরক লাভই তিনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। বিষ্ণুকে অন্ন দেবের সহ সমান বুদ্ধি করা নারকীয় লক্ষণ। বিষ্ণুর নাম ও বিষ্ণুমন্ত্রকে অপর আভিধানিক শব্দের অন্ততঃ জ্ঞানই অজ্ঞানের পরিচায়ক। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের পদজলকে অপর জলের সহিত সমান জ্ঞানই নারকীয় অক্ষজ্ঞ জ্ঞান।

মায়াদ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভুক্তকে নিজজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় না। যিনি মাপিয়া লইতে প্রমত্ত হন তাহার অচিরেই বিনাশ লাভ ঘটে ও বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল ঘটয়া যায়। জড়ীয় আভিজাত্য, ভোগপিপাসা, অর্থেষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি প্রবল হইয়া নরকের পথের পথিক করাইয়া দেয়। জীবের স্বাভাবিক বিনয় ঔদ্ধত্যে পরিণত হয়। পাণ্ডিত্য নীচতা ও হিংসার পর্যাবসিত হয়।

বাঁহারা গ্রাম্য ব্যবহার-ধনে প্রমত্ত তাহারা কখনও চরিলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারে না। তাহারা বৈষ্ণবের অনুকরণে কতকগুলি কাপট্য প্রচার করিয়া হান্তাপ্পদ হয় মাত্র। চক্ষের জল মাত্তিকতাবসমূহের অনুকরণ, দশা পাওয়া প্রভৃতি বাহ্যিক কপটতা প্রদ্রব্য করিয়া বৈধভক্তিকে বিপন্ন করে মাত্র। তাহাদের বোধশক্তি কপটতা করিতে করিতে এতদূর লাজ্জ হইয়া যে তাহারা দিগ্‌বিদগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুবৈষ্ণবকে তাহাদেরই স্তায় নীচের সন্তান, কপট প্রভৃতি তুর্লোক্য ভূষিত করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। হরিদাস ঠাকুরের প্রেম দর্শন করিয়া একটা মূর্খ ব্রাহ্মণ পরিচয়াকাজক্ষী সন্তান কৃত্রিম ভক্তিভাব দেখাইতে গিয়া যে প্রকারে ভঙ্ককর্তৃক প্রদ্রুত হইয়াছিল, বাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই কপটীর বৈষ্ণব-চেষ্টানুকরণের ফলে দণ্ডের কথা সবিশেষ অবগত আছেন। অধুনা কতিপয় অর্বলোভী প্রতিষ্টাশাপরায়ণ মায়াবাদী কুকর্ম্মরত জীব ভগবদ্ভুক্ত পরিচয়ে পরিচিত হইবার লোভে নিজের ব্যবহারিক আভিজাত্য লইয়া ভক্তগণকে ও ষোড়শব্রহ্ম সমাজকে ঠকাইবার উদ্দেশে বৈষ্ণবের নজ্জা না লইয়াই হাম্‌ বড়া বৈষ্ণব খ্যাতি লাভ করিতে গিয়া ব্যবহারিক অবৈষ্ণবতাকে বহমানন করিয়া কনিজনোচিত কার্য-বিস্তারে

শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের অর্থব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া অনেকেই বিম্বিত হইয়াছেন। তাহারা নিকোঁধ লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছে যে, বৈষ্ণবগণ সমাজের অগ্রণী নহেন। অপ্রাকৃত ধর্ম প্রাকৃত সমাজের অধীন। ধর্মাবধীন সমাজের পুনঃ সংস্থাপনের আবশ্যকতা নাই। সমাজের ব্যবহারিক অবৈধ নিয়মগুলিতে তিরদিনই পরমার্থ-পথ কক থাকুক। আর অর্কাচীনতার স্ববিধা লইয়া তাহারা যার পর নাই তাগুব নৃত্য করিবার অবসর পাউক। বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-বিধি পুনঃ সংস্থাপিত না হইয়া অবিচারিত স্বার্থপর নীতিগুলি সর্কর্মপ্রচারকগণ স্বীকার করুন, তাহা হইলেই ধর্মের নামে তাহারা নিঃশিক্ষিত মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়া রাবণের চ্যায় উপাস্তবস্ত্র সীতাপ্রবন্ধেও ধর্ম নামে চালাইতে পারেন। সমাজের কুপ্রথাসমূহ যাহাতে অপমোদিত হয় তাদূশ পরিমার্জনে বাধ্য দিতে গিয়া শুদ্ধ বর্ণাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। শাস্ত্রের নামে মূর্ততার অন্তরালে হরি-বিদ্বেষ, শাধু-বিদ্বেষ প্রভৃতি চলিতে পারে না। চুরি করিয়া নিজের চৌধ্যবৃদ্ধি আধরণ করিতে গিয়া অপর শাধুকে নিজের গ্লান অসৎ মনে করিলে সাধারণ লোকেরও আর তাহাদের ধরিয়া ফেলিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ধর্মই সমাজের রক্ষক। অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রচলনকারী কুনীতিপরায়ণ সমাজ কখনই শুদ্ধভক্তিধর্মকে অধীন করিতে পারে না। বদ্ধজীব যেকোন ব্রহ্মকে মাপিয়া লইতে অসমর্থ, নিজের ভ্রম-প্রমাদাদি সন্ধান চেষ্টা দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বৈকুণ্ঠদত্তকে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার গ্লান স্বায়ত্তীকৃত করিবার মিফল চেষ্টা করে, সেইরূপ ন্যাত্যকে আধরণ করিয়া কেহই কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার ভোগরূপ গৃহব্রত-ধর্ম চালাইতে পারেন না। অতীরেই তাহাদের কাণটা ধরা পড়িয়া যাইবে।

অন্তঃ—ভক্তির ভান করিয়া কতক্ষণ লোক-প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে আমবা তাহা বুঝি না। চাণক্য বসিয়াছেন,—যে কাল পর্যন্ত মূর্থ কিছু না বলে, তৎকাল পর্যন্তই পণ্ডিত বলিয়া গণিত হয়, কিন্তু বাক্জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। দাঁড়কাঁক ময়ূরের মত বিভূষিত হইলেই সে ময়ূর হয় না। বাহিরের চিহ্ন লক্ষ্য না শাধুচিহ্নের নিন্দাপর হইয়া ভিতরের কপটতা লইয়া শাধু হজিয়া যায় না। অনাধুতা অপনা হইতেই কুটিয়া বাহির হয়। প্রাকৃত সহজিয়া কপটীগণ এখনও সাবধান হউন।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

‘ভাষা’ ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মুক ব্যক্তির নিকট ‘বৈথরী’ স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অল্পভঙ্গিই সে-স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ, লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রমায়া লক্ষ্য করা যায়। হাশ্বের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হউন না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে অক্ষরাজক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই ‘ভাষা’ নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদিরও ভাষা আমাদের অমুদ্রাক্ষরের বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদগণ, পশুতত্ত্ব আলোচকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্বজনীন ও সর্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য বিষয়। কীট-পতঙ্গাদি, আত্মক দেব, দানব, মনুষ্য, স্তম্ভ পর্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্তমান এবং তাহাদের মধ্যে বাহ্যকঃ যেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্তমান।

বিভিন্নমাংশ অণুচেতনের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতের যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্মে অবস্থিত হইলেও তাহারা বিভিন্নমাংশ। এক অণুচেতন, অন্য অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রণালীই ‘ভাষা’ বলিয়া কথিত হয়। কীটপুতীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু এক জাতি অন্য জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছে। এই

ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচেতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্ববাদিসম্মত যে, চেতনতার কাহারও কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আন্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীবাত্মা অণুত্বে ও ধর্ম্মে এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক্ হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সুসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মায়াশক্তি-বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ধৃত ভাষারই পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আত্মার ভাব-বৈভিন্ন্য অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্ন্য না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাট্টিক প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে ‘বৈশিষ্ট্য’ বলিতে কোনপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। পরস্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অণুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ ‘ব্যবহারিকতা’ ও ‘মিথ্যার’ প্রশ্ন দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। তজ্জগৎই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অন্বেষণে যাহারা যত উন্নত, তাহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাশ্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন, উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক

সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাটভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে 'ব্রহ্মসূত্রে' আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মস্ত্রে এবং বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। 'বীজ' অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সত্তা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট মহীকুহের সত্তা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী বলেন,—“বাখা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্বং ন হৃদয়মিবেহাস্তি।” (নৃ: তা: ৮২)

উক্ত উপনিষদের শব্দরত্ন-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—
“বাঙ্মাত্রত্বাচ্চোঙ্কারস্তোক্তং সিদ্ধমিত্যাহ বাখা ইতি। সর্ব-বর্ণ-কবলন-ক্লপত্বাদ্ বৈখর্যাদিকল্পত্বাচ্চ বাঙ্মাত্রমবগম্যবাম্।”

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাঙ্মাত্রতাহেতু তাহার ওতর অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থ বর্ণিত হয়। সকল পদার্থই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাঙ্মাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ) ষাটতীয় বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হইয়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং ‘ওঁ’ এই দিব্য শব্দটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা বৈজ্ঞানিক রূপে সিদ্ধ।

‘সংস্কৃত’ ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারতবর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ, কাল, পাত্র হইতে বহির্ভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনোবিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (১) হইতে প্রচুর পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই ‘সংস্কৃত ভাষা’।

ভাষার 'সংস্কৃত' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

'সংস্কৃত' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে ভাষা সর্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে। দশসংস্কারে মানব যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেইপ্রকার 'সংস্কৃত ভাষা'টিও সর্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। বিহ সর্দবেজর দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে। সেইপ্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মূল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—'সংস্কৃত ভাষা'। এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দেশকারিণী।

'অক্ষর'-পরিচয়

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে। ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু। এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অহুনাদান না করিলেই আমরা 'কৃপণ' হইয়া পড়ি। তজ্জন্ত বৃহদারণ্যক (অৱা১০) বলিয়াছেন,—“এতদ্ 'অক্ষরং' গার্গি অবিদিত্বা অশ্মাৎ লোকাং প্রৈতি স এব 'কৃপণঃ'।

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অহুনীলন না করিয়া কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অজ্ঞাত দেশের জায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে। ভারতীয় লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দেবভাষাই অতুচ্চতম জীবনাত্মের ভাবজ্ঞাপক হানিবাহন। বাল্যজীবনে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে। তজ্জন্তই তাহাকে শিক্ষাভরু প্রাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতির দারাবশ পরিচ্যায় করিয়া গভাভুগতিক ধারা অহুনারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আত্মগতানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর-বস্তুর পরিচয় হইতেছে না। আমরা আমাদের ত্রিকালজ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি। ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর বস্তুর সহিত সঙ্গ না থাকিলে তাহা সর্বতোভাবে আমাদের পথে চালিত করিবে।

লক্ষ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য লক্ষ না থাকিলে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-ঝিলোড়নে উৎপন্ন হয়। ফোটাবাদী বৈয়াকরণিকগণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধানতঃ কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ

বলা যাইতে পারে, ‘ন’ তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে তালব্য স=‘শ’, মূর্ছা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্ছন্ত স=‘ষ’ এবং দন্ত হইতে যে স এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স=‘স’। এইপ্রকার উচ্চারণ ভেদে ‘ন’ ও দুইপ্রকার। যথা দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন এর নাম—দন্ত্য ‘ন’ এবং মূর্ছা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম—মূর্ছন্ত ‘ণ’। সুতরাং ‘বৈয়াকরণিকের’ শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের ভ্রায় প্রাকৃতই বৃষ্টিতে হইবে। ইহাকে আমরা ‘অক্ষর’ শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐপ্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালায় সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমাণ্বিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন,—বর্ণমালাকে সর্কতোভাবে ‘সংস্কৃত’ করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় মূল বিদূষিত করিয়া অথবা সন্দৈবের ভ্রায় জারিত করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তুর সম্বন্ধ পাইব। ‘বর্ণ’ এবং ‘অক্ষর’ এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যবৃত্ত। সন্দৈববস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও, উপমান-জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবরণ্য জগদগুরু শ্রীশ্রীজীবগোষামিপাদ তাঁহার স্বরচিত ‘শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে’র প্রথমে লিখিয়াছেন,—“নারায়ণ উদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রমঃ”—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্মবস্তু। যে বর্ণ অপ্রাকৃত বিত্তকদত্ত স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশক সমাবেশে বাক্য এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই ‘সংস্কৃত ভাষা’ বলিয়া জানি।

—জগদগুরু শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোষাধী

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
আবির্ভাব-তিথি তব এই ধরাধাম ॥ ১ ॥
যোগ্য নহি বর্ণিবারে মহিমা তোমার ।
তবু চাহি বর্ণিবারে করুণা তোমার ॥ ২ ॥
বহুভাগ্য-ফলে পাইলু তোমার চরণ ।
তোমার কৃপায় (যেন) করি মহিমা বর্ণন ॥ ৩ ॥
ভানু-রশ্মিদ্বারা যেন ভানুর দর্শন ।
তোমার কৃপায় চাই তব মহিমা বর্ণন ॥ ৪ ॥
বৈষ্ণবগত প্রাণ তোমার নিজজন ধন ।
গোবিন্দের হও তুমি অতি প্রিয়জন ॥ ৫ ॥
সরস্বতীর প্রিয় শিষ্য অতি গুণবান্ ।
মায়াপুর নাম যাহা গুণের নিধান ॥ ৬ ॥
অতীবধি তোমার সেবা প্রমাণ আছে তাহাতে ।
সূর্য্যরশ্মি-সম বিজুলী জ্বলিছে তাহাতে ॥ ৭ ॥
গুরুসেবা-শিক্ষা দিলা নিজ হাতে ।
প্রমাণ আছে প্রতি পাতে পাতে ॥ ৮ ॥
তোমার করুণা বিনা ভবসিদ্ধি পার ।
আশা করি পার হব—চরণ-তরী সার ॥ ৯ ॥
সহিতে পারি না প্রভু সংসারের জ্বালা ।
কৃপা করি ছিন্ন কর জন্ম-মৃত্যু মালা ॥ ১০ ॥
অধম হরিদাসী কয়—আর নাই কোন ভয় ।
গুরুপদে যদি ভক্তি-বিশ্বাস মোর রয় ॥ ১১ ॥

—শ্রীযুক্ত হরিদাসী দেবী
গোলকগঞ্জ (আসাম)

শ্রীগুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীবাসপূজা

বামনকল্পে পরমেশ্বর-বাক্য হইতে পাওয়া যায়,—

প্রথমস্ত গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্ ।

কুর্কনু সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্থবা নিফলং ভবেৎ ॥

“প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে থাকেন, অন্যথা অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিফল হইয়া থাকে ।” এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাহার বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন,—“জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্বোত্তম, আর সেই সর্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড় । সেই পূজকে ভগবান্ পূজা করিয়া থাকেন । সর্বাপেক্ষা পূজ্য—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত ; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম । ভগবান্ যার পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় ।”

গুরুদেবের জয়গান করিবার জগ্গই আমাদের এই জীবন-ধারণ । শুধু নিজে জয়গান করিলে চলিবে না, জগতের অন্ত সবাইকেও তাহা করিবার জগ্গ সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে । যাহার সহিত শিষ্যের মিত্য সম্পর্ক, যিনি শিষ্যকে মনজ্ঞান দান করিয়া থাকেন, সেই গুরুদেবের জয়গান শিষ্য যদি করিতে না পারেন, তবে শিষ্যের সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি ? জগতে বাঁচিয়া থাকিয়াও বা কি লাভ ? “শ্রীল প্রভুপাদ-প্রের্ত শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের অধস্তন আচার্য্যের পৃথকভাবে জয় দেওয়া যাইবে না”—এই উপদেশকের দ্বারা সর্বোত্তম শ্রদ্ধা জগতে এক বই হই নাই । গুরুতবে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার জগ্গই তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধস্তন অস্ত্র কাউকে গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করেন না । যদি স্বীকার করিতেন, তবে নিশ্চয়ই গুরুদেবের জয়গানে শিষ্যকে বাধা দিতেন না । অনেকে গুরুদেবের Photo বা আলোখ্য পূজা করিবার পক্ষপাতী নহেন । তাঁহারা গুরুদেবের Photo বা আলোখ্যকে জড় সামান্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অর্চাবিগ্রহ ঘেরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তদ্রূপ গুরুদেবের আলোখ্য স্বয়ং গুরুদেবই । যাহারা গুরুদেবের আলোখ্যকে ‘গুরু’ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহরাই উপদেশকের কাৰ্য্য করিয়া জগতের

মদল করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ স্বদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ‘অপ্রকট-তিথিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন,—“এই যে আলেখ্য অর্চা আপনারা দর্শন করছেন, এই বস্তুকে ধারা ‘গুরু’ বলে বিচার করেন, তাঁরা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।” শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য সকল মঠগুলি সকল গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজন ও মিলনের স্থান—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ব-স্ব-দীক্ষাদাতার পরিচয়ে পরিচিত না হইয়া আমরা ‘অমুক মঠের শিষ্য’ বলিলে কেহই তাহা বিশ্বাস করিবেন না।

দীক্ষাগুরুর দীক্ষাসূত্র ধরিয়াই গোড়ীয় মঠের সহিত আমাদের পরিচয়। দীক্ষাগুরুর গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া “অমুক মঠের সেবক” বলিলে তাহা “পিতাকে মানি না, অথচ আমি অমুক বাড়ীর আদরের সন্তান”—এর ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইবে না কি? প্রত্যেকটী গোড়ীয় মঠের সেবকগণের লক্ষ্যবস্তু বা লক্ষ্যবল যদি একই হয়, তবে আমরা “অমুক গুরুদেবের শিষ্য” পরিচয় প্রদানে কেন বিভেদের সৃষ্টি হইবে? বরং ইহাতে বিভেদ ভ’ দূরের কথা, প্রত্যেক মঠের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সূদৃঢ় হইবে। স্ব-স্ব-গুরুদেবের মহিমা প্রচার করিলেই হিংসা বা বিভেদের নীজ সমূলে ধ্বংস হইয়া সকলের মধ্যে সূদৃঢ় ঐক্য স্থাপিত হইবে।

একই বৃন্তের মধ্যে যতগুলি ব্যাস অঙ্কন করা হউক না কেন যেমন সবগুলিই সমান, তেমনই শ্রী-ব্রহ্ম-কৃষ্ণ-সমক—চারি সম্প্রদায়ে যত গুরুদেব থাকুক না কেন সকলের সমান গুরুত্ব। শ্রীব্যাসদেবের মনোহভীষ্ট পূরণ করা সকল গুরুদেবের কার্য্য বলিয়া গুরুপূজা মানেই ব্যাসপূজা। শ্রীব্যাসদেব-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহাতেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। শ্রীগুরু-কৃপাবলেই শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতিপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের চরম প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়। শ্রীব্যাসদেব ও গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পার্থক্য নাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, পঞ্চোপাসক ও মায়াবাদিগণের মধ্যেও গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদৃশ ব্যাসপূজায় অহমিকার বিচারই প্রবল। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজনীয় বস্তু—স্বর্গস্বখ-ভোগ ও মোক্ষ, শুদ্ধভক্তি কখনও নহে। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদের দ্বারা ব্যাসপূজা কখনও দাখিত হইতে পারে না। তাহারা মুখে ব্যাসদেবের অহং বলিলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাসদেবের ষোর বিরোধী। নিাক্ষশেষবাদিগণ তথা মায়াবাদিগণ গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের নিত্য স্বীকার করেন না। তাহারা গুরুদেবকে ‘ব্রহ্ম’

বলিয়া মনে করেন। মৌকার সাহায্যে নদীর ওপারে পৌঁছিয়া গেলে আরোহীর মৌকার সহিত যেমন কোন সহস্র থাকে না, তদ্রূপ প্রয়োজন-নিকি হইলেই তাহাদের গুরুদেবের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়া যায়। তাই তাহারা শ্রীব্যাসদেবকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ। তাহারা বলপূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেবকে তাহাদের ধর্মের মূল প্রচারক বলিলেও তাহা কেহই স্বীকার করিয়া লইবেন না।

মায়াবাদী সম্প্রদায়, তথা সবিশেষ ও নির্বিশেষবাদ-নির্বিশেষে সকলেই জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা দিবসে শ্রীব্যাসপূজার অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথির সন্মানের জ্ঞায় শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে তাহার পূজা বিধান করিয়া শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি অত্যন্ত পবিত্র ও জগতের সমস্ত অন্তঃকরণার্থক। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ব্যাসপূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ের অমুভাবে বলিয়াছেন,—“শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে তাহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আত্মকূল্য বিধান করেন। বার্ষিক অমুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব-গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর ‘শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পাত্তার্পন’ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবেহ-মনোহতীষ্ট যে স্তূপ ভগবৎ-দেবন তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।” মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথি শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীল প্রভুপাদ অমুভাবে মাধ্যমে তাবিকালের গৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে স্ব-স্ব গুরুদেবের আবির্ভাব-দিনে বর্ষে বর্ষে গৌরবের পাত্র-বোধে গুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজার আত্মকূল্য বিধান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। অনেকে নুখে প্রভুপাদের অমুগ প্রচার করিলেও, কার্যক্ষেত্রে তাহারা প্রভুপাদের নিদিষ্ট সিদ্ধান্তবিরোধী কথাগুলি জগতে প্রচার করিয়া জগতের সশেষ ক্ষতিসাধন করেন। তাহারা শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত অন্য কোন গুরুদেবের পূজার বা ব্যাসপূজার পক্ষপাতী নহেন।

তাহারা বলেন,—“শ্রীল প্রভুপাদ তাহার জীবদ্দশাতেই যখন আড়ম্বরের সহিত ব্যাসপূজা শিষ্যবর্গদের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অমুগ আমরা গুরুর আসন্ন অধিকার করিয়া আপন আপন জন্মদিনে স্ব-স্ব-শিষ্যের আয়োজিত ব্যাসপূজার উপচৌকন বা পূজা কেমনই বা গ্রহণ না করিব?” তাহারা প্রভুপাদের সত্যিকারের অমুগ, তাহারা অবশ্যই স্ব-স্ব-গুরুর আবির্ভাব দিনে বিশেষ আড়ম্বরসহকারে ব্যাসপূজা করিবেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জড়ীয় লাভ-পূজা-

প্রতিষ্ঠার অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করেন। ‘শিষ্টা আমার পূজাবিধান করুক’— এই আকাজক্ষা তিনি মনে কখনও পোষণ করেন না ; বরং নিজেরই আবির্ভাব দিনে স্বকীয় পূর্ববর্তী গুরুবর্গের পূজাবিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু শিষ্টগণ গুরুদেবের পূজাবিধান ব্যতীত নিজেরদের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করেন। (ক্রমঃ)

—শ্রীবল্লভ দাস ব্রহ্মচারী

অভিধেয় তত্ত্ব

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮১ পৃষ্ঠার পর]

সংসারাক্রষ্ট জীবের প্রথমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা সকাম ভক্তি। সকাম ভক্তিও পরে নিকাম হয়, যেমন ঐবের হইয়াছিল।

“কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-বন্দে।

‘কাম’ ছাড়ি ‘দাম’ হৈতে হয় অভিনায়ে ॥”

শাস্ত্র অবস্থানভেদে ভক্তিকে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—(১) সাধন-ভক্তি, (২) ভাবভক্তি, (৩) প্রেমভক্তি।

প্রেমভক্তি—নিত্যসিদ্ধভাব। নিত্যসিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়, যেহেতু জীব স্বরূপ-বিভ্রান্ত, সে-কারণে তাহার হৃদয়ে এই নিত্যসিদ্ধ-প্রেমভাব প্রকটিত নহে। হৃদয়ে এই ভাবকে প্রকট করার নাম ‘সাধন’।

হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই বলিয়া তটস্থভাবে কিয়দ্দিনের জন্য তাহার সাধ্যতা আছে—স্বরূপতঃ তাহা নিত্যসিদ্ধভাব ; প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। তাহা অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ ; জড়বদ্ধ জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় নাই। কায়মনোবাক্যে তাহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার সাধনা। যে-কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাব প্রাপ্ত ; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা না সাধন্যভিধা।

নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব। তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা। তাৎপর্য এই যে, চিংকণ জীব স্বভাবতঃ চিংসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ-ভাবই হৃদয়ে প্রকটনযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর বস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্য-ভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা নাশিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধন-ভক্তি'।

প্রেমভক্তির প্রথম অবস্থা ভাবভক্তি নামে প্রকাশিত। যে-কোনপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করানই সাধনভক্তির লক্ষণ। এই সাধনভক্তি আবার দুই প্রকার—বৈধী ও বাগাহুগা।

“রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।

‘বৈধীভক্তি’ বলি’ তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥”

“জীবের দুইপ্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়—বিধি অহুসারে যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি; শাস্ত্রশাসনক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধী প্রবৃত্তি চইতে জাত হওয়ায় বৈধীভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্র যাঁহা কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ‘বিধি’; শাস্ত্র যাঁহাকে অকর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম নিষেধ; বিধি পালন ও নিষেধ পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধর্ম্ম।”

বৈধ ধর্ম্মের বিস্তার বহু। শ্রীল রূপগোস্বামী বৈধ ভক্তির সাধনের চতুষ্টয় অঙ্গের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং বৈধ ধর্ম্মের সর্ব্ব অঙ্গগুলি জানিয়া পালন করা কোন জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। একারণে সংক্ষেপে বিধি-নিষেধ নির্ণয় করিবার শাস্ত্র-সদ্ব্যবহৃত পদ্ধত্যাগে লিখিয়াছেন,—

“স্বর্জব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মর্জব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্ব্বো বিধিনিষেধাঃ স্মারতয়োরেব কিস্করাঃ ॥”

‘বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে’—ইহাই বিধি; ‘কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না’—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি-নিষেধ উক্ত মূলবিধি-নিষেধের অহুগামী কিস্কর।

গীতাশাস্ত্রে ‘অর্জ’, ‘জিজ্ঞাহ’, ‘অর্থার্থী’ ও ‘জ্ঞানী’—এই চারিবিধ ব্যক্তি ভক্তি করিয়া থাকেন বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা এই চারিপ্রকার ব্যক্তির অনন্তভক্তিতে প্রকা জন্মে।

‘নালোকা’, ‘দাষ্টি’, ‘দামীপ্য’, ‘দারূপ্য’ ও ‘দাঘুজ্য’—এই পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে ‘দাঘুজ্য’ মুক্তি ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরোধী; একারণে কৃষ্ণভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না। অন্ত চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী না হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে—কৃষ্ণভক্তগণ নারায়ণ-ধামগত ঐ চারিপ্রকার মুক্তিও কখনও গ্রহণ করেন না। এমনকি, ঐকান্তিক কৃষ্ণাকৃষ্ট ভক্তদিগের শ্রীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ করিতে পারে না। কারণ নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণরূপে রসের উৎকর্ষের ভেদ আছে।”

শুদ্ধ-ভক্ত্যাধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্যে অবস্থিত থাকিলেও কেবলমাত্র ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতেই বাধ্য, কর্ম্মাঙ্গ পালন ভক্ত্যঙ্গ পালনেই তাহাদের হইয়া যায় এবং কোনপ্রকার পাপ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

শ্রুতবাং অনন্তভক্তিতে যখন অধিকার জন্মে, তখন তিনি জ্ঞানশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রের বিধির বাধ্য হন না। ভক্তির অমূল্যলভ্যতাই তাহার সর্ব্বসিকি হয়।

শ্রীমদ্ভগবতে শ্রীপ্রহ্লাদেব উক্তিতে আমরা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই।

“শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চৈবলক্ষণা।

ক্রিয়েত ভগবত্যাঙ্কা তন্নন্তেহধীতমুত্তমাম্”

এই নববিধা ভক্তি যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে অস্থদিন অমূল্যলভ্য করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।

শ্রবণ :—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অপ্ৰাকৃত বর্ণনা কর্ণরঞ্জণার্থে প্রবেশ করানই শ্রবণ। শ্রদ্ধার পূর্বে নাধুমুখে শ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদয়ে গাঢ় পিপাসার সহিত শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মে।

কীর্ত্তন :—শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দসমূহের জিহ্বা-স্পর্শের নাম কীর্ত্তন। কলিযুগে কীর্ত্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সমর্থ। একারণে বলা হইয়াছে—“কীর্ত্তনীয়ঃ নদা হরিঃ।” সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে

যজ্ঞ এবং ঋপণের অর্চনদ্বারা যাঁহা লাভ হয়, কলিতে একমাত্র অপরাধশূন্য নামকীর্তনদ্বারা সেই প্রয়োজন লাভ করা যায়।

স্মরণ :—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার স্মরণের নাম স্মরণ। স্মরণ পাঁচ প্রকার। সামান্য পরিমাণ অহুসঙ্কানের নাম স্মরণ। অজ্ঞাত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কিছুক্ষণ মনোধারণের নাম ‘ধারণা’। বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান : অমৃতধারণার দ্বারা অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ঐকান্ত্যবৃত্তি এবং ধ্যেয়মাত্র স্মৃতির নাম সমাধি। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ ভক্তির প্রধানাদি। অন্তর্গুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পাদসেবা :—শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের সহিত পাদসেবা বিষয়। সেবা বস্তুকে সচ্ছিদানন্দ বুদ্ধিতে এবং নিজকে অকিঞ্চন জ্ঞানে পাদসেবা করা কর্তব্য।

অর্চন :—শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের ফলে যদি অর্চনমার্গে প্রভা জন্মে, তবে শ্রীকৃষ্ণদাস্যপূর্বক অর্চনে অধিকার আসে।

বন্দন :—পাদসেবা ও কীর্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও মনস্বারই বন্দন। মনস্বার দুই প্রকার—পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ মনস্বার।

দাস্ত :—‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই অভিমানই দাস্ত।

সখ্য :—কৃষ্ণকে সখা জ্ঞানে সেবা।

আত্মনিবেদন :—নিজের জন্ত চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্ত অখিলচেষ্টাময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণে সব কিছু অর্পণের নাম আত্মনিবেদন। সর্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণসেবার নিযুক্ত করার চেষ্টাই বৈধভক্তির লক্ষণ। এই চেষ্টার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সম্ভব।

“অধরীষ মহারাজ স্বীয় মন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করষয় হরিমন্দির মার্জনাধিতে, কর্ণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণে, চক্ষুষ্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি দর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসা কৃষ্ণের পাদপদ্ম সৌরভ ভ্রাণে, রসনা কৃষ্ণাধিত তুলসীর আশ্বাদনে, পাদদ্বয় কৃষ্ণকোমলগমনে, মস্তক হৃদীকেশের চরণে প্রণতিকার্যে ও কাম কামনারহিত বিষ্ণুদাস্তে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।”

শ্রীকৃষ্ণের রূপায় বৈধভক্তির পরে রাগভক্তি সম্পর্কে জানিতে চেষ্টা করি।

শ্রীরাগগোবিন্দী বলিয়াছেন,—“ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই ‘রাগ’ বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। স্বরূপের বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। ইহা কেবল কৃষ্ণের নিজজন ব্রজবাসি-গণের মধ্যে সম্ভব। যে ব্যক্তিতে এরূপ রাগ উদ্ভিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্র-

বিধিই ভক্তির প্রবর্তক ; সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে । ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাব-প্রাপ্তির জন্য লুক্ক হন, তিনিই রাগাঙ্গুগা ভক্তির অধিকারী ।”

রাগাঙ্গুগা ভক্তি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা রাখে না । এইপ্রকার ভক্তির অধিকারী বাহ্যে সাধকরূপে ও অন্তরে ব্রজজনের আনুগত্যে সিদ্ধদেহাভিमानে সেবা করেন ।

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন ।

‘বাহ্যে’ সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥

‘মনে’ নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

এই রাগাঙ্গিকা-ভক্তি দুইপ্রকার—সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা । আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা বা সখা ইত্যাদি অভিমানই সম্বন্ধরূপা রাগাঙ্গিকা ভক্তি ।

কাম-শব্দে সন্তোগ-তৃষ্ণাকে বুঝায় । বন্ধজীবের কাম সন্দোষ ও তুচ্ছ । এই কাম ইন্দ্রিয়ভোগ্য, কালদ্বারা দ্বন্দ্ব, কালের গতিতে অল্পক্ষণেই লয়প্রাপ্ত । ব্রজ-গোপীগণের কাম অপ্রাকৃত ও দোষগন্ধ-রহিত । এই কাম কালদ্বারা দ্বন্দ্ব হয় না, নিত্যনবনবায়মান ভাব রসসঞ্চারী, যে ভাব-রসসমুদ্রে কৃষ্ণচন্দ্র পরমস্থখে সম্ভরণ করেন ও মহাতৃপ্তিলাভ করেন । গোপীদের কাম—খ্রীতি-সন্তোগের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নমস্ত চেষ্টার উদয় করায় ও নিজস্থলের প্রতি দৃষ্টির অপেক্ষা করে না । এই কামরূপা ব্রজগোপীগণ ভিন্ন অন্য কেহই কৃষ্ণচন্দ্রকে সেই পরম সুখ দান করিবার ক্ষমতা ধারণ করেন না । এই গোপীদের মধ্যে মহাভাবময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণীই সাধ্যগণের শিরোমণি ও কৃষ্ণকে সর্বোত্তম স্থখবিধানে অলুক্ষণ তৎপর । তাই পণ্ডিতগণ গোপীগণের এতাদৃশ ভাবকে কেবল প্রেম না বলিয়া কাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । কারণ প্রেম বলিতে সম্বন্ধরূপা রাগাঙ্গিকা ভক্তিও আসিয়া পড়ে । কিন্তু ব্রজগোপীদের একমাত্র কৃষ্ণসুখচেষ্টার জন্য যে কাম, সে একমাত্র ব্রজগোপীদের আনুগত্যে ব্রজেই সম্ভব, অন্য কোথাও দুর্লভ এবং ভগবৎপ্রিয় উদ্ভবাদিও তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন ।

এই কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহা কামাঙ্গুগা । ইহাও দুই প্রকার—সন্তোগেচ্ছাময়ী ও তত্ত্বদ্বাবেচ্ছাময়ী । ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া, তাহাই সন্তোগ শব্দের তাৎপর্য । ব্রজযুথেশ্বরীদিগের

কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব-মাধুর্য্য, সেইরূপ ভাবমাধুর্য্যের কামনাকে তত্ত্বাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়। এই দুটাই ভক্তির চরমতম পর্যায়।

শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মাধুরী দর্শন করিয়া ও কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া সেই সেই ভাবের আকাঙ্ক্ষা যাহাদের হয়, তাঁহারাষ্ট কামাত্মগা ও সঙ্কমাত্মগা রূপা রাগাত্মগা ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন।

রাগাত্মগা ভক্তির মাহাত্ম্য হইল—বৈধীনীষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না হয়, রাগাত্মগা ভক্তিতে স্বল্পকালেই সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমার্গের ভক্তি বিধিনাপেক্ষ হওয়ায় দুর্বলতা; কিন্তু রাগাত্মগাভক্তি শ্রবলা।

এতক্ষণ ভক্তিসম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জামিলাম মহাপ্রভুর রূপায়, নববিধা ভক্তির একমাত্র শ্রীনাম কীর্তনের মাধ্যমেই সকল কিছু, এমনকি, পঞ্চম পুরুষার্থ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সবই পাওয়া সম্ভব।

“প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নহি আর ॥”

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥

—শ্রীমতী মায়া সরসকান্ত

ধর্ম ও বিজ্ঞান

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর]

বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান রাষ্ট্র কম বিজ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রকে করুণার চোখে দেখে। শক্তির মদমত্ততায় ‘ধরাকে সরা জ্ঞান’ করে। উদার মানবতা সময় সময় বিসর্জিত হয়। ধর্ম সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনে অপরিহার্য। মানুষকে মানুষ বলে ভাবা শক্তিমান বিজ্ঞান-শক্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই কঠিন। তা’ যদি না হত গুটিকতক ব্যক্তির উপর আক্রোশবশতঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমার বিধ্বংসী পরিণতি আরোপ করা হত না। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। দুটি আধুনিক স্তম্ভভিত্ত

শহর ভূমিসাং হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা বলেন,—পৃথিবীতে যে আণবিক অস্ত্র মজুত আছে, তার প্রয়োগে এই পৃথিবীর মত দশটি পৃথিবী মিনিট কুড়ির মধ্যে ধ্বংস হতে পারে। বিজ্ঞানের এই মারমুখিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধর্মের কল্যাণপেতঃ প্রলেপন।

বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য, বিজ্ঞানীর স্বপ্নও তাই। কিন্তু ছুভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞানশক্তির নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র বিশ্বের আপামর সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা অগ্রাধিকার দিতে পারেন না। পারেন না যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—মারণাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার উত্তরোত্তর বিবর্ধন। আরও বিশ্বাসের কথা, এই মহাকালের মহাবিধ্বংসী মহাস্ত্রের নির্মাণকলার প্রযুক্তি অত্যন্ত সংগোপন রাখা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের দোষ কিছু নয়। শক্তিমদমত্ত মানুষ ক্ষমতার লিপ্সায় অধিকারের সীমায়তির প্রসারণে বিজ্ঞানকে মৃত্যুদূত করে তুলছেন। তার অজস্র কল্যাণমুখিতার কথা তাদের প্রাণে কোন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে না। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছেন—এ কোন ধরনের মানব-কল্যাণ, মানব-বুদ্ধির অগম্য। বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় মানব-কল্যাণের এ কোন প্রতিচ্ছবি দেখছি আমরা? অথচ পাশাপাশি ধর্মের জগতে আমরা মানবপ্রেমের কি অনবন্ত নিদর্শনই না দেখি। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যাধির হাত হতে নিরীক্ষণের জন্য ঐশ্বর্য্য-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত রাজকুমার সন্ন্যাসের পথে পা বাড়ালেন। আর এই সেদিন গুণবতী ভার্য্যা, অক্লান্ত যশঃ, প্রেমময়ী জননী, পাণ্ডিত্যের আকর্ষণ-বলয়, চতুর্পাঠীর দূর বিস্তার সুখ্যাতির সর্ববিধ আকর্ষণকে উপেক্ষা করে এবং গুণমুগ্ধ অগণিত ভক্ত ও অনুরক্তের স্নেহের বন্ধনকে ছিন্ন করে আর এক মানববিগ্রহ রুদ্ধতার রুদ্ধরুদ্ধ পথের অভিযাত্রী হলেন, সেও ত' মানুষের মঙ্গলের জন্য। শুধু মঙ্গল নয়, মানুষকে মানুষ ভেবে আপন করে নেবার সাধনার মহামন্ত্রই তিনি দিয়ে গেলেন। তিনি মহাবদান্ত অমেয় প্রেমময় অলোক-সামান্য চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীমমহাপ্রভু। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বিদ্যা, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যের অভিমান ত্যাগ করে সকল মানুষকে কাছে নেবার চিরকালীন পথনির্দেশ রেখে গেছেন তিনি। সর্বধর্মের উচ্চকোটির ভাবনাতে মানুষকে আপন করে নেবার নির্দেশই দেয়। মত-পথ-সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি পরিহার করে বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা একমাত্র ধর্মের প্রবক্তারই মূখ্য অবদান। মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে, মানুষে মানুষে প্রীতির এবং সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন রচনা করতে প্রয়োজন ধর্মের।

বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষকে যখন ধর্মজগতের মানির দিকগুলোকেই বড় করে তুলে ধরতে দেখি, তখন বেদনায় অভিভূত হয়ে যাই। বিজ্ঞানই ত' বলে প্রত্যেক জিনিষের Dark side এবং Bright side আছে। সেখানে শুধু মাত্র নেতিবাচক দিকটির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে তা' নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ মতাদর্শ বলে পরিগণিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ যিনি বলেন,—নরওয়ের গীর্জাগুলি শিক্ষালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে, চিকিৎসালয়ে পর্যাবসিত হচ্ছে। রবিবারে গীর্জায় ধর্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য কেউ আর সেখানে যায় না, কাজেই পৃথিবীর মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ছেন। তখন তাঁকে সবিনয়ে বলা যায়,—ঠিক তারই পাশাপাশি সাম্রাজ্যের দেশ রাশিয়া ও চীনে ISKCON-এর কৃষ্ণ ভাবনামোলনের ক্রমবিস্তার কি ধর্ম-বিমুখতার পরিচয় বহন করে? আমেরিকার ধর্মীয় ছুলালেরা, সরস্বতীর বরপুত্রেরা কিদের আশায় চৈতন্য-সান্দোলনে সামিল হচ্ছেন? এ কি ধর্ম-বিমুখতা?

শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা,—

“পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

কোন মহাসত্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত বচন করে? পৃথিবীর ধর্মামোলনের খবর খাঁচা বিন্দুমাত্র রাখেন, তাঁদের পক্ষে আজকের ছুনিয়া ধর্ম-বিমুখ একথা বলা শোভা পায় না। জানি এর পরের কথা, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সেই মানুষই বলবেন,—ধর্মের নামে ও একটা নেশাগ্রস্ততা, একটা বাতিকের অভিযুক্তি মাত্র। সত্য বটে নেশা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নেশা কোথায় নেই? রাজনীতির আবর্তে পড়ে অমানুষিক কলঙ্কতা যিনি প্রসঙ্গবদনে বরণ করছেন, সেও ত রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করবারই এক উদগ্র নেশা। প্রতিভা ত' কথান্তরে নেশাই। প্রতিভাধর মানুষ মাত্রই ত' নেশাগ্রস্তের মত। আচরণে জীবনচর্যায় স্বাভাবিকতা সেখানে পরিলক্ষিত হয় কদাই। সত্যসঙ্ঘ গ্যালিলিও, বিজ্ঞানী ক্রনো, আর্কিমিডিস্, নিউটন সকলেই মানবকল্যাণের দূরতিশায়ী বাসনার নেশায় প্রলুব্ধ হয়ে জীবনপাত করেছেন। কেউ প্রাণ দিয়েছেন রাষ্ট্রশক্তির বিদ্রোহ-বহ্নিতে, কেউ প্রাণ দিয়েছেন শত্রুর উগত খড়্গতলে, কেউ গেছেন নির্কাসনে। নেশাগ্রস্ত না হলে সত্যসন্ধানের তথ্য মানবকল্যাণের পথ হতে তাঁরা সরে দাঁড়াতেন। মহামতি আলেকজান্ডারের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা, সেও আর এক নেশা। হিমালয়ের উত্তীর্ণ-শীর্ষে মানব পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার অভিলাষ—সেও এক দুঃসাহসিক নেশা।

চাঁদে পাড়ি দেওয়া—সেও কি নেশাগ্রস্ত মানুষের কাজ নয় ? সব মহৎ কাজ যদি নেশার ফলশ্রুতি হতে পারে, তবে ধর্মের জগতে মানুষের অহুসন্ধিৎসা, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াস কেবলমাত্র নেশা বলে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হবে কেন ?

এই প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিমত পর্যালোচনা করা যেতে পারে। যে কোন ধর্মবোধের সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মবোধ আছে, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই, এ হতেই পারে না। “ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজনের সৃষ্টি”—একথা বলেছেন ভারতের অগ্রতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জুল অব টপিক্যাল মেডিসিনের ইম্যারিটাস অধ্যাপক ডাঃ অমিয় বিকাশ চৌধুরী। অথচ ভাবতে বিশ্বয় লাগে তিনি যখন বলেন,—“শুধু মন্দিরে কেন, আমি গির্জায়ও যাই, যেখানে ঈশ্বরের মূর্তি না থাকলেও ঈশ্বরের কল্পনা আছে। কেন যাই জানেন ? যাই, কারণ ওসব জায়গায় মানুষ ভালো মন নিয়ে থাকে, অন্ততঃ মন ভালো করতে যায়। এইটাই আমার ভালো লাগে। মন্দির, মসজিদ, গির্জার পরিবেশে সকলেরই মন পবিত্র হয়। অলঙ্কারের জন্ত হলেও মনে শান্তি আসে, চিন্তা প্রশম হয়। তাই মন্দিরে গিয়ে মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম করতেও আমার দ্বিধা হয় না।”

একথা সত্য, আদিম মানুষ প্রকৃতির ভয়াবহতা, দুর্দমতা দেখে তাঁর উদ্দেশে তার হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। সেই মানুষের উত্তরস্বয়ী তার শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির নিরিখে ঈশ্বরের স্বরূপের সন্ধান পেয়েছে। যা’ আদিম মানুষের নিকট অনবজ্ঞাত ছিল, তা’ পরবর্তী মানুষের প্রজ্ঞায় এবং প্রত্যয়ে স্থষ্টি হয়েছে। তাই “ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি” অর্থ ঈশ্বরোপলব্ধি মানুষেরই অবদান। মনুষ্যের কোন প্রাণীর নয়। বিজ্ঞান বলে,—মানুষের অবগতির জন্ত কোন মহাসত্য অজানা থাকলে তাকে অস্বীকার করা দুর্ভাগ্য নামান্তর। কলহাসের আবিষ্কারের পূর্বে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না—একথা ইতিহাস বলে না। তাই বিজ্ঞানী মন্দির, মসজিদ, গির্জায় যাবেন—ঈশ্বরের (মূর্তির) উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করবেন, অথচ তাঁকে মানবেন না—এ উক্তি পরস্পরবিরোধী।

আর এক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ত’ পরিষ্কার বলেছেন,—“মানুষকে একদিন না একদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেই হবে। না হয়ে তার উপায় নেই।” বলাবাহুল্য তিনি নিজে ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ধর্মের প্রয়োজন এই উভয় বিজ্ঞানীই অকপটে স্বীকার করলেন। বক্তব্যের সমর্থনে আরও বিজ্ঞানীর মতবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

আমাদের প্রতীতি—শান্তি, চিন্তের প্রশ্রয়, পবিত্রতার জ্ঞান দেবালয়ের প্রয়োজন যদি স্বীকার করতে হয়, তবে সেই দেবালয়গুলির পরমাশ্রয় যা' সেই বস্তুবও প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের প্রয়োজন সেখানেই। বস্তুতঃ মানবিক স্রবুত্তিগুলির অহুশীলন এবং বিবর্ধন ধর্মের প্রশ্রয়েই সংসাধিত হতে পারে। অগ্নিজ্ঞ সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীকেও সকলের মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল যে মঙ্গলময় শ্রীভগবান্—তঁার আরাধনার আশ্রয় খুঁজতে হবে। ঈশ্বরকে সম্মুখে রেখে ধর্মবোধদ্বারা অনুপ্রাণিত হলে বিজ্ঞানী মানুষ মারার বিধ্বংসী অস্ত্র-নির্মাণে, ঔষধ বা গ্যাস প্রস্তুতিতে উত্তোষী না হয়ে সর্বমানবের মঙ্গলবিধায়ক প্রয়াসে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করবেন। তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানকে সমস্তরকম কলুষমুক্ত হয়ে মানবকল্যাণমুখী হতে হবে। অশুভশক্তির নারকীয় বিলাসের ক্ষেত্র ধর্ম বা বিজ্ঞান কোনটাই নয়। একথা জ্ঞতবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, তত দ্রুত পৃথিবী শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি এবং পারম্পরিক সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্যের অভয় নিকেতনে রূপান্তরিত হবে।

—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস,

আটুখিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

(১) ধর্ম ও আত্মকের জিজ্ঞাসা : স্বামী মোক্ষবানন্দ

(২) ধর্মকর্ম : যুগান্তর

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রণীত

জংক্রিয়াজার-দীপিকা

ও

সংস্কার-দীপিকা

['শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ'-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীগুরু-চরণে প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিবামন ।
জয় বাঙ্গাকল্পতরু, পতিতপাবন ॥
জয় জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-প্রেষ্ঠজন ।
জয় সর্বসিদ্ধিদাতা ভুবন-পাবন ॥
ভক্তবৎসল প্রভু সদা হাস্তময় ।
তব দর্শনে সবার চিত্ত পূত হয় ॥
পরজগৎ হইতে তুমি আসি' এ ভূতলে ।
আচার্য্য-রূপেতে বহু পাপী উদ্ধারিলে ॥
সর্বত্র বিদিত প্রভু আচার্য্য মহান্ ।
নাম-প্রেম দানি' কৈলে জীরের কল্যাণ ॥
সকল শাস্ত্র-বাণীর সামঞ্জস্য করি' ।
জানাইলে পরতত্ত্ব — গোলোকবিহারী ॥
তুমি কৃষ্ণ-নিজজন, নহ' ত' মানব ।
তব কৃপা বিনা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অসম্ভব ॥
'ন ভজনম্ অপেক্ষ্যতে' — বাণী 'অনুসারে ।
অন্য কোন ভজনাঙ্গের অপেক্ষা না করে ॥
শ্রীগুরু-সেবায় শীঘ্র সর্বসিদ্ধি হয় ।
জড় জগতের গন্ধ সেথা নাহি রয় ॥
গুরু-মনোহভীষ্ট সেবা ভজনের সার ।
মাগি তাই তব পদসেবা-অধিকার ॥
মোর হৃৎকাসনা যত করিয়া খণ্ডন ।
তোমার সেবায় মোরে কর আকর্ষণ ॥
এ শুভ বাসরে যাচি তোমার চরণে ।
নিত্য যেন তব কৃপা পাই ক্ষণে ক্ষণে ॥

শ্রীগুরুপূজা-বাসর

৮ নারায়ণ, ৫০৪ গৌরাঙ্গ

}

শ্রীগুরু সেবাভিলাষী—

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

সেই অখিলরসামুদ্রমুগ্ধ শ্রীভগবান্ একাধারে শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাংদল্য, মধুররসে আরাধিত হন। সাধক-সাধিকা স্ব-স্ব ভাব ও অধিকারানুসারে প্রেমময় ভগবানকে আরাধনা করেন এবং সাফাৎ সেবালাভে ধন্ত হন। ভগবানের নিত্যধাম রয়েছে। সেই ধাম—আমাদের নিত্যবাসস্থান আমরা বর্তমানে ভুলে গেছি। আমাদের নিত্যবসতিস্থলে ফিরে যাওয়াই আমাদের বুদ্ধিমত্তা।

সর্বাবতারী—ভগবান্, আর যত অবতারের কথা বলেছেন শাস্ত্রে সে-সব অবতারই ভগবানের অঙ্গীভূত। কৃষ্ণের অঙ্গীভূত সকল অবতার। সেই কথা শাস্ত্রে বলছেন,—

রামাদিমুর্তিবু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোদ্ভবনেষু কিস্ত্ ।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পূমান্ যো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

আমি সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজনা করি। কে তিনি?—সকলের উপরওয়ালা। সকলের উপরওয়ালা যিনি তাঁকে ভজনা করি। রাম, নৃসিংহ, বৃদ্ধ, কষ্টি, বামনাদি যত অবতার আছেন, সমস্ত অবতারের অঙ্গী তিনি, সেইজন্য তিনি অবতারী—Main Fountain Source। সুতরাং সেইভাবে তাঁকে বুঝতে হবে। ভগবান্ যে রূপ, As it is তাঁকে সেইভাবে বুঝব। তাঁর সঙ্ক্ষে কোন কষ্টকল্পনা করব না আমরা। ভগবান্ এই ছিলেন, ঐ ছিলেন, তা নয়। ভগবান্ যা ছিলেন, ঋষিগণ যেভাবে তাঁর স্বরূপ আমাদের বুঝিয়েছেন, তাঁদের Light-এ আমরা এটা বুঝবার চেষ্টা করব। আমাদের সীমিত বিচার-বুদ্ধি নিয়ে যখনই আমরা কিছু বুঝতে যাই, তখনই ভুল করে ফেলি। তখনই Misunderstanding—ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যায় ভগবান্ সঙ্ক্ষে। ভগবান্ তাঁর তত্ত্ব সঙ্ক্ষে শাস্ত্রে যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁকে বুঝতে হবে। সাফাৎ ভগবানের মুখের বাণী রয়েছে, পরোক্ষবাদ বেদ রয়েছে, সে-সব বিচার করে ভগবত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এটাই সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁদের নিজের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে যে বিচারটুকু করেছেন, সে-সব বিচার বহু আগেই আমাদের সনাতন শাস্ত্রে খণ্ডিত হয়েছে— প্রতিবাদ করা হয়ে আছে। তাঁরা যা কিছু করেছেন, করছেন বা করবেন, তার সবটাই শাস্ত্রে মীমাংসা দেওয়া আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করা উচিত। তখন আমরা দেখব অবতারী বা কে, অবতার বা কে, জীব কে, সাধক কে, সাধিকা কে বা ভক্তগণই বা কে? ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করতে হবে। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করবেন— এই কথা শাস্ত্র বলেছেন। দেখানে অন্য কোন উপায় নাই। ‘নাতঃ পরতরোপায়ঃ’—এছাড়া অন্য কোন গতি নাই, অন্য কোন পথ নাই। ভগবানকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তির দ্বারা পেতে হবে। ভগবানকে জানবার একমাত্র মাধ্যম হল ‘ভক্তি’। ভক্তির দ্বারা পরম প্রেমময় ভগবানকে জানতে পারা যায়। তাই গীতায় বলেছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি যাবানু যশচাশ্রি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং ভক্ততো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

ভাগবত বলেছেন,—

ভক্ত্যাহমেকমা গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।

ভক্তিঃ পুনাক্তি ময়িষ্ঠা স্বাপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥”—ভক্তির দ্বারাই সেই ভগবানকে জানতে পারা যায়। তাঁর তত্ত্বদর্শন দূরতিগম্য হলেও সেটা বুঝবার বিষয় হয়। ভক্তি মহাদেবী ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। সুতরাং ভক্তির মহিমাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, ভক্তির মহিমাই সর্বত্র বিঘোষিত রয়েছে। ‘ভক্ত্যা তুষ্ণতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তি-প্রিয়ো মাধবঃ ॥’—ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তির বশ। ভক্তি ছাড়া চলবে না। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—ভক্তির যে Step-গুলি পর পর ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে, এর প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আলোচনা করবার সময় আমরা ভুল করে ফেলি অনেকে। কেহ বা নিজেকে কর্মী, কেহ বা জ্ঞানী, কেহ বা যোগী, কেহ বা ভক্ত বলে দাবী করি। বাস্তব ক্ষেত্রে ভক্তি ছাড়া কর্ম নিফল, ভক্তি ছাড়া জ্ঞান নিফল, ভক্তি ছাড়া যোগ নিফল। মেকথা ত’ কথ ভাগবতে নিজস্বথেই বলেছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥

আমার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবৃত্ত যে ভক্তি, তার দ্বারা আমি যেমন বশীভূত হই, নির্বিশেষ চিন্তাদ্বারা—নির্বিশেষ কৰ্ম্ম, জ্ঞান, বোগাদির দ্বারা (তেমন) বশীভূত হই না। ভগবান্ একথা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছেন।

আপনারা সবাই গীতা আলোচনা করেন, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় হল কৰ্ম্মযোগ। কৰ্ম্মযোগ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কৃষ্ণ কি বলতে চাচ্ছেন? দুটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন কৰ্ম্মতত্ত্বটাকে বুঝাবার জন্য। সেখানে বললেন,— তপশ্চিত্তোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ।

কশ্চিত্ত্যাসাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন।

হে অর্জুন! তুমি সেই যোগী হও—কৰ্ম্মীর থেকে যে যোগী শ্রেষ্ঠ; হে অর্জুন, তুমি সেই যোগী হও—জ্ঞানীর থেকে যে যোগী শ্রেষ্ঠ; হে অর্জুন, তুমি সেই যোগী হও—অষ্টাদ যোগীর থেকে যে যোগী শ্রেষ্ঠ। তাহলে কোন্টা বাকী থাকে? কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগ তিনটে বলা হয়েছে। এর থেকে যেটা শ্রেষ্ঠ যোগ, সেই যোগ আশ্রয় কর। যদি বলেন, আমি কিছু কষ্ট কল্পনায় মানে করছি, তাহলে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের পরবর্তী শেষ শ্লোকে আসুন,—

যোগিনামপি সর্বেষাং মঙ্গতেনাস্তরাশ্রয়ন।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

‘শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং’—যিনি আমাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, ভক্তিপূর্ব্বক লাধনা করেন, তিনি হলেন উত্তম যোগী, শ্রেষ্ঠ যোগী। এর মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। সুতরাং সবিশেষভাবে বাস্তবক্ষেত্রে কৰ্ম্মই জ্ঞান, জ্ঞানই যোগ এবং যোগই ভক্তি। ঠিক সেইকথাই ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে পর পর। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন। কৰ্ম্ম যখন আমার নিজের জন্য হয়, ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় হয় না, তখন সেই কৰ্ম্মই বন্ধনের কারণ। কৰ্ম্ম যখন ভগবৎপ্রীতির জন্য হয়, তখন সেই কৰ্ম্মই মুক্তির কারণ। গীতায় বলছেন,— ‘যজ্ঞার্থং কৰ্ম্মণোহন্তত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ।’—ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় তুমি কৰ্ম্ম আচরণ কর সংসারে। ভগবান্ তুমি খুশী হও, এইজন্ত সংসারে থেকে আমাদের কৰ্ম্মাচরণ করতে হবে। একবিচারে আমরা সবাই সংসারী।

পূর্ব্ববর্তী একজন বক্তৃমহোদয় বলেছেন—‘মিথুনীচারণাং নৃণাম্’। আমি সেই কথাটা তুলে ধরছি। মিথুনীচারী কাকে বললেন? গৃহস্থ—তঁারা ছেলেপুলে, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সংসার করছেন। মিথুনীচারীর একটা বাস্তব ধারণা আমাদের থাকা প্রয়োজন আছে। এ দৃষ্টান্তে যদি কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে আমরা কি করে জিনিষটা বুঝব? এগোব কি করে যদি

দিকান্ত না বুঝি, তব্দর্শনটা যদি আমাদের না জানা থাকে । Axiomatic Truth যদি আমাদের না জানা থাকে, Formula—সূত্র যদি আমাদের না মুখস্থ থাকে, তাহলে কি করে আমরা অঙ্কটা কষব? Formula ত' আগে জানতে হচ্ছে । সেইজন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নির্দেশ আছে,—‘দিকান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অঙ্গস।’ এই দিকান্ত, তব্দর্শন যাকে বলা হয়েছে, তাকে বলে Axiomatic Truth । গুটার প্রয়োজন আছে । আমাদের জানতে, বুঝতে, শিখতে হবে । সনাতন ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য আগে বুঝতে হবে । তার সূত্রগুলো, Theory-গুলো আগে জেনে নিতে হবে, শিখতে হবে । তবেই বুঝতে পারা যাবে কে অবতার, কে কৃষ্ণ, কে অবতারী, কে মায়া, কি জগৎ—এ সব সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে । তারপর গুরু-কৃপাবলে সাধন করতে করতে ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁর সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা পরবর্তিকালে আসবে, আগে নয় । তখন যে জ্ঞান, সেটা হল শিষ্ট ‘জ্ঞান’—বাস্তব জ্ঞান । সেই জ্ঞানকে ঋষিগণ বলেছেন ‘বিজ্ঞান’ ।

তব্ধবস্ত সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান—সাক্ষাৎ দর্শন যখন, তখন তাকে ‘বিজ্ঞান’ বলে অভিহিত করেছেন । তাই গীতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে,—“জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।” কৃষ্ণ বলছেন—আমি বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান-তত্ত্ব তোমাকে বলছি, তুমি শোন । ‘বিজ্ঞানসহ’ মানে একটা জ্ঞান আমি জানি, বুঝলাম Theory, কিন্তু তাতে প্রবেশ নাই আমার । মুখস্থ করেছি মাত্র । কিন্তু যখন তার ভিতরে প্রবেশ হচ্ছে, যখন সেটা Theoretical থেকে Practical-এ আসছে, তখন তাকে বলা হচ্ছে ‘বিজ্ঞান’ । ঋষিগণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন । জ্ঞান যখন Practical একজন্মের জীবনে, তখন তাকে ‘বিজ্ঞান’-শব্দে অভিহিত করা হয়েছে । সুতরাং আমাদের এ সমস্ত বিচারগুলি শিখতে হবে, জানতে হবে । (ক্রেমাংশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯ম	৩৪৪	২৬	অস্বীকার	স্বীকার
১০ম	৩৭১	২১	স্বয়ী	স্বীয়
”	৩৭৫	৩৩	‘ব্যাসদেব’	‘বাসুদেব’
”	৩২৪	৬	গঙ্গীগর্ভে	পদ্মীগর্ভে

শ্রীগুরুদেবোনিবেদন

কালের কুটিল চক্রে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
 অবশেষে । পুঁজুছিল এসে তব দেশে
 দীনবেশে । বিচারিতে তোমা, মন্দমতি
 আমি বাঁধা পড়ে গেছু—তব কৃপাডোরে—
 মায়াডোরো পরে ; জানি পরম আদরে
 পিতৃবক্ষে পলায়িত শ্রান্ত পুত্র যেন
 হয় ! নারিল কাঁদিতে, অতি অভিমানে ।
 দাও গো সাস্থনা তারে, শোধন করিয়া ॥
 অভিমান নাহি সাজে বড় পাতকীরে—
 নাহি শোভে দাবী ; কিবা গরবে গরবী
 হইবে বুনো করবী । যদি কোন দেব
 লয় পূজা, কৃপাসিন্ধু জানি' তারে নমি
 দূর হতে । তাই বলি,—শূন্য করি মনে
 পদধূলি কর, তব বীরভদ্রে ছলে ॥

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী (দশধরা)

শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
 শ্রীমন্তকিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের একোনদশতিতম শুভাবির্ভাব-তিথি
 উপলক্ষে আসাম-প্রদেশস্থ ধুবড়ী-জেলার বিজাপাড়া কলেজ যোডনিবাসী
 শ্রীকিশোরকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীকিশোরীমোহন পাল চৌধুরী) প্রভুর
 বান্ধবনে বিরাট ব্যাসপূজা মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল । উক্ত
 অশুষ্ঠানে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ হইতে ত্রিদণ্ডিষ্মামী
 শ্রীমন্তকিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, আসাম-প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ
 হইতে ত্রিদণ্ডিষ্মামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত বৈকব মহারাজ, শ্রীবাহুদেব গৌড়ীয় মঠ

হইতে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ এবং শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্বদিবসে অর্থাৎ ২১২১২০ তারিখে উপস্থিত হন।

শ্রীবাসপূজার পূর্বদিবসে শ্রীল গুরু-মহারাজ যখন ধুবড়ীতে পদার্পণ করেন তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নান্দর অভ্যর্থনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ অবিবাস কীর্তনের দ্বারা ব্যাসপূজার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩২৭, ইং ১০ই ডিসেম্বর সোমবার কৃষ্ণ-মবমী-তিথিতে অর্থাৎ শ্রীগুরুপূজা-দিবসে সকাল ৭টায় এক বর্ণাঢ্য নগর-সংকীর্ণনের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত নগর-পরিক্রমায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও ধুবড়ী সহরের বহু নর-নারী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধুবড়ীবাসিগণের মতে এই ধরনের নগর-সংকীর্ণন-শোভাযাত্রা ধুবড়ী-সহরে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। স্থানীয় সরকারী প্রশাসন বিভাগ উক্ত নগর-পরিক্রমায় যথায়ীতি সাহায্য করায় আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নগর-পরিক্রমার পর শ্রীব্রহ্ম-মাদব-গোড়ীয়-সম্প্রদায়িক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিনিবাস্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংগৃহীত, শ্রীল সক্তিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কর্তৃক সংশোধিত ও সারস্বত গোড়ীয় সম্প্রদায়মোদিত ‘শ্রীশ্রীবাসপূজা-পদ্ধতিঃ’-মহন্যারে শ্রীগুরুবর্গের অর্চনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীগুরুপূজা সম্পাদন করেন। শ্রীগুরুপূজান্তে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শ্রদ্ধালু নর-নারীগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি অন্তে শ্রীবিগ্রহের মধ্যাক্ষ-ভোগ ও আরতি সম্পন্ন হয়। তৎপরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আহুত, অনাহুত, ববাহুত প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীবাসপূজা উপলক্ষে আয়োজিত মহতী ধর্মসভায় প্রধান-অতিথি শ্রীবেণীজনাথ বরা (D. C., ধুবড়ী-জেলা), শ্রীরামপ্রদত্ত ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত সংস্কৃত অধ্যাপক, ধুবড়ী কলেজ), ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীমুকুণ্ডবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃতা “শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীবাসপূজা” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজ

তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় মাননীয় প্রধান-অতিথি-প্রদত্ত ভাষণের (শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মহাপুরুষের তথাকথিত মতবাদ সম্বলিত) প্রতিবাদ করেন এবং শ্রীরামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের চিন্তাকে ধূলিস্তাৎ করিয়া সকল ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয় অসম্ভব তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট করেন। একমাত্র সনাতন ধর্মেই যে সমন্বয় সাধিত হইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

পরবর্ত্তিদিবসে অর্থাৎ ১১/১২/২০ তারিখের ধর্মসভায় শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারীর বক্তৃতার পর শ্রীল গুরু-মহারাজ গত দিনের প্রতিবাদিত বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত ভাষণ দান করেন। উক্ত কুসিদ্ধান্ত-মিরাসপার তুলনামূলক আলোচনা প্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

শ্রীকিশোরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীরামবিহারী দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীরমেশ চন্দ্র দে, জলপাইগুড়ি) এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দের শ্রীগুরুপূজার প্রচেষ্টাও যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

বাদলা গ্রামে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

বর্ত্তমান জেলাস্তর্গত বাদলা-গ্রামে শ্রীপাদ ভজনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর গৃহে গত ২৩শে অগ্রহায়ণ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাধিষ্ঠাব-তিথিপূজা-মহোৎসব শ্রীপাদ সব্যাসাচী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শুকদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জিলোচন দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আহূত এক মহতী ধর্মসভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক প্রপূজ্যপাদ শ্রীমন্তজিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা-হিসাবে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় প্রধান-অতিথি বক্তৃতা শেষে তাঁহার স্ব-রচিত কবিতাধর্ম পাঠ করেন। বহু ভক্ত ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে সভাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বলাবাহুল্য এই শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সমিতির মূলকেন্দ্র ও সমস্ত শাখামঠ-সমূহেও মহাসমারোহে অহুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

। শ্রীশ্রীগৌরান্দো জয়তঃ ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন : ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পো: নবদ্বীপ ;

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১২ই ফাল্গুন, ১৩২৭ (ইং ২১/২/২১) সোমবার হইতে ১৬ই ফাল্গুন, '২৭ (ইং ১/৩/২১) শুক্রবার পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হইবে। এই মহদুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ শুভাঙ্গনমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান সাহায্যকীর্তন ও নগরসকীর্তন-মুখে ঘোষণাক্রমে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুভতত্ত্বাচরণে স্বাক্ষরে যোগদান করিলে সমিতির সমস্তবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদুষ্ঠানের শুক্ল উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাস্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলে তত্ত্বানুগী স্বকৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রস্তুত হইল। ইতি—২২শে পৌষ, ১৩২৭

শুভভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সত্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির “সাধারণ-সম্পাদক”-এর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।২১), সোমবার ;—(১) শ্রীগৌরমদ্বীপ (কীর্তনাত্ম্য)—গঙ্গাপ্রাণান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, স্বরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, স্ববর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্বরণাত্ম্য)—মাজিরা, হাটভাদ্রা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬।২।২১), মঙ্গলবার ;—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদ-সেবনাত্ম্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমদ, কোলের গজ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চনাত্ম্য)—রাতুপুর । (৫) শ্রীঋতুদ্বীপ (বন্দনাত্ম্য)—জামগর (জহুমনিহান), বিদ্যানগর (সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) শ্রীমোক্ষদ্বীপ (দাস্যাত্ম্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একভালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৩। ১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।২১), বুধবার ;—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাত্ম্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইত্রাকপুর ও গঞ্জের ভাদ্রা ; এবং (৮) শ্রীদীক্ষাদ্বীপ (শ্রবণাত্ম্য)—শিমুলিয়া, শরভাঙ্গা, শোণভাঙ্গা মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রোঢ়া-মায়াস্থান) । (৯) শ্রীশ্রীদ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাত্ম্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-ছদ্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅবৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচৈতন্য শেখর আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন ।

৪। ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।২১), বৃহস্পতিবার ;—শ্রীগৌরজন্মোৎসব ।

৫। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।২১), শুক্রবার ;—সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।

জ্ঞাতব্য :—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছ যাত্রিগণ হাঙ্গা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ১১ই ফাল্গুন (ইং ২৪।২।২১) রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন । এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না । পরিক্রমা ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।২১), সোমবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে ।



সেই ধর্ম গ্রেত বাতে অঙ্গ-পদসহ

অধোক্ষজে অহৈতুক্য ভক্তি বিহীনতা ।

অন্ত ধর্ম সূচরূপে পালে ঘেই জন ।

হবি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

৭ বর্ষ	১৪ গোবিন্দ, অনিচ্ছক, ৫০৪ শ্রীগোবিন্দ ৩০ মাদ, বুধবার, ১৩২৭, ইং ১৩৭২১১	১২৭ সংখ্যা
--------	---	------------

দাক্ষ্যবাদঃ

শ্রীচতুর্নুখ-ব্রহ্মকৃতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বল্লভাঙ্ক-সংবাদে
 ব্রহ্মস্তুতো নবমেহধ্যায়ঃ]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

৩৮। তস্মাৎ ক্রমস্ব গোবিন্দ প্রসীদ ত্বং মমোপরি ।

অগণধ্যাপরাধং মে স্তুতোপরি পিতা যথা ॥ ৩৮ ॥

প্রভো! আমাকে ক্রমা করুন। হে গোবিন্দ! পিতা যেমন পুত্রের
 অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া
 আমার উপর প্রদত্ত হউন ॥ ৩৮ ॥

৩৯-৪০। ভদ্রভক্তা রতা জ্ঞানে তেষাং ক্লেশো বিশিখ্যতে ।

পরিশ্রমাৎ কর্ককাণাং যথা ক্ষেত্রে তুযার্থিনাম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্তস্তিতাবে নিরতা বহুবস্তুদগতিং গতাঃ ।

যোগিনো মুনশ্চৈব তথা যে ব্রহ্মবাসিনঃ ।

দ্বিধা রতির্ভবেদ্বরা ক্রান্তাচ্চ দর্শনাচ্চ বা ॥ ৪০ ॥

যাহারা আপনার অভক্ত হইয়া জ্ঞানে রত, পরিশ্রমপূর্ব্বক ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া তুষলাভকারীর ন্যায় তাহাদের ক্রেশ হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ আপনাকেই প্রাপ্ত হন । গোপী, মুনি ও ব্রহ্মবাদি-গণের মধ্যেও জ্ঞানে ও দর্শনে দ্বিধারতি দৃষ্ট হয় ॥ ৩৯-৪০ ॥

৪১-৪২ । অহো হরে তু মায়ায়া বভূব নৈব মে রতিঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যাভ্রাশ্রমুখো ভূত্বা নত্বা তৎপাদপঙ্কজৌ ।

পুনরাহ বিধিঃ কৃষ্ণং ভক্ত্যা নর্ব্বাং ক্ষমাপয়ন্ ॥ ৪২ ॥

অহো ! হরির মায়ায় ভগবানের প্রতি আমার রতি হইল না !—ব্রজা এইরূপ বলিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে তাহার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক নর্বাংক্ষমাপয় ক্ষমার জন্য পুনরায় কৃষ্ণকে ভক্তিভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

৪৩ । ঘোষেষু বাসিনামেবাং ভূত্বাহং তৎপদাশুজন্ম ।

যদা ভজ্যেয়ং স্মৃতিস্তদা ভূয়ার চান্যথা ॥ ৪৩ ॥

আমি গোপকুলে জন্ম লইয়া যেন আপনার পাদপদ্ম ভজনা করত স্মৃতি লাভ করিতে পারি, ইহার যেন অন্যথা না হয় ॥ ৪৩ ॥

৪৪ । বয়ন্তু গোপদোহেষু সংস্থিতাশ্চ শিবাদয়ঃ ।

নকুং কৃষ্ণন্তু পশ্যন্তুস্তস্মাদ্ভ্রাতৃশ্চ ভারতে ॥ ৪৪ ॥

আমরা ব্রজা, শিবাদি দেবভাগব গোপরূপে যখন ভারতে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একবার কৃষ্ণদর্শন করিয়াছি, তখন বহু ॥ ৪৪ ॥

৪৫ । অহো ভাগ্যন্তু শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিত্রোস্তব প্রভো ।

তথা চ গোপ-গোপীনাং পূর্ব্বন্তং দৃষ্ট্বাসে ব্রজে ॥ ৪৫ ॥

হে কৃষ্ণ ! আপনার মাতাপিতা এবং গোপ-গোপীগণেরও কি সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ব্রজপুরে আপনার পূর্ব্বরূপ দর্শন করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

৪৬ । মুক্তাহারঃ নর্ব্ববিশ্বোপকারঃ

নর্ব্বাধারঃ পাতু মাং বিশ্বকারঃ ।

লীলাগারঃ সুরিকণ্ঠা-বিহারঃ

ক্রীড়াপারঃ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারঃ ॥ ৪৬ ॥

সর্ববিশ্বোপকার মূক্তাহার বিখ্যাকার সর্বাধার লীলাগার দেবকন্ডা-বিহার
কীড়াপার কৃষ্ণচন্দ্রাবতার আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৬ ॥

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ-বৃষ্ণিকুল-পুঙ্কর নন্দপুত্র

রাধাপতে মদনমোহন দেবদেব ।

সম্মোহিতং ব্রজপতে ভূবি তেহজয়া মাং

গোবিন্দ গোকুলপতে পরিপাহি পাহি ॥ ৪৭ ॥

বৃষ্ণিকুলের কমলস্বরূপ নন্দনন্দন রাধাপতি দেবদেব মদনমোহন ব্রজপতি
গোকুলপতি গোবিন্দ মায়া-মোহাপন্ন আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ॥ ৪৭ ॥

৪৮। করোতি যঃ কৃষ্ণ হরেঃ প্রদক্ষিণাং

ভবেজ্জগত্তীর্থকলঞ্চ তস্য তু ।

তে কৃষ্ণ লোকং সুখদং পরাংপরং

গোলোকলোকং শ্রবণং গমিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সর্বজগতের তীর্থফললাভ হয় ।
তিনি সুখদ পরাংপর লোকপ্রবর পরম গোলোকধামে গমন করেন ॥ ৪৮ ॥

[লোকেশ ব্রহ্মা এইরূপে সুন্দর বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়া
প্রগতিপূর্বক বারত্ৰয় প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া
বৎস ও বৎসপালগণকে প্রত্যাগমনপূর্বক পুনরায় প্রণামপূর্বক নিজলোকে গমন
করিলেন ।]

মাৎসর্য্য

‘মাৎসর্য্য’-শব্দের অর্থ ও নির্মাৎসর্য্য প্রেমধর্ম্মের অধিকারী নির্ণয়

‘মাৎসর্য্য’-শব্দটী অনেকস্থানে অনেক অর্থ সংযুক্ত হয় । পরশুভ-ষেব,
পরশ্রীকান্তরতা, অশ্বয়া ও ঈষা ইত্যাদি নামা অর্থ পাওয়া যায় । বৈষ্ণব-শাস্ত্রে
যে যে-স্থলে মাৎসর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্বত্রই তদ্বারা প্রেমের প্রতিবন্ধী
ভাবে বৃদ্ধিতে হয় । “ধর্ম্মঃ প্রোজ্জিহ-কৈতবোহত্র পরম-নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্”
—এই ভাগবত-বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরম ধর্ম্মের অধিকারী নিরূপিত
হইয়াছে । প্রেম-রসই ঐ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পরম ধর্ম্ম । যিনি নির্ম্মৎসর, তিনি

ঐ ধর্মের অধিকারী। মাৎসর্যশূন্যতার নাম নির্মৎসরতা। যদিও টীকাংকার মহোদয় পরের স্থখে দুঃখী ও পর দুঃখে সুখী হওয়াকে মৎসরতা বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, তথাপি উক্ত শব্দের বিস্তীর্ণরূপ অর্থ প্রকাশ না করিলে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ এবং তাঁহাদের পরম্পর উৎপত্তির কারণ

অবিকারূপ জীব ষড়্‌বর্গ-রূপ বজ্জ্বারা জড় আবদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—ছয়টিকে ষড়্‌বর্গ বলে। ইহারা অবিতা, অগ্নিতা, অতিনিবেশ, রাগ ও ঘেমনরূপ পঞ্চ ক্রেশের অবস্থান্তর। জড়বস্তুর অতিনিবেশ হইতে কামের উৎপত্তি। কাম সহজে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কথিত হইয়াছে,—

ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রাণশ্চতি ॥ (গী: ২।৬২-৬৩)

বিষয়াতিনিবেশ-রূপ মদ হইতে কাম উৎপত্তি হয়। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সন্মোহ অর্থাৎ অন্তায়রূপে বিষয় লোভ, বিষয় লোভ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম অর্থাৎ মোহ, মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মদ, মদ হইতে বিনাশ অর্থাৎ জীবের স্বরূপ-বিকৃতিরূপ মাৎসর্য হয়।

রিপু-দমনের উপায়

উপদেশ-স্থলে কথিত হইয়াছে ;—

এবং বুদ্ধে: পরং বুদ্ধা সংতত্যান্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো। কামরূপং তুরাসদম্ ॥ (গী: ৩।৪৩)

বুদ্ধির অতীত যে চিন্তন জীব, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়াত্মিক সিদ্ধান্তদ্বারা মনকে বশীভূত করত তুচ্ছ কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

অন্য সমস্ত রিপুই মাৎসর্যের অন্তর্গত

এই সমস্ত উপদেশদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইতে কামরূপ অস্তুর ক্রমশ: মাৎসর্যরূপ বুদ্ধাকারে পরিণত হইয়া ‘জৈবধর্ম’ যে প্রেম, তাহাকে সুদ্রবন্তী করিয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটাই মাৎসর্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধে কাম আছে। লোভে ক্রোধ ও কাম আছে। মোহতে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মাৎসর্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।

মদ শব্দে ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিজ্ঞামদ প্রভৃতি ছয়প্রকার মদই বুঝিতে হইবে।

যাবজ্জীবন ক্রেতাই মাৎসর্যের অন্তর্গত ও 'জীবে দয়া'—

হীন ব্যক্তি মাৎসর্যপর

জীবের সমস্ত ক্রেতাই মাৎসর্যের অন্তর্গত। অবিজ্ঞা, পাপবাসনা ও পাপ, তথা অবিজ্ঞা, পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সমস্তই মাৎসর্যের অন্তর্গত। 'জীবে দয়া', 'নামে রুচি', 'বৈষ্ণবসেবা'-রূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য একদিকে অবস্থিতি করে। যিনি পরস্মুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না। ভগবানের প্রতিও তাঁহার দয়সত্তাব উদয় হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিঃসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে।

মাৎসর্যশূন্য ব্যক্তিই 'তৃণাদপি' শ্লোকের তাৎপর্য গ্রহণে সমর্থ যিনি মাৎসর্যশূন্য, তিনিই তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু বলিয়াছেন;—

তৃণাদপি জ্ঞানীচেন তবোবপি নহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তমীয়ঃ সদা হরিঃ। (শিকাষ্টক—৩)

মাৎসর্যশূন্য ব্যক্তির ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিজ্ঞামদ ও জড়ীয় বস-মদ থাকে না; অতএব তিনি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। মাৎসর্যশূন্য ব্যক্তির ক্ষোধ, তীব্রতা ও পরহিংসা থাকে না। অতএব তিনি বুদ্ধ হইতেও সঙ্ক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরম দয়ালু। জাতি-বিজ্ঞা মদাদি-রহিত নির্মৎসর পুরুষ সমস্ত গুণসম্পন্ন হইলেও প্রতিষ্টাশা-শূন্য, অতএব তিনি অমানী। নির্মৎসর পুরুষ পর-স্মুখে সুখী ও পর-দুঃখে দুঃখী; অতএব সর্বজীবে তিনি যথাযোগ্য মান বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দয়া দ্বারা সর্বজীবে সম্মান, সম্মানের দ্বারা ভ্রাতৃত্ব ও বৈষ্ণবপ্রায়-ভক্তজীবে ভ্রাতৃত্ব ও চরণ পূজাদ্বারা বৈষ্ণব সেবা বিধান করেন।

নির্মৎসর পুরুষের ১০টী লক্ষণ

- ১। নির্মৎসর পুরুষ স্বভাবতঃ সাধুনিন্দা করেন না।
- ২। কঠোরাস্তিক বৃদ্ধিসহকারে অন্তর্দেবে পৃথগীশ্বর জ্ঞানশূন্য হইয়াও ভক্তদেবের প্রতি অবজ্ঞা করেন না।
- ৩। গুরুজনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করেন।
- ৪। শ্রুত্যাদি ভক্তি-শাস্ত্রের সম্মান করেন।

৫। বুধা তর্ক পরিত্যাগপূর্বক নাম ও নামীয় একত্ব বিশ্বাসে নামকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন।

৬। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি করেন না।

৭। ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ প্রভৃতি অল্প শুভ-কর্মকে নামের তুলা শুভ মনে করেন না।

৮। অদ্বৈতশূন্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার যত্ন করেন কিন্তু যতদিন শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহাকে নামোপদেশ করেন না।

৯। নাম-মাহাত্ম্য যাহা কিছু শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

১০। জড় সযস্বে অহংতা-মমতা-শূন্য থাকেন।

হে পাঠকবর্গ! নিম্নলিখিতসবটাই জীবের নৃষ্টি এবং মাৎস্য্যই জীবের বন্ধন।

অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

চৈতন্য-চরিত শুভ শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।

মাৎস্য্য ছাড়িয়া, মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।৩৬১)

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বর্ষ-পরীক্ষা

শাস্ত্র বলেন, নম্বর রাগ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রতীতিতে নিরন্তরুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎপার্বদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ-বাদিদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহবাদিগণ নিজে প্রত্যক্ষ ও অহুমানাদিকে মঞ্চ করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যেকালে অক্ষয়-জ্ঞানবাদী অধোক্ষয় বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা হয়। ইহারই নামান্তর 'কর্মবাদ'; ভগবদ্ভক্তিধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্তু, চিদ বস্তু, ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্মফল-ভোগী কর্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের স্বযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত

কর্মবাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অঙ্কুলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য এক বর্ষকাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে এক বর্ষকাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত অক্ষম শিষ্য তাহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি-প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরন্তরকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্ত, শিষ্যকে পাইবার জন্ত এক বৎসরকাল কর্মবাদীর দ্বায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবাপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজ্ঞানদৃষ্ট কর্মবাদীর দ্বায় তাহাদের পথ অন্ধসরণ করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রাপ্তে উপনীত হন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্বে হইতেই ভক্তি-বৃত্তি—যাহা আত্মার নিত্যবৃত্তি—দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য ফলভোগময়ী চেষ্টার অন্ততম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাহারই অক্ষজ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন। শিষ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্ততম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গক্রমে ক্ষীণতাল্লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্তে ক্রমশঃ নিরন্তরকুহক-সত্য নয়নে দেখিবার সুযোগ পান। চিকিৎসকের অধীনে যে-সময় রোগী আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকাকালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যেখানে জীব কর্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সেখানে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরন্তরকুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি প্রদীক্ষিত হন, তখন শিষ্যক্রম জীব তাহার এক বৎসরকাল সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ

ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যক্রম ধর্ম শিষ্যে পরিণত হইবে। আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহবাদীকে তাহার মঙ্গলাভ কয়াইবার সুযোগ দিয়া থাকেন।

গাছেব তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না, মেরুপ শিষ্যক্রম গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। যেকালে শিষ্যক্রম আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্য-ক্রমত্ব হইতে পতন হইয়া অতিবাড়ি নামে উপনন্দ্রায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহাকেই ধর্ম নামে চালাইতে থাকেন। যদি কোন গুরুক্রম অক্ষজ-কর্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরুক্রমত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যক্রমের মঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আর গুরুক্রমত্বে স্থাপিত করিবেন না। তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্বেই বর্ষকাল পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরন্তরুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেও অতরু শিষ্যক্রমের একপ আচরণ ভক্তির অমূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীরাধারাগীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তুলসী-প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বয়

মেদিনীপুর নহরস্ব মাণিকপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র সীতারা মহাশয় সহস্রর প্রার্থনা করিয়া পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছেন।

প্রথম প্রশ্ন :—শ্রীরাধারাগীর শ্রীপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করা যায় কি না? যদি না যায়, তবে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি এবং যাহারা দিয়া থাকেন, তাহাদের অপরাধ হয় কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন :—শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় কি না ? অনেক জাতি-গোস্থামী নিজদিগকে ভগবানের স্বরূপ অভিযানে নিজপদে শিষ্টকর্তৃক প্রদত্ত তুলসী গ্রহণ করেন। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে শ্রীঅজিত গোস্থামী এবং শ্রীশ্রীমিত্যানন্দ প্রভু শ্রীপাটের গোস্থামী প্রভুগণ ঐরূপ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ের স্মৃতিমাংসা হইলে জগতের অনেক উপকার ও মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে তুলসী-দান সম্বন্ধে

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী। শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীও সকল শক্তিতত্ত্বের অংশিনী। সখীগণ তাঁহার কার্যবাহুস্বরূপ ; অতএব তাঁহার অভিয়া। তুলসী দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর আত্মগতো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন।

শ্রীঅনন্তসংহিতা গ্রন্থে এবিষয়ের এইরূপ যুক্তি দেখা যায়,—

পূর্ণাশক্তি-স্বরূপা চ শ্রীমতীবার্ষভানবী ।

বৈভবরূপিণী তস্মা বৃন্দাদেবী প্রকীৰ্ত্তিতা ।

নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম্ ।

অন্যোক্তমেব বিশিষ্টভাবস্তয়োবস্থিতঃ ॥

দত্বাৎ শ্রীতুলসীং ওম্মাৎ শ্রীদেব্য্যাঃ করপল্লবে ।

শুদ্ধো হি বৈষ্ণবো নিত্যং পাদয়োৰ্ন কথঞ্চন্ ।

মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্ত ভবেস্তাপরাধবান্ ॥

অর্থাৎ শ্রীমতী বার্ষভানবী স্বয়ং পূর্ণাশক্তিস্বরূপা। শ্রীতুলসীদেবী তাঁহারই বৈভবরূপিণী। তাঁহারা বিশিষ্টভাবে অবস্থিতা। তিনি নিত্যই শ্রীমতীর সেবা করেন। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসীদেবীকে শ্রীমতীর শ্রীকরপল্লবে অর্পণ করিয়া থাকেন। কারণ এক শক্তিকে অন্য শক্তির শ্রীচরণে অর্পণ করা যায় না। মোহবশতঃ কেহ ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিলে অপরাধী হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী-দান সম্বন্ধে

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

শ্রীমমিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ অথবা শ্রীগদাধরাদি শক্তিতত্ত্বের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া হয় না। শ্রীগুরুদেবও গৌরশক্তিতত্ত্ব। যদিও তাঁহাকে ভগবদভিন্ন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেবা-ভগবান্। সেবককে সেব্যের সহিত সমবিচারে গণনা করা অপরাধজনক।

এ বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত এই—গুরুভক্ত্যন্তেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্ত চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টং ভৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে । যথা—

বয়স্ত সাক্ষাদভগবান্ ভবস্ত প্রিয়স্ত সখ্যঃ ক্ষণসঙ্গমেন ।

সুহৃদিকিংস্ত ভবস্ত মৃত্যোর্ভিষকৃতম্ আত্ম গতিং গতাঃ স্ব ॥ (ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

কোন কোন গুরুভক্ত শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন । যথা—হে ভগবন্ । আমরা আপনার প্রিয়সখা, সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবের ক্ষণকাল সঙ্গ-প্রভাবেই অল্প দুশিকিংস্ত ভব এবং মৃত্যুরূপ রোগের ভিষকৃতম-স্বরূপ আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি । যিনি আপনার প্রিয়সখা, সেই ভবের (মহাদেবের), দুশিকিংস্ত অর্থাৎ নিতান্ত অচিকিংস্ত, ভব (জন্ম) এবং মৃত্যুর ভিষকৃতম্ (সদ্বৈতস্বরূপ) আপনাকে গতি অর্থাৎ শরণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি । শ্রীশিবই এই বক্তৃগণের গুরু । (শ্রীভগবানের প্রতি প্রেচোগণের উক্তি) । শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদের অনুসরণে গাহিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্বিন্দেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সঙ্গিঃ ।

কিস্ত প্রভোঃ প্রিয় এব তস্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ (গুরুষ্টক—৭)

সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরিরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং নাধুগণও তজ্জপ ভাবনা করিয়া থাকেন । কিন্তু বাস্তব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয় । তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে আমি প্রণাম করি ।

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ-সম্বন্ধে শ্রীমনস্ত-সংহিতায় সিদ্ধান্ত এই—

তুলস্তা বিবদ্যং তবং বিষ্ণুমেব সমর্চয়েৎ ।

সো দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা ॥

অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নাগ্ন্যপদে সমর্পয়েৎ ।

অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্তাৎ সেবাপরাদ্ধ এব চ ॥

অতত্ত্বজ্ঞস্ত পাষণ্ডো গুরুভবস্ত পাদয়োঃ ।

অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জয়েন্নরকং পদম্ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ-শক্তি তুলসীদেবী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া । তদ্বারা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই অর্চন করিতে হইবে । অগ্ন্য বৈষ্ণবপদে কদাচ অর্পণ করিবে না বা করিতে নাই । করিলে তত্ত্বহানি ও সেবাপরাদ্ধ হইবে । তত্ত্বজ্ঞানহীন পাষণ্ডগণ গুরুভবের পায়ে তুলসী অর্পণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে ।

—জগদগুরু শ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী

জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী

শ্রীমভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্যে

দীনের বিজ্ঞপ্তি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রার্থায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি-নামিনে ॥
শ্রীবার্হভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাকরে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

হে প্রভু সরস্বতী ! প্রেমের মহাজন ।
রূপাঙ্গুবর তুমি গৌর-নিজজন ॥
মায়াবাদ-রাজ্জগন্ত দেখি' বিষ্ণুভক্তি ।
অবতীর্ণ হইলে তুমি মূর্ত-গৌরশক্তি ॥
অপূর্ব পাণ্ডিত্য-বলে খণ্ডি যত মত ।
প্রচারিলে বিষ্ণুভক্তি শাস্ত্র-মুসঙ্গত ॥
শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-ধারা পুনঃ প্রবর্তন ।
করিয়া করিলে তুমি ভক্তির স্থাপন ॥
শ্রীচৈতন্য-বাণীর তুমি মূর্ত-বিগ্রহ ।
ভক্ত-ভক্তি-সংরক্ষণে অপূর্ব আগ্রহ ॥
তব মুখ-বিগলিত ভক্তি-মন্দাকিনী ।
প্লাবিত করিয়া পুত করিলে মেদিনী ॥
অচেতন বিশ্বে তুমি চৈতন্য জাগাইয়া ।
করিলে চৈতন্যময় জগতের হিয়া ॥
বাণীর আলোকে দেখি চৈতন্য-মূর্তি ।
নাচয়ে চেতন-প্রাণ উল্লসিত অতি ॥
দয়ার সাগর তুমি পতিতপাবন ।
উদ্ধারিলে মায়া হ'তে শত শতজন ॥

কত অপরাধ কৈলু চরণে তোমার ।
 স্নেহ করি' ক্ষমিয়াছ উহা বার বার ॥
 কত যে করিলে তুমি আমা লাগি' যত্ন ।
 যাতে ছুড়ে নাহি কেলি ভক্তি-মহারত্ন ॥
 আপন শাবকে রক্ষি' যেমতি পক্ষিণী ।
 তেমতি রক্ষিলে তুমি মোরে গুণমণি ॥
 বল-বুদ্ধি যাহা মোর, সব ছিলে তুমি ।
 তুমি হারা আমি যেন মণিহারা কণী ॥
 কি করিতে পারে রথী শূন্যচক্র-রথে ।
 যদিও ভূগভরা তীর-শর লাখে লাখে ॥
 তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ।
 আবার কি গুনিব কানে মায়ার জঙ্কার ॥
 দয়া করি দিয়াছিলে দেবহুগ্ধ সঙ্গ ।
 ভাগ্যদোষে হ'ল উহা অকালেতে ভঙ্গ ॥
 যত্নপি স্বেচ্ছায় লীলা করিলে গোপন ।
 তথাপি প্রবোধ নাহি মানে মোর মন ॥
 অভিন্ন বলদেব তুমি, মোরে সেবা দিতে ।
 এসেছিলে সপার্বদ এই অবনীতে ॥
 কিন্তু হতভাগ্য আমি অতি ছরমতি ।
 লেশমাত্র নাহি হল চরণেতে রতি ॥
 অযতনে লভি ধন হারানু অযতনে ।
 এই দুঃখে মোর প্রাণ কঁাদে অনুক্ষণে ॥
 তোমার স্নেহের কথা উদিত হইয়া ।
 শোকের সাগরে মোরে দিতেছে ডারিয়া ॥
 কি করিব, কোথা যাব, কি হইবে গতি ।
 নাহি মনে শাস্তি মোর, করমে শকতি ॥
 আশীর্বাদ কর প্রভু এই দীনহীনে ।
 যেন তব দত্ত সেবা করি প্রাণপণে ॥

তব প্রিয়জন যাহা করিবে আদেশ ।
 পাগিব সতত জানি তোমার নির্দেশ ॥
 তাঁদের হইয়া যেন তোমার চরণ ।
 হৃদয়-মন্দিরে ধ্যান করি সর্বক্ষণ ॥
 প্রতি জন্মে করি আমি এই অভিলাষ ।
 যেন তব ভক্তসহ হয় নিত্যবাস ॥
 এই মাত্র আশা মম চরণে তোমার ।
 অধম বৃন্দাবনে কর ভবসিদ্ধি পার ॥

—ত্রিদিগ্ভিক্ষু ত্রিভুক্তিবৈবেক বন (মহারাজ)
 ধর্মধামা (আসাম)

গৃহস্থের কর্তব্য কি ?

নিজের সুখের জন্ত যত্ন করলে ভোগী গৃহস্থত হয়ে পড়তে হয় । কৃষ্ণসেবার জন্ত নিখিল প্রয়াস করলে মঙ্গল হয় । যারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে সর্বতোভাবে অহুক্ষণ কৃষ্ণভজন করছেন, তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা করবার জন্ত গৃহস্থ ভক্তগণ সর্বদা যত্নপর থাকিবেন । তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হবে, সংসারাসক্তি শিথিল হবে । যারা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁরা নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্ত যেকোন প্রচুর পরিশ্রম করেন, মেরুপ হরিসেবার জন্তও প্রচুর চেষ্টা করে থাকেন । নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন করছে জানলে তাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না । তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাদক জেনে তর্ফাং হয়ে যান ।

আমি যখন প্রভু সাঙ্গতে চাই, অস্ত্রের উপর প্রভুত্ব করতে চাই, তখনই মায়ী বা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে পড়ি । বর্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে—এই যে সংসার—এই যে বোকাগীর হাতে পড়েছি, তা হতে উদ্ধার লাভ করে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ লাভ করা, অস্ত্র উপায়ে হয় না ।

যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অজ্ঞাভিলাষী, কস্মী, ছলনাময়, প্রচ্ছন্ন, নাস্তিক, নির্ভেদ জ্ঞানী বা যোগী হতে পারেন? পরমপুরুষ ভগবানে সর্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হলে কি কেহ প্রকৃত গুরু হতে পারেন? গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরু-সেবাই প্রধান কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবামুখ কর্ণে পৌঁছিলে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্মল হয় এবং সেই নির্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হয়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বের ইচ্ছা আমার সর্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃ-পথে চালিত হই—সংসার করতে দোড়াই—সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য। স্তব্রাং মনের কথা ও মনোবন্দী লোকের কথা না শুনে ধারা সর্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁহাদের উপদেশ সর্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্তব্য।

—শ্রীমৎ উদ্ধবদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীগুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীব্যাসপূজা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২১ পৃষ্ঠার পর]

অনেকে আবার ব্যাসপূজার তিথি নির্ধারণ করিতে গিয়া মহাঈশ্বরে পড়িয়া যান। তাঁহারা গুরুদেবে মর্ত্যবুঝি করিয়া তাঁহাকে জাতি-কুলাদির অন্তর্গত মনে করেন এবং তাঁহার শৌক্লজন্ম অপেক্ষা দৈক্য ও সম্যাস-জন্মের অধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন। যাহারা গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে ব্যাসপূজা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে মূর্থ ও স্তাবক এবং নিজেদের প্রভুপাদের দ্বারা বাহক অভিমান করিয়া ‘নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিয়া’ থাকেন। অপসিদ্ধান্তকারিগণ বলেন,—“বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা, উপশাখা, বিচ্ছিন্ন মঠ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত মঠাধ্যক্ষগণ পরমারাধ্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাবের পরে উচ্চবর্ণ বা অন্ত্যজবর্ণে পিতা-মাতা-কর্তৃক উদ্ধৃত গুরুদেবের শৌক্ল জন্মলাভের দিনটিকে মূর্থ স্তাবকগণ দ্বারা আবির্ভাব তিথি-পূজা জাঁক-জমকের সহিত করিতেছেন। ইহা অর্যোক্তিক ও অর্থেষণ বলিয়া

মনে করি। যদি বিষ্ণুমন্ড্রে দীক্ষা বা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসগ্রহণের দিনটিতে জন্মোৎসব করিতেন তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভক্তিনিদ্রান্তের আলোক পাইতাম। শূদ্রের জন্ম-তারিখে আবির্ভাব উৎসব হওয়া কি সমীচীন?”

প্রকৃতপক্ষে কর্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের স্তায় গুরু-বৈষ্ণবগণের কোন শৌক্রেজন্ম নাই। তাঁহাদের এই জগতে আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র। স্বার্থগণই শৌক্রেপদ্ধতির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা পারমার্থিকের আদরের বস্তু নহে। যেক্ষেত্রে বৈষ্ণবকে জাতি-কুলাদির অন্তর্গত বলিলে মহাপরাধ উপস্থিত হয়, সেইক্ষেত্রে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গুরুদেবকে ‘শূদ্র’ বলিলে নরকের দ্বার পরিষ্কার করা হইবে না কি? গুরু-বৈষ্ণবগণ উচ্চ বা নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন কেবলমাত্র কুলকে পবিত্র করিবার জন্ত। এই প্রসঙ্গ চৈঃ ভাঃ আদি ৩৭।৪৮, ২।৪৪-৪৫, ২।৪২-৫১, চৈঃ ভাঃ অস্ত্য ৮।১৭৩-১৭৪, পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৫৭।৫৭-৫৮ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

দীক্ষাগুরু শিষ্যকে স্বয়ং দীক্ষা দিয়া নবজন্ম দান করেন, অতএব তাঁহার দৈক্ষ্যজন্মের কোন আবশ্যকতা আছে কি? দীক্ষাগুরুর দৈক্ষ্যজন্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে তাহা ‘কোটিপতি একটি পয়সার জন্ত রাত্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন’ এর স্তায় নিরর্থক হইবে না কি? শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগজ্জীবের কল্যাণার্থে ও শিক্ষার্থে দীক্ষাগ্রহণ ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করেন মাত্র। উহা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ গুরুদেবের দৈক্ষ্য ও সন্ন্যাসজন্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া নিজেদের মঙ্গলের পথ চিরতরে হারািয়া ফেলেন। কলিযুগ-পাবনাবতারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে লোকহিতার্থে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রেও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজন্ম হইয়াছিল—এই কথা স্বীকার করিতে হইবে, তাই নয় কি? তখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি অপেক্ষা সন্ন্যাসগ্রহণের তিথির গুরুত্ব অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না কি? শ্রীল প্রভুপাদের অতুল্য অভিমান করিয়া প্রভুপাদের বিরোধী নিন্দাস্ত প্রচার করা কি কোন বুদ্ধিমানের কার্য? যাঁহারা প্রভুপাদের বিচারের স্রোতধারায় অহর্নিশ অবগাহন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নূর্য ও স্তাবক বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নিজেদের দৈন্তদশাকেই অধিক পরিমাণে প্রকাশ করেন না কি?

জগদগুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে গুরুদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি সম্বন্ধে যে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন,

তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল কেশব গোস্বামী বলিয়াছেন,—“শ্রীগুরুদেব নিগুণ বস্তু—ব্রহ্মবস্তু। পরম কারুণিক নিগুণ গুরুপাদপদ্মের এরূপ মহিমা যে, তিনি গুণমধ্যে আবিস্কৃত হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত সত্তা সর্বদা রক্ষিত হয়। * * *। অপ্রাকৃত নিগুণ বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত ধর্ম। ‘জন্ম’ বলিলে যেমন প্রাকৃত চিন্তাধারা মানসপটে তানিয়া উঠে, ‘আবির্ভাব’ বলিলে তাহা একটু মার্জিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও হৃদয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে। জন্ম-মৃত্যুতে হেয়তা, অবরতা বিদ্যমান। পার্থিব চিন্তাস্রোত হইতে বদ্ধজীবগণকে উদ্ধারের নিমিত্তই অপার্থিব নিগুণ তত্ত্বের এ জগতে আবির্ভাব। নিগুণ বস্তু নিগুণ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেন। ভগবান্ ও ভগবদ্বক্তার আবির্ভাব ও আবির্ভাব-স্থান নিগুণ ও অপ্রাকৃত।”

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই জীবের ভয়, শোক ও মোহ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অবশ্যই “সর্বস্ব গুরবে দত্তাং”—এই শ্রোতবাণী অনুসরণে গুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ই জীবকে একমাত্র নির্ভয় ও অশোক করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করা পর্যন্ত জীবের যথার্থরূপে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ (চৈঃ ভাঃ ৫ম অধ্যায়ের অমৃতভাষ্য) বলিয়াছেন,—“যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগ বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্তি হইলেই জীব ‘পরিত্রাজক’ হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে ‘ব্যাসপূজা’ কহে।” এই প্রসঙ্গে শ্রীল কেশব গোস্বামী তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ঘাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীল কেশব গোস্বামী বলিয়াছেন,—“হরি-গুরু-বৈক্যবলেবার জন্ত শিষ্যের জীবনোৎসর্গ শ্রেষ্ঠ ব্রত। ইহা না করিলে বা না করিতে পারিলে শিষ্যের শিষ্যত্ব সাধিত হয় নাই, জানিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে যাবতীয় সমর্পণই শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ। কেবল নিজে নহে, জগতের সকলেই আমার গুরুদেবের সেবা করুক,—এই বিচার সংশিষ্যের কাম্য। সংশিষ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুষ্পসকলকে গুরুসেবায় ডালি দিয়া থাকেন। এই আত্মসমর্পণের বৃত্তি—গুরুপূজা বা সেবা।”

গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত শিষ্যের কখনও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই শিষ্যের নিজের লঘুত্ব বোধ হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল মরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“গুরুবাদ এক অখণ্ডতত্ত্ব—‘মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।’ আমার গুরু—নমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—নমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরু-বিদ্যেবী—জগতের সকলের বিদ্যেবী—মহুমাাত্রের বিদ্যেবী—জগদীশের বিদ্যেবী। নিকপটে এই বিচারটা না আসিলে আমি গুরুপাদপদের ভূতা হতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি ‘তুপাদপি সুনীচ’, ‘অমানী মানদ’ হয়ে হরিকীর্তন করতে পারি না।”

স্বীয় গুরুদেবের প্রতি নির্ভা থাকিলেই শিষ্যের কৃষ্ণভক্তির দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়। নিজ গুরুদেবকে ‘মদগুরুঃ জগদগুরুঃ’ বলিতে গিয়া অল্প গুরুদেবের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি আসিলেই শিষ্যের পতন অবশ্যজ্ঞাবী। শিষ্যের অল্প গুরুদেবের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি আসিলে বুদ্ধিতে হইবে, তাঁহার নিজ-গুরুদেবের প্রতিও অপ্রাকৃত বুদ্ধির অভাব আছে। গুরুতত্ত্ব যেহেতু এক অখণ্ডতত্ত্ব, সেইহেতু প্রত্যেক মদগুরুতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি থাকা অবশ্যই আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ২।১৮৬-এর অমুভাষ্যে বলিয়াছেন,—“যাঁহারা ‘আমার গুরু’ এবং ‘তাঁহার গুরু’ প্রভৃতি মর্ত্যবুদ্ধিধারা ভগবদভিন্ন গুরুতত্ত্বকে অসম্মান করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম-জ্ঞানকে গুরুত্ব বরণ করেন নাই। (তাঁহারা) ব্যবহারিক জগতে মায়িক-বিচার-বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ ‘গুরুকে’ ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। শুদ্ধ-ভক্তগণের সহিত এই সকল উপসম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলন অসম্ভব।”

অতএব যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারাকে বহুমানন করিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্যভিক্ষিত করিতে চাহেন, তাঁহারা অতি অবশ্যই স্ব-স্ব-গুরুর আবির্ভাব দিনে বিশেষ সমারোহের সহিত ব্যাসপূজার অচুষ্ঠান করিবেন। ‘ব্যাসপূজা’ ব্যতীত ভগবৎপ্রীতি এবং নিজের আত্মকল্যাণ-লাভ অসম্ভব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

বাংলায় তখন চলছিল হোসেন শাহের রাজত্বকাল। ভারতবর্ষ সাধকের দেশ। এই দেশে বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল একটা বিশেষ সময়ে, বঙ্গদেশ তখন কুসংস্কারের আন্দোলনে হাবুডুবু খাচ্ছে, চেতনায় এগোবার পথ দেখতে পাচ্ছে না। স্বধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুরা এগিয়ে যাচ্ছে অস্ত্র ধর্ম গ্রহণের জন্ত। তাঁর আবির্ভাবে দিশেহারা মানুষ যেন স্থিতিলাভ করল। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন দোল পূর্ণিমার পূর্ণ তিথিতে। তাঁর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র ও মায়ের নাম শচীদেবী। তাঁর জন্মের সময়ে নবদ্বীপ ছিল শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

বালাকালে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল নিমাই। পরে যৌবনকালে নিমাইপণ্ডিত নামে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা ছিল বলে তাঁকে গোর্গাদও বলা হত। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অনাধারণ মেধাবী ছিলেন। বালাকালে তিনি খুব ছরস্তু হলেও শৈশবের মধ্যেই তিনি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর কিছুতেই ঘরে মন বসে না দেখে মাতা শচীদেবী প্রথমে তাঁকে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁর প্রথমা স্ত্রী সর্পদংশনে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়বার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিন দারিদ্র্য-ধর্ম পালন করেন।

২৪ বছর বয়সে এক গভীর রাতে গৃহত্যাগ করেন। এরপর তিনি দৈবদর্শনীদের কাছ থেকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর তিনি মিত্যানন্দ, গদাধর, অশ্বত, শ্রীবাস-এর সঙ্গে নাম-সংকীর্ণনে মেতে ওঠেন। নবদ্বীপের কাজী সাহেব তাঁদের যুদ্ধ, করতাল ভেঙে কেড়ে নিয়ে নানা নির্ধাতন করেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেব কাজীসাহেবকে উদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি ঐ সময়েই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গা ভ্রমণ করে তাঁর নিজের ধর্মমত অর্থাৎ গোড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তিনি লৌকিক জাতিভেদ

মানস্তেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমান চোখে দেখতেন। তিনি নিজে রাধাভাবে ভাবিত ছিলেন, আর সবাইকেও ভাবিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মের মূলকথা ছিল—কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবৎপ্রেমের দ্বারাই মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে। কৃষ্ণনাম বা মহামন্ত্র—নাম-সংকীর্ণনের দ্বারা তিনি সমাজের বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষেত্রে কোন জাতি-বর্ণের প্রসঙ্গ নেই। সব মানুষই কৃষ্ণের সন্তান, কাজেই সকলেই কৃষ্ণ-ভজনের অধিকারী। তাঁর ধর্ম-অনুপ্রেরণায় গোটা হিন্দুজাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার ঘটল। হিন্দুদের অন্য ধর্মের প্রতি টান কমে গেল।

তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই মানুষ তার কুসংস্কার, ঈর্ষা, মিন্দা থেকে নিস্তার পেয়েছেন। তাঁর বাণীগুলি তখনকার বঙ্গসমাজে বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি সকল জাতির মিলনের ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি পুরী নীলাচল বা জগন্নাথধামে অতিবাহিত করেন। ৪৮ বছর বয়সে এই নীলাচলেই তাঁর তিরোভাব ঘটে।

—শ্রীঅমিত সরকার (অষ্টম শ্রেণী)

শক্তিগড়, শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

শ্রীল গুরু মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ কে ?—Supreme Command, Supreme Lord, Omniscient Lord, Omnipresent Lord, Omnipotent Lord—সর্বশক্তিমান্ ভগবান্। তাঁর আকার আছে, গুণ আছে, লীলা আছে। তাঁর সবকিছু আছে, অস্বীকার করবার উপায় নাই। সেইকথা শাস্ত্রে বলছেন। ভগবানকে কি দেখা যায় ? তিনি কি Visible—দর্শনীয় আমাদের সামনে ?—হ্যাঁ, সেই ভগবানকে দেখা যায়—যেমন তুমি আমাকে দেখছ, আমি তোমাকে দেখছি, আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখছি, সেইরকম দেখা যায়। তাহলে দৃষ্টিটা কি ? কোন side-এ দেখব ? তাঁকে দেখতে গেলে একটা আলাদা চশমা লাগে। কি চশমা লাগবে ? কামলা রোগীর যে চশমা সেই চশমা

কি ? যার কামলা হয়েছে সে একটা চশমা লাগায়। সাদা রঙের চশমা লাগালেও তার দুনিয়াটা হলুদ দেখা যায়। কোন্ চশমা লাগাতে বলছেন ?— প্রেমচক্ষু। সেই উপচক্ষু—স্বার করা চক্ষুর নাম উপচক্ষু। তার দ্বারা ভগবদর্শন হয়, ভগবানের স্বরূপ দর্শন হয়। “প্রেমোজ্জ্বলচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সর্দৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।” প্রেমের কাজলমাখা যে চোখ, সেই চোখ দিয়েই সাধু-সন্তগণ প্রেমময় ভগবানকে দর্শন করেন। মাঝে মাঝে দর্শন করেন, মাঝে মাঝে অদর্শন হয়, এমন কি ? না, ‘সন্তঃ সর্দৈব’ (সদা+এব) Continuously—সর্বদা দর্শন করেন। কোথায় ?—‘হৃদয়েষুপি’ শুধু হৃদয়ে ? না, অনন্ত জীবাত্মায় ভগবদর্শন, ভগবানে অনন্ত জীবাত্মার স্বরূপ দর্শন। তাকে বলে সমদর্শন। সেই সমদর্শনের কথা শাস্ত্রে বলছেন,—

বিজ্ঞা-বিনয়-সম্পাদে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

গুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

সে সমদর্শী কে ?—যিনি আত্মায় আত্মা দর্শন করেন, যিনি পরমাত্মায় আত্মা দর্শন করেন, জীবাত্মায় আত্মা দর্শন করেন, তিনি হলেন সমদর্শী সাধু। তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাহলেও ব্যাপারটা আছে। সেই Percentage কষেছেন গীতার মধ্যে,—মহুয্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

সহস্র সহস্র মহুয্যের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি তত্ত্বতঃ ভগবানকে জানতে ইচ্ছুক, আগ্রহী। ঐরূপ আগ্রহশীল হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তত্ত্বতঃ কেউ আমাকে অবগত হতে পারেন। Percentage সেখানে খুব কম। তাহলে কি আমরা ধাবড়ে যাব ? আমরা ধর্মপ্রচারক, বহু জায়গায় বহু লোক প্রসন্ন করেন,—মহাশয় ! আপনাদের প্রচারের ফল কি ? কত লক্ষ লোক আপনাদের সনাতন ধর্ম embrace করেছেন ? সেখানে আমাদের উত্তর এই,—গীতা-ভাগবতে এর উত্তর দিয়ে রেখেছেন। তোমাদের ধাবড়ার কোন কারণ নাই। কেন ?—সহস্র সহস্র মহুয্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আত্মকল্যাণের জন্ত ব্রতী হন, ইচ্ছুক হন। ‘যততামপি সিদ্ধানাম’—সিদ্ধিলাভ করেছেন, Realised soul, ঐরূপ হাজার হাজারের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তত্ত্বতঃ আমাকে অবগত হতে পারেন, আমার যে স্বরূপ সে স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন ঠিক ঠিক ভাবে বাস্তবক্ষেত্রে। এরপরে শুধু ভাগবতে হিসাব কষেছেন,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুহৃৎতঃ প্রশান্তাত্মা কোটিবপি মহামুনে ॥

দুর্ভাগ্য এক কৃষ্ণভক্ত কোটি কোটির মধ্যে। Percentage হিসাব করুন এবার। যদি বর্তমানে আমরা ভারতবাসী ৮০-৮৫ কোটি ধরি, এর মধ্যে যদি ৮০-৮৫টি লোক পাওয়া যায় যথেষ্ট, তাহলে আমাদের যে পরিশ্রম, আমাদের যে চিন্তাকার, আমাদের যে প্রচারণা সেটা সফল। অতএব ঘাবড়াবার কি আছে? সুতরাং সনাতন ধর্ম এত উদারনৈতিক ধর্ম যার ভিতরে সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে, কেহ বাদ দান ঘাই। অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৃষ্ট জীবকে ভগবান্ ভালবাসার অধিকার দিয়েছেন। তাকে বলে সনাতন ধর্ম। সেই সনাতন ধর্ম আলোচনা করবার জন্য এখানে আসার হয়েছে। এ ধর্ম আলোচনার জন্য প্রত্যেকটা মানুষেরই সমান অধিকার আছে, কম-বেশী অধিকার নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে একটা শ্লোক দেখতে পাই আমরা। তার ভিতরে সন্ন্যাসীদের কথা কিরকম বলেছেন, শুদ্ধন আপনারা। হৃষীকেশ-স্তব করেছেন শ্রীল শঙ্করের গোস্বামী,—

কিরাত-হুণাজ-পুলিন্দ-পুন্ড্রা আভীরশূদ্রা যবনাঃ খনাদয়ঃ।

যেহন্তে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥

হে ভগবান্! তোমাকে সম্বন্ধ করি। কে তুমি? অনন্ত বিশ্বের অনন্ত জাতি, Irrespective of Caste and creed সবাই তোমাকে ভালবাসতে পারে। তোমাকে ভালবাসার হৃষোগ দিয়েছ, ক্ষমতা দিয়েছ, সমান অধিকার দিয়েছ। সেই সনাতন ধর্ম যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে পারব—কে অবতার, কে অবতারী, কে কৃষ্ণ, কে শ্রীরামচন্দ্র। কারা বিষ্ণুভক্ত, কারা ভক্ত, কারা জীবাত্মা, এই জগৎভক্ত কি? এসব সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা আসে। সাধন-ভজন ত' পৃথক জিনিস। সেটা যখন শুরু হয়, তখন সবই বাস্তবায়িত হয়, তার আগে নয়। কতকগুলো পড়া মুখস্থ করা যায়, আবার যখন সাধন-ভজনের ক্রম নিয়ে চলা যায় তখন ওটা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ঠিক সেইভাবে জিনিসটা বুঝবার চেষ্টা করব।

সনাতন আধ্যাত্মবিগণ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, সে শিক্ষার পরে চরম শিক্ষা আর কিছু হতে পারে না, হয় নাই, কেউ সেই শিক্ষা দিতে পারেন নাই, জগতের কেউ দিতে পারবেন না। তারপরে কোন প্রেষ্ঠ বিচার নাই। 'যাহা নাহি বেদে তাহা নাহি পৃথিবীতে।'—ইহাই আধ্যাত্মবিগণের বিচার। আর একথা প্রমাণিত কিসের দ্বারা?—পাশ্চাত্য দেশের দ্বারা। স্বয়ং শাস্ত্র যদি নিজে মহিমা-মাহাত্ম্যের কথা বলেন, তাহলে ওটা গ্রাহ্য হয় না; কেননা ওঁরা নিজেদের কথা নিজেরা বলছেন। অত্রে যদি বলে, তাহলে সেটা ঠিক হয়। যেমন কথাটা আছে,—

“আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়।

লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় ॥”

যদি তাই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পাশ্চাত্য দেশের কথা আমাদের

মানতে হবে। তাঁরা কি বলেছেন? সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করেন, সেইটাই বুঝতে হবে। তাঁরা খুব সুন্দর কথা বলেছেন, আপনারা নিশ্চয় কথাটা শুনেছেন। পুনরায় আমি এখানে কথাটার পুনরুক্তি করছি,—“India guided by God can lead the world, back to sanity.” পোপ নিজের ‘World Congress of Faith’ এর ধর্ম'সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে একথা বলেছেন। কয়েক বৎসর আগেকার ঘটনা। তিনি বলেছেন—‘India guided by God’. ভারতবর্ষ, কোন্ ভারতবর্ষ?—ঈশ্বরকর্তৃক পরিচালিত ভারতবর্ষ, অধ্যাত্ম ভারত can lead the world—সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে। ‘Back to sanity’ তাহলে সমগ্র জগৎকে Insanity—পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। সেই পাগলামিটা কি?—ঈর্ষা, হিংসা, মাংসখ্যা, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, রণোন্মাদনা। এই পাগলামিতে পেয়ে বসেছে সমগ্র দুনিয়াকে। এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে অধ্যাত্ম ভারত, ধার্মিক ভারত, ঈশ্বরকর্তৃক পরিচালিত ভারত। তাহলে চিন্তা করুন—পাশ্চাত্য দেশের একজন বিশেষ ব্যক্তি আমাদের সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করছেন।

এ সব কথা চিন্তা করে আমাদের শাস্ত্রীয় সমস্ত তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে,—‘আত্মধর্ম’ থেকে বড় জিনিস কেউ দিতে পারেন না। এজন্ত পাশ্চাত্য দেশও স্বীকার করছে, আমরা ভারতের কাছে ঋণী। আমরা ভারত থেকে যা কিছু পাওয়ার পেয়েছি। এখনও তাঁদের স্বীকৃতি রয়েছে। তাঁরা বলেছেন একথা এবং এই নিয়ে আলোচনাও হয়েছে—“Where East and West can meet?” মিলনটা সম্ভব। কবি শুধু এক জায়গায় বলেছেন, তা নয়। ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।’ ‘হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাহুকার ধ্বনি। হৃদয়তন্ত্রী একের মস্ত্রে উঠেছিল রণরবি।’ পাশ্চাত্য দেশ এই জিনিসটা উপলব্ধি করে কিছুটা। অস্বীকার করবার উপায় নাই।

আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি, ডুলে গেছি বর্তমানে আমাদের ঋণিগণের নীতি-আদর্শ, ভাবধারা। পুনরায় এটাকে Revive করা দরকার। এর জাগরণ প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ—সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই বলিতেছি,—শ্রীজন্মান্তর্ময়ী-তিথি ও শ্রীন্দোঃসব—জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর অপূর্ণ মিলনোৎসব। আমরা সকলেই আত্মধর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩২২ পৃষ্ঠার পর]

“সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশ-সময়ে সূর্যম্বরকেশরী-
জ্ঞেতাঃ দশকঙ্করং পরিভবন্ বামেতি নামাকৃতিঃ ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে তারং হরন্ ষাপরে
গৌরাদঃ প্রিয়কীৰ্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্ত্যনামা হরিঃ ॥”

—নৃসিংহ-পূবাণে

অর্থাৎ—“সত্যযুগে যিনি দৈত্যদম্বাট্ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশকালে নৃসিংহ-
মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; যিনি ত্রেতাযুগে দশানন রাবণ-বধের নিমিত্ত পরম
মনোহর রাম-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; যিনি ষাপরে পৃথিবীর ভার
হরণ ও গোপবালকগণকে পালন করিবার জন্য ব্রজধামে বিরাজ করিয়াছিলেন,
তিনিই কলিযুগে কীৰ্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত ।”

“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং সাদোপাঙ্গাজ-পার্ষদম্ ।

যজ্ঞঃ সংকীৰ্ত্তন-প্রারৈর্ধজন্তি হি স্তম্বেদসঃ ॥” (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ—“যাহার মুখে সর্বদা ‘কৃষ্ণ’—এই দুইটা বর্ণ, যাহার কান্টি অকৃষ্ণ
অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে
স্ববুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীৰ্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ করিয়া থাকেন ।”

“ইখং নৃতির্ধ্যগৃষিদের-ঋষাবতারৈ-

লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাশি যুগাস্তবৃত্তম্

ছয়ঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগৌহথ স ত্বম্ ॥” (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

অর্থাৎ “(প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ !) তুমি এই প্রকার নর, তির্ধ্যক্,
ঋষি, দেব, মন্ত্র ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে
বিনাশ কর । হে মহাপুরুষ ! কলিকালে যুগাস্তবৃত্ত নামকীৰ্ত্তনধর্ম্ম ছয়ভাবে
প্রচার করিবে । এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ ।”

“কলৌ কৃষ্ণাবতারৌহপি গৃঢ় সম্যাসরূপধৃক্ ।” (জৈমিনি ভারতে)

অর্থাৎ—“কৃষ্ণাবতার হইলেও ইনি কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়া
সম্যাস গ্রহণ করিবেন ।”

বায়ুপুরাণে ভগবহুক্তি—

“কলৌ সংকীৰ্ত্তনারভ্তে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ।

স্বৰ্গদ্বীতীরমাস্থাস নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে ।

তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালায়ে ।”

অৰ্থাৎ—“আমি কলিযুগে যুগোচিত নামসংকীৰ্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত বহু জনসমাকীর্ণ, গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপধামে বিত্ত্বদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে শচীদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব ।”

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

“অত্র ব্রহ্মপুং নাম পুণ্ডরীকং যচ্চ্যতে ।

তদেবাস্তদলং পদ্মসমিভং পুরমদ্ভুতম্ ॥

তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুর ইতীৰ্য্যতে ।

তত্র বেদ্য ভগবত্ত্ৰৈচৈতন্যস্য পরাশ্রয়ঃ ।”

অৰ্থাৎ—“এই উপনিষদে যাহা ব্রহ্মমণ্ডল বলিয়া কথিত হইতেছে, ইহাই অষ্টদলপদ্ম সদৃশ পরমধাম । তন্মধ্যে ‘মায়াপুর’-নামক স্থানই ভগবান্ ত্রৈচৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান ।”

ত্রৈচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে বহু প্রমাণ বৈদিক শাস্ত্রে থাকি সত্ত্বেও তাঁহাকে মাহুঘ বা অস্তিমাহুঘ বলিয়া চিন্তা করাই অপরাধ ।

(৮) লেখক তাঁহার পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“সেই সন্ন্যাসী চৈতন্তই আবার অন্ততম পার্শ্বদ-সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই স্বর্ঘ্যদাস সরথেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করবার জন্ত আদেশ করেছেন । বসন্ত মনের দিক থেকে চৈতন্ত কোনদিনই সন্ন্যাসী ছিলেন না ।”

লেখকের নিত্যানন্দ সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য সত্য নহে । শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গোড়দেশে শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ গমনের আদেশ করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে (৫।২২৩-২২২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

“প্রভু বলে,—‘শুন নিত্যানন্দ মহামতি !

সত্ত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে ।

‘মূৰ্খ-নীচ-দরিদ্র ভাসাব প্রেম-স্বখে ॥’

তুমিও থাকিলা যদি মূনিধৰ্ম্ম করি’ ।

আপন-উদ্যম-ভাব সব পরিহরি’ ॥

তবে মূৰ্খ-নীচ যত পতিত সংসার ।
 বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥
 ভক্তিৰস-দাতা তুমি, তুমি শঙ্করিলে ।
 তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ॥
 এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও ।
 তবে অবিলম্বে তুমি গোড়দেশে যাও ॥
 মূৰ্খ-নীচ-পতিত-দুঃখিত যত জন ।
 ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন ॥”

শ্রীমন্নৃপাধিপতির উক্ত আদেশ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ণফলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণের ও মুমূর্ষু জ্ঞানী নির্বিশেষ মায়াবাদী-সম্প্রদায়ের অভক্তি ছাড়াইবার জন্য এবং সকলকে উন্নত বিচারে আনিয়া প্রেমমগ্নে আকৃষ্ট করাইবার জন্যই শ্রীমন্নৃপাধিপতি নিত্যানন্দপ্রভুকে গোড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তদেব নিত্যানন্দকে বিবাহ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন,—ইহা বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্তভাগবতের কোন্ পরিচ্ছেদে ও কোন্ শ্লোকে লেখক পাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিলেন না কেন? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের একটি পঙ্কর উল্লেখ করিতেছি,—

“নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—যাও গোড়দেশে ।

অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥” (১৫: ৮: মধ্য ১৫:৪২)

উহার অমূল্যার্থে পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীকৃষ্ণানুগবর্ধ্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—নিত্যানন্দে আজ্ঞা,—প্রাকৃত-সহজিয়ার দল অভিন্ন-রোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ‘শ্রীমন্নৃপাধিপতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বংশ রক্ষা (১) করিবার জন্য শ্রীমীলাচল হইতে শ্রীগোড়দেশে পাঠাইলেন।’ শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ হইতেই এইরূপ পামণ্ডবুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকসকল যাবতীয় ঈশ্বরবিগ্রহ—বিশুত্বের মূল-আকর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকে তাহাদের মতই একজন ‘কুপ্যাস্বাদী’ এবং জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যমদণ্ড মর্ত্যজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথেরই পথিক হয়। ঐ সকল কমক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী, বণিকস্বভাব, স্বার্থপর ব্যক্তি স্বীয় উর্ধ্বর মস্তিকে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত উদ্ভাবন-পূর্বক নিত্যানন্দের নাম করিয়া তাহার ঈশ্বর-চেষ্টাধারা নিজেদের ব্যবসায়, নির্বোধ-লোক-প্রবঞ্চন এবং দুর্ভিক্ষস্ত্রীমূলে গর্বিত গর্হিত বোঝা-সঙ্গ-স্পৃহা ও গৃহব্রত বা গৃহযেধ-ধর্মের অস্ত্রায় ও অশাস্ত্রীয়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ

অবেষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্ত শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু-কর্তৃক তৎপ্রকাশবিগ্রহ তদভিন্ন শ্রীমন্ত্যামন্দ প্রভুকে বজ্রোণ্ডাশ্রিত প্রজাপতিবর্গের স্তায় বংশবৃদ্ধিধারা সৃষ্টি-রক্ষা, অথবা কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্য সমর্থন করিবার যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবার কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, থাকিতেও পারে না,— কেননা, উহা সর্ব্বথা অশ্রাব্য। ঐরূপ কথা প্রচার করিয়া প্রাকৃত ঘোষণা-সন্ধি-সুহৃজিয়াগণ আপনারাও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং সদনন্দবিবেকহীন জগৎকেও বঞ্চনা করিয়া জগতে অমঙ্গলই উৎপাদন করেন।”

— শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল'গুরু-মহারাজের শুভাবির্ভাব-তীর্থ উপলক্ষে বন্দনা

আমি বন্দি তোমারে গুরু,

জীবন-সাগরে কাণ্ডারী তুমি,

হে মোর কল্লতরু ।

আমি বন্দি তোমারে গুরু ॥

হে মোর জীবনের ধ্রুবতারা,

আমি অঁধারে অঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

হয়েছিছু দিশাহারা ।

তুমি যে জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া,—

'ভয় নাই' বলি' পথ দেখাইয়া,

আগে আগে যাও, ফিরে ফিরে চাও,

বুঝিয়া আমারে ভীরা ।

আমি বন্দি তোমারে গুরু ॥

তুমি যে আমার পরম বন্ধু,

এ ভব-যাতনা সহিতে না পারি

অপার করুণা সিদ্ধ ।

জীবন পথের তুমি যে দিশারী,
হরিনাম-সুখা দিয়াছ নিগাড়ী,
আলোর পিছে, ভ্রমিতেছি মিছে,
আমি যে তুষিত মরু ।
আমি বন্দি তোমারে গুরু ॥

—শ্রীজ্ঞানেশ চৌধুরী
তুরা (মেঘালয়)

ভগবৎপ্রের্ত শ্রীগুরুদেব

প্রাণিক জগতের কোন বস্তু পাইতে বা সেই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে
হইলে যে রূপ উপযুক্ত প্রাকৃত মাধ্যম প্রয়োজন, তদ্রূপ পারমার্থিক জগতের
অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্ত্র প্রাপ্তির জন্যও পারমার্থিক মাধ্যম প্রয়োজন । সেই
অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত মাধ্যমই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম । সম্ভব-পদাশ্রয় বিনা ভগবৎ-
প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই । সেই সম্ভব কল্পিত লক্ষণবিশিষ্ট, তাহা বর্ণিত
হইয়াছে,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাস্ত্রে পূরে চ নিষ্যতং ব্রহ্মপুণ্যশমাস্রমম্ ॥ (ভাঃ ১১৩২১)

ভক্ত-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম এবং শ্রেয়বস্ত্র লাভের নিমিত্ত সম্ভবের আশ্রয়
গ্রহণ করিবেন । যিনি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি শাস্ত্র-
সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং যিনি ভগবদবুদ্ভুতিসম্পন্ন ও প্রাকৃত কোন ক্ষোভের
বশীভূত নন, তিনিই সম্ভব ।

শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসেও উক্ত হইয়াছে,—

কৃপাসিন্ধুঃ স্নানপূর্ণঃ সর্বসম্বোধনকারকঃ ।

নিম্পুঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিজ্ঞা-বিশারদঃ ।

সর্বসংশয়-সংচ্ছেদতানসমো গুরুরাজিতঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১৪৫-৪৬)

যিনি অপার করুণাময়, যাহার কোনরূপ অভাব নাই, যিনি সর্বসম্ভব-
বিশিষ্ট, সর্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্ঠাম, সর্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ববিজ্ঞা—

ব্রহ্মবিজ্ঞা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে হুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও সতত হরিসেবানিষ্ঠ, তিনিই 'সদগুরু' বলিয়া অভিহিত হন।

এইরূপ গুরুকরণে যথার্থ ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যদি কেহ ব্যবহারিক বা লৌকিক গুরুকরণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার গতি কিরূপ? শাস্ত্র বলেন,—

যো ব্যক্তি জ্ঞানবহিঃসমজ্ঞায়েন শৃণোতি যঃ ।

তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১০১)

যিনি আচার্য্যবেষে অজ্ঞায় অর্থাৎ দাত্ত-শাস্ত্র-বিরোধী কথা বলেন এবং যিনি শিষ্যরূপে অজ্ঞায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন। যদি কেহ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদর্শন করেন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং ধিনা ।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিকংপাতায়ৈব কেবলম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।২.৪৬)

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক যদি কেহ ভক্তির বাড়াবাড়ি করেন, তাহা উৎপাতেরই কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। সেক্ষেত্রে করণীয় কি?—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সমাগ্-গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবান্দ গুরোঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩৬৬)

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরক-গমনের পথ প্রশস্ত হয়। তজ্জন্ত পুনরায় শাস্ত্র-বিধি অহুনায়ে বৈষ্ণব-গুরুকরণ অবশ্য কর্তব্য।

পরমার্থ-গুরুপ্রাপ্তো ব্যবহারিক-গুরুদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ ।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০)

ব্যবহারিক, লৌকিক, বৌলিক অর্যোগ্য গুরুত্ব পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় কর্তব্য।

পরমার্থলিপ্সু ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া যখন অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের নিকট আত্মকল্যাণসূচক সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত নির্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্ত হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাস হইয়া প্রশ্ন করেন,—

কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপজয় ।

ইহা নাহি জানি, কেনে হিত হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

শ্রীগুরুমুখ হইতে এই প্রেমের সচ্ছত্র পাইলে সকল সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়বিশ্বাসের উদয় হয়। তখন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অবগৎ-কীর্তনেও আগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

যাহা হইতে রুষে লাগে স্ফূর্ত মানস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সম্যগ্ভাবে সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারিলে উপাস্যতত্ত্ব-বিষয়ে অধিকতর নির্ভার উদয় হয়। ইষ্টবস্তুর প্রতি নির্ভার অভাব হইলে প্রয়োজন সিদ্ধিতে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত, অপসম্প্রদায়িগণের অনেকেই বলেন,—আমরা অধৈর্য-পরিবার, নিত্যানন্দ-পরিবার প্রভৃতি। সাধারণতঃ তাঁহারা শৌক্য বিচারেই আবদ্ধ ও গর্বিত। শ্রীমদ্রামানন্দ ও বীরভদ্র প্রভুর শৌক্য-পরিচয় দান করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মহিমা-মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় না।

শ্রীল মরোত্তম ঠাকুর রূপানুগগণের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—

“হা হা প্রভু সমাতন ! গৌর-পরিবার।

সবে মিলি বাঙ্খা পূর্ণ করহ আমার ॥”

কোন অপসম্প্রদায়ী পক্ষে এই পদের গূঢ়ার্থ বোধগম্য বা অসম্ভবের বিষয় নহে। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভাগবত-আশ্রয়-পরম্পরায় শ্রীমদ্রামানন্দ প্রভুর সিদ্ধান্তে তত্ত্বপ্রের্তা নিজজনকে ‘পরিবার’ বলা হইয়াছে।

সম্প্রদায়-বিহীন। যে যন্ত্রান্তে বিফলা মতাঃ।

শ্রী-ব্রহ্ম-কল্প-সনক। বৈষ্ণবাঃ ক্ষিত্তিপাবনাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

সং সম্প্রদায়-স্বীকৃত আচার্য্যগণোপদিষ্ট গম্ভ ব্যতীত অন্য যন্ত্রসকল বিফল। শ্রী-ব্রহ্ম-কল্প-সনক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগুরুই জগৎ উদ্ধার করিতে পারেন। (১) ‘শ্রী’ সম্প্রদায়ে শ্রীরামানুজাচার্য্য ‘বিশিষ্টাধৈত’ মতে ভক্তি প্রচার করেন। চিৎ ও অচিৎ দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) ‘ব্রহ্ম’ সম্প্রদায়ে শ্রীমধ্বাচার্য্য ‘স্বত্বাধৈত’ মতে ভক্তি প্রচার করেন। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশ্বরভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (৩) ‘সনক’ সম্প্রদায়ে শ্রীনিহাদিত্যাচার্য্য ‘বৈতাদৈত’ মতে ভক্তি প্রচার করেন। জীব ঈশ্বর হইতে রূপং ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। (৪) ‘কল্প’ সম্প্রদায়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ‘স্বত্বাধৈত’ মতে ভক্তি প্রচার করেন। বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। ইহারা চারজনই স্বত্বভক্তি-

প্রচারক। সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাশ্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের মত পৃথক পৃথক থাকায় তব্ব অসম্পূর্ণ। তাই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই অসম্পূর্ণতা দূর করত গুহ্যভক্তিতত্ত্ব ভগবৎকে শিক্ষা দেন। শ্রীমধ্বযতে যে 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ' স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়কেই স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার দশমূল-শিক্ষায় শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে উপদেশমুখে বলিয়াছেন,—

আমায়ঃ প্রোহ তত্ত্বং হরিরিহ পুরমং সর্কশক্তিং বদাস্বিং

তদ্ভিন্নাংশাংশ জীবান্ প্রকৃতি কবলিতান্ তদ্বিকৃত্যংশ ভাবাৎ ।

ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং স্তবভক্তিং

সাধ্যং তং প্রীতিমেবেতু্যপদিশতি জ্ঞানান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ।

প্রথমটী প্রমাণ এবং শেষ ন্যটী প্রমের। যে-সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রমের এবং যাহার দ্বারাই সেই প্রমেরসকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। “গুরু-পরম্পরাগ্ৰাপ্ত বেদবাক্যই আমায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ-দ্বারা নির্ণীত হয়—হরিরই পরমতত্ত্ব, তিনিই সর্কশক্তিসম্পন্ন, তিনিই অখিলরসায়ুতসিদ্ধ। মুক্ত ও বদ্ধ—এই দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ। বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত। চিদচিং নমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ। ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।”

শ্রীমন্নহাপ্রভু আরও বলিলেন,—এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই প্রাচীন। শ্রী-ব্রহ্ম-সনক—এই তিন সম্প্রদায়ই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ কারবে। শাস্ত্রে উক্ত তিন সম্প্রদায় ব্যতীত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রণালী বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। যথা :—

কৃষ্ণ হইতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি ।

নারদ হইতে ব্যাস, মধব কহে ব্যাসদাশ, পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি ॥

*

*

*

এই সদ্গুরুই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদাতা হন। শাস্ত্র বলেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্বাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্ ।

তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ২৭)

যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাভ্যক্ত অপ্রাকৃত ভাব অল্পতব হয়, সেই অল্পষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা বলেন । ব্রহ্ম-মাক্ষ-সারস্বত-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংবন্ধক, ভাগবত পারম্পর্য বা গুরু-পরম্পরানুসৃত, পারমার্থিক, অপ্রাকৃত গুরুদেব দীক্ষা ও শিক্ষা-প্রদাতা । যদি কেহ ঈর্ষা-বিরোধমূলে বলেন যে,—দীক্ষাপ্তক দীক্ষা দিবারই অধিকারী, তিনি শ্রীনাম ও ভজন-শিক্ষা দিতে পারেন না, আর এহেন গুরুতে কাহারও যদি অষ্টাবক্র মূনির উক্তির স্থায় নৈতিক আচরণের বিচার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূত্রের বিচার এবং সাধারণ মনুষ্য-বুদ্ধি হয়, তদ্বস্তুরে শাস্তবাক্য,—

গুরুমু নরমতির্ঘস্ত বা নারকী মঃ । (পদ্মপুরাণ)

ঈহাং শ্রীগুরুদেবে মর্ত্য বা মনুষ্যবুদ্ধি, সে ব্যক্তি নারকী ।

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।

মন্ত্র বৈষ্ণবেরে মিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩১৬০)

তাই—শ্রীগুরু রূপায় ভেঙ্গেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমিই আপন ।

তব নিজ জন পরম বান্ধব সংসার কারাগারে ॥

যতপি আমার গুরু চৈতন্তের দাম ।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১১৪৪)

ঈহাং রূপায় ভগবৎরূপা লাভ হয়, সেই গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দেশ ও আত্মসত্যে শ্রীমদ্ব্যাক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিচারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্ববন্দনে ও সেবা, অন্তরায় সকল শ্রম ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয় ।

ধ্বংঃ হস্তস্তিতঃ পুংসাং বিশ্বক্লেম কথাসু যঃ ।

নোংপাদভেদু যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১২৮)

অন্তর্ধর্ম হৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।

হরিকথায় রতি নৈলে পশু সেই শ্রম ॥

হখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম অহুঙ্কিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাস্কর-মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা কুচিৎ উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র । শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি,—“বিষয় ও আশ্রয়কে ‘অবলম্বন’ বলে । বাহ্যদেব বিষয় ও তাঁহার তত্ত্ব আশ্রয় । বিষয়াশ্রয়-সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যদি হৃৎকলীলা বর্ণনাদিতে কচিরূপ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই দার, ফল লাভ ঘটে না । কথাজিজ্ঞাসিত ফলরূপে পরিণত হয় । যদি হরিনাম শ্রবণ-কীর্তনে রতি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে অবলম্বনের অভাবহেতু প্রাকৃত ফলভোগময় রাজ্যে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে দেহ-মনেরই পরিশ্রম করা হইল । হরি-সামিধ্য লাভ ঘটিল না । অনতিজ্ঞ সম্প্রদায় অবলম্বনের অভাবে যে শ্রবণ করেন, তাহা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মাত্র । উহাতে সকল শ্রম ব্যর্থ হয় ।

শ্রীগুরু-চরণেই সার জানিয়া শ্রীগুরু-বন্দনা শ্রবণ করি।—

আশ্রয় করিয়া বন্দে। শ্রীগুরু-চরণ।

যাহা হইতে মিলে তাই কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥

* * *
মহিমায় 'গুরু' 'কৃষ্ণ' এক করি' জান।

গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি' মান ॥

সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।

অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস ॥

যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।

কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন ॥

'কৃষ্ণ' কষ্ট হ'লে 'গুরু' রাখিবারে পারে।

'গুরু' কষ্ট হ'লে 'কৃষ্ণ' রাখিবারে নারে ॥

গুরু—মাতা, গুরু—পিতা, গুরু হ'ন পতি।

গুরু বিমা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥

গুরুকে 'মল্লম্ব'-জ্ঞান না কর কখন।

গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥

গুরু-নিন্দকের মুখ কভু না হেরিবে।

যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না ঘাইবে ॥

* * *
গুরু-পাদপদ্মে যার রহে নিষ্ঠা-ভক্তি।

জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥

হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।

যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥

(হেন) গুরু-পাদপদ্ম নিত্য ঘে করে বন্দন।

শিরে ধরি' বন্দি আমি তাহার চরণ ॥

* * *
নামশ্রেষ্ঠং মল্লমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং

রূপং তস্যোগ্রজমুকপূরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা মাধবাশাং

প্রাপ্তো যশ্চ প্রথিতরূপয়া শ্রীগুরুং ভং নতোহস্মি ॥

বাংলাকল্পতরুভ্যাং কৃপাসিদ্ধুভ্যা এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস—

—শ্রীনিবদীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। কাঙ্ক্ষন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের স্তম্ভিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। সাধারণ ভাষাযোগে “শ্রীপত্রিকা” গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২৫.০০ টাকা ও বার্ষাসিক ১৫.০০ টাকা এবং আর্জীবন সদস্যপক্ষে ১০০.১০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সমস্ত প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-সম্বন্ধ উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৬। শ্রীমদ্বাহপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ইতিমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। মন-আলোচনা সর্বদা অদ্বন্দ্বীয়।
- ৭। কেনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’ অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গোড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০০০৯ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয় গীতগোবিন্দ, ৫। যাস্তাবাদ্যত্ব জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীমদ্বদীপনাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড), ৯। সংক্রিয়ামায়-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীশ্রীমদ্বদীপ-সংস্করণ, ১১। শ্রীমদ্বদীপনাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমদ্বাহপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। চৈববংগ (বাংলা ও হিন্দী), ১৪। বিদ্যাপ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরবিষ্ণু, ১৬। সূক্তন-দীপিকা, ১৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যজীলা ও শিক্ষা, ১৮। শ্রীগৌড়ীয়, ১৯। শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা, ২০। শ্রীকৃষ্ণদীপ-ব্রহ্মকা, ২১। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২২। উচ্চারের পথ, ২৩। শ্রীমদ্বদীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমদ্বদীপিকা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। শুদ্ধভক্তাবলী (যুক্তিভিত্তিক), ২৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৮। The Bhagavat, ২৯। Nam-Bhajan, ৩০। The Vedanta, ৩১। Vaishnavism, ৩২। Rā Ramananda, ৩৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রদ-ভক্তি, ৩৪। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পৰিচালিত
স্কন্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীধ্বানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পো: (নদীয়া) ।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পো: (হুগলী) ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কন্দলী, মথুরা পো:, (মথুরা), ইউ. পি. ।
- ৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পো:, (মথুরা) ইউ. পি. ।
- ৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পো:, (মথুরা) ইউ. পি. ।
- ৬। শ্রীভক্তিবোধান্ত গৌড়ীয় মঠ—দয়াল রোড, কল্লল পো:, (হরিদ্বার) ইউ. পি. ।
- ৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পো:, (পুরী), উড়িষ্যা ।
- ৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪ ।
- ৯। শ্রীগোলোকগঙ্গ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঙ্গ পো: (ধুবড়ী), আসাম ।
- ১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পো: ও জেলা কোচবিহার ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—হান্দিয়াহাট পো:, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা ।
- ১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পো:, (জলপাইগুড়ি) ।
- ১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পো:, (মেদিনীপুর) ।
- ১৪। শ্রীশিববাটী গৌড়ীয় মঠ—মিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পো:, (বর্ধমান) ।
- ১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পো:, (কোকড়াবাড়) আসাম ।
- ১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পো:, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয় ।
- ১৭। শ্রীশ্রামহাস্বর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পো:, (দাক্ষিণি) ।
- ১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পো: (কোচবিহার) ।
- ১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পো:, (নদীয়া) ।
- ২০। শ্রীত্রিগুণভীত লমামি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পো:, (নদীয়া) ।
- ২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেবাহাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

BOOK-POST SL. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office Pb : 55-7227

SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH

28, Halder Bagan Lane

Calcutta-700004